সাগরে মিলায় ডন

সাগরে মিলায় ডন

প্রথম খণ্ড

মিখাইল শলোখফ

অনুবাদ : রথীন্দ্র সরকার

*

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

মিখাইল শলোকফের "Don Flows Home To The Sea" কেবল বিপ্লবোত্তর সোবিয়েত সাহিত্যেই নয় সর্বকালের সর্বদেশের মহত্তম সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন।

নানা ভাষায় অনূদিত দেশে দেশে নন্দিত এই গ্রন্থখানার প্রথম খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে আমরা গর্ব ও আনন্দ অনুভব করছি। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদও আগামী বছরের মধ্যে প্রকাশ করতে পারব বলে আশা রাখি।

প্রসঙ্গত মুদ্রণ প্রমাদজনিত একটি ত্রুটীর দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২৬৪ পৃষ্ঠার পরে '২৬৫' পৃষ্ঠার জায়গায় '২৮১' পৃষ্ঠা ছাপা হওয়ায় পরবর্তী অংশে সেই পৃষ্ঠাংকই অনুসরণ করা হয়েছে। পৃষ্ঠাংকে ফাঁক পড়ে গেলেও উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গতা ও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পৃষ্ঠাংকে এই ভুলের জন্য সহৃদয় পাঠকদের মার্জনা চাইছি।

—প্রকাশক

॥ চরিত্র পরিচিতি ॥

আন্দ্রিয়ানভ, কর্নেল ॥ শ্বেতরক্ষী অফিসার। গ্রিগর মেলেখফের সেনাপতিদের প্রধান।
আনিকুশ্‌কা ॥ জনৈক কসাক।
আস্তাখফ, স্তেপান ॥ ঐ।
আস্তাখফ, আক্‌সিনিয়া ॥ স্তেপানের স্ত্রী।
বোগাতিরিয়েভ, পিয়োত্রা ॥ ডন কসাক বিদ্রোহীবাহিনীর ব্রিগেড নায়ক।
ফোমিন, ইয়াকফ য়েফিমোভিচ ॥ কসাক অফিসার, প্রথমে লালরক্ষী দলে; পরবর্তীকালে শ্বেতরক্ষী দস্যুদলের নেতা।
গরচাকভ, ক্যাপ্টেন ॥ শ্বেতরক্ষী অফিসার। লিস্তনিৎস্কার বন্ধু।
করশুনভ, গ্রিশাকা ॥ বৃদ্ধ কসাক।
করশুনভ, মিরন গ্রিগরেভিচ ॥ তার ছেলে; নাতালিয়া মেলেখভার বাবা।
করশুনভা, মারিয়া লুকিনিচ্‌না ॥ মিরনের স্ত্রী।
করশুনভ, দিমিত্রি মিরনোভিচ (মিৎকা) ॥ মিরন ও মারিয়া করশুনভের ছেলে।
করশুনভ, আগ্রিপিনা মিরনভ্‌না ॥ মিরন ও মারিয়ার মেয়ে।
কশেভয়, মিখাইল (মিশ্‌কা) ॥ লালরক্ষী কসাক।
কৎলিয়ারভ, ইভান আলেক্সিয়েভিচ ॥ ঐ।
কুদীনভ ॥ ডন কসাক বিদ্রোহীবাহিনীর সেনাপতি।
লিস্তনিৎস্কি, নিকোলাই আলেক্সিয়েভিচ ॥ জমিদার।
লিস্তনিৎস্কি, ইভজিন নিকোলায়েভিচ ॥ নিকোলাইয়ের ছেলে। শ্বেতরক্ষী অফিসার।
মেলেখফ, পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ ॥ প্রবীণ কসাক।
মেলেখভা, ইলিনিচ্‌না ॥ পান্তালিমনের স্ত্রী।
মেলেখফ, পিয়োত্রা পান্তালিয়েভিচ ॥ পান্তালিমনের বড়ো ছেলে। কসাক অফিসার।
মেলেখফ, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ (গ্রিশ্‌কা) ॥ পান্তালিমনের ছোট ছেলে। কসাক অফিসার। কসাক বিদ্রোহী ফৌজের নায়ক।
মেলেখভা, ইকেভদকিয়া পান্তালিয়েভ্‌না (দুনিয়া) ॥ পান্তালিমনের মেয়ে।
মেলেখভা, দারিয়া ॥ পিয়োত্রা মেলেখফের স্ত্রী।
মেলেখভা, নাতালিয়া ॥ গ্রিগর মেলেখফের স্ত্রী।
মেলেখফ, মিশাৎকা ॥ গ্রিগর ও নাতালিয়ার ছেলে।
মেলেখভা, পলিয়া (পলিউশ্‌কা) ॥ গ্রিগর ও নাতালিয়ার মেয়ে।
রিয়াব্‌চিকভ, পল্টন ॥ কসাক বিদ্রোহী ফৌজের নায়ক।
সেক্রেতভ, জেনারেল ॥ শ্বেতরক্ষী ভলান্টিয়ার বাহিনীর সেনাপতি।
শামিল, মার্তিন ও আলেক্সি ॥ কসাক ভ্রাতৃদ্বয়।
স্তকমান, ওসিপ দাভিদোভিচ ॥ কমিউনিস্ট সংগঠক।
ভোকিন, ক্রিস্তোনিয়া ॥ বুড়ো কসাক।
ইয়েরমাকফ, খারলাম্‌পি ॥ কসাক বিদ্রোহী রেজিমেন্টের নায়ক।
জাইকফ, প্রোখর ॥ কসাক। গ্রিগর মেলেখফের আরদালি।

॥ এক ॥

ডন থেকে উক্রেইন হয়ে জার্মানি—লম্বা লম্বা সার বেঁধে ট্রাক চলেছে ময়দা, মাখন, ডিম আর গরুভেড়া নিয়ে। প্রত্যেক ট্রাকে সঙীন উঁচিয়ে একেকজন জার্মান সেপাই পাহারা, নীল-ধূসর উর্দি পরা, মাথায় চ্যাপটা গোল টুপি। গোড়ালিতে লোহার নাল-আঁটা হলদে জার্মান-বুট ডনের পথ মাড়িয়ে এসেছে। ব্যাভেরিয়ান ঘোড়সওয়ার-ফৌজ ডন-নদীতে ঘোড়া নামিয়ে তাদের জলও খাইয়েছিল। কিন্তু ডন-উক্রেইন সীমান্তে তখন জোয়ান কসাকরা হাতিয়ারবন্দ্ হয়ে লড়ছে পেৎলুরার বাহিনীর সঙ্গে। স্তারোবিয়েলস্কের কাছে বারো নম্বর ডন কসাক ফৌজের প্রায় অর্ধেকটাই লড়াইয়ে সামিল হল—উক্রেইন এলাকার আরো খানিকটা চলে গেল তাদের দখলে। ডন প্রদেশের উত্তরে বলশেভিকরা পেছু হটে যাচ্ছিল। নতুনভাবে সাজিয়ে, নভোচেরকাস্ থেকে অফিসারদের এনে দলে ভর্তি করে শ্বেত বাহিনীকে এবার বেশ পাকাপোক্ত জঙ্গী ফৌজের মতোই দেখাচ্ছে। বিভিন্ন জেলা থেকে পাঠানো ছোট ছোট ফৌজীদলকে একসঙ্গে মেলানো হল, স্থায়ী পল্টনদলগুলোকে নতুনভাবে গড়ে তাদের জার্মান-যুদ্ধের আমলের পুরনো বেঁচে-যাওয়া হাতিয়ার দিয়ে সাজানো হল, বিভিন্ন ডিভিশনে ভাগ করা হল ফৌজকে, নিশান-বরদারদের জায়গায় আবার আগেকার কর্নেলদের বসানো হল, এমন কি অধিনায়ক অফিসারদের পর্যন্ত আস্তে আস্তে বদলি করে দেওয়া হল।

গ্রীষ্মের শেষাশেষি এদের বাহিনী ডন সীমান্ত পার হয়ে ভরোনেঝ্ প্রদেশের সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রামগুলো দখল করে নিলে।

* *

চারদিন ধরে পিয়োত্রা মেলেখফের পরিচালনায় কসাকদের একটা স্কোয়াড্রন এগিয়ে চলেছে উত্তরদিকে, গ্রামের পর গ্রাম আর জেলা পার হয়ে। ওদের ডানদিকেই কোনো এক জায়গায় মিরোনোভের লালরক্ষীরা লড়াইয়ের ঝুঁকি না নিয়ে কেবল পেছু হটে রেলরাস্তার দিকে সরে যাচ্ছে। কসাকরা তাদের চলার পথে শত্রুর কোনো চিহ্নও দেখতে পায়নি। এক নাগাড়ে খুব বেশি এগোলো না ওরা : পিয়োত্রা আর সেই সঙ্গে অন্য সব কসাকরাও স্থির করে ফেলেছে শুধু-শুধু মরণের দিকে ছুটে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না, এ নিয়ে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠেনি।

পাঁচদিনের দিন ওরা খপার নদী পার হল। ঘেসো জমির ওপর মস্‌লিনের পর্দার মতো এক ঝাঁক মাছি পড়েছে, কাঁপা-কাঁপা গুন্‌গুন্ আওয়াজ উঠছে একটানা।

ঘোড়া আর সওয়ারদের কানে চোখে উড়ে এসে পড়ছে মাছিগুলো। ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘোড়াগুলো মাথা ঝাঁকাচ্ছে। কসাকরা হাত নাড়ছে আর কেবলই দিশি তামাকের চুরুট টেনে চলেছে।

ক্রিস্তোনিয়ার পাশাপাশি চলেছে গ্রিগর। তাতারস্ক্ ছাড়ার পর থেকেই ওরা দুজন একসঙ্গে। ওদের সঙ্গে আনিকুশ্‌কাও এসে জুটেছে। গেল ক'হপ্তায় আনিকুশ্‌কা যেন আরো মোটা হয়েছে, আগের চেয়েও মেয়েলিপানা হয়েছে চেহারাটা।

স্কোয়াড্রনে সেপাই বোধহয় একশোও হবে না। পিয়োত্রার সহকারী হল সার্জেণ্ট-মেজর লাতিশেভ, তাতারস্কের এক পরিবারে বিয়ে হয়েছে ওর। গ্রিগরের হেপাজতে একটা ফৌজী দল। ওর দলের কসাকরা প্রায় সবাই এসেছে গ্রামের শেষ প্রান্ত থেকে: ক্রিস্তোনিয়া, আনিকুশ্‌কা, প্রোখর জাইখভ, আরো জনাকুড়ি জোয়ান কসাক। আরেকটা ফৌজীদলের অধিনায়ক মিৎকা করশুনভ। সেনাপতি আলফেরভ স্বয়ং তাকে সিনিয়র সার্জেণ্টের পদে উন্নীত করেছেন।

পাশাপাশি যাচ্ছিল পিয়োত্রা মেলেখভ আর লাতিশেভ। কসাকরা নিজেদের মধ্যে গালগল্প করছে আর মাঝে মাঝে সারি ভেঙে পাশাপাশি পাঁচজনও চলেছে। কেউ কেউ মনোযোগ দিয়ে অজানা অচেনা এই দেশটাকে দেখে নিচ্ছে,—মেঠো জমি, তারি মাঝে মাঝে বসন্তের দাগের মতো একেকটা দীঘি, বেতসলতার সবুজ বেড়া আর দূরে দূরে পপ্‌লার গাছ। ওদের সাজপোশাক দেখলেই মনে হয় দীর্ঘ অভিযানে বেরিয়েছে ওরা। জিনের ঝুলিগুলো কাপড়চোপড় আর জিনিসপত্রে ঠাসা, জোব্বাকোট সযত্নে ভাঁজ করে জিনের পেছনে ফিতে দিয়ে বাঁধা। ঘোড়াদের সাজের প্রতিটি ফিতে মোম দিয়ে ভালো করে ঘষা, প্রত্যেকটা জিনিসই নিখুঁত, দুরস্ত। এক মাস আগেও ওদের নিশ্চিত ধারণা ছিল যুদ্ধ হবে না, কিন্তু এখন রক্তপাত আর এড়ানো যাবে না মুখ বুজে সেটা মেনে নিয়েই ওরা ঘোড়ায় চেপেছে।

একটা গ্রামের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ওরা—কুঁড়েঘরগুলো খড়ের চাল দিয়ে ছাওয়া। আনিকুশ্‌কা পাৎলুনের পকেট থেকে ঘরে-তৈরি কিছু মিষ্টি খাবার বের করে অর্ধেকটা কামড়ে নিয়ে চিবুতে লাগল। খরগোশের মতো চোয়াল দুটো নড়ছে।

ক্রিস্তোনিয়া ওর দিকে তাকাল—খিদে পেয়েছিল?

—পাবে না কেন...আমার বউয়ের হাতের তৈরি।

—হাবাতের মতো গিলতেও পারিস! ক্রিস্তোনিয়া গজ্‌গজ্ করতে করতে চটা মেজাজে বললে—মুখ চালা, হতভাগা মেলেচ্ছ! ঢোকাবার জায়গা পাস্ কোথায় এত? গ্রিগরের দিকে মুখ ফেরাল ক্রিস্তোনিয়া—আজকাল ওকে দেখলেও ভয় হয়। চেহারাটা মোটেই দশাসই নয়, অথচ দেখলে মনে হয় এই বুঝি ফেটে পড়বে।

তমিলিন চেঁচাল—পিয়োত্রা পান্তেলিয়েভ, রাতটা কোথায় কাটাব আমরা? পিয়োত্রা চাবুক ঘোরাল।

—সামনের গাঁয়েও হতে পারে, আবার কুমিলঝেন্‌স্ক্-এর দিকেও এগিয়ে যেতে পারি।

কোঁকড়া কালো দাড়ির ফাঁক দিয়ে হাসল মেরকুলভ, তমিলিনের কানে কানে বললে :

—আলফেরভের সুনজরে পড়তে চেষ্টা করছে শুয়োরটা! তাই তাড়াহুড়ো লাগিয়েছে!

রাতে সামনের গাঁয়েই কাটাল ওরা। ভোর হতেই আবার রওনা হল কুমিল্‌-ঝেন্‌স্কের দিকে। কিন্তু কিছুদূর এগোবার পরই এক সংবাদবাহক এসে ধরল ওদের। পিয়োত্রা লোকটার পুলিন্দাটা খুললে। চিঠি পড়তে পড়তে জিনের ওপর বসে দুলতে

লাগল সে, কাগজটা এমনভাবে চেপে ধরে আছে যেন সেটা কোনো ভারী জিনিস। গ্রিগর ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে এল কাছে।

বললে—হুকুম এলো কোনো?

—হ্যাঁ!

—কি বলেছে?

—স্কোয়াড্রনটা আমার হাতছাড়া করে দিতে হচ্ছে। আমার মতো চাকরির মেয়াদ যাদের তাদের সবাইকে ডাকা হয়েছে, আমাদের দিয়ে আটাশ নম্বর রেজিমেণ্ট তৈরি হবে। গোলন্দাজ আর মেশিনগান-সেপাইরাও যাবে। চিঠিতে বলছে ঃ তোমাদের আটাশ নম্বর রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের হেপাজতে যেতে হবে।...এই মুহূর্তে রওনা হও..। এই মুহূর্তে!

দলের দিকে ফিরে সে চেঁচাল ঃ আগে বাড়ো! কসাকরা কদম চালে এগোলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে, স-মনোযোগে লক্ষ্য করতে লাগল পিয়োত্রাকে, কখন সে কথা বলে। কুমিলঝেনস্কে এসে পিয়োত্রা হুকুমনামাটা শুনিয়ে দিল। যেসব কসাক আগে ফৌজে নাম লিখিয়েছিল তারা এবার ফেরার জন্য হৈ-হল্লা করে তৈরি হতে লাগল। রাতটা ওরা কুমিল্‌ঝেন্‌স্কেই কাটাবে ঠিক করেছে, পরদিন সকালে দল ভেঙে যে যার আলাদা আলাদা রাস্তায় রওনা হবে। সারাদিন পিয়োত্রা সুযোগ খুঁজেছে ওর ভাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করার। এবার সে চলল ওর আস্তানায়।

গ্রিগরকে ডাকলে—এসো না বাইরের উঠোনে।

গ্রিগর নীরবে ওর পেছু-পেছু বেরিয়ে আসে। মিৎকা করশুনভও দৌড়ে ছুটে আসছিল, কিন্তু পিয়োত্রা নীরস গলায় বললে—

—কেটে পড়ো মিৎকা! ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

গ্রিগর আড়চোখে পিয়োত্রার দিকে তাকায়, তাকিয়েই বুঝে ফেলে ওর মনের মধ্যে কিছু রয়েছে। আলাপটাকে ও একটু হাল্‌কা দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

—খুব অদ্ভুত না! দেশ ছেড়ে মাত্র এই একশো মাইল এলাম, অথচ মানুষজন একেবারে অন্য জাতের। এরা আমাদের ভাষায় কথা বলে না, আমাদের মতো বাড়িঘরও নয় এদের। ওই দ্যাখো, একটা ফটকের ওপর চালা দেওয়া, ঠিক মঠবাড়ির মতো। আমাদের তো ওরকম নয়। আবার ওই যে! একটা কুঁড়েঘরের দিকে আঙুল দেখায় সে—ওবাড়িটার কার্নিশের ওপর ছাউনিও রয়েছে। বোধহয় কাঠগুলো যাতে না পচে সেইজন্য, তাই না?

চুপ্‌ কর্‌ তো!—পিয়োত্রা ভুরু কোঁচকায়—ওসব কথা বলতে আমরা এখানে আসিনি।

অধৈর্য হয়ে ভ্রূকুটি করে গ্রিগর বলে—তাহলে কি নিয়ে আলোচনা করতে চাও?

—সবকিছু নিয়ে। পিয়োত্রা অপরাধীর মতো হাসে, ব্যথামলিন হাসি। জুলফির ডগাদুটো দাঁতে চেপে ধরে।—যা দিনকাল পড়েছে গ্রিশ্‌কা, আবার হয়তো তোতে আমাতে দেখা নাও হতে পারে।...

ভায়ের ওপর গ্রিগরের যে অবচেতন বিদ্বেষের অনুভূতিটুকু ছিল এবার হঠাৎ তা কেটে যায়। পিয়োত্রার কথায়, ওর ম্লানকরুণ হাসিতে মুছে যায় তা। বেদনাময় হাসিটা ওর ঠোঁটের কোণে যেন জমে বসে গেছে। পিয়োত্রা তাকিয়ে থাকে ভায়ের দিকে। ঠোঁটে একটা ভঙ্গি এনে হাসি চাপা দেয় ও; মুখটা ওর কঠিন হয়ে ওঠে। বলে ঃ

—হতচ্ছাড়াগুলো কিভাবে মানুষের ভেতর ভেদ এনে দিয়েছে দ্যাখ্! যেন লাঙল চালানো জমি একটা, একদিকে একদল, অন্যদিকে আর। কি জঘন্য জীবন, কি ভয়ানক দিনকাল। যেমন ধর্, তুই। আমার এক মায়ের পেটের ভাই তুই, অথচ তোকে বুঝে উঠতে পারি না, সত্যি বলছি! আমার মনে হয় যেন তুই ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিস। সত্যি কথাই, নারে? নিজেই ভালো করে জানিস। ভয় হয় তুই বুঝি বা লালদের দলেই চলে যাস্। গ্রিশ্কা, তুই এখনো নিজেকে চিনে নিতে পারিসনি।

—আর তুমি? গ্রিশ্কা প্রশ্ন করে। খড়িমাটির পাহাড়ের ওপাশে অস্তগামী সূর্যটার দিকে ও তাকিয়ে আছে; সারা পশ্চিম আকাশ আগুনের শেষ আঁচটুকুতে যেন গন্গনে লাল হয়ে উঠেছে।

—হ্যাঁ আমি চিনেছি। আমি আমার বাঁধা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। সেখান থেকে আমাকে হটাতে পারবি না। আমি তোর মতো হোঁচটও খাব না গ্রিগর।

—ওহো! হাসিতে ঠোঁটদুটো মোচড় খেয়ে গেল গ্রিগরের।

পিয়োত্রা চটে গিয়ে গোঁপে তা দিতে থাকে, যেন চোখে ধুলো পড়েছে এমনিভাবে চোখ পিটপিট করে—না হোঁচট আমি খাব না। আমায় তুই ওই লাল ফাঁসের দড়ির মধ্যে কিছুতেই টেনে নিতে পারবি না। কসাকরা ওদের ওপর খড়্গহস্ত, আমিও তাই। তর্ক আমি করতে চাই না, করবও না! এক রাস্তায় আমাদের চলা হবে না।

—এসব কথা ছাড়ান দাও! ক্লান্তভাবে বলে গ্রিগর, নিজের আস্তানার দিকে পা বাড়ায়। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে পিয়োত্রাঃ

—আমায় তুই বল্, জানতে চাই আমি।.. তুই বল্ গ্রিগর, ওদের দলে ভিড়বি না?

—জানি না।

ইতস্তত করে নিতান্ত অনিচ্ছায় জবাব দিলে গ্রিগর। পিয়োত্রা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন ভাইকে করে না। মনের মধ্যে তোলপাড় চলে ওর। গাল-দুটো বসে গেছে। ও আর গ্রিগর দুজনের কাছেই এখন বেদনাদায়কভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে—যে-পথ ওরা একসঙ্গে পেরিয়ে এসেছিল তা আজ হারিয়ে গেছে অভিজ্ঞতার দুর্গম অরণ্যে। ঠিক যেমন ঘোড়ার খুরের ঘষায় ঘষায় তৈরি রাস্তা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যায় নিচে আর একেবারে গভীর সানুদেশে গিয়ে হঠাৎ শেষ হয় বুনো ঝোপের মধ্যে।

* * *

পরদিন পিয়োত্রা স্কোয়াড্রনের অর্ধেক ফিরিয়ে নিয়ে এল ভিয়েশন্স্কাতে। বাদবাকি জোয়ান সেপাইরা গ্রিগরের হেপাজতে আরজেমভ্স্ক্ রওনা হল। সকাল থেকেই সূর্যের জ্বালাময় উত্তাপ। একটা বাদামি কুয়াশায় স্তেপের প্রান্তর ধু-ধু করছে। ওদের পেছনে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের নীল রেখা। জাফরানী রঙের বন্যার মতো বালি ছড়ানো। ঘোড়াগুলো ঘেমে উঠে দুলে দুলে চলেছে কদম চালে। কসাকদের মুখগুলো বাদামি, রোদের তাপে রাঙা হয়ে ওঠা। জিনের চুড়ো, রেকাব আর লাগাম এমন তেতে উঠেছে যে শুধু-হাতে সেগুলো ছোঁয়াই যায় না। এমনকি বনের ভেতরেও ঠাণ্ডা নেই ঃ সেখানেও বাষ্পের ভাপ, বৃষ্টির ঝাঁঝলো গন্ধ ম-ম করছে।

একটা ভোঁতা কামনার অনুভূতি গ্রিগরকে পীড়া দিচ্ছিল। সারাদিন জিনের ওপর

বসে দুলুনি খেতে খেতে   কথাই ভেবেছে ছাড়া-ছাড়াভাবে। পিয়োত্রার কথাগুলো ওর কানে বাজছিল কাঁচের মালার পংক্তির মতো। সোমরাজের তেতো স্বাদ ওর ঠোঁটে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। গরমে রাস্তা থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। সূর্যের নিচে সোনালি-বাদামি স্তেপভূমির পূর্ণ বিস্তার। শুকনো হাওয়া হা-হা করে ছুটেছে ধুলো উড়িয়ে।

সন্ধ্যের দিকে একটা আবছা কুয়াশা সূর্যটাকে ঢেকে ফেলে। আকাশ প্রথমে ফ্যাকাশে, তারপর ধূসর হয়ে যায়। বিমর্ষ মেঘ ঘনিয়ে আসে পশ্চিমে. দিগন্তের সূক্ষ্ম প্রান্ত রেখায় এসে প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে ঝুঁকে থাকে। তারপর, বাতাসের বেগের মুখে তারা ভেসে আসে ভয়াল রূপ নিয়ে, বাদামি পুচ্ছরেখাকে অতিরিক্ত নিচে টেনে আনে, কিনারাগুলো হয়ে ওঠে চিনির মতো সাদা।

ফৌজীদলটা একটা ছোট্ট নদী পার হয়ে পপ্‌লার বনের ভেতর ঢুকে পড়ে। হাওয়ার দাপটে গাছের পাতা উল্টে গিয়ে ভেতরের সাদা-নীল দিকটা উঁকি দেয়, গভীর মর্মর ধ্বনি জাগে পাতায় পাতায়। খপার নদীর ওপারেই কোথাও মেঘের সাদা পাড় বেয়ে তেরছা শিলাবৃষ্টির ধারা ছড়িয়ে পড়ছে, আর তারই পর্দায় ফুটে উঠেছে রামধনুর বিচিত্র বর্ণলেপ।

একটা ছোট্ট নির্জন পল্লীতে রাত কাটায় ওরা। ঘোড়াটাকে দেখাশুনা করে গ্রিগর ওর নিজের আস্তানার বাগানে গিয়ে ঢোকে। গৃহকর্তা বয়স্ক কসাক, চুলগুলো কোঁকড়া। ব্যগ্রভাবে বলে ঃ

দেখেছ ওই মৌচাকটা? এই সেদিন মাছিগুলো কিনলাম অথচ কেন জানি সব বাচ্চাগুলো মরে যাচ্ছে। ওই দ্যাখো অন্য মাছিরা ওদের টেনে বের করছে।—কাঠের গুঁড়ির ওপর একটা চাক, ওরা এসে দাঁড়ায় সেখানে। ফোকরটার দিকে আঙুল দেখায় লোকটা। চাপা গুন্‌গুন্‌ আওয়াজ তুলে মৌমাছিগুলো বাচ্চাদের টেনে বের করে নিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে।

বাড়ির কর্তা সক্ষোভে চোখদুটো কুঁচকে অতি দুঃখে চুম্‌কুড়ি কাটে। লোকটা ঝুঁকে ঝুঁকে চলে, হাত দুটো জোরে জোরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দোলায়। গ্রিগর কেমন-যেন একটা অপছন্দের ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

রান্নাঘরে বসে গ্রিগর চা খাচ্ছিল, পুরু আঠার মতো চট্‌চটে মধু দিয়ে মিষ্টি করা হয়েছে চা-টুকু। মধুতে গাছগাছড়া আর মেঠো ফুলের মিষ্টি সুবাস। চা ঢালছিল কর্তার মেয়ে—দীঘল গড়ন সুন্দরী। সৈনিকের বউ। ওর স্বামীটি লাল সৈন্যদের সঙ্গে পেছু হটে গেছে, তাই ওর বাপ ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না, আপোসে শান্তিতে থাকতে চায়। মেয়ে যে চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে গ্রিগরকে ক্ষিপ্র কটাক্ষে দেখে নিচ্ছিল তা বাপের নজরে পড়েছে মনে হল না। চায়ের কেতলি নেবার জন্য মেয়েটি যখন হাত বাড়িয়েছে, গ্রিগরের দৃষ্টি পড়ল ওর বগলের চিকচিকে কালো কোঁকড়া চুলের উপর। ওর সন্ধানী উৎসুক চাউনির সঙ্গে অনেকবারই চোখ মিলল গ্রিগরের। মনে হল যেন চোখে চোখ মিলতেই মেয়েটি লাল হয়ে উঠেছে, আবেগোষ্ণ হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে।

চায়ের পর্ব শেষ হতে মেয়েটি বললে—সামনের ঘরে তোমার বিছানা করে দেব।—কম্বল আর বালিশ আনতে গেল সে। যাবার সময় একেবারে সরাসরি ক্ষুধার্ত একটা কটাক্ষ হেনে গ্রিগরকে যেন পুড়িয়ে দিয়ে গেল। বালিশটাকে থাবড়া দিয়ে ফোলাতে ফোলাতে ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনিভাবে মেয়েটি তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বললে—আমি শুই চালাটার নিচে। ঘরের ভেতর বড্ডো গুমোট আর মশা কামড়ায় কিনা...।

গ্রিগর শুধু ওর বুটজোড়া খুলে রাখে। তারপর বুড়ো কসাকটার নাক ডাকার

আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র চালার নিচে মেয়েটির কাছে চলে যায়। পাশে গ্রিগরের শোবার জায়গা করে দিয়ে মেয়েটি ভেড়ার চামড়াখানা টেনে নেয় নিজের ওপর। তারপর চুপচাপ শুয়ে থাকে পা দিয়ে গ্রিগরকে ছুঁয়ে। ঠোঁটদুটো ওর শুকনো, খস্‌খসে, পেঁয়াজের গন্ধ মাখা, আর একটা স্পর্শাতীত তরতাজা ভাব তাতে। ওর কালচে পেলব দুটো বাহুর আশ্রয়ে শুয়ে থাকে গ্রিগর সেই রাতভোর অবধি। সারা রাত গ্রিগরকে সে সজোরে নিজের দেহের ওপর চেপে রেখেছে, অতৃপ্তের মতো সোহাগ করেছে, হাসি তামাশা করে ওর ঠোঁট কামড়ে দিয়েছে যতক্ষণ না রক্ত বেরিয়ে আসে। গ্রিগরের গলায়, বুকে, কাঁধে ওর চুমু-কামড়ের নীল দাগ আর চমৎকার দাঁতের ছোট ছোট চিহ্ন বসে গেছে। রাত তিনপহর হয়ে যাবার পর গ্রিগর ঘরে যাবে বলে ওঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু মেয়েটি ওকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

—যেতে দাও লক্ষ্মীটি, এবার ছাড়ো, আমার ছোট্ট সোনামণি!—গোঁফের কোণায় মুচকি হেসে গ্রিগর সাধাসাধি করে, আলতোভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে।

—আরেকটু থাকো না...শোও।

—কিন্তু আমাদের দেখে ফেলবে যে। এক্ষুণি তো আলো হয়ে যাবে।

—দেখুক গে'।

—কিন্তু তোমার বাবা?

—বাবা জানে।

—তার মানে? অবাক হয়ে ভুরু উঁচোয় গ্রিগর।

—ও, জানো না বুঝি...কালই তো বাবা আমাকে বলে দিল যদি অফিসারটা চায় তাহলে যেন তার সঙ্গে শুই, না হলে আবার আমার স্বামীর কসুর দেখিয়ে ঘোড়াখানা কেড়ে নেবে, কিংবা, আরো খারাপ কিছু করবে...আমার স্বামী তো আবার লালফৌজে চলে গেছে কিনা।

—ও, এই ব্যাপার! সকৌতুকে হাসে বটে গ্রিগর, তবু মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ বোধ করে।

ওর অসুখী ভাবটাকে অবশ্য কাটিয়ে দেয় মেয়েটিই। সোহাগভরে ওর হাতের পেশীগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকে। শিউরে উঠে বলেঃ

—আমার স্বামী কিন্তু তোমার মতো নয়..

—কিসের মতো তাহলে? ফর্সা হয়ে-আসা আকাশের চাঁদোয়াটার দিকে নেশা কাটিয়ে-ওঠা চোখদুটো রেখে গ্রিগর জিজ্ঞেস করে।

—কোনো কাজের নয়...কাহিল মানুষ। পরম আস্থাভরে গ্রিগরের কোলের কাছে জড়োসড়ো হয়ে মেয়েটা বলে। ওর গলায় শুকনো কান্নার আভাস।—এতদিন কাটালাম ওর সঙ্গে, জীবনে মিঠে স্বাদটুকু পেলাম না। মেয়েমানুষের চাহিদা মেটাবে এমন লোক নয় সে।

অজানা অচেনা, ছেলেমানুষের মতো সরল একটি প্রাণ কতো সহজে নিজেকে মেলে ধরছে গ্রিগরের চোখের সামনে, যেমন অনায়াসে ছোট্ট শিশিরভেজা একটা ফুল তার পাঁপড়ি মেলে ধরে। গ্রিগরের নেশা ধরে যায়, ওর প্রাণটা যেন উথলে ওঠে। নতুন-পাওয়া বন্ধুটির এলোমেলো চুলে আদর করে হাত বোলায় ও, আর ক্লান্ত চোখদুটো বোজে।

খড়ের চালার ফাঁক দিয়ে ম্রিয়মান চাঁদের আলো গলে আসছে। একটা ছুট্‌তারা

সবেগে ছুটে দিগন্তের দিকে, ছাইরঙা আকাশের তারই একটা মুমূর্ষু আলোরেখা আঁকা হয়ে রইল। পুকুরে একটা মাদী হাঁস ডাকছে প্যাঁক প্যাঁক করে, আর নরটা আসঙ্গ কামনায় ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে সাড়া দিচ্ছে।

নিজের ঠাণ্ডা দেহটাকে আলগোছে টেনে নিয়ে গ্রিগর চলে কুঁড়েঘরের দিকে। একটা আরামভরা ঝিম্‌ঝিম্ ক্লান্তিতে শরীর যেন ভরে উঠেছে। ঠোঁটে মেয়েটির ঠোঁটের নোন্‌তা আস্বাদটুকু নিয়েই ও ঘুমিয়ে পড়ে, সযত্নে মনে করে রাখে কসাক যুবতীর উদগ্র দেহ আর দেহগন্ধের স্মৃতিঃ সে গন্ধে মিশে একাকার হয়েছে বুনো মধু, ঘাম আর স্নিগ্ধ উষ্ণতা!

দুঘণ্টা বাদে দলের কসাকরা এসে ঘুম ভাঙালো গ্রিগরের। প্রোখর জাইকভ ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ফটকের বাইরে নিয়ে আসে। বাড়ির কর্তাকে বিদায়সম্ভাষণ জানায় গ্রিগর। লোকটার একরোখা দৃষ্টির সঙ্গে মেলে গ্রিগরের বিদ্বেষভরা চাউনি। মেয়েটি ঘরে ঢোকার সময় গ্রিগর ওকে দেখে মাথা নোয়াল। মাথাটা ঝুঁকিয়ে হাসল মেয়েটি। হাসির আড়ালে ওর পাতলা ঠোঁটদুটোর কোণায় জেগে উঠেছে একটা দুর্বোধ্য ব্যথাবিধুর তিক্ততা।

ঘোড়ায় চেপে পাশের গলি ধরে এগিয়ে গেল গ্রিগর পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে। যে বাড়িটায় ও রাত কাটিয়েছিল তারই পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে গলিটা। গ্রিগর দেখল বেড়ার ওপর দিয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সেই মেয়েটি যাকে ও উষ্ণ আলিঙ্গন দিয়েছিল। হাতের তেলোয় চোখ আড়াল করে রেখেছে। একটা অপ্রত্যাশিত কামনাব্যাকুলতায় গ্রিগর ফিরে তাকায়, ওর মুখের ভাবটা বুঝতে চেষ্টা করে, ওর সমগ্র অবয়বকে উপলব্ধি করে নিতে চায়। কিন্তু পারে না। শুধু দেখতে পায় ওর মাথাটুকু, মেয়েটির চোখ ওকে অনুসরণ করে চলেছে—সূর্যের ধীর অর্ধবৃত্তাকার গতিকে যেমন অনুসরণ করে সূর্যমুখী।

॥ দুই ॥

*

১৯১৮ সালের এপ্রিল মাস। ডন প্রদেশে একটা প্রকাণ্ড ভাগাভাগি ঘটে গেল। উত্তরের জেলাগুলোয় যুদ্ধরত কসাকরা লালরক্ষী ফৌজীদলগুলোর পেছু হটার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও অবসর নিয়েছে। এদিকে দক্ষিণের জেলাগুলোয় কিন্তু কসাকরা তাদের তাড়িয়ে একেবারে প্রদেশের সীমান্ত অবধি ঠেলে নিয়ে চলল আর প্রতিপদেই লড়তে লাগল তাদের দেশ উদ্ধার করার জন্য।

এই বিরাট ভাগাভাগিটা সম্পূর্ণ হল ১৯১৮ সালেই প্রথম। অথচ এর সূত্রপাত হয়েছিল একশো বছর আগে। উত্তরের গরিব কসাকদের না ছিল ফসলভরা জমি,

না ছিল আঙুরের ক্ষেত; শিকার করা বা মাছধরারও তেমন ভালো জায়গা ছিল না তাদের। মাঝে মাঝেই তারা এলোপাথাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ত বৃহৎ-রাশিয়ার জেলাগুলোর ওপর। সেই স্তেঙ্কা রাজিনের আমল থেকে ওরাই ছিল সবরকম বিদ্রোহীদের আসল ঘাঁটি। এমনকি পরের যুগেও যখন জারের স্বেচ্ছাতন্ত্রের চাপে সারা প্রদেশে বিক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে তখন এই উত্তর এলাকার কসাকরাই খোলাখুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের সর্দার আতামানদের হুকুমে সম্রাটের ফৌজের সঙ্গে লড়েছে; ডন এলাকায় কারাভান লুট করে, প্রদেশময় অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জার সরকারকে কাঁপিয়ে তুলেছে।

১৯১৮ সালের মে মাসের গোড়াতেই ডন প্রদেশের তিনভাগের দু'ভাগ বলশেভিকদের হাতছাড়া হয়ে গেল। যাহোক কোনোরকম একটা স্থানীয় সরকার খাড়া করা তখন একান্তই দরকার হয়ে পড়েছে। ডনের অস্থায়ী সরকারের সদস্য আর জেলা ও গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১১ই মে তারিখে একটা সভা হবে ঠিক হল। ভিয়েশেন্স্কা জেলার এক সভায় পান্তালিমন মেলেখভকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হল। মিরন করশুনভের সঙ্গে ৬ই মে ভোরবেলায় সে রওনা হল মিলেরোভোর দিকে যাতে ঠিক-সময়ে নভোচেরকাসে হাজির হতে পারে। মিরন ওর সঙ্গে মিলেরোভো চলেছে প্যারাফিন, সাবান আর ঘর-কন্নার কিছু টুকিটাকি সওদা করবে বলে, তাছাড়া মখোভের পেষাইকলের জন্য দু'চারটে চালুনি কিনে দিয়ে সামান্য কিছু রোজগার করবার ইচ্ছেও আছে।

মিরন করশুনভের কুচকুচে কালো ঘোড়াদুটো অনায়াসেই হাল্কা গাড়িটাকে টেনে নিয়ে চলে। রংচঙে বেতের ঝুড়ির মধ্যে পাশাপাশি বসেছে দু'জন। গাঁয়ের পাশের পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যায় ওরা, তারপর আলাপ শুরু করে। মিলেরোভোতে জার্মানদের ঘাঁটি বসেছে, তাই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করে মিরনঃ

—জার্মানরা আমাদের ঠ্যাঙানি দেবে বলে মনে হয়? বেটারা কিন্তু শয়তানের ঝাড়।

—না, না। পান্তালিমন ওকে আশ্বস্ত করে—এই তো সেদিন মাৎভেই কাশুলিন মিলেরোভো থেকে ঘুরে এল। ও বলল জার্মানরা বড়ো ভয় পায়। কসাকদের গায়ে হাত তোলার সাহস নেই ওদের।

মিরন দাড়ির ফাঁক দিয়ে হাসে আর চেরীকাঠের ছড়িখানা নাড়াচাড়া করে। মনটা এবার বেশ হাল্কা হয়েছে মনে হয়। অন্য বিষয় নিয়ে আলাপ করতে থাকে।

—কেমন গভর্নমেণ্ট তৈরি করবেন ঠিক করেছেন? প্রশ্ন করে ও।

—একজন আতামান থাকবে। আমাদের ভেতর থেকেই কেউ। কসাক আর কি!

—ভগবান্ করুন তাই হোক। ভালো দেখে একজনকে বেছে নেবেন। জিপ্সিরা যেমন ঘোড়ার চাল দেখে ঘোড়া কেনে, তেমনি বাজিয়ে নেবেন প্রত্যেকটি জেনারেলকে।

—নেবই তো। ডনে এখনো মগজওয়ালা লোকের অভাব ঘটেনি।

দু'জনেই চুপ করে যায়। হাল্কা হাওয়ায় পিঠ ঠান্ডা হয়ে আসে ওদের। পেছনে ডন নদী বরাবর ভোরের ঝল্মলে আভা যেন নীরবে, অপরূপ করে, রাঙিয়ে দিচ্ছে অরণ্য, প্রান্তর, হ্রদ আর বনবীথি। একটা বালির ঢিবি হলদে তামার মতো দেখতে, বেঁটে বেঁটে ঝোপঝাড়ের ছায়া পড়েছে ঘষা পেতলের মতো।

সন্ধ্যায় মিলেরোভোতে পৌঁছায় ওরা, রাত কাটায় চেনাজানা এক উক্রেইনীয়ানের বাসায়। এলিভেটরের পাশে থাকে সে। পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর পান্তালিমন চলে যায় রেলস্টেশনে; আর মিরন ঘোড়াদুটোকে গাড়িতে জুতে বাজারের দিকে রওনা

হয়। লেভেল ক্রসিংটা নিরাপদে পার হয়ে এসে জীবনে এই প্রথম সে দ্যাখে জার্মানদের। তিনটে জার্মান ল্যান্ট্স্টুরমার সেপাই সোজা এগিয়ে আসছিল ওর দিকেই। ওদের মধ্যে বেঁটে, ঘনদাড়িওয়ালা একজন হাত নেড়ে ইশারা করল।

চিন্তিতভাবে ঠোঁট কামড়ে মিরন ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। জার্মানরা এসে দাঁড়াল ওর সামনে। ঢ্যাঙা হোঁৎকা চেহারার একজন প্রাশিয়ান মুচ্কি হেসে বললে—

—এই দ্যাখ্ রে একটা খাঁটি জলজ্যান্ত কসাক! আবার কসাক পোশাকও পরেছে! হয়তো বা দেখা যাবে এর ছেলেই আমাদের সঙ্গে লড়েছে। আয় এটিকে জ্যান্ত পাঠিয়ে দি বার্লিনে। বেশ অদ্ভুত এক দেখবার মতো চীজ্ হবে কিন্তু।

আরেকজন বললে—আমাদের দরকার ঘোড়া; এ বেটা চুলোয় যাক্!—সাবধানে ঘোড়াগুলোর মাথার কাছ দিয়ে ঘুরে লোকটা গাড়ির দিকে এগোলো।

—এই বুড়ো, নেমে আয়! তোর ঘোড়াগুলো চাই, মিল থেকে স্টেশনে ময়দা বয়ে নিয়ে যাবে। ময়দাকলের দিকে আঙুল দেখাল লোকটা, আর মিরনকে নামতে বলল এমন ভঙ্গি করে যে, তার মানে বুঝতে আর বাকি থাকে না। আর দুটি সাগরেদ ঘুরে হেঁটে চলল ময়দাকলের দিকে আর পেছন ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসতে লাগল। ফ্যাকাশে-হলদে হয়ে গেছে মিরন। চট্ করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে ও ঘোড়াগুলোর মাথার কাছে আসে নিজেই টেনে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু জার্মানটা ঠোঁট কুঁচকে মিরনের জামার হাতা চেপে ধরে, ইশারায় ওকে ফিরে যেতে বলে।

ছেড়ে দাও!—নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় মিরন, চেহারাটা ওর আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—পাবে না আমার ঘোড়া! মিরনের গলার স্বরেই জার্মানটা বোঝে ওর জবাবের ধরনটা কি। দাঁত খিঁচিয়ে লোকটা তাকিয়ে থাকে কসাকের দিকে, মাতব্বরী চালে গলা চড়িয়ে ধমকায়। কাঁধে ঝোলানো রাইফেলের ফিতে চেপে ধরে। কিন্তু মিরনেরও তখন জোয়ান বয়েসের কথা মনে পড়ে গেছে। ধাঁ করে লোকটার চোয়ালের ওপর একখানা ঘুষি মেরে বসল সে। জার্মানটা চিৎপাত হয়ে পড়ল। ফের উঠবার চেষ্টা করতেই মিরন আরেকটা ঘুষি ঝেড়ে দিল তার মাথার পেছনে, তারপর চারিদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই লোকটার রাইফেলটা তুলে নিল। মিরন জানে ঘোড়াগুলোকে ঘুরিয়ে নেবার সময় এবার আর গুলি চালাতে পারবে না লোকটা, ওর একমাত্র ভয় পাছে রেলস্টেশন থেকে কেউ ওকে দেখে ফেলে। আগে কোনদিনও ওর কালো কুচকুচে ঘোড়াগুলো এত বেগে দৌড়োয়নি! এমনকি কোনো বিয়ের উৎসবেও ওর গাড়ির চাকা এত হুড়মুড় করে ছোটেনি। সমানে চাবুক চালাতে চালাতে মিরন বিড়বিড় করছে—হে ভগবান, বাঁচাও! রক্ষা করো, হে ঈশ্বর! পরমপিতার দিব্যি! লোভ জিনিসটা মিরনের রক্তের মধ্যে, ফলে প্রায় সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল আর কি—ও ভেবেছিল উক্রেইনীয়ান বন্ধুটির ওখানে গিয়ে নিজের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেবে। কিন্তু শেষ অবধি ওর সংবুদ্ধি হল, শহরের বাইরে চলে এল। প্রথম যে গ্রামটায় এল আট মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে, সে (ওর নিজের ভাষায় বলতে গেলে) ঋষি এলিজার আগুনের রথের চেয়েও বেশি তাড়াতাড়ি। চেনাজানা এক উক্রেইনীয়ানের বাড়ির উঠোনে এসে ঢুকল মিরন, তখন তার পাড় কি মরি অবস্থা। সব ঘটনা লোকটিকে খুলে বলে নিজের জন্য আর ঘোড়াগুলোর জন্য একটা লুকোবার জায়গা চাইলে।

—আমায় লুকিয়ে রাখো! যা তোমার চাই দেব! শুধু আমাকে বাঁচাও, যা হোক কোথাও লুকিয়ে রাখো। আমার একপাল ভেড়া তোমায় দেব। সবচেয়ে সেরা দেখে

গোটা দশেক ভেড়া তোমাকে দিলেও আমার দুঃখ নেই!—মিরন আবেদন জানালে, কথাও দিলে।

উক্রেইনীয়ানের বাড়িতে সন্ধ্যে অবধি কাটিয়ে মিরন ফের পাগলের মতো ছুটল জোর কদমে ঘোড়া চালিয়ে, যতোক্ষণ না ঘোড়াগুলোর গা ফেনায় জবজবিয়ে ওঠে। মিলেরোভো থেকে বেশ-খানিকটা দূর চলে আসার পর তবে সে ঘোড়াগুলোর লাগাম আঁটলো।

কিন্তু উক্রেইনের লোকটিকে ভেড়া দেবে বলে যে প্রতিশ্রুতি মিরন দিয়েছিল সে ভেড়া ও পাঠায়নি। সেবারই শরৎকালে একবার সেই গাঁয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল মিরন। লোকটা কিছু প্রত্যাশা করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে সে শুধু বলেছিলঃ

—আমাদের ভেড়াগুলো সব মরে গেল কিনা...ভেড়ার যখন এই দুরবস্থা, তাই ক'টা নাসপাতি নিয়ে এলাম নিজের বাগানের—পুরনো দিনের কথা মনে করে।—এক বস্তা নাসপাতি গাড়ি থেকে বের করে সামনে রাখল সে। পথে ঝাঁকুনি খেয়ে নাসপাতিগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মিরন চোখদুটো অন্যদিকে ফিরিয়ে বললঃ আমাদের নাসপাতি কিন্তু চমৎকার, খুব ভালো জিনিস...। তারপর তাড়াতাড়ি নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে।

মিরন যখন মিলেরোভো থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে পালায় পান্তালিমন তখন রেল-স্টেশনে। এক ছোকরা জার্মান অফিসার ওর জন্য একটা পাশ লিখে দিল। দোভাষীর মারফত ওকে সওয়াল জেরা করে শেষে সদয়ভাবে বললঃ

—পাশ তুমি পাবে। কিন্তু খেয়াল রেখো, বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে এমন একটা গভর্নমেণ্ট তোমাদের চাই। রাষ্ট্রপতি কিংবা জার কিংবা তোমাদের যেমন খুশি এক-জনকে বেছে নাও, তবে হ্যাঁ, মাথায় যেন কিছুটা রাজনীতির জ্ঞান থাকে আর জার্মানিকে যেন বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করে চলে।

অসৌহার্দ্যের দৃষ্টি নিয়ে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে পান্তালিমন, তারপর পাশটা নিয়ে টিকিট কিনতে চলে যায়। নভোচেরকাসে এসে শহরে এত ছোকরা অফিসার দেখে ওর তো চক্ষুস্থির। রাস্তাঘাটে ভিড় জমাচ্ছে ওরা, রেস্তোরাঁয় বসছে, আতামানের প্রাসাদ আর যেখানে সম্মেলন হবার কথা সেই আদালত-বাড়িটার আশেপাশে জটলা করছে।

প্রতিনিধিদের জন্য আলাদা করে রাখা বাড়িটায় পান্তালিমন নিজের জেলার আরো ক'জন কসাককে পেয়ে গেল। প্রতিনিধি বেশির ভাগই কসাক। অফিসার আছে মাত্র কয়েকজন, মফস্বলের বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি বরং কিছু বেশি। প্রাদেশিক সরকার গঠন করা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, কিন্তু একটা জিনিস বেশ পরিষ্কার বেরিয়ে এল—একজন আতামানকে বেছে নিতেই হবে। অনেক জনপ্রিয় কসাক জেনারেলের নাম নিয়ে তর্কাতর্কি হল, আলোচনা হল একেকজন প্রার্থীর গুণাগুণ নিয়ে। কিন্তু কেউই মনের মতো নয়।

আলোচনায় যোগ দিয়েছে একজন ফৌজী লেফটেন্যাণ্ট। কোনো এক জেলার প্রতিনিধি। সে মেজাজ দেখিয়ে বললে,—

—কী বলতে চান আপনারা, যোগ্য লোক নেই? কেন, জেনারেল ক্রাস্নভ হতে পারেন না?

—ক্রাস্‌নভটা আবার কে?

—মশাইরা, আপনাদের জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা হচ্ছে না? নামজাদা সেনাপতি উনি, তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার ফৌজের কমান্ডার, বিচক্ষণ লোক. সেণ্ট জর্জ পদক পেয়েছেন, অত্যন্ত প্রতিভাশালী রেজিমেণ্ট অধিনায়ক।

লেফ্‌টেন্যাণ্টকে এমন পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে শুনে যুদ্ধরত রেজিমেণ্টের একজন প্রতিনিধি আর না বলে পারল নাঃ

—হ্যাঁ, তাঁর প্রতিভার কথা আমাদের আর অজানা নেই! চমৎকার জেনারেল বটে! জার্মান যুদ্ধে তাঁর হিম্মত আমরা দেখে নিয়েছি! বিপ্লব যদি না হত তাহলে বড়ো জোর ব্রিগেডিয়ার অবধি হতে পারতেন, তার ওপাশে আর নয়।

—জেনারেল ক্রাস্‌নভকে আপনি যখন জানেন না তখন কোন্‌ সাহসে একথা বলতে পারলেন?—কঠিন স্বরে লেফ্‌টেন্যাণ্ট জবাব দিলে—সকলের শ্রদ্ধার পাত্র একজন জেনারেলের সম্বন্ধে কোন্‌ সাহসে এমন কথা উচ্চারণ করলেন আপনি? বোধহয় ভুলে গেছেন যে, আপনি একজন চুনোপুঁটি কসাক সেপাই।

কসাকটি যেন মহা ফাঁপরে পড়ে বিড়বিড় করে বললঃ

—মাননীয় হুজুর, আমার বক্তব্য শুধু এই যে, একসময় আমি নিজে তাঁর ফৌজে কাজ করেছি। অস্ট্রিয়ার ফ্রণ্টে উনি আমাদের রেজিমেণ্টকে একেবারে কাঁটা-তারের বেড়ার ওপর টেনে এনে ফেলেছিলেন। তাই ওঁর সম্পর্কে বড়ো একটা উঁচু ধারণা আমাদের নেই। তবে অবিশ্যি এও হতে পারে যে তাঁর সম্পর্কে যা ভেবেছিলাম আসলে তা একেবারেই নয়!

লড়াইয়ের ময়দান-ফেরৎ লোকটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পান্তালিমন বললে—তাহলে সেণ্ট জর্জ পদকটা কি তাঁকে মুখ দেখে দেওয়া হয়েছিল বলতে চাও? গাধা কোথাকার! গাঁইগুঁই করা তোমাদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—কোনো কিছুই মনমতো নয়, সহ্য হয় না। প্যানপ্যানানিটা যদি একটু কম করতে তাহলে এখন আর এ ঝামেলায় আমাদের পড়তে হত না। যতোসব হাঁড়িচাচার দল!

গোটা চেরকাস্‌ জেলা মনে প্রাণে ক্রাস্‌নভের পক্ষে। বুড়োরা তাঁকে ভালোবাসতঃ জাপানী যুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গে থেকে লড়েছেও অনেকে। অফিসাররা তাঁর অতীত কর্মজীবন সম্পর্কে গর্ববোধ করে; উনি নিজে ছিলেন গার্ডস্‌ অফিসার, পড়াশোনাও ছিল বিস্তর। সম্রাটের প্রাসাদ আর খাসমহলে থেকেছেন এক সময়। উদারপন্থী বুদ্ধি-জীবীরাও একটা ব্যাপারে সন্তুষ্ট যে, উনি শুধু জেনারেলই নন, লেখকও বটেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ফৌজী অফিসারের জীবন নিয়ে লেখা ওঁর অনেক গল্প বেরিয়েছিল, অর্থাৎ মিলিটারির লোক হলেও উনি সংস্কৃতিবান্‌ ব্যক্তি।

তাই সম্মেলনের তৃতীয় দিনে যখন দীর্ঘকায় একজন সেনাপতি উঠে এসে মঞ্চে দাঁড়ালেন, সারা হলঘরটা প্রচণ্ড হাততালি আর হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল। বয়েস হওয়া সত্ত্বেও তরুণোচিত কান্তি নিয়ে জেনারেল যখন পোস্টকার্ড-ছবির ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন বুকে ক্রুশ আর পদক ঝুলিয়ে, মুখে উত্তেজনার ব্যঞ্জনা নিয়ে, তখন উপস্থিত অনেকের কাছেই মনে হল বুঝি-বা সেই বিগত দিনের সম্রাজশাহী আমল আবার ফিরে এল, এ তারই অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

পান্তালিমনের চোখে জল এসে গেল, লাল রুমালে মুখ গুঁজল সে। ভাবলঃ আহা! এই একজন জেনারেলের মতো জেনারেল! মুখ দেখলেই বোঝা যায় লোকটা

মরদ বটে! অনেকটা প্রায় সম্রাটের মতোই দেখতে, লোকে অনায়াসেই স্বর্গীয় আলেক-জান্দার বলে ভুল করতে পারে।

চমৎকার গুছিয়ে তৈরি-করা একটা বক্তৃতা দিলেন ক্রাস্‌নভ। বলশেভিকদের অভিশপ্ত শাসনে রাশিয়ার কি হাল হয়েছে, কী শক্তি তার ছিল এক সময়ে, আর ভবিষ্যতে ডনের ভাগ্যে কী ঘটবে তাই নিয়ে মর্মস্পর্শী আলোচনা করলেন। বর্তমান পরিস্থিতির মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে জার্মান দখল সম্পর্কে সামান্য একটু উল্লেখ করলেন। বলশেভিকরা হেরে যাবার পর ডনের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার সম্ভাবনা আছে—এই বলে যখন তিনি বক্তৃতার উপসংহার টানলেন তখন একেবারে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল।

—সামরিক পরিষদই ডন প্রদেশ শাসন করবে। বিপ্লবের ফলে মুক্ত কসাকজাতি কসাকজীবনের সমৃদ্ধ প্রাচীন ধারাকে আবার ফিরিয়ে আনবে আর আমরা আমাদের সেকালের বাপ-পিতামহদের মতোই দরাজ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলবঃ 'বিনয়াবনত ডনের কসাক আমরা মস্কোর ক্রেমলিনের সাদা জারের স্বাস্থ্য কামনা করি।'

সেদিনই সন্ধ্যায় ক্রাস্‌নভ সামরিক আতামান নির্বাচিত হলেন। কিন্তু পরিষদ ওঁর কয়েকটা শর্ত না মেনে নেওয়া পর্যন্ত উনি পদ গ্রহণ করবেন না। আতামান হিসাবে অসীম ক্ষমতা হাতে রাখতে চাইলেন উনি, কতগুলো মূল আইন মেনে নিতে হবে এই দাবি জানালেন। আইনগুলো অবশ্য সাবেকী সম্রাজশাহী আমলেরই, সামান্য একটু মেজে ঘষে ডনের নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া—পরিষদ তাই মেনে নিলো, বেশ খুশি হয়েই মেনে নিলো। ক্রাস্‌নভ যে পতাকা-চিহ্ন প্রস্তাব করলেন তাতেও আগেকার আমলেরই ছাপ রয়ে গেছেঃ নীল, লাল আর হলদে ডোরা (কসাক, বিদেশাগত বসবাসকারী আর কাল্‌মিক এই তিন গোষ্ঠীকে বোঝাবার জন্য)। শুধু সরকারী তকমার প্রতীকচিহ্নগুলোতেই যা একটু পরিবর্তন হল জাতীয়তাবোধকে খাতির করে। ডানা ছড়ানো আর নখ বের-করা দুমাথাওয়ালা শিকারী ঈগলের বদলে এবার সেগুলোতে থাকবে মাথায় ফারের টুপিপরা একজন উলঙ্গ কসাক, তলোয়ার রাইফেল আর কার্তুজ নিয়ে একটা মদের পিপের ওপর চড়ে আছে।

আঠারোই মে তারিখে সম্মেলন ভাঙলো। পরিষদ সদস্যরা আতামানের নির্বাচনে খুশি হয়ে, রণাঙ্গনের খবরাখবর নিয়ে বেশ তুষ্ট মনেই ঘরে ফিরল।

পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ্‌ও উদ্বেলচিত্তে একটা তুরীয়ানন্দ ভাব নিয়ে নভো-চেরকাস্‌ থেকে ফিরতি ট্রেন ধরল। আতামানের ক্ষমতা যে যোগ্য হাতেই গিয়েছে সে সম্পর্কে অটল বিশ্বাস ওর। বলশেভিকরা এবার দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আর ওর ছেলেরাও যে ঘরে ফিরবে এতে ওর আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। টেবিলে কনুই রেখে গাড়িতে বসেছিল ও, আর তখনো যেন ওর কানে বাজছিল ডন সংগীতের শেষ রেশটুকু।

কিন্তু নভোচেরকাস ছাড়িয়ে খুব বেশিদূর যায়নি ট্রেন এমন সময় জানলা দিয়ে তাকিয়ে পান্তালিমন দেখল ব্যাভেরিয়ান ঘোড়সওয়ার বাহিনীর পয়লা ফৌজীদল। একদল সওয়ার রেলরাস্তার ধার দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে ট্রেন লক্ষ্য করেই। ভুরু কুঁচকে সামনে ঝুঁকে পান্তালিমন দেখতে লাগল ডনের মাটি কেমন সদর্পে মাড়িয়ে চলেছে ঘোড়ার খুরগুলো। ওরা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ আসনে জড়োসড়ো হয়ে জানলার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে বসে রইল পান্তালিমন। আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

। তিন ।

ভিয়েশেন্স্কা থেকে মিখাইল কশেভয়কে জোর করে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রণাঙ্গনে। মফস্বলের গ্রাম ফিয়েদোসিয়েভে পৌঁছোবার পর জেলা-আতামান ওকে একদিন সেখানে রেখে. ফের সঙ্গে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিল ভিয়েশেন্স্কাতেই।

জেলা সম্পাদককে মিখাইল জিজ্ঞেস করলে—আমাকে ফেরত পাঠাচ্ছেন কেন?

অনিচ্ছাভরে লোকটি বললে—ভিয়েশেন্স্কা থেকে আমরা হুকুম পেয়েছি।

ভিয়েশেন্স্কাতে ফিরে আসার পর খবর রটে গেল মিখাইলের মা নাকি নিজেই হামা দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে মোড়লদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। মোড়লরা তাদের সমাজের নামে অনুরোধ করে পাঠায় মিখাইলকে জেলার চরানি-মাঠে ঘোড়া চরানোর কাজে লাগিয়ে দেওয়া হোক। জেলা আতামান চড়া গলায় খবরটা মিশ্‌কাকে জানিয়ে দিল। গরম মেজাজে গরম বক্তৃতা শেষ করল—

—বলশেভিকগুলোর হাতে বিশ্বাস করে ডনের ভার ছেড়ে দেওয়া চলে না। এখন তুমি ঘোড়ার খাটালে মরো গিয়ে, পরে দেখে নেব, হ্যাঁ। শুয়োরের বাচ্চা, এদিকে তাকা! তোর মায়ের ওপর নেহাৎ দয়া হয়েছিল বলে, নয় তো...যা ভাগ্!

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল মিশ্‌কা, সঙ্গে লোকজন কেউ নেই। এত মাইল পথ ধুঁকতে ধুঁকতে এসেছে, এখন আর ক্লান্তিতে পা চলতে চায় না। কায়ক্লেশে কোনো রকমে নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে সন্ধ্যে লাগার মুখে। মা কান্নাকাটি করেন, বুকে জড়িয়ে ধরেন। পরদিন আবার ঘোড়ায় চেপে ও রওনা হয় চরানি-মাঠের দিকে। স্মৃতির পটে ভেসে থাকে শুধু মায়ের বুড়িয়ে-আসা মুখখানার ছবি, তার চুলের প্রথম রুপোলি ছোপ...।

কারগিনের দক্ষিণে মাইল পাঁচেশেক লম্বা আর চার মাইল চওড়া একটা জায়গা জুড়ে স্তেপের অনুঢ়া আ-চষা মাটি। কয়েক হাজার একরের এই জমিটা আলাদা করে রাখা হয়েছে জেলার মদ্দা ঘোড়াদের চরে বেড়াবার জন্য। প্রত্যেক বছর সন্ত-ইগরের উৎসব দিনে চরানি-দাররা শীতের আস্তাবল থেকে ঘোড়াগুলোকে বের করে তাড়িয়ে নিয়ে আসে এই চারণভূমিতে। জেলার খাজাঞ্চিখানা থেকে টাকা দিয়ে বানিয়ে দিয়েছে একটা আস্তাবল. আর চরানিদার. তদারককারী ও একজন পশু-ডাক্তারের জন্য একটা চালাবাড়ি। ফি বছর ভিয়েশেন্স্কা জেলার কসাকরা তাদের ঘুড়ীগুলোকে টেনে নিয়ে আসে, পশু-ডাক্তার আর পরিদর্শক প্রত্যেকটা ঘুড়ীকে যাচাই করে দ্যাখে গড়নপেটন ঠিক মাপমতো আছে কিনা। স্বাস্থ্য যেগুলোর ভালো সেগুলোকে জড়ো করে গোটা চল্লিশেক দিয়ে একেকটা পাল তৈরি হয়, আর একেকটা মদ্দা ঘোড়া সেই পাল নিয়ে

চরে বেড়ায় স্তেপের মাঠে। ওদের পাহারা দেয় একজন করে চরানিদার, ঘুড়ীগুলোর ওপর সে কড়া নজর রাখে।

মিশ্‌কা তার খামারের একমাত্র সম্বল ঘোড়াটির পিঠে চেপে রওনা হয় খাটালের দিকে। দুপুর নাগাদ একটা উপত্যকার ওপর ধোঁয়াটে কুয়াশার আড়ালে দেখতে পায় চালাবাড়িটা আর আস্তাবলের ময়লাটে রোদপোড়া জলে-ভেজা ছাদ। আরো দূরে, একেবারে পূর্বদিকটাতে দেখতে পায় বাদামি ছোপের মতো একপাল ঘোড়া একটা পুকুরের পাড় বেয়ে নামছে। ওদের পাশ দিয়ে কদমচালে ঘোড়া ছুটিয়েছে একটি লোক—দেখতে ঠিক যেন খেলনার ঘোড়ার পিঠে পুতুল সওয়ার।

চালাবাড়ির উঠোনে ঢোকে মিশ্‌কা, ঘোড়া থেকে নেমে লাগামজোড়া দরজার খুঁটিতে বেঁধে ভেতরে চলে যায়। চওড়া ভেতর-বারান্দায় একজন চরানিদারের সঙ্গে দেখা—লোকটা কসাক, গাট্টাগোট্টা, মুখে বসন্তের দাগ।

মিশ্‌কাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করে—কাকে চাই?

—ওভারসিয়ারকে।

—সে এখানে নেই। বাইরে গেছে। তার সহকারী আছে। বাঁদিকে দোতলা। কেন, তাকে কি জন্য দরকার? কোত্থেকে আসছ?

—আমি এসেছি চরানিদারের কাজে।

—চমৎকার লোক সব পাঠায় বটে...! বিড়বিড় করতে করতে দরজার দিকে এগিয়ে যায় লোকটা। কাঁধে ঝোলানো ল্যাসো (ফাঁসের) দড়িটা পেছন পেছন মেঝের ওপর গড়াতে গড়াতে চলে। দরজা খুলে মিশ্‌কার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাতের চাবুকটা নাচায়, এবার আরেকটু নরম গলায় বলে—আমাদের কাজটা বড্ড মেহনতের, ভাই। মাঝে মাঝে একটানা দু'দিন হয়তো জিনে বসেই কাটাতে হয়।

লোকটার গোল কাঁধ আর বাঁকা পা দুটোর দিকে তাকায় মিশ্‌কা। দরজার আলোয় বেয়াড়া দেহের গড়নের প্রত্যেকটা রেখা স্পষ্ট জোরালো হয়ে ফুটে উঠেছে। ধনুকের মতো বাঁকা পাজোড়া দেখতে অদ্ভুত লাগে মিশ্‌কার। দরজার ছিট্‌কিনিটা হাত বাড়িয়ে ঠাহর করতে করতে মিশ্‌কা ভাবে—লোকটাকে দেখলে মনে হয় যেন চল্লিশ বছর একটানা কেবল খালি-গায়ে ঘোড়া দাবড়েছে।

সহকারী ওভারসিয়ার নতুন চরানিদারকে ধীরেসুস্থে আদবকেতা দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানালে। শক্তসমর্থ চেহারার কসাক, আগে আতামান ফৌজে সার্জেণ্ট-মেজর ছিল। রেশন তালিকায় মিশ্‌কার নামটা ঢোকাবার হুকুম দিয়ে সে ওর সঙ্গে বেরিয়ে এল দরজার মুখে।

বললে—ঘোড়াকে তালিম দিতে পারো? কোনো সময় ঘোড়া বশ করেছ?

—করেছি বললে মিথ্যে বলা হবে। খোলাখুলি স্বীকার করলো মিশ্‌কা। সঙ্গে সঙ্গে দেখল ওভারসিয়ারের মুখে যেন একটা অসন্তুষ্টির ছায়া। পিঠ চুলকোতে চুলকোতে একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে লোকটা।

আবার বলে—ল্যাসো ছুঁড়তে জানো?

—জানি।

—ঘোড়াদের যত্নআত্তি করো তো?

—হ্যাঁ।

—ওরাও ঠিক মানুষের মতোই, তবে অবোলা জীব। যত্নআত্তি কোরো, বুঝলে!

হুকুম করেই ফের আবার অযথা খেপে উঠে গলা চড়িয়ে বললে—একটু নজর দিও ওদের দিকে, কেবল চাবুক হাঁকিও না!

এক মুহূর্ত লোকটার মুখখানা সচিন্তিত সজীব হয়ে উঠেছিল, পরক্ষণেই সেভাবটা কেটে গেল, একটা ভোঁতা নির্বিকারত্বের ভারি মুখোসে ঢাকা পড়ল আবার।

—বিয়ে করেছ?

—না।

—তুমি একটা গাধা! বিয়ে করা উচিত ছিল!—ওভারসিয়ার খুশি মনে উঠে দাঁড়াল।

চুপ করে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল স্তেপভূমির বিস্তীর্ণ বুকের রেখার দিকে, তারপর হাই তুলে চালাবাড়ির ভেতর ঢুকল। এর পর এক মাসের চাকরিতে মিশ্‌কা আর একটি কথাও শোনেনি লোকটির মুখ থেকে।

খাটালে সবশুদ্ধ পঞ্চান্নটা মদ্দ-ঘোড়া। একেকজন চরানিদারকে দু'তিনটে ঘোড়ার পাল দেখতে হত। মিশ্‌কার হাতে পড়েছে মস্তো একটা পালের ভার, সে পালের সর্দার "বাখার" নামে বয়স্ক তেজীয়ান এক ঘোড়া। আর একটা ছোট দলও আছে, তাতে কুড়িটা ঘুড়ী আর "মামুলি" ডাকনাম-দেওয়া একটা ঘোড়া। ওভারসিয়ার সবচেয়ে ওস্তাদ আর সাহসী চরানিদারদের একজনকে ডেকে পাঠাল। লোকটার নাম সল্‌দাতভ্‌। তাকে বলল:

—এই একজন নতুন চরানিদার। তাতারস্ক্‌ গাঁ থেকে এসেছে, মিখাইল কশেভয়। ওকে 'মামুলি' আর বাখারের পাল দুটো দেখিয়ে দাও, আর একটা ল্যাসোও দিও। তোমার ঘরেই ও থাকবে। দেখিয়ে দাও জায়গাটা। যাও, চট্‌পট্‌!

সল্‌দাতভ নীরবে সিগারেট ধরিয়ে মিশ্‌কার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়েঃ এসো!

রোদে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছিল মিশ্‌কার মাদী-ঘোড়াটা। দরজার সামনে এসে সেটাকে দেখিয়ে সল্‌দাতভ জিজ্ঞেস করলে—ওই বুঝি তোমার ঘোড়া? পেটে বাচ্চা?

—না।

—বাখারের জিম্মায় ছেড়ে দাও ওটিকে। বাখার ছিল সম্রাটের আস্তাবলের ঘোড়া, রক্তে বিলিতি ঘোড়ার মিশেল আছে। তা বেশ, এবার ওঠো!

দু'জনে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়। হাঁটু অবধি ঘাসে ডুবে যায় ঘোড়াগুলোর। ওদের সামনে হাল্‌কা নীলচে কুয়াশায় ঢাকা সৌম্য মৌন স্তেপের প্রান্তর। এক চিল্‌তে সাদা মেঘের ওপাশ দিয়ে মাথার ওপর খাড়া সূর্যের আলো ঝরছে। গরম ঘাস থেকে উঠছে একটা ভারি বুক-চাপা ভাপ। ডানদিকে একটা খাদ, কিনারার রেখা কুয়াশায় ঢাকা। ভেতর থেকে চিক্‌চিক্‌ করছে মুক্তোর মতো সাদা, হাসি-ঝল্‌মল্‌ হ্রদের জল। কিন্তু আর সবদিকে যতোদূর নজর চলে কেবলই সবুজের সীমাহীন বিস্তার আর কুয়াশার কাঁপা-কাঁপা স্রোত। দুপুরের গরমে আদিম স্তেপভূমি অলস মন্থর। দিগন্তে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে জাদুমাখা নীল এক পাহাড়।

কথাবার্তা না বলে নীরবে চলেছে দু'জন কসাক। অনুচ্চার নম্রতার এক নতুন অনুভূতি জাগছে মিশ্‌কার মনে। স্তেপের নিথর নীরবতা, তার পরমপ্রজ্ঞ গাম্ভীর্য মিশকার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। ঘোড়ার ঘাড়ের চুল অবধি ঝুঁকে জিনে বসে ঝিমোচ্ছিল ওর সঙ্গীটি। ব্রণের দাগভরা হাতদুটো জিনের চুড়োর ওপর এমনভাবে আঁজলা করে রেখেছে যেন ভগবানের প্রসাদ নেবে এখুনি।

মিশ্‌কার ভাগে যে দুটো ঘোড়ার পাল পড়েছে মিশ্‌কা তার ভার বুঝে নিল। সঙ্গের জিনিসপত্র রাখল মাঠের চালাঘরে। আরো তিনজন চরানিদার থাকবে ঘরটাতে, সল্‌দাতভ্‌ তাদের সর্দার। মিশ্‌কার কাজকর্মের কথা সে নিজে ইচ্ছে করেই ওকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে দিল। মন্দা-ঘোড়াগুলোর চাল-চলন অভ্যেসের কথা বলে শেষে অল্প একটু হেসে উপদেশ দিলঃ

—নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাজ করবে এইটেই অবশ্য নিয়ম, তবে যদি দিনের পর দিন চাপো তাহলে হয়রান করে ফেলবে। তাই পালের সঙ্গে তাকে ভিড়তে দিও, আর অন্য কারুর একটাতে জিন কষে নিও, মাঝে-মাঝেই বদ্‌লাবদলি কোরো ঘোড়া।

মিশ্‌কার চোখের সামনেই পাল থেকে একটা মাদী-ঘোড়া বেছে সুকৌশলে তাকে ল্যাসো ছুঁড়ে বন্দী করলে সল্‌দাতভ। মিশ্‌কার জিনটা সেই ঘোড়ার পিঠে এঁটে টেনে আনল ওর সামনেঃ

—নাও, এটার পিঠে চাপো! দ্যাখো না, শয়তান ঘুড়ীটাকে কেউ কোনোদিন বাগ মানাতে পারেনি! উঠে পড়ো!—রেগে চেঁচিয়ে ডান হাতে সজোরে লাগাম খিঁচে বাঁ হাতে ঘুড়ীর পেটটা টিপে ধরল—সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো এদের! আর নজর রেখো ওই বাখারটার ওপর। খুব কাছেপিঠে ঘেঁষো না কিন্তু, লাথি মেরে ফেলে দেবে। —রেকাব ধরে আদর করে ঘুড়ীর ওলানে চাপড় মেরে বাকি কথাগুলো বললে ও।

ভর হপ্তা মিশ্‌কা বিশ্রাম নিয়েছে সারাদিন ঘোড়ার জিনের ওপর বসে থেকে-থেকে। স্তেপই ওকে দমিয়ে দিয়েছে, দাপটের জোরে বাধ্য করেছে আদিম, আরণ্য এক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলতে। ঘোড়ার পালটা খুব বেশি দূরে হয়তো সরে যায়নি, এদিকে মিশ্‌কা জিনের ওপর বসে ঢুলছে, কিংবা হয়তো ঘাসের বুকে গা এলিয়ে আন্‌মনা চেয়ে-চেয়ে দেখছে আকাশের গায়ে সাদা ভেড়ার পালের মতো মেঘেদের আনাগোনা। প্রথম প্রথম সংসারের ওপর এই বৈরাগ্যের ভাবটা ওর ভালোই লাগত। এমন কি মানুষজন থেকে বহু তফাতের এই জীবনটাকে বেশ উপভোগ্যও মনে হত ওর কাছে। কিন্তু প্রথম হপ্তার শেষ দিকে যখন নতুন অবস্থাটা ওর ধাত-সওয়া হয়ে এল, তখন একটা অস্পষ্ট আতঙ্কে উতলা হয়ে উঠতে লাগল ওর মন। ভাবল—ওরা ওদিকে আপন-পর সকলের ভাগ্য নির্ণয় করছে, আর আমি এখানে বসে ঘোড়া চরাচ্ছি। এখান থেকে সরে পড়তেই হবে, নয়তো পচে শুকিয়ে মরব! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতর থেকে যেন আর কেউ অলসভাবে ফিস্‌ফিস করে ওঠে—লড়ুক গে ওরা! ওখানে তো সব মরছে, আর এখানে আছে মুক্তি, খোলা মাঠ আর আকাশ। ওখানে মানুষের মেজাজ চড়া, এখানে শান্তি। কোথায় কে কী করছে, তাই নিয়ে এত মাথা ঘামানো কিসের? কিন্তু তবু ওর নীরব প্রশান্তিতে ভাবনার খোঁচা লাগে যেন। তারই তাড়নায় সে অন্যদের সঙ্গ খোঁজে। আগের চেয়েও ঘন ঘন সল্‌দাতভের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করে ও। তার সঙ্গে পরিচয়টা আরো ঘনিষ্ঠ করে নিতে চায়।

সল্‌দাতভ যে নিজের একাকীত্বে মোটেই পীড়িত নয় সে তো বোঝাই যায়। রাতগুলো পারতপক্ষে সে চালাঘরে থাকেই না। প্রায় সব সময় রয়েছে ঘোড়ার পালের সঙ্গে। ওর জীবনটাই জানোয়ারের জীবন। সব সময় মাথা ঘামাচ্ছে কী করে নতুন নতুন কায়দায় রান্না করবে। রাঁধতেও পারে খাসা। জীবনে রান্না ছাড়া আর কোনো

কাজই সে করেনি। একদিন দেখল মিশ্‌কা ঘোড়ার চুল পাকিয়ে পাকিয়ে বঁড়শির সুতো বানাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলঃ

—ওটা করছ কেন?

—মাছ ধরব।

—মাছ কোথায়?

—ঝিলে।

—কী দিয়ে ধরবে মাছ?

—রুটি আর কেঁচো।

—ঠাট্টা করছ?

—দ্যাখো না একটু!--বলে মিশ্‌কা পকেট থেকে কার্পমাছের একটা টুকরো বের করে সল্‌দাতভের হাতে দিল।

আরেকবার মিশ্‌কা ঘোড়ার পাল নিয়ে এগোতে এগোতে দেখল সল্‌দাতভের পাতা ফাঁদে একটা বন-মুরগি পড়েছে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে নিপুণ-হাতে তৈরি একটা বন-মুরগির নকল। জালগুলো খুব কায়দা করে ঘাসের আড়ালে লুকোনো। সেদিন সন্ধ্যায় সল্‌দাতভ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে জ্বলন্ত কয়লা ছড়িয়ে বন-মুরগি রাঁধলে। মিশ্‌কাকে ডাকলে সঙ্গে বসে খাবার জন্য।

—এখানে তুমি এলে কেমন করে? মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করে।

—আমিই বাড়ির একমাত্র ছেলে। সল্‌দাতভ এক মুহূর্ত চুপ করে আচম্‌কা প্রশ্ন করে বসে ঃ শোনো! সাথীরা যা সব বলে তা কি সত্যি? তুমি নাকি লালদের দলের?

এরকম প্রশ্ন মিশ্‌কা আশা করেনি, একটু অস্বস্তি বোধ করে ও।

—না...মানে...হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম...তারপর ধরা পড়ে যাই।

—কেন ওদের দলে ভিড়েছিলে? কিসের খোঁজে—আরো আস্তে চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করে সল্‌দাতভ। একটা শুকনো পাহাড়ী সোঁতার ধারে আগুন ঘিরে বসেছে ওরা। গোবরের ঘুঁটে থেকে ঘন ধোঁয়া বেরুচ্ছে, ছাই থেকে অল্প আঁচ উঠছে আগুনের। ওদের পেছনে রাতের নিঃশ্বাসে শুকনো গরম আর শুকিয়ে-যাওয়া সোম-রাজের গন্ধ। কাজল কালো আকাশের গায়ে ছুট্‌তারার আঁচড়।

আগুনের আভায় লাল হয়ে ওঠা সল্‌দাতভের মুখখানার দিকে সাবধানে তাকিয়ে থেকে মিশ্‌কা জবাব দিলেঃ

—দেশের লোকের অধিকার নিয়ে লড়ব এই ইচ্ছে ছিল।

—কী অধিকার? বলো তো দেখি আমাকে।

সল্‌দাতভের গলার আওয়াজ নিচু, চাপা। মিশ্‌কা এক মুহূর্ত ইতস্তত করে। ওর মনে হল ওর সঙ্গী যেন ইচ্ছে করেই একটা নতুন ঘুঁটে আগুনে তুলে দিল যাতে ওর মুখের ভাবটা অন্ধকারের আড়ালে ঢাকা পড়ে। সাহস করে মিশ্‌কা বলে ফেললঃ

—সকলের জন্য সমান অধিকার, এই আর কি! জমিদার চাষী এসব ভেদ না থাকাই উচিত। বুঝতে পেরেছ?

—ক্যাডেটরা জিতবে বলে মনে হয় না তোমার?

—না, মনে হয় না জিতবে।

—ও, এই তাহলে চেয়েছিলে তুমি?..সল্‌দাতভের গলার স্বর বদলে যায়। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।—শুয়োরের বাচ্চা, কসাকদের তুই ইহুদিগুলোর হাতে তুলে দেবার

ফিকিরে ছিলি, অ্যাঁ?—ভয়ানক চিৎকার করে শয়তানিভরা গলায় বলতে থাকে—আমাদের শেকড়শুদ্ধ উপড়ে দিবি এই মতলব? ও-হো! ইহুদিগুলো যাতে স্তেপের মাঠ জুড়ে ফ্যাক্টরি বসাতে পারে, যাতে জমি থেকে আমাদের ভাগিয়ে দিতে পারে এই মতলব?

হতভম্ব মিশ্‌কা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। ওর মনে হয় সল্‌দাতভ্‌ বুঝি ওকে মারবে, তাই পেছু হটে আসে। মিশ্‌কাকে পেছনে সরতে দেখে আরেকজন ঘুষি পাকিয়ে হাত ওঠায়। কিন্তু মিশ্‌কা ওর হাতটা শূন্যে থাকতেই চেপে ধরে, কব্জিতে মোচড় দিতে দিতে একই সঙ্গে আশ্বাস আর উপদেশ দিতে থাকেঃ

—থামো তো তুমি, নয়তো ঘায়েল করে দেব! অতো চেঁচাচ্ছ কেন?

অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দুজন। ওদের পায়ের তলায় চাপা পড়ে আগুনটা নিভে গেছে। শুধু একপাশে লাথি খেয়ে ছিট্‌কে পড়া একটা ঘুঁটের কিনারা থেকে ধোঁয়া উঠছিল। মিশ্‌কার জামার কলার বাঁ হাতের মুঠোয় খিম্‌চে টেনে উঁচু করে ধরেছে সল্‌দাতভ যাতে ডান হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়া যায়।

মিশ্‌কা শক্ত ঘাড়টা বেঁকিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়—জামা ছেড়ে দাও বলছি! ছেড়ে দাও! মেরে ফেলব কিন্তু, শুনতে পাচ্ছ?

—নাঃ আমিই তোকে মারব, দাঁড়া না!...সল্‌দাতভ ফোঁস ফোঁস করে।

মিশ্‌কা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রতিপক্ষকে ঝট্‌কা মেরে ফেলে দেয়। ওর ভয়ানক ইচ্ছে হতে থাকে আঘাত করার, লাথি মারার। ইচ্ছে করে নিজের হাতগুলোকে এবার খুশিমতো ছেড়ে দেওয়া যাক্‌। কাঁপতে কাঁপতে জামাটা ঠিক করে নিতে থাকে।

সল্‌দাতভ ওর দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না আর। দাঁত কিড়মিড় করে গালিগালাজ দেয়, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে চেঁচাতে থাকেঃ

—আমি বলে দেব। ওভারসিয়ারকে আমি এক্ষুণি বলব। বেটা গোখ্‌রো! শয়তান কেউটে! বলশেভিক!

...যদি বলে দেয়...মিথ্যে করে বানিয়ে বলে...তাহলে তো আমায় গারদে পুরবে। লড়াইয়ের ময়দানে কিছুতেই পাঠাবে না আমাকে, লালদের দলে চলে যাবারও উপায় থাকবে না তাহলে। এবার গেছি!—মিশকা যেন ঠান্ডা হয়ে গেছে, একটা উপায় খুঁজে বের করতে গিয়ে ওর মনের অবস্থা হয়ে উঠল নদীতে বন্যা নেমে যাবার পর জল-ছাড়া মাছের মতো মরীয়া।—মেরে ফেলব ওকে! এখুনি মুখ বন্ধ করে দিতে হবে! এ ছাড়া আর রাস্তা নেই।—এর মধ্যেই একটা ওজর খাড়া করে ফেলেছে মনে-মনে—বলব, আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিল। তাই আমিও ওর গলা টিপে ধরেছি।...লড়াই করতে করতে...।

পা ফেলে ফেলে সল্‌দাতভের দিকে এগিয়ে যায় ও। সেই মুহূর্তে যদি অপর জনও এগিয়ে আসত ওর কাছে তাহলে মৃত্যু আর রক্তের একটা মাতামাতি লেগে যেত এখুনি। কিন্তু সল্‌দাতভ ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালাগালি করতে লাগল। মিশা থেমে পড়ল। পা দুটো থরথর করছে, পিঠ বেয়ে ঘাম ঝরছে।

—সবুর। শুনতে পাচ্ছ? সল্‌দাতভ, থামো! চেঁচিও না! তুমিই তো আগে-ভাগে শুরু করলে...

চোয়াল দুটো নড়ছে, চোখজোড়া পাগলের মতো ঘুরছে মিশ্‌কার। একেবারে নুয়ে পড়ে আবেদনের সুরে বলতে লাগলঃ

—আমি তো তোমাকে মারিনি। তুমি আমার জামাটা চেপে ধরলে। কেন যে তোমাকে সব কথা বলতে গেলাম? যদি তোমার মনে আঘাত দিয়ে থাকি, মাফ কোরো... ঈশ্বরের দোহাই! ব্যস্, হল?

ধীরে ধীরে শান্ত হল সল্‌দাতভ। খানিকবাদে মুখ ফিরিয়ে, মিশ্‌কার ঘামে-ভেজা ঠাণ্ডা হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেঃ

—সাপের মতো লেজ গোটাতে শুরু করেছ! ঠিক আছে, কাউকে বলব না। তোমার বোকামি দেখে শুধু দয়াই করব। কিন্তু আর যেন তোমার শ্রীমুখ দেখতে না হয় আমাকে, দেখলে পেটের ভাত হজম হবে না। হারামজাদা! ইহুদিদের কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছ। যারা পয়সার জন্য নিজেদের বিকোতে পারে তাদের ওপর আমার কোনো ভক্তি নেই।

অন্ধকারে হাসল মিশা,—হীন, ম্লানকরুণ হাসি। অবশ্য সল্‌দাতভ তা দেখতে পেল না, মিশ্‌কার দৃঢ়বদ্ধ হাতের মুঠি দুটোও তার নজরে পড়েনি।

আর একটি কথাও না বলে ওরা বিদায় নিল। কশেভয় উন্মাদের মতো ঘোড়া চাবকে জোর কদমে ছুটল নিজের পালের খোঁজে। পূর্বদিকে তখন বিজলি চমকাচ্ছে, আর গুরগুর করছে মেঘ।

সে রাতে স্তেপের বুকে ঝড় বয়ে গেল। মাঝরাত্রি নাগাদ একটা হাওয়া উঠল, মাঠের ওপর দিয়ে গর্জন করে ছুটল সে হাওয়া, পেছনে পেছনে পর্দার মতো টেনে নিয়ে এল ঠাণ্ডা আর সাংঘাতিক ধুলো। সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। থরে থরে কালো মেঘ ছড়িয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের চমকে। তারপর একটানা দীর্ঘ নীরবতা। খানিক-বাদেই শঙ্কার পূর্বাভাস জানিয়ে দূরে মেঘের গর্জন শোনা গেল। দানা-দানা হয়ে ঘাসের ওপর ঝরতে লাগল বৃষ্টি। দ্বিতীয়বার বিজলির চমক জাগতেই আবছা আলোয় কশেভয় দেখতে পেল আকাশের বুকে ভারি হয়ে, ভয়ঙ্কর কালো হয়ে জমে আছে মেঘ, আর মাটিতে ওর ঘোড়াগুলো একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিকট গর্জন করে বাজ পড়ল। হঠাৎ তুমুল ধারায় নামল বৃষ্টি।

স্তেপের মাটিতে গুমরে-ওঠা কান্না। মিশ্‌কার মাথা থেকে হাওয়ায় টুপি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বাধ্য হয়ে জিনের ওপর ঝুঁকে থাকতে হচ্ছে ওকে। মিনিট খানেকের নৈঃশব্দ, সেই সঙ্গে একটা কাঁপুনি। তারপরেই আকাশ চিরে ধক্ করে জ্বলে উঠল আগুনে-বিজলির রেখা, সঙ্গে সঙ্গে গাঢ়তর হল অন্ধকার। এর পরেই বাজের শব্দটা এমন কান-ফাটানো আর একটানা যে, মিশ্‌কার ঘোড়া মাটিতে পাছা রেখে বসে পড়ল, তারপর পেছনের পায়ে ভর দিয়ে পেছু হটতে লাগল। পালের অন্য ঘোড়াগুলোও তখন খুব দাপাতে শুরু করেছে। গায়ের জোরে লাগাম টেনে ধরে মিশ্‌কা ওদের উৎসাহ দেবার জন্য চেঁচাতে লাগলঃ

—হোই! হোই! থাম্!

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চিনির মতো সাদা আঁকাবাঁকা বিজলির ঝলক্। সেই আলোতে ও দেখল ঘোড়ার পাল ঘুরে ছুটে আসছে ওরই দিকে, পাগলের মতো। ঘোড়াগুলোর নাক মাটি ছোঁয় আর কি! নাকের ফুটোগুলো বড়ো করে সজোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আর ওদের নাল-বিহীন খুর মাটির বুকে ভোঁতা আওয়াজ তুলছে ধুপ্ ধুপ্ করে। বাথার ছিল সামনেই, প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসছিল সে। কশেভয় কৌশলে নিজের ঘোড়া রুখে নিয়ে অতিকষ্টে ঘোড়ার পালটাকে এড়াতে পেরেছেঃ ঘোড়াগুলো হুড়মুড়

করে পাশ কাটিয়ে একটু দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। মিশ্‌কা বুঝতে পারেনি যে, মেঘের ডাকে ঘাবড়ে ভড়কে গিয়ে ঘোড়াগুলো ওর চিৎকার শুনেই ওর দিকে ছুটে এসেছিল। তাই আরো জোরে চেঁচাতে লাগল সেঃ

—সবুর! এ্যাই!

অন্ধকারে আবার শুনতে পেল পেছন থেকে ছুটে আসছে খুরের বিকট আওয়াজ। ভয়ে মাদী ঘোড়াটার দু চোখের মাঝখানে চাবুক কষাল সে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একটা পাগলা ঘোড়া বুক দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারলো ওর নিজের ঘোড়াটার পাছার ওপর, গুল্‌তির পাথরের মতো মিশ্‌কা ছিটকে পড়ে গেল জিন থেকে। আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে ও মৃত্যুর হাত থেকেঃ পালের মূল অংশটা ক্রমেই বেশি করে ওর ডানদিকে চলে আসছিল, শুধু একটি মাদীঘোড়া খুরের নিচে পিষে ফেলেছে ওর ডান হাতখানা। উঠে দাঁড়িয়ে সাবধানে সরে গেল ও, যতোটা নিঃশব্দে পারা যায়। শুনল একটু দূরেই ঘোড়ার দল ওর ডাক শোনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আওয়াজ পেলেই এখুনি প্রবলবেগে ছুটে আসবে ওর দিকে। মন্দা ঘোড়াটার মার্কামারা নিঃশ্বাসের আওয়াজ কানে এল।

ভোর হওয়ার আগে আর ঘরে ফিরল না মিশ্‌কা।

। চার ।

শীতের সময় দুদুবার জখম হয়েছিল ইউজিন লিস্ত্‌নিৎস্কি। জখম অবশ্য কোনোবারই তেমন মারাত্মক হয়নি, লড়াইয়ে আবার ফিরে গেছে। কিন্তু মে মাসে যখন 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' নভোচেরকাসে বিশ্রাম নিচ্ছে তখন ও ফের অসুস্থ হয়ে পড়ল। পনেরদিনের ছুটি মিলেছে। বাড়ি যাবার দারুণ ইচ্ছা থাকলেও ঠিক করল নভোচেরকাসেই রয়ে যাবে—নয়তো লম্বা পাড়ি দিতে গিয়ে মিছিমিছি অনেক সময় নষ্ট হবে। ওরই সঙ্গে ছুটি পেল পল্টনের আরেক সাথী ক্যাপ্টেন গরচাকফ। গরচাকফ প্রস্তাব করল, নভোচেরকাসে ওর নিজের বাড়িতে এসে থাকুক লিস্তনিৎস্কি।

বলল—আমার তো ছেলেপেলে নেই, তোমাকে দেখলে বউ আমার খুবই খুশি হবে। আমি তাকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম তোমার কথা।

দুপুরে ওরা গাড়ি হাঁকিয়ে এল রেল-স্টেশনের কাছে একটা রাস্তার একপাশে জড়ো-সড়ো হয়ে থাকা ছোট্ট একটা বাড়ির সামনে।

—এই যে গরিবের আস্তানা। বলে গরচাকভ তাড়াতাড়ি পা চালায়। সুখের আবেগে ওর বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির ভেতর ঢোকে। সৈনিকের গায়ের ঝাঁঝালো গন্ধে কামরাগুলো ভরে যায়।

রান্নাঘর থেকে ঝি বেরিয়ে আসতেই চেঁচিয়ে বলে—অল্‌গা নিখোলায়েভ্‌না কই? বাগানে? এসো হে লিস্ত্‌নিৎস্কি।

বাগানে আপেলগাছগুলোর নিচে আলো-আঁধারির ছোপ ছোপ ছায়া পড়েছে। বাতাসে মধু আর গরম মাটির সুবাস। একটা সরু রাস্তা ধরে হল্‌দে পোশাক পরা একটি মহিলা এগিয়ে আসে ওদের দিকে। বুকের ওপর নিজের হাত দুটো চেপে ধরে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে, যেন ভয় পেয়েছে। তারপরেই হাত দুটো বাড়িয়ে দৌড়ে ছুটে আসে ওদের দিকে। এত তাড়াতাড়ি ছুটে আসে যে, লিস্ত্‌নিৎস্কির নজরে পড়ে শুধু ওর স্কার্টের সঙ্গে লেপ্‌টে-যাওয়া হাঁটু দুটো, চটির ছুঁচলো আগা আর মাথার ওপর পাগলপারা একরাশ সোনালি চুলের বন্যা। পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে নিরাবরণ হাত দুটো স্বামীর কাঁধের ওপর ফেলে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় ওর ধুলোমাখা গালে, নাকে, চোখে, ঠোঁটে। লিস্ত্‌নিৎস্কি পাঁশনেটা মোছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভারবেনার সুঘ্রাণ টেনে একটুখানি হাসে—আত্ম-সচেতন, সকুণ্ঠ হাসি।

স্ত্রীর আনন্দোচ্ছ্বাস একটু কমতে গরচাকফ সাবধানে অথচ দৃঢ়ভাবে নিজের ঘাড়ের ওপর থেকে ওর আঙুলগুলো ছাড়িয়ে নেয়। তারপর ওর কাঁধে হাত রেখে আলতো করে এপাশে ঘুরিয়ে বলেঃ

—অল্‌গা, এই আমার বন্ধু লিস্ত্‌নিৎস্কি।

—লিস্ত্‌নিৎস্কি? আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশি হলাম। আমার স্বামীর মুখে আপনার কথা শুনেছি।—হাসিভরা চোখদুটো ওর ওপর বুলিয়ে নেয়।

সবাই একসঙ্গে বাড়ির ভেতর ঢোকে। বউয়ের পাতলা কোমরের ওপর গরচাকফের বদখত নখওয়ালা লোমশ হাতখানা। লিস্ত্‌নিৎস্কি আড়চোখে চেয়ে দ্যাখে হাতটা আর খুব একটা ছেলেমানুষী কষ্ট জাগে ওর মনে,—যেন কেউ ওকে অন্যায়ভাবে সাংঘাতিক রকম জখম করে দিয়েছে। মেয়েটির গালের রেশম-মসৃণ চামড়ার দিকে তাকিয়ে থাকে ও দ্যাখে ওর লাল্‌চে সোনালী চুলের গোছার আড়ালে আধ-ঢাকা ছোট্ট কানের গোলাপী কম্বুরেখা। মেয়েটির বুকের ওপর গাউনের চেরা জায়গাটায় ওর নজর গিয়ে পড়ে,—দুধের মতো সাদা পীনোন্নত স্তন, ছোট একটা বাদামী বোঁটা। মাঝে মাঝে হালকা-নীল চোখ দুটো ফিরিয়ে লিস্ত্‌নিৎস্কিকে দেখছে, সহৃদয় সৌহার্দময় দৃষ্টি। কিন্তু ওই চোখই যখন ওর স্বামীর কালচে মুখখানার ওপর গিয়ে পড়ছে তখন সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে অন্য এক আভা—তাই দেখে মনে মনে একটা অস্বস্তিকর বেদনার দংশন অনুভব করে লিস্ত্‌নিৎস্কি।

খেতে বসার সময়ই প্রথম লিস্ত্‌নিৎস্কি ওর বন্ধুপত্নীকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেল। তিরিশ বছর পার হয়ে আসার পর নারীদেহে যে ম্লানায়মান ক্ষীয়মান সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তারই আভাস ওর সুডৌল দেহকাণ্ডে আর মুখশ্রীতে। কিন্তু ওর ভরা যৌবনের অনবসিত সঞ্চয় রয়েছে দেহের গতিছন্দে আর খানিকটা উষ্ণতাহীন, কৌতুকোজ্জ্বল চোখে। ওর মুখের কোমল অ-সুষম রেখায় একটা আকর্ষণ আছে যদিও হয়তো বা তাতে অসাধারণ কিছু নেই। কিন্তু একটা বৈপরীত্য খুবই নজরে পড়ে—মেয়েটির ঠোঁট দুটো পাতলা, গাঢ় লাল আতপ্ত শুকনো দুটো ঠোঁট, দক্ষিণের শামলা মেয়েদের মধ্যেই যেমনটি শুধু দেখতে পাওয়া যায়। অথচ ওর চামড়ার রঙ স্বচ্ছ গোলাপী আর ভুরুজোড়া হাল্‌কা। যখন জোরে হাসে তখন প্রাণ খুলেই হাসে কিন্তু মুচ্‌কি হাসিটা যেন খানিকটা কষ্টকৃত। নিচু গলার স্বরে খাদ-চড়া নেই,

আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য নেই। লিস্ত্‌নিৎস্কি দু'মাস কোনো মেয়েমানুষ দ্যাখেনি এক ধুকড়ি নার্সদের ছাড়া, তাই ওর চোখে এ মেয়ে মনে হল যা-নয় তার-চেয়েও সুন্দরী। সগর্বে উঁচু করে তোলা ওর মাথা আর চুলের মস্তো খোঁপার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে লিস্ত্‌নিৎস্কি। কথার জবাব দেয় বোকা-বোকা মতো, তারপর একটু বাদেই ক্লান্তির অজুহাতে নিজের কামরায় গিয়ে ঢোকে।

* *

দিনগুলো কাটে মধুর, আকুতিভরা। লিস্ত্‌নিৎস্কি পরে নিজের মনে মনেই পরম ভক্তিভরে এসব দিনগুলোর স্মৃতিরোমন্থন করেছে, নিজেকে পীড়ন করেছে শিশুর মতো নিরর্থক মূঢ়তায়। গরচাকফ দম্পতি একজোট হয়েই ওকে এড়িয়ে চলত। মেরামতী কাজ হবে এই ছুতোয় ওকে ওদের শোবার-ঘরের লাগোয়া কামরাটা থেকে সরানো হল বাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে। লিস্ত্‌নিৎস্কি বুঝেছিল গরচাকফদের পক্ষে ও একটা বাধা, কিন্তু অন্য কোথাও নড়বারও ইচ্ছে নেই ওর। দিনের পর দিন আপেল গাছগুলোর তলায় ধূলি-ধূসর নারঙী ঠাণ্ডা ছায়ায় শুয়ে মোড়ক-কাগজে যেমন-তেমন করে ছাপা খবরের কাগজগুলো পড়ে, কিংবা ঢলে পড়ে গভীর ঘুমে যদিও তাতে শ্রান্তি কাটে না। ক্লান্তির একঘেয়েমির মধ্যে ওর একমাত্র ভাগীদার একটা সুন্দর চেহারার পয়েণ্টার কুকুর। মনিব-গিন্নিকে মনিব একচেটে দখলে রেখেছে তাই তার ওপর একটা নীরব ঈর্ষা। লিস্ত্‌নিৎস্কির কাছে এসে জুটেছে, ওরই পাশে শুয়ে থাকে।

মেয়েদের সহজাত বুদ্ধিতেই অল্‌গা বুঝে ফেলেছিল লিস্ত্‌নিৎস্কির মনের আসল গলদটা কোথায়। গোড়া থেকেই নিজেকে অল্‌গা সংযত রেখেছিল, এবার ওর চাল-চলনে আরো বেশি কাঠিন্য এসে গেল। একদিন এক সন্ধ্যায় শহরের বাগিচা থেকে ফেরবার পথে ওরা পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। (গরচাকফকে তার অফিসার বন্ধুরা বাগানের ফটকের কাছে ধরেছিল)। অল্‌গাকে লিস্ত্‌নিৎস্কি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, সজোরে ওর কনুইটা এমনভাবে একপাশে চেপে ধরল যে, ভয় পেয়ে গেল অল্‌গা।

তবু হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল—অমন করে কী দেখছেন চেয়ে?

ওর গলার স্বরে খেলার ছলে ধমকানির একটা মৃদু আভাস পেল লিস্ত্‌নিৎস্কি। এবার একটা ঝুঁকি নিয়েই টোপ ছাড়ল সে। মাথাটা নুইয়ে হাসিমুখে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল- -

"কী এক পাগল-করা অশান্ত সত্তা আমাকে বেঁধেছে,
ঘোমটা-ঢাকা আঁধারের অন্তরালে মেলেছি যে চোখ
দেখেছি মায়ার ঘোরে মগ্ন কোনো সমুদ্ররেখা,
জাদুস্পর্শে মায়াসুপ্ত কোনো উপত্যকা।"

আস্তে করে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অল্‌গা তামাশার সুরে বললে—ইউজিন নিখোলায়েভিচ্‌...আমি...আপনার ধরন-ধারন আমি নজর না করে পারিনি। আপনার কি লজ্জা হয় না? দাঁড়ান, দাঁড়ান, সবুর! আমি তো ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় একটু...অন্য ধরনের। দেখুন, এ ব্যাপারে ক্ষান্তি দেওয়াই ভালো। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামগ্রী হিসাবে আমি নেহাৎই গোবেচারা। আপনার বুঝি তাহলে প্রেম করার শখ চেপেছে? না না, আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটা নষ্ট হতে দেবেন না, এসব বাজে ব্যাপার ছাড়ান দিন দয়া করে। রাজি আছেন তো? হাতে হাত মেলান তাহলে।

লিস্ত্‌নিৎস্কি ভাব দেখাল যেন কতোই না অভিমান হয়েছে ওর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিনয়টা টিকলো না। তাই অল্‌গার মতো সেও হো-হো করে হেসে ফেলল। গরচাকফ এসে ওদের ধরার পর অল্‌গা যেন আরো প্রাণবন্ত আরো উচ্ছল হয়ে উঠল, কিন্তু ইউজিন তখন চুপ মেরে গেছে আর মনে মনে উপহাস করছে নিজেকে।

সবকিছু জানার পরেও অল্‌গা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছিল এবার থেকে ওরা নিশ্চয় বন্ধুর মতো মিশবে। বাইরে থেকে লিস্ত্‌নিৎস্কি অবিশ্যি ওর এই ধারণার মর্যাদা রেখেছিল কিন্তু মনে মনে প্রায় ঘৃণাই করতে শুরু করেছিল অল্‌গাকে। তারপর কিছুদিন বাদে যখন আবিষ্কার করল অল্‌গার চরিত্র আর চেহারার খুঁত বের করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় ও ব্যাপৃত তখন আর ওর বুঝতে বাকি রইল না যে একটা সত্যিকারের গভীর অনুভূতির প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে ও।

ছুটির দিনগুলো দেখতে দেখতে কেটে গেল, শুধু তিনজনের চেতনার মধ্যে জমে রইল তার তলানিটুকু। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নতুন করে পল্টনে লোক নিয়ে, বিশ্রাম নিয়ে ফের তৈরি হতে লাগল আঘাত হানার জন্য। গরচাকফ আর লিস্ত্‌নিৎস্কিকে সঙ্গে নিয়ে ফৌজ কুবান পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

বিদায় দিতে এসেছিল অল্‌গা। ওর বিনম্র সৌন্দর্যটুকু যেন আরো বেড়ে গেছে কালো সিল্কের গাউন পরে। জল-ভরা চোখে একটু হাসল। ফোলা ঠোঁট দুটোর জন্য ওর মুখখানার মধ্যে একটা ব্যাকুল ছেলেমানুষী ভাব ফুটে উঠেছে। লিস্ত্‌নিৎস্কির মনের পটেও এইভাবেই আঁকা রইল ওর ছবি। দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে ওর এই স্পষ্ট, অম্লান প্রতিকৃতিটা বুকে ধরে রেখেছিল লিস্ত্‌নিৎস্কি, একটা স্পর্শাতীত জ্যোতির্বলয় দিয়ে ঘিরে রেখেছিল তাকে একনিষ্ঠ অনুরাগে।

জুন মাসে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে নামতে হল লড়াইয়ে। সংঘর্ষের শুরুতেই গরচাকফ কামানের গোলার টুকরো লেগে জখম হল। রণাঙ্গনের পেছনে টেনে আনা হল ওকে। তারপর ঘণ্টাখানেক বাদে রক্ত-ঝরতে থাকা অবস্থায় একটা গাড়ির মধ্যে শুয়ে ও লিস্ত্‌নিৎস্কিকে বললঃ

—মরব বলে মনে হয় না...এক্ষুণি ডাক্তাররা ছুরি-কাঁচি চালাবে আমার ওপর।... ওরা বলছে ক্লোরোফরম নেই। এভাবে মরার কোনো মূল্য আছে? তোমার কি মনে হয়? কিন্তু সে যাই হোক...আমার পূর্ণ জ্ঞানে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি...ইউজিন, তুমি অল্‌গাকে ছেড়ে যেও না। আমার বা ওর কোনো আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তুমি তো সৎ মানুষ, ভদ্র। ওকে বিয়ে কোরো...নাকি করতে চাও না?

ইউজিনের দিকে তাকিয়ে রইল চোখে একাধারে আবেদন আর ঘৃণা নিয়ে। দাড়িভরা গালদুটো কাঁপছে। ওর বুকের ওপর সাবধানে নিজের রক্ত-কাদামাখা হাতটা চেপে ধরে, ঠোঁটের লালচে ঘামটুকু চেটে নিয়ে বলল ঃ

—কথা দিচ্ছ তাহলে? ওকে ছেড়ে যাবে না? অবিশ্যি যদি রুশ সেপাইরা আমার মতো তোমাকেও খাপসুরত করে না দেয়! প্রতিজ্ঞা করছ? চমৎকার মেয়ে কিন্তু ও।—গোটা মুখটা বিকৃত হয়ে গেল গরচাকফের—ঠিক তুর্গেনিভের উপন্যাসের পাতায় যেমন মেয়েদের দেখি। আজকাল আর ওর মতো মেয়ে পাবে না। কথা দিচ্ছ? চুপ করে আছ কেন?

—কথা দিচ্ছি।

—যাও, এবার চুলোয় যাও! বিদায়!

কাঁপা হাতে একবার চেপে ধরল লিস্তনিৎস্কির হাত, তারপর একটা অদ্ভুত মরীয়া ভঙ্গিতে ওকে টেনে নিল নিজের কাছে। ভিজে মাথাটা তুলে কাঁপতে কাঁপতে লিস্তনিৎস্কির হাতের ওপর শুকনো ঠোঁট দুটো চেপে ধরল। তারপরেই ঝট্ করে জোব্বাকোটের কিনারাটা মাথার ওপর চেপে ধরেই কাত হয়ে ঘুরে গেল। ওর ঠোঁটের আড়ষ্ট বিকৃতি আর গালের ভিজে ময়লাটে ছোপটুকু চকিতের জন্য নজরে পড়ে গেল ইউজিনের।

দু'দিন বাদে মারা গেল ও। ঠিক পরের দিনই লিস্ত্নিৎস্কিকে রণাঙ্গনের পেছনে পাঠানো হল বাঁ হাত আর উরুতটা সাংঘাতিক রকম জখম হয়ে যাওয়ার ফলে।

* * *

একটানা এক নাগাড়ে লড়াই চলেছে। রেজিমেন্টের সঙ্গে দু'দুবার ইউজিন পালটা আক্রমণ চালাতে গিয়েছিল। তৃতীয়বার ওর ব্যাটেলিয়নের সেপাইদের ওপর হুকুম হল এগিয়ে যাবার। বাঁ হাতে মাথার ওপর একটা কোদাল তুলে, ডান হাতে রাইফেলটা চেপে ধরে ও হোঁচট খেতে খেতে ছুটে চলেছে আ-কাটা গমক্ষেতের ভেতর দিয়ে। কোদালের পাত ঘেঁষে একটা বুলেট শিস্ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, একটা আনন্দের শিহরণ জাগল ইউজিনের মনে—"ফস্কে গেছে"। কিন্তু পর মুহূর্তেই ওর হাতটা ছিট্কে একপাশে সরে গেল আচমকা এক ভয়ানক তীক্ষ্ণ আঘাতে। কোদালটা ফেলে দিয়ে আরো পঞ্চাশ গজ দৌড়ে গেল ও মাথা বাঁচাবার কোনো ভরসা না করেই। রাইফেলটা মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হাতই উঁচু করতে পারল না। ব্যথাটা ভেতর ভেতর শরীরের সমস্ত গিঁটগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষেতের একটা আলের মধ্যে শুয়ে পড়ে যন্ত্রণা চাপতে না পেরে মাঝে মাঝে গোঙাতে লাগল ও। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই আরেকটা বুলেট এসে বিঁধল ওর উরুতে, তারপর ধীরে ধীরে কষ্ট পেতে পেতে জ্ঞান হারালো ইউজিন।

রণাঙ্গনের পেছনে এনে ইউজিনের ছিন্নভিন্ন হাতটা কেটে বাদ দিয়েছে ওরা। উরু থেকে হাড়ের ভাঙা টুকরো টেনে বার করেছে। দু'হপ্তা ও শুয়ে থাকল হতাশা, যন্ত্রণা আর উদ্বেগে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। তারপর ওকে সরানো হল নভোচেরকাস্কে, সেখানকার হাসপাতালে আরো তিরিশটা দিন কাটল অবসাদখিন্ন অবস্থায়। মাঝে মাঝে অল্গা দেখতে আসত। ওর গালদুটোর ওপর সবুজে-হলুদ ছাপ পড়েছে। চোখের আকৃতিকে আরো গভীর করে তুলেছে শোকের ছায়া। ওর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে লিস্ত্নিৎস্কি আর চুপ করে থাকে। জামার হাতশূন্য হাতাটা কম্বলের নিচে লুকিয়ে রাখে সলজ্জভাবে, চুপিচুপি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অল্গা ওর কাছ থেকে স্বামীর মৃত্যুর খুঁটিনাটি সবটুকু বিবরণ পেতে চায়। ওর চোখদুটো ফেরে বিছানাগুলোর ওপর, কথাগুলো শুনে যায় একটা বাহ্যিক নির্লিপ্ততার ভাব নিয়ে। হাসপাতাল ছেড়ে ইউজিন দেখা করতে এল ওর বাড়িতে। অল্গার সঙ্গে সিঁড়িতে সাক্ষাৎ। হাতে চুমু খেতে গিয়ে ইউজিনের মাথাটা ওর ঘন সোনালি চুলের গোছার মধ্যে ঝুঁকে পড়তেই ও ফিরে চলল।

সাবধানে দাড়ি কামিয়েছে ইউজিন, চমৎকার একটা কোর্তাও পরেছে, কিন্তু জামার খালি হাতাটাই হয়ে উঠেছে পীড়াদায়ক। ভেতরে ওর খাটো, পটি-বাঁধা ঠুঁটো হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। দু'জনে বাড়ির ভেতর ঢুকল। আসনে না বসে দাঁড়িয়ে থেকেই বলতে শুরু করল ইউজিনঃ

—মরার আগে বরিস্ আমায় অনুরোধ করেছিল...প্রতিজ্ঞা করিয়ে গিয়েছিল যাতে তোমাকে ছেড়ে না যাই...

—জানি। ওর শেষ চিঠিতে জানিয়েছিল সে কথা...

—ওর ইচ্ছা ছিল আমরা একসঙ্গে থাকি। অবিশ্যি যদি তুমি রাজি থাকো, যদি একটা পঙ্গু লোককে বিয়ে করতে আপত্তি না থাকে। বিশ্বাস করতে পারো... এখন অবিশ্যি নিজের অনুভূতি নিয়ে বক্তৃতা দিতে গেলে কেমন শোনাবে...কিন্তু সত্যিসত্যিই আমি অন্তর দিয়ে তোমার কল্যাণ কামনা করি।

ইউজিনের অপ্রতিভ ভাব, অসংলগ্ন আবেগময় ভাষা ওর মনকে স্পর্শ করে। ও বলে—আমি এ নিয়ে চিন্তা করেছি। আমি রাজি।

—আগে আমার বাবার জমিদারীতেই যাবো। বাকিটা পরে ব্যবস্থা করা যাবে।

—আচ্ছা।

অল্‌গার মর্মরশুভ্র হাতে সশ্রদ্ধভাবে চুমু খায় ইউজিন। যখন বিনীতভাবে চোখ দুটো তোলে, দ্যাখে ওর ঠোঁটের কোণে মিলিয়ে যাচ্ছে একটা স্মিতহাসির আভাস।

অল্‌গার প্রতি লিস্ত্‌নিৎস্কির আকর্ষণ প্রেমের আর অসহ্য দৈহিক কামনার। রোজই এসে দেখা করতে শুরু করে ও। রোজকার লড়াইয়ে ক্লান্ত হয়ে ওর মন ছোটে রূপকথার রাজ্যে। নিজেকে কল্পনা করে নেয় নামজাদা কোনো উপন্যাসের নায়কের মতো, যেন ধৈর্যসহকারে খুঁজে ফিরছে এমন সব মহনীয় অনুভূতি যা ও কোনদিনই অনুভব করেনি। বোধহয় অল্‌গার প্রতি ওর সরল শারীরিক আকর্ষণের নগ্নতাকে একটা লজ্জার আড়ালে চাপা দেবার জন্যই এই প্রয়াস। তবু বুঝি কল্পনা এসে বাস্তবকে ছোঁয় একটা জায়গায় ঃ নিছক যৌন আকর্ষণ নয়, আরেকটা অদৃশ্য সূত্রও যেন ওকে বেঁধে ফেলেছে এই নারীটির সঙ্গে—যে-নারী ওর জীবনে এসেছে নেহাৎই এক দৈব যোগাযোগের ফলে। নিজের অভিজ্ঞতাকে ও সদুঃখে যাচাই করে দেখেছে, শুধু একটা জিনিসই পরিষ্কার করে বুঝেছে ঃ সেনাদল থেকে বিকলাঙ্গ আর অপসারিত হয়ে আগের মতোই ও একটা অসংযত বন্য প্রবৃত্তির দাসত্ব করে চলেছে, তা হল "ওর নিজের কাছে সবই আইনসংগত"। এমন কি যখন অল্‌গা ওর শোকের দিনে মনে মনে একটা বিপুল ক্ষতির তিক্ততা বহন করে চলেছে তখনো ইউজিন মৃত বরিসের প্রতি ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে ওকে কামনা করেছে, পাগলের মতো পেতে চেয়েছে ওকে। একটা উন্মত্ত ঘূর্ণিপাকের মতো ফেনোচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছিল ইউজিনের জীবন। সে-সব দিনে যারাই ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছে, আশেপাশের ঘটনাপ্রবাহে যারাই অন্ধ হয়েছে, বধির হয়েছে, তারাই বাঁচতে চেয়েছে ক্ষণিকের উদগ্র আবেগ আর উত্তেজনার মধ্যে। হয়তো বা সেই একই কারণে লিস্ত্‌নিৎস্কিও অল্‌গার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে বেঁধে ফেলতে তৎপর হয়েছিল, হয়তো করুণভাবে উপলব্ধি করেছিল—যার জন্য ও মৃত্যুর মোকাবিলা করতে গিয়েছে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

বাপকে ও চিঠি লিখে জানাল যে, ওর বিয়ে করার বাসনা আছে। বউকে নিয়েই ইয়াগদ্‌নয়েতে যাবে। চিঠিটা শেষ করল সকরুণ আর শ্লেষাত্মক কয়েকটা কথা লিখে— "আমি তো আমার কর্তব্য করেছি। এখনো আমি এক হাতে কোতল করতে পারি এই বিপ্লবী আপদগুলোকে, এই অভিশপ্ত 'জনগণ'কে, যাদের ভাগ্য নিয়ে আমাদের রুশ বুদ্ধিজীবীরা যুগ যুগ ধরে কতো কান্নাই কেঁদেছেন অঝোর ধারায়। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এখন আমার এসব ভয়ানক অর্থহীন মনে হয়। ক্রস্‌নভের সঙ্গে

কোনদিনই মিল হবে না দোনিকিনের, দুটি শিবিরের মধ্যেই ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, কলঙ্ক আর শয়তানি। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি তোমাকে আমার একটি হাতে আলিঙ্গন করতে। তোমার সঙ্গেই থাকব আর লড়াইটা দেখব বাইরে থেকে। আমি আর সৈনিক নই, আমি এখন ঠুঁটো—শারীরিকভাবেও, নৈতিক দিক থেকেও। আমি পরিশ্রান্ত—আমি হার মেনেছি। নিঃসন্দেহেই এর খানিকটা কারণ হল আমার বিয়ে, আর নিজের জন্য একটা 'নির্ঝঞ্ঝাট আশ্রয়' পাবার তাগিদ।"

নভোচেরকাস্ক থেকে বিদায় নেবার ক'দিন আগে ইউজিন এসে উঠেছিল অল্গার বাড়িতে। যেদিন রাতে ওরা একসঙ্গে হল সেদিন থেকেই অল্গার গাল বসে গেল, চেহারার মধ্যে একটা মালিন্য এল। ইউজিনের সাধাসাধিতে আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু যে-অবস্থার মধ্যে ও পড়েছে তাতে মনে হল ও অত্যাচারিত, মনে মনে আঘাত পেয়েছে। ইউজিন জানতো না, জানতেও চায়নি যে ওদের মধ্যে যে প্রেমের বন্ধন তার সম্পর্কে দুজনের ধারণা দুরকম, যদিও ওদের পারস্পরিক ঘৃণার পরিমাণটা একই।

ইয়াগদ্নয়ের দিকে রওনা হবার আগে লিস্তনিৎস্কি একান্ত অনিচ্ছাভরে এবং অসংলগ্নভাবেই আক্সিনিয়ার কথা ভেবেছিল। হাত দিয়ে লোকে যেমন সূর্যকে চোখের আড়াল করে, তেমনিভাবে ও আকসিনিয়াকে চিন্তার নাগালের বাইরে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ওদের সম্পর্কটা তো এতদিনে একটা অচ্ছেদ্য মিলনের রূপ নিয়েছে তাই সে-ভাবনা যেন আরো বেশি ক'রে ওকে চঞ্চল করে তুলতে লাগল। একসময় ওর এও মনে হয়েছিল বোধহয় ওদের সম্পর্কটা মুছে ফেলার দরকার হবে না—"অল্গা রাজি হবে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর ভদ্রতাবোধই প্রবল হয়, ঠিক করল বাড়ি পৌঁছোবার পর আক্সিনিয়ার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবে, যদি সম্ভব হয় সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেবে।

নভোচেরকাস্ক ছাড়ার চারদিন পর বিকেলের দিকে ইয়াগদ্নয়েতে এসে পৌঁছোয় ওরা। মহাল ছেড়ে প্রায় মাইলখানেক এসে ইউজিনের বাবা ওদের সঙ্গে দেখা করলেন। ইউজিন লক্ষ্য করল ওর বাপ খুব ধীরে ধীরে টুপি খুলে হাল্কা দ্রশ্‌কি গাড়ির আসনের ওপর দিয়ে পা তুললেন।

—আমার আদরের অতিথিদের নিতে এলাম। দেখি তো মা তোমার চেহারাটা একটু।—বলে বুড়ো ভদ্রলোক বেয়াড়া ভঙ্গিতে ছেলের বউকে বুকে টেনে নিলেন, সবুজে-ধূসর গোঁফ ঠেকল বউয়ের গালে।

ইউজিন বললে—বাবা তুমি ভেতরে এসে আমার জায়গায় বসো। আমি কোচম্যানের পাশে বসছি।

বুড়ো বসলেন অল্গার পাশে, রুমাল দিয়ে গোঁফ মুছে বেশ ধীরভাবে জেরা করতে লাগলেন ছেলেকে :

—তারপর, কেমন আছ?

—তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে বাবা।

—তাহলে তুমি পঙ্গু হয়ে পড়েছ, বলছ?

—কোনো উপায় ছিল না।

একটা কঠিন মুখভাবের আড়ালে মনের কাতরতাকে চাপা দেবার চেষ্টা করে বাপ

তাকালেন ছেলের দিকে, ওর কোর্তার খালি-হাতার ওপর থেকে চোখটা ফিরিয়ে রাখলেন অন্যদিকে।

ইউজিন কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—এ কিছু নয়। অভ্যেস হয়ে গেছে।

ওর বাপ তাড়াতাড়ি বললেন—অভ্যেস তো নিশ্চয়ই হবে। যতোক্ষণ মাথাটা আস্ত রয়েছে। সম্মান বজায় রেখে ফিরে এসেছ। সঙ্গে একজন সুন্দরী বন্দিনীকেও ধরে এনেছ।

বাপের মার্জিত, সাবেকী-কালের রসিকতাবোধে খুশি হয়ে ওঠে ইউজিন। চোখের ইশারায় অল্‌গাকে প্রশ্ন করে—কেমন লাগছে বুড়োকে? অল্‌গার উৎফুল্ল হাসি আর খুশিভরা চোখ দেখে ও বোঝে বুড়ো মানুষটিকে ওর পছন্দই হয়েছে।

ঘোড়াগুলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছে ইউজিন আর হাসি মুখে চেয়ে দেখছে ওর বাপকে, অল্‌গাকে, ওদের পেছনে ধীরে ধীরে সরে যাওয়া রাস্তাটা, আর দেখছে দূরের পাহাড়চূড়া, দিগন্ত।

—কী নির্জন জায়গা! কী চুপচাপ!—অল্‌গা হেসে রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া কাকগুলোর দিকে তাকায়। দ্যাখে সোমরাজ আর তেপাতার ঝাড়গুলো সবেগে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

ইউজিনের বাপ চোখদুটো কুঁচকে বললেন—ওরা আমাদের নেবার জন্য এসেছে।

ইউজিন ঘাড় ফিরিয়ে দ্যাখে। যদিও খুব দূরে বলে মুখগুলো ঠাহর করা যায় না, কিন্তু ও বুঝতে পারে মেয়েদের মধ্যে একজন হল আক্‌সিনিয়া। লাল হয়ে ওঠে ইউজিন। দ্রশ্‌কিটা ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় ইউজিন ভেবেছিল আক্‌সিনিয়ার মুখে বুঝি চাঞ্চল্যের আভাস দেখতে পাবে। ওর বুকটা ভয়ানক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে, ডান দিকে চোখ ফিরিয়ে আক্‌সিনিয়াকে দ্যাখে। কিন্তু অবাক হয়ে যায় ওর মুখে চাপা আনন্দ আর হাসি দেখে। ইউজিনের ঘাড় থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়ালো সে।

আর্কাসিনিয়াকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে অল্‌গা বললে—কী মারাত্মক সুন্দরী! কে ও? তারিফ না করে পারা যায় না, তাই না?

কিন্তু ইউজিন ততোক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছে। শান্ত নিস্পৃহ গলায় সায় দিলে—হাঁ, তা সুন্দরীই বটে। ও আমাদের বাড়ির ঝি।

* * * * *

ইয়াগদ্‌নয়ের প্রত্যেকটা লোকের ওপরই প্রভাব পড়েছে অল্‌গার উপস্থিতির। বুড়ো কর্তা আগে সারাটা দিনই ঘুরে বেড়াতেন রাত-পোশাক আর গরম পশমী পাণ্টালুন পরে। এবার উনি ন্যাপ্‌থালিন-দেওয়া বাক্‌স পেঁটরা খুলে তাঁর সাবেকী কোট আর ট্রাউজার বার করতে হুকুম দিলেন। আগে তাঁর নিজের সম্পর্কে কোনো খেয়ালই থাকতো না, এখন কাপড়ে একটু ভাঁজ পড়েছে কি অমনি আক্‌সিনিয়ার ওপর তম্বি করেন। সকালে যদি নোংরা জুতো এনে দেয় আক্‌সিনিয়া, তো ভীষণ দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেন। বেশ তরতাজা হয়ে উঠেছেন উনি, ওঁর কামানো গালের চৌরস দেখে ইউজিন পর্যন্ত খুশি আর অবাক হয়ে যায়।

যেন অশুভ কিছুর পূর্বাভাস পেয়েছে আক্‌সিনিয়া, তাই তরুণী মনিব-পত্নীকে খুশি করতে চেষ্টা করে ও, বাধ্য বশংবদ হয়ে অতিরিক্ত উৎসাহে তার সেবা যত্ন করে।

লুকেরিয়াও হঠাৎ খুব ভালো রান্না শুরু করেছে। চমৎকার সব নতুন নতুন সরেশ চাটনি আর সুরুয়া আবিষ্কার করছে আজকাল। এমন-কি খুনখুনে বুড়ো যে সাশ্‌কা, সে অবধি ইয়াগদুনয়ের এইসব অদল-বদলের 'বিষময়' প্রভাব থেকে নিস্তার পায়নি। বুড়ো কর্তা একদিন তাকে সিঁড়ির কাছে ধরে ফেললেন, ওর পা থেকে মাথা অবধি খুঁটিয়ে দেখে আঙুল উঁচিয়ে শাসালেন :

—এই হারামীর বাচ্চা, এসব কি, অ্যাঁ? বুড়ো লিস্তুনিৎস্কি চোখ পাকাতে লাগলেন—তোর পাৎলুনের কি ছিরি দেখেছিস!

বুড়ো সাশ্‌কা মুখের ওপর জবাব দিলে—কেন, কি ছিরি হয়েছে?—অবিশ্যি আচমকা এই তদারকী আর কর্তার কাঁপা-কাঁপা গলার আওয়াজে ও খানিকটা ফাঁপরেও পড়ে গিয়েছিল।

—বাড়িতে যুবতী স্ত্রীলোক রয়েছে, আর তুই বেটা নচ্ছার এখুনি আমাকে কবরের রাস্তায় ঠেলতে চাস্? পাৎলুনের বোতামগুলো কেন আঁটিসনি, হতভাগা ভোমরা পাঁঠা।

বুড়ো সাশ্‌কা লম্বা সার-বাঁধা বোতামগুলোর ওপর নোংরা আঙুল বুলোয়, যেন অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে। আর একবার বুড়ো কর্তার মুখের ওপর বুঝি জবাব দিতে যাচ্ছিল, কর্তা তার পা-টা এমন জোরে মাড়িয়ে দিলেন যে ওর সাবেকী আমলের ছুঁচলো-ডগা জুতোর তলাটা হাঁ হয়ে গেল। কর্তা ফুঁসিয়ে উঠলেন :

—যা তোর আস্তাবলে ফিরে যা! চট্‌পট্! লুকেরিয়াকে বলে দেব গরম জল দিয়ে তোকে রগড়ে দেবার জন্য। গায়ের ময়লা তোল্ গে' বেটা ইল্লুতে বুড়ো!

ইউজিন বিশ্রাম করে বন্দুক হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তিতির শিকার করবে বলে। আক্‌সিনিয়ার সমস্যাটা একটা বোঝার মতো হয়ে রয়েছে। কিন্তু একদিন সন্ধ্যের সময় বাপ ওকে ডেকে পাঠালেন নিজের কামরায়। ছেলের চোখের দিকে না চেয়ে দরজার দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন :

—আমি, বুঝলে...তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছি বলে কিছু মনে কোরো না। কিন্তু আক্‌সিনিয়াকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও সেটা আমার জানা দরকার।

যেভাবে তাড়াতাড়ি ইউজিন সিগারেট ফুঁকতে থাকে তাতেই ওর মনের চাঞ্চল্য ধরা পড়ে যায়। মুখটা লাল হয়ে ওঠে, আর সেটা বুঝতে পেরেই আরো বেশি লজ্জারুণ হয়ে ওঠে ও।

খোলাখুলি স্বীকার করে—আমি জানি না...বাস্তবিকই আমার জানা নেই .

বুড়ো ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলেন—

—কিন্তু আমি জানি! যাও এক্ষুনি গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলো। টাকা দাও ওকে, টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করো। —হাসেন উনি —ওকে বলো এখান থেকে চলে যেতে। আর কাউকে বহাল করে নেব ওর জায়গায়।

ইউজিন সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় চাকরবাকরদের আস্তানার দিকে। দ্যাখে আক্‌সিনিয়া দরজার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ময়দা ঠাসছে। ওর ঘাড়ের ওপরকার নরম নরম কোঁকড়া চুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ইউজিন বলে :

—আক্‌সিনিয়া, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

চট্ করে ঘুরল আক্‌সিনিয়া। মুখে একটা নম্র শান্ত ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা

করছিল ও। কিন্তু ইউজিন লক্ষ্য করল আস্তিন ছেড়ে দেবার সময় ওর হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে।

ভীরু চোখে একবার রাঁধুনির দিকে তাকাল। তারপর খুশি চাপতে না পেরে একটা সানন্দ সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে ইউজিনের পেছু পেছু বেরিয়ে এল।

বাইরের সিঁড়িতে এসে ইউজিন বলে :

—বাগানের ভেতর যাওয়া যাক। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—বেশ তো!—খুশি হয়ে বাধ্য মেয়ের মতো আক্সিনিয়া মেনে নেয়। ও ভেবেছে এই বুঝি আবার ওদের আগের সেই সম্পর্কটা নতুন করে গড়ে উঠল। যেতে যেতে ইউজিন নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে,

—কেন তোমাকে ডেকে আনলাম জানো?

অন্ধকারের মধ্যে হাসে আক্সিনিয়া, ইউজিনের হাত চেপে ধরে; কিন্তু এক ঝট্কা দিয়ে হাত সরিয়ে নেয় ইউজিন, আকসিনিয়ারও কিছু বুঝতে বাকি থাকে না। ও থেমে পড়ে।

—আপনার কি চাই, ইউজিন নিখোলায়েভিচ্? আমি আর বেশিদূর এগোচ্ছি না।

—বেশ। এখানেই কথাবার্তা হয়ে যাক্! কেউ শুনতে পাবে না। ইউজিন তড়বড় করতে গিয়ে নিজের কথার অদৃশ্য জালে নিজেই জড়িয়ে যায়।—তোমার বোঝা উচিত। আগের মতো আর তোমার সঙ্গে আমার থাকা চলে না। তোমার সঙ্গে সেভাবে দিন কাটানো সম্ভব নয়, বুঝতে পেরেছ? আমি এখন বিবাহিত। সৎ মানুষ হিসাবে তাই এখন এমন কিছু করতে পারি না যাতে কেলেঙ্কারি হয়। আমার বিবেকই আমাকে বাধা দেবে।—নিজের বড়ো-বড়ো কথায় নিজেই ভয়ানক লজ্জা পেয়ে যায় ইউজিন।

আঁধার ঘনিয়ে-আসা পূর্বদিক থেকে রাত তখন সবে নেমে এসেছে। পশ্চিমের একখণ্ড আকাশ তখনো সূর্যাস্তের আভায় নীলাভ ধূসর। ফসল মাড়াইয়ের উঠোনে লণ্ঠনের আলো জ্বেলে মুনিষরা ঝাড়াই-মাড়াই করছে। চমৎকার জল-হাওয়া আর জীবনের স্পন্দনমুখর কলকল্লোর সুবিধে পেয়েছে ওরা। একটানা মাড়াই-কলের খোরাক দিতে দিতে জোগানদারটা মনের খুশিতে ঘ্যাসঘেসে গলায় বলে উঠছিল : আরো দাও, আরো! বাগানের ভেতরটা একেবারে নীরব নিস্তব্ধ, শুধু আলফ্‌শি, গম আর শিশিরের গন্ধ।

আকসিনিয়া কিছু বললে না।

—তুমি কি বলো? চুপ করে আছ কেন আকসিনিয়া?

—বলার কিছু নেই আমার।

—টাকা দেব। তোমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। রাজি আছ বোধ হয়। তোমাকে সব সময় চোখের সামনে দেখা আমার পক্ষে বড়ো শক্ত।

—আর এক হপ্তার মধ্যেই আমার মাস কাবার। এ সময়টুকু থেকে যেতে পারব তো?

—নিশ্চয়, তা তো বটেই!

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে আকসিনিয়া। তারপর যেন কেউ ওকে মেরেছে এমনিভাবে ভয়ে-ভয়ে পাশের দিকে সরে এসে ইউজিনের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। বলে :

—বেশ...চলে যাব। পরে তোমার দুঃখ হবে না তো? আমার নিজের তাগিদেই লজ্জার মাথা খেয়েছিলাম। একা একা থেকে পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আমাকে দুষবে না তো ইউজিন।

আর্কাসিনিয়ার গলার আওয়াজটা খনখনে, শুকনো। সত্যিসত্যি, না, ঠাট্টা করে কথাগুলো বলল ও?—ইউজিন বৃথাই বুঝতে চেষ্টা করে।

কী চাই তোমার?—অস্বস্তির সঙ্গে কেশে ওঠে, হঠাৎ অনুভব করে আর্কাসিনিয়া আবার ওর হাতটা ভয়ে-ভয়ে ছোঁবার চেষ্টা করছে।

কয়েক মিনিট বাদে একটা স্যাঁতসেঁতে সুগন্ধ করমচা ঝোপের তলা থেকে বেরিয়ে আসে ইউজিন। বাড়িতে ঢোকার আগে নিচু হয়ে পাৎলুনের হাঁটুর ওপর রুমাল ঘষে—সরস ঘাসের সবুজ ছোপ লেগে রয়েছে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে একবার পেছন ফিরে তাকায়। চাকরদের ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পায় আর্কাসিনিয়া মাথার পেছনে হাতদুটো তুলে চুলগুলো সমান করছে। ওর ঠোঁটের কোণে খেলছে একটা হাসি।

॥ পাঁচ ॥

কাশের বনে পাক ধরেছে। স্তেপের মাঠ ছেয়ে মাইলের পর মাইল রুপোলির দুলুনি—যেন আর শেষ নেই। মাঝে মাঝে বাতাস ছুটে আসে লাফিয়ে ডিঙিয়ে, সর্ সর্ করে নীলচে-ধূসর ঢেউ খেলে যায় কখনো দক্ষিণে, কখনো পশ্চিমে। যেখানেই হাওয়ার মোড় ঘোরে, কাশবনের মাথা সেখানে নুয়ে পড়ে ভক্তিভরে, আর ধূসর তৃণ-বিস্তারের বুকে জেগে ওঠে গাঢ়তর পথরেখা। নানারঙের ঘাসে ফুল ফুটেছে। টিলা-গুলোর মাথা থেকে শুকনো, নিরেস সোমরাজলতা অদৃশ্য হয়েছে। ছোট ছোট রাত তাড়াতাড়ি কাবার হয়ে যায়। রাতের কাজল-কালো আকাশে অগণন তারার ছড়াছড়ি। কসাকদের "ছোট সূর্য"—চাঁদ ম্লান হতে হতে ক্ষয় পায় আর পাণ্ডুরাভ হয়ে ওঠে। দীর্ঘ ছায়াপথটা আকাশের অন্য তারাপুঞ্জের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। ঝাঁঝালো বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। খটখটে শুকনো হাওয়ায় সোমরাজের গন্ধ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোমরাজের তেতো আস্বাদ ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি পর্যন্ত ঠাণ্ডার জন্য আঁকুপাঁকু করে। আকাশের গর্বদৃপ্ত তারাপথে ঘোড়ার খুর বা মানুষের পায়ের চিহ্ন কখনো পড়েনি। ম্লান হয়ে মুখ লুকিয়েছে সে পথ। শুকনো কালো আসমানী মাটিতে পড়ে তারার মতো গমের চূর্ণ তেমনি নষ্ট হয়েছে—সে-মাটিতে অঙ্কুর গজায়নি, বীজের জয়গান ওঠেনি। ঘাস। আর তারই ওপর রুপালি তিতিরের অক্লান্ত প্রয়াসী কর্মতৎপরতা, গঙ্গাফড়িঙের অন্তহীন ধাতব সঙ্গীত।

দিনের বেলায় গোটা স্তেপ একটা গুমোট, দম-আটকানো, ভ্যাপসা কুয়াশা ছাড়া আর চাঁদ— সে তো ঊষর লবণাক্ত জলাভূমি। অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে গেছে স্তেপপ্রান্তরের আর কিছু নয় : আকাশের ফ্যাকাশে মেঘহীন কপোত-নীল তখন নির্মম সূর্যের তেজ আর বাদামী ইস্পাত-রঙা ডানা-ছড়ানো চিলের বঙ্কিম-রেখা। স্তেপের মাঠ জুড়ে চোখ-ঝলসানো, চোখ-ধাঁধানো কাশবন, ধোঁয়াটে পিঙ্গল-বাদামী তার রঙ; কাত হয়ে চিল ভাসে আকাশের বুকে আর তারই প্রকাণ্ড ছায়া নিঃশব্দে সরে যায় ঘাসের ওপর দিয়ে।

আদরের স্তেপের মাটি! ঘোড়াদের ঘাড়ের ঝুঁটি এলোমেলো করে দিচ্ছে ঝাঁঝালো হাওয়া এসে। পিপাসার্ত ঘোড়ার শ্বাস-প্রশ্বাস নোন্‌তা হয়ে ওঠে সে-হাওয়ায়, নুন-জড়ানো তেতো নিঃশ্বাস নাকে টেনে ঘোড়া নরম ঠোঁট দুটো চোষে আর জিভে রোদ-বাতাসের উগ্র আস্বাদ পেয়ে হ্রেষাধ্বনি করে। ডনের আনত আকাশের নিচে আদরের স্তেপভূমি! আঁকাবাঁকা নদী-খাত, শুকনো উপত্যকা, লালাভ খাড়াই পাহাড়, কাশ-বনের বিপুল বিস্তারের মাঝে মাঝে ঘোড়ার খুরের কালো দাগ, ধ্যান গম্ভীর পাহাড়—কসাকদের অতীত গৌরবকে বাঁচিয়ে রেখেছে এরা। মাথা নিচু করে আমি সন্তানের মতো চুম্বন করি তোমার সতেজ মাটি, আমি চুম্বন করি ডন কসাকের অকলঙ্কিত রক্তস্নাত স্তেপভূমি।

* *

মর্দা ঘোড়াটার মাথা ছোট, রোগাটে, সাপের মতো। কানদুটো খুদে খুদে, চঞ্চল। বুকের পেশীগুলো চমৎকার সুগঠিত। পাগুলো সুন্দর, সুদৃঢ়, পায়ের গোছ অনবদ্য, আর নদীর নুড়িপাথরের মতো মসৃণ খুর। পাছার দিকটা নমনীয়, দোদুল্যমান। দেহে নির্ভেজাল ডন ঘোড়ার রক্ত, এক ফোঁটা বিদেশী রক্ত তার শিরায় নেই। প্রত্যেকটা চালচলনের মধ্যে ফুটে উঠছে বংশমর্যাদার পরিচয়।

একদিন জল খাবার সময় ঘোড়াটা নিজের ঘুড়ীদের বাঁচাতে গিয়ে অন্য এক বয়স্ক সবলতর ঘোড়ার সঙ্গে লড়াইয়ে মাতে। বিশ্রীভাবে লাথি খায় সামনের বাঁ পায়ে, যদিও চরানির মাঠে ঘোড়াদের খুরে কখনো নাল লাগানো হয় না। দুটো ঘোড়াই উঁচু হয়ে লাথালাথি শুরু করে সামনের পা ছুঁড়ে, কামড়াকামড়ি করে এ ওর মাংস ছিঁড়ে ফেলে।

কাছে পিঠে চরানিদার নেই। সে তখন পিঠে রোদ লাগিয়ে ঘুমোচ্ছে স্তেপের মাঠে। অন্য ঘোড়াটা মালব্রাক্‌কে মাটিতে ফেলে দেয়, তাড়া করে নিয়ে যায় পাল থেকে অনেক দূরে। সেখানে রক্তাক্ত অবস্থায় মালব্রাক্‌কে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়াটা ফিরে এসে দখল করে বসে মাদীঘোড়ার দুটো পালই।

আহত ঘোড়াকে আনা হল আস্তাবলে। পশু-ডাক্তার তার জখম-পায়ের শুশ্রূষা করল। ছ'দিন বাদে মিশ্‌কা কশেভয় একটা রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এসে দ্যাখে মালব্রাক্‌ বংশপ্রজননের প্রবল তাগিদে মতিচ্ছন্ন হয়ে লাগামের দড়ি কেটে খোঁয়াড় থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ছাউনির উঠোনে চরছিল খুঁড়িয়ে-চলা মাদীঘোড়াগুলো। পাশ দিয়ে চক্কর দিয়ে মালব্রাক্‌ তাদের তাড়া করে নিয়ে চলল স্তেপের মাঠে—প্রথমে কদম চালে, তারপর যারা পেছনে পড়ে যাচ্ছিল তাদের কামড় দিয়ে তাড়িয়ে। চরানিদাররা, ওভারসিয়ার নিজে, ছুটে বেরিয়ে এল চালাবাড়ি থেকে। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে।

ওভারসিয়ার গাল পাড়ল—হতভাগা! একটা ঘোড়াও রেখে যায়নি যে চড়ে যাওয়া যায়! দূরে পালিয়ে-যাওয়া ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে, মনে মনে অবশ্য তারিফই জানাল।

দুপুরে মালব্রাক্‌ তার ঘুড়ীদের নিয়ে ফিরে এল জল খাবার জন্য। চরানিদাররা পায়ে হেঁটেই তাকে ঘুড়ীদের দল থেকে আলাদা সরিয়ে নিল। তারপর মিশ্‌কা জিন চাপিয়ে তার পিঠে চেপে স্তেপের মাঠে নিয়ে গেল, নিজের আসল পালটার মধ্যে ছেড়ে দিল মালব্রাক্‌কে।

দু'মাস চরানিদারের চাকরি করে মিশ্‌কা সযত্নে লক্ষ্য করেছে চরানির ঘোড়াদের জীবন। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি আর একান্ত 'অ-মানবীয়' উদারতা দেখে ওর মন ভরে উঠেছে

পরম শ্রদ্ধায়। দেখেছে ঘুড়ীদের ওপর ঘোড়াদের চাপতে, আর আদিম পরিবেশের মধ্যে ওদের এই আদিম ক্রিয়ানুষ্ঠান এত স্বাভাবিক প্রজ্ঞাব্যঞ্জক আর এত সহজ যে অজ্ঞাতসারেই মানুষের সঙ্গে এক একটা তুলনা এসে গেছে ওর মনে, আর সে তুলনায় হার হয়েছে মানুষেরই। কিন্তু ঘোড়াদের সম্পর্কের মধ্যেও এমন অনেক কিছু আছে যা মানবিক। যেমন মিশ্‌কা লক্ষ্য করেছে, বয়েস-বেড়ে-যাওয়া মন্দ ঘোড়া বাখার—নিজের মাদী ঘোড়াদের সঙ্গে তার আচরণটা বড়ো বেয়াড়ারকমের উগ্র আর শয়তানিভরা; সেও একটা চার-বছর বয়েসের পাটলবর্ণা সুন্দরীকে আলাদা বেছে নিয়েছে। চাঁদ-কপালে, জ্বলজ্বলে চোখওয়ালা ঘুড়ীটার সঙ্গে তার ব্যবহারই একেবারে অন্যরকম। তার কাছে থাকলে ও কেমন বেসামাল আর উত্তেজনায় বোকা-বোকা হয়ে যায়, আর নাক দিয়ে একটা বিশেষ ধরনের, সংযত অথচ কামনার্ত আওয়াজ ক'রে ওর গন্ধ অনুভব করে। খোঁয়াড়ে দাঁড়াবার সময় ওর পেয়ারের ঘুড়ীর পাছার ওপর নিজের বজ্জাতিভরা মাথাটা কাত করে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝিমোতে ভালোবাসে। মিশ্‌কা ওকে লক্ষ্য করে, দ্যাখে ওর চৌরস চামড়ার নিচে থিরথির করে কাঁপছে পেশীর গোছা। তখন ওর মনে হয় যেন বাখার ওই বিশেষ একটি ঘুড়ীকেই ভালোবাসে বার্ধক্যের মরীয়া রকমের উগ্র আর বিষাদময় আবেগ দিয়ে।

কাজে মিশ্‌কার গাফিলতি নেই। ওর মন লাগিয়ে কাজ করার খবরটা নিশ্চয়ই জেলা আতামান জানতে পেরেছে, তাই আগস্ট মাসের মাঝামাঝি ওভারসিয়ারের কাছে নির্দেশ এল কশেভয়কে আবার ভিয়েশেন্‌স্কাতে ফেরৎ পাঠাবার জন্য।

মিশ্‌কা সঙ্গে সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি। সাজ-সরঞ্জাম বুঝিয়ে দিয়ে সেদিনই সন্ধ্যের দিকে ও রওনা হয় ভিয়েশেন্‌স্কার উদ্দেশে। মাদী ঘোড়াটাকে ক্রমাগত দাবড়ানি দেয়। কারগিন পেরিয়ে যায় বেলা ডোবার আগেই। পাহাড়ের ওপাশে গিয়ে একটা হাল্‌কি ঘোড়ার-গাড়ির নাগাল ধরল মিশ্‌কা। গাড়িটাও ভিয়েশেনস্কার দিকেই যাচ্ছিল। উক্রেইনীয় চালক হাঁফিয়ে-ওঠা তাগড়াই ঘোড়াগুলোকে দাবড়াচ্ছে। হাল্‌কা গাড়িটার পেছনের আসনে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে ভদ্রচেহারার একজন লোক। চওড়া কাঁধ, গায়ে শহুরে ছাঁদের কোট, মাথার পেছনে ঠেলে দিয়েছে ধূসর ফেল্টের টুপি। কিছুক্ষণ মিশ্‌কা গাড়িটার পেছন পেছন চলে। তাকিয়ে থাকে লোকটার কাঁধের দিকে। রাস্তার চাকার গর্তে গাড়ি পড়তেই ঝাঁকুনি খেয়ে উঠছে কাঁধজোড়া। কলারের সাদা ধুলোমাখা পট্টির দিকে চোখ পড়ে মিশ্‌কার। যাত্রীর পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা হলদে হাতব্যাগ আর ওভারকোটে ঢাকা একটা থলি। মিশ্‌কার নাকে চুরোটের অনভ্যস্ত গন্ধ এসে ঠেকে। ও ভাবে—নিশ্চয় কোনো সরকারী আমলা ভিয়েশেন্‌স্কা যাচ্ছে। লোকটার পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে যায় নিজের ঘুড়ীটাকে। টুপির তলায় আড়চোখে উঁকি মারতেই ওর মুখখানা হাঁ হয়ে যায়, দারুণ বিস্ময় আর ভয়ের একটা শিহরণ নেমে যায় ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। গাড়ির ভেতর শুয়ে যে লোকটা চুরোটের কালো দিকটা অধৈর্য হয়ে চিবুচ্ছে আর কটা-রঙের চোখদুটো কুঁচকে রয়েছে সে হল স্তেপান আস্তাখফ। তবু স্থির-নিশ্চয় হতে না পেরে মিশ্‌কা আরেকবার তাকায় তার গাঁয়ের পড়শীটির দিকে—কী অদ্ভুত আর বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে মুখখানার মধ্যে, কিন্তু এবার ভালো করে বুঝতে পারে এ সেই স্তেপানই। উত্তেজনায় ঘেমে উঠে ও গলা খাঁকারি দেয় :

—মাফ করবেন দাদা, আপনার নাম তো আস্তাখফ?

গাড়ির লোকটা মাথার পেছনে টুপিখানা ঠেলে দিয়ে ফিরে তাকাল মিশ্‌কার দিকে।

বললে—হ্যাঁ, আমি আস্তাখভ্। তাতে হয়েছে কি? তুমি না...সবুর সবুর, আরে কশেভয় না তুমি?—গাড়িতেই একটুখানি উঁচু হয়ে উঠে, গোঁফের তলায় মুচকি হাসল স্তেপান। মুখের বাকি অংশের মধ্যে একটা দুর্বোধগম্য কাঠিন্য বজায় রেখে হাতটা বাড়িয়ে দিল খুশি হয়ে। খানিকটা অপ্রস্তুতও হয়েছে সে—এ তো কশেভয়ই দেখছি! মিখাইল! বড্ড খুশি হলাম...

—কিন্তু একী ব্যাপার...? কেমন করে এখানে এলেন?—লাগাম ছেড়ে দিয়ে হাত দুটো সবিস্ময়ে মেলে ধরল কশেভয়।--আপনি নাকি মারা গেছেন সবাই বললে। কিন্তু আস্তাখফ তো দেখছি বহাল তবিয়েতেই!

হেসে ফেলে কশেভয় জিনের ওপর উশ্‌খুশ্‌ করতে লাগল। স্তেপানের চেহারা আর মার্জিত বিশুদ্ধ কথাবার্তায় ও একটু বোকা বনে গেছে। সম্ভাষণের ধরনটা বদলালো কশেভয়, বন্ধুত্বের সুরে আর কথা বলা চলল না। একটা অদৃশ্য ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠেছে, করুণভাবে উপলব্ধি করল ও। আলাপ শুরু হল দুজনের। ঘোড়াগুলো হেঁটে হেঁটে পথ চলেছে। পশ্চিমে সূর্যাস্তের উজ্জ্বল লালিমা, নীল আকাশ বেয়ে মেঘের দল ছুটেছে রাত্রির পানে। রাস্তার পাশে ঘাসবনে একটা তিতির ডেকে উঠল সুতীক্ষ্ণ স্বরে। কিন্তু দিনের কলরব থেকে সন্ধ্যার নীরবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে স্তেপভূমি আর সেই সঙ্গে একটা ধূলি--ধূসর নৈঃশব্দ্য নেমে আসছে প্রান্তরের বুকে। দূরে নীলচে-লাল আকাশের পটে ফুটে উঠেছে তাতারস্ক আর ভিয়েশেনস্কার রাস্তার চৌমাথার মোড়ে সমাধিস্তম্ভটার কালো রেখাকৃতি।

মিশ্‌কা খুশিমনে জিজ্ঞেস করে—কোথা থেকে এলেন আপনি, স্তেপান আন্দ্রেয়িচ্?

--জার্মানি থেকে। ফিরে এসেছি নিজের দেশে, দেখতেই পাচ্ছ।

—কিন্তু আমাদের কসাকরা যে বলেছিল ওরা চোখের সামনে আপনাকে মরতে দেখেছে!

স্তেপান জবাব দেয় ভেবে চিন্তে, সংযতভাবে, যেন এ প্রশ্নগুলো ওকে চেপে ধরেছে বোঝার মতো

- দুজায়গায় ঘায়েল হয়েছিলাম। আর কসাকরা তো...ওদের আর কি? সেখানেই আমায় ফেলে চলে এল।.. তারপর বন্দী হলাম। জার্মানরা জখম সারিয়ে তুলে কাজে পাঠাল..

-কিন্তু গাঁয়ে থাকতে তো আপনার কোনো চিঠিপত্রই পাইনি আমরা..

--এমন কেউ নেই যাকে লিখব। -চুরুটের গোড়াটা ফেলে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ধরায় স্তেপান।

--কিন্তু আপনার স্ত্রী? সে তো বেঁচে আছে, ভালোই আছে।

--আমি তো তার সঙ্গে থাকতাম না। সবাই সে কথা জানে বলেই তো ধারণা ছিল আমার।

গলার আওয়াজটা শুকনো ঠেকে, অনুভূতির লেশ নেই তাতে। বউয়ের নাম বলতেও যেন কোনো চাঞ্চল্য জাগে না ওর মধ্যে।

বিমর্ষভাবে গাড়ির কোচোয়ান চাবুক নাচাল। ক্লান্ত ঘোড়াগুলো বল্‌গায় টান মারল অনিচ্ছাভরে। চাকার দাগের ওপর দিয়ে লাফিয়ে উঠল গাড়িখানা। মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে স্তেপান আলাপে ছেদ টানল শেষ প্রশ্নটা ক'রে—গাঁয়ের দিকে চলেছ?

—না। চলেছি জেলা আতামানের কাছে।

চৌমাথার মোড়ে এসে মিশ্‌কা ডানদিকে ঘোরে। রেকাবের ওপর উঁচু হয়ে বলে—আজকের মতো তাহলে আসি, স্তেপান আন্দ্রেয়িচ্‌!

স্তেপান ধুলোভরা টুপির কিনারায় আঙুল ছুঁয়ে নিস্পৃহ গলায় জবাব দেয়—আচ্ছা, এসো তাহলে, ভালোয় ভালোয়!—প্রত্যেকটা শব্দ বিদেশীদের ঢঙে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে ও।

॥ ছয় ॥

*

লালবাহিনী তাদের শক্তি সংহত করে নতুন এক পাল্‌টা আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে। কসাকদের দারুণ গুলিগোলা রসদের অভাব, তাই প্রদেশের সীমা পেরোবার চেষ্টা না করে তারা কেবল ছোটখাটো লড়াইয়ের মধ্যে নিজেদের আক্রমণশক্তি বজায় রেখেছে। একবার এপক্ষের সাফল্য, আরেকবার ওপক্ষের। আগস্ট মাসে সামরিক তৎপরতা খানিকটা বন্ধ হল। যেসব কসাক অল্প কিছুদিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরেছিল তারা শরৎকালে সন্ধি করার কথা তুলল।

রণাঙ্গনের পেছনের মফস্বল ও পল্লী এলাকায় তখন ফসল তোলার কাজ শুরু হয়েছে। টের পাওয়া যাচ্ছে কর্মীর অভাব। বুড়োরা আর মেয়েরা এমনিতেই ফসল কাটার কাজ সামাল দিতে পারছে না, তার ওপর আবার অনবরত বাধা পড়ছে সামরিক রসদপত্র লড়াইয়ের ময়দানে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি-ঘোড়া চেয়ে বসার ফলে। প্রায় রোজই পাঁচ ছ'টা করে গাড়ি সংগ্রহ করা হয় তাতারস্কে, ফৌজী রসদ বোঝাই করার জন্য সেগুলো ভিয়েশেন্‌স্কায় পাঠানো হয়, তারপর চালান করে দেয় কসাকবাহিনীর কাছে।

স্তেপান আস্তাখফ ফিরে আসায় সাড়া পড়ে গেছে গোটা গ্রামে। প্রত্যেকটা বাড়িতে প্রত্যেকটা ফসল মাড়াইয়ের আঙিনায় এইটেই হল আলাপের একমাত্র বিষয়। বহুকাল আগে কবরের তলায় চলে গেছে বলে ধারণা ছিল যার সম্পর্কে, বুড়িরাই শুধু যার কথা মনে করত বিড়বিড় করে "ওর আত্মার শান্তি হোক্‌" বলে,—সেই কসাক আজ ফিরে এসেছে নিজের ঘরে। এ যদি দৈবের খেলা না হয় তো..!

আনিকুশ্‌কার ফটকের সামনে দাঁড়ায় স্তেপান, ওর জিনিসপত্রগুলো বাড়ির ভেতর নিয়ে যায়। আনিকুশ্‌কার বউ যখন ওর জন্য জলখাবার বানাচ্ছে সেই ফাঁকে ও নিজের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। চাঁদের আলোভরা উঠোনে জোরে জোরে পা ফেলে পায়চারি করে—বাড়ির কর্তার মতো। আধা ধ্বসে-পড়া চালাঘরগুলোর চালের তলা দিয়ে হেঁটে যায়, ঘরটাকে ভালো করে দ্যাখে, বেড়াগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে পরখ করে। আনিকুশ্‌কার টেবিলে গরম ভাজা ডিম কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, স্তেপান কিন্তু তখনো নিজের ঘাস-গজিয়ে ওঠা বাড়িটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, আঙুল ফোটাচ্ছে আর আপন মনে বিড়বিড় করছে।

সেদিন সন্ধ্যায় কসাকরা আসে ওকে দেখতে, জিজ্ঞেস করে ওর বন্দী-জীবনের কথা। আনিকুশ্‌কার সামনের ঘরে মেয়েমানুষ আর ছেলেপেলেদের ভিড়। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ওরা আর হাঁ করে শুনছে স্তেপানের গল্প। ইচ্ছে নেই তবু বলছে স্তেপান; একবারও ওর বুড়িয়ে যাওয়া মুখখানার মধ্যে হাসি ফুটল না। বোঝা যাচ্ছে জীবনের অভিজ্ঞতা একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে ওর মধ্যে।

পরদিন সকালে দেখা করতে এল পান্তালিমন মেলেখফ্‌। স্তেপান তখনো ঘুমোচ্ছে। হাতের মুঠোয় কাশি চেপে বুড়ো বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগল যতোক্ষণ না ওর ঘুম ভাঙে। ঘরের ভেতর থেকে মাটির মেঝের ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ আসছে, আর কড়া তামাকের অনভ্যস্ত দম-আটকানো গন্ধ। সেই সঙ্গে এমন একটা অস্পষ্ট ঘ্রাণ যা পথ-ডিঙিয়ে-আসা মানুষের গায়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত লেগে থাকে।

স্তেপানের ঘুম ভেঙেছে বোঝা যাচ্ছে। চুরুট ধরাবার জন্য দেশলাইকাঠি ঘষার আওয়াজ এল।

পান্তালিমন বললে—ভেতরে আসতে পারি?—যেন কোনো উপরওয়ালা কর্মচারীর সামনে হাজির হচ্ছে এমনিভাবে সাবধানে নতুন শার্টের ভাঁজগুলো ঠিক করে নিল সে। ইলিনিচ্‌না অনেক করে বলেছিল এ জামাটা পরে আসতে বিশেষ করে এই ব্যাপারের জন্য।

—আসুন!

চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতেই পোশাকটা পরে নিচ্ছিল স্তেপান। ধোঁয়ার জন্য চোখদুটো কুঁচকে রয়েছে। একটু যেন ঘাবড়ে পান্তালিমন চৌকাঠ ডিঙোয়; অবাক হয়ে গেছে স্তেপানের চেহারার বদল আর ওর সিল্কের পটির ওপর পেতলের বগলেশ দেখে। থমকে দাঁড়িয়ে কালো হাতের তেলোটা বাড়িয়ে দেয় পান্তালিমন।

—নমস্কার পড়শি।

—নমস্কার।

সবল কাঁধের ওপর পটিজোড়া টেনে দেয় স্তেপান। নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে বুড়োর লোমশ হাতে নিজের হাতটা রাখে। চট্‌ করে দুজন দুজনের ওপর নজর বুলিয়ে নেয়। স্তেপানের চোখে ঝিক্‌মিক করে ওঠে অসৌহার্দের স্ফুলিঙ্গ; মেলেখফের ট্যারচা বড়ো-হয়ে-ওঠা চোখের তারায় সম্ভ্রম আর একটা হাল্‌কা সশ্লেষ বিস্ময়।

—তুমি যে দেখছি অনেকটা বড়ো হয়ে গেছ স্তেপান; বয়েসে অনেকটা বেড়ে গেছ যে বাছা।

—হ্যাঁ, তা বয়েস বেড়েছে বই কি।

—তোমার আত্মার সদ্গতি কামনা করে কতো প্রার্থনা করেছি আমরা, যেমন করেছিলাম গ্রিশ্‌কার বেলায়ও। শুরু করেই বুড়ো বিরক্ত হয়ে কথার মাঝখানেই আবার থেমে পড়ে। এখন সেসব কথা তোলার সময়? নিজের ভুলটা শুধরে নেবার চেষ্টা করে—ঈশ্বরের গৌরব হোক, ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছ আবার। ভগবানের মহিমা! গ্রিশ্‌কার জন্যও আমরা প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু লাজারাসের মতো সে তো আবার খাড়া হয়ে উঠল, হাঁটাচলা করল। ওর এখন দুটি বাচ্চা, আর ওর বউ নাতালিয়াও এখন ঈশ্বরের দয়ায় ভালো হয়ে উঠেছে। খুব চমৎকার মেয়ে যাহোক্‌!...হ্যাঁ, তারপর, ভালো আছ তো?

—আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ।

—একবার বেরোবে নাকি পড়শিদের দেখতে? এসো এসো, আমাদের এটুকু কৃতার্থ করো। আলাপ-সালাপ হবে'খন।

স্তেপান রাজি হয় না। কিন্তু পান্তালিমন নাছোড়বান্দা, সে চটে যেতে লাগল, অগত্যা রাজি হতে হল স্তেপানকে। হাতমুখ ধুয়ে, ছোট করে ছাঁটা চুল চিরুনি দিয়ে পেছনে ঠেলে আঁচড়াল। বুড়ো যখন বললে—কী হে তোমার মাথার সামনের চুল কি হল? টাক বানিয়ে ফেলেছ যে!—ও শুধু হাসল। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মাথার ওপর টুপিটাকে বসিয়ে উঠোনের রাস্তা দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল বুড়োকে।

পান্তালিমন যেন কৃতজ্ঞতায় গদগদ। তাই দেখে স্তেপানের অজ্ঞাতসারেই মনে হয়—লোকটা আগে যে অন্যায় করেছিল এখন সেটা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।...

স্বামীর চোখের নীরব হুকুম মেনে নিয়ে ইলিনিচ্না রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে ঘুট্ঘাট্ করলে নাতালিয়া আর দুনিয়াকে দিয়ে ফাইফরমাশ খাটালে,আর নিজে করলে পরিবেশন। সাধুসন্তদের পটের নিচে বসেছে স্তেপান। মেয়েরা মাঝে মাঝে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে ওর দিকে। ওর কোট, কলার, রুপোর ঘড়ি-চেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। দেখছে ওর চুল আঁচড়ানো নতুন কায়দাটা। আর ওদের নিজেদের মধ্যে বিস্ময়মুগ্ধ হাসির বিনিময় হচ্ছে, সেটা আর চেপে রাখতে পারছে না ওরা। দারিয়া এল আঙিনা থেকে। মুখখানা ওর লাল হয়ে উঠেছে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাসল। আঙরাখার কোণা দিয়ে মুছল ঠোঁটের পাতলা রেখাদুটো।

চোখদুটো ঘোঁচ করে অবাক হয়ে বললে—আরে, আপনাকে যেন আগে দেখিইনি। কসাকের মতো দেখাচ্ছে না তো আপনাকে।

সময় আর নষ্ট না করে পান্তালিমন টেবিলের ওপর রাখলে ঘরে চোলাই-করা এক বোতল ভদ্‌কা। নেক্‌ড়ার ছিপি খুলে তেতো-মিষ্টি গন্ধটা একটু শুঁকে জিনিসটার তারিফ করে বললে—চেখে দ্যাখো! এ আমার নিজের হাতে তৈরি।

স্তেপানের খাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এক গেলাস টেনেই তার নেশা ধরে গেল, এবার আরো খোলাখুলি কথাবার্তা বলতে শুরু করল সে।

পান্তালিমন মন্তব্য করল—তোমার এবার বিয়ে করা উচিত পড়শি।

—আমার আগের বউয়ের কি ব্যবস্থা হবে তাহলে?

—আরে, তার কথা ছেড়ে দাও! তুমি কি ভাবো এতদিনে সে বুড়িয়ে যায়নি? বউ হল ঘুড়ীর মতো : যতোদিন চাপবে ততোদিন দাঁতের জোর। তোমায় আমরা ছুকরি দেখে একট বউ জোগাড় করে দেব।

—আজকাল জীবনটাই বড়ো জগাখিচুড়ি হয়ে উঠেছে...বিয়ের সময় নয় এটা। দশদিনের ছুটি পেয়েছি, তারপর যাবো ভিয়েশেন্‌স্কা, তারপর হয়তো-বা লড়াইয়ের মাঠে—জবাব দিলে স্তেপান। নেশা বেড়ে ওঠার সঙ্গে ওর কথা বলার বিদেশী ঢংটাও চলে গেছে।

একটু বাদেই বিদায় নিল স্তেপান—আলোচনা তর্ক পেছনে রেখে দারিয়ার সপ্রণয় দৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে।

স্তেপান যে আতিথ্য গ্রহণ করেছে আর আগের সেই অন্যায়টুকু ভুলে গিয়েছে তাতে খুবই কৃতার্থ হয়েছে পান্তালিমন। তারিফ করে বলতে লাগল—কুত্তীর বাচ্চা কেমন লেখাপড়া শিখেছে দ্যাখো! কী কথাবার্তা! যেন আবগারি হাকিম কি উঁচু-ঘরের ছেলে। যখন দেখা করতে গেলাম, দেখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর সিল্কের

পটি আর বগলেশ আঁটছে। ভগবানের দিব্যি! কাঁধে আর বুকে সাজ এ'টে যেন একেবারে ঘোড়ার মতো। এত সব কিসের জন্য? এখন ও পুরোদস্তুর লেখাপড়া-জানা মানুষ যে।

তারপর দুয়ে দুয়ে চার করে হিসেবনিকেশ হল স্তেপানের চাকরির মেয়াদ যখন ফুরোবে ও এসে গাঁয়ে থাকবে, বাড়ি আর জমি-জিরেত ফের উদ্ধার করবে। কথায় কথায় স্তেপান বলেছিল ওর নাকি সে সঙ্গতি আছে, আর তাতেই পান্তালিমনের ঈর্ষাতুর কল্পনা আর অনিচ্ছুক সম্ভ্রম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

স্তেপান চলে যাবার পর পান্তালিমন বলছিল ওর পয়সাকড়ি আছে, পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে। অন্য কসাকরা কয়েদী অবস্থা থেকে ফিরে আসে, গায়ে সুতোগাছি থাকে না। কিন্তু এতো দেখছি দিব্যি সিল্কের জামা পরে ফিরলো। নিশ্চয় কাউকে খুন করেছে কিংবা চুরিচামারি করেছে।

ফিরে আসার পর প্রথম ক'দিন স্তেপান চুপচাপ কাটায় আনিকুশ্‌কার বাড়িতে, রাস্তায় প্রায় মুখই দেখা যায় না ওর। পড়শিরা লক্ষ্য করে, ওর প্রত্যেকটা চালচলন নজর করে দ্যাখে। এমনকি আনিকুশ্‌কার বউকেও জেরা করে জানতে চায় স্তেপানের আসল মতলবটা কি। কিন্তু না-জানার ওজর দিয়ে একেবারে মুখ বুজে থাকে আনি-কুশ্‌কার বউ। তারপর যখন মেলেখফদের বাড়ি থেকে আনিকুশ্‌কার বউ একটা ঘোড়া আর হাল্‌কি গাড়ি ভাড়া করে শনিবারের ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়ে কোনো অজানা জায়গার উদ্দেশে তখন দারুণ কানাঘুষো চলতে থাকে গাঁয়ে । শুধু পান্তালিমনই খানিকটা আঁচ করেছে ব্যাপারটা। গাড়িতে খোঁড়া ঘুড়ীটাকে জুততে জুততে ইলিনিচ্‌নার দিকে চোখ মট্‌কে বলে—আনিকুশ্‌কার বউ যাচ্ছে আক্‌সিনিয়াকে আনতে। ভুল করেনি বুড়ো। সত্যিই স্তেপান আনিকুশ্‌কার বউকে হুকুম দিয়েছে ইয়াগদ্‌নয়েতে গিয়ে "আক্‌সিনিয়াকে জিজ্ঞেস করতে সে অতীতের সব অন্যায় ভুলে স্বামীর কাছে ফিরে আসবে কি না।"

সেদিন স্তেপান ওর সমস্ত স্থৈর্য আর সংযম পুরোপুরি হারিয়ে বসল। সারাদিন ঘুরে বেড়াল গাঁয়ে। মখভের বাড়ির দরজার সামনে অনেকক্ষণ বসে বসে মখভকে শোনাতে লাগল জার্মানিতে ওর বন্দীজীবনের গল্প, কেমন করে ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরল সেই কাহিনী। কথা বলতে বলতে আর মখভের নালিশ শুনতে শুনতে কেবলই উদ্বিগ্নভাবে দেখছিল ঘড়িটা।

বেলা পড়ে আসার মুখে আনিকুশ্‌কার বউ ফিরে এল ইয়াগদনয়ে থেকে। বার-বাড়ির রান্নাঘরে খাবার তৈরি করতে করতে আনিকুশ্‌কার বউ বলল, হঠাৎ খবরটা পেয়ে নাকি চমকে উঠেছিল আক্‌সিনিয়া, কতো কথাই না জিজ্ঞেস করল তারপর। কিন্তু ফিরতে একেবারেই রাজি হল না।

-ওর আর ফিরে আসার দরকারই বা কি, রাণীর হালে আছে। কতো মোলায়েম হয়েছে। আর ফর্সা হয়েছে মুখটা। কোনো শক্ত কাজে হাতই লাগাতে হয় না, বাস্ এর চেয়ে আর বেশি কি চাই? আর কাপড়চোপড় যা পরে সে তুমি ভাবতেও পারবে না! আজকে তো কাজের দিন, অথচ স্কার্ট পরেছে দুধের মতো ধব্‌ধবে, হাত দুটো কি সাফ্, একেবারে নিদাগ। —ঈর্ষায় নিঃশ্বাস চেপে চেপে আনিকুশ্‌কার বউ খবরটা দেয় ওকে।

লাল হয়ে ওঠে স্তেপানের গাল। চোখদুটো নামিয়ে রেখেছে, ক্রুদ্ধ কামনার্ত আগুনের শিখা জ্বলছে আর নিবছে চোখদুটোর মধ্যে। হাতের কাঁপুনিটা ঠেকিয়ে রেখে ও গামলা থেকে এক চামচ দই তুলে নেয়। ইচ্ছে করেই ভেবেচিন্তে ও প্রশ্ন করে।

—যেভাবে আছে তাতে সে খুব খুশিই বলছ?

—কেন হবে না? ওভাবে থাকতে কেই বা আপত্তি করবে বলো।

—কিন্তু আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল?

—কেন করবে না? যখন বললুম তুমি ফিরে এসেছো তখন যেন একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

সন্ধ্যার খাওয়া সেরে স্তেপান ঘাস-গজানো উঠোনটার মধ্যে ঢোকে। আগস্টের স্বল্পস্থায়ী ছায়া যেমন এসেছে তেমনি তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেছে। রাতের ভিজে ঠান্ডায় ঝাড়াইকলের আওয়াজ আর রুক্ষ গলার স্বর বিরক্তিকর ঠেকে। হলদে, কলঙ্কলাঞ্ছিত চাঁদের নিচে গাঁয়ের লোকেরা কলরবমুখর। দিনের বেলায় মাড়াই-করা ফসলের গাদা ঝেড়ে নিচ্ছে এখন। ঝাড়াইয়ের পর গোলাঘরে তুলছে। সবে মাড়াই-করা গমের ঝাঁঝালো উগ্র গন্ধ আর তুষ-মেশানো ধুলো গোটা গ্রামটাকে ঢেকে ফেলেছে। চত্বরের কাছেই কোথায় যেন একটা বিজলি-চলা মাড়াই-কল ঝক্‌ঝক্‌ করছে। কুকুরের ডাক। দূরের ফসল মাড়াইয়ের আঙিনা থেকে ভেসে আসছিল গানের আওয়াজ। ডন থেকে একটা তাজা ভিজে হাওয়া উঠছে। বেড়ায় হেলান দিয়ে স্তেপান তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে যেখানটায় ডনের বাঁকা স্রোতটুকু নজরে পড়ে, আর দেখা যায় চাঁদের আলোয় উছলে-ওঠা পাক-খেয়ে-যাওয়া একটা জলের প্রাচীর রেখা। ছোট ছোট কুঁকড়ে-ওঠা ঢেউ স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে। নদীর আরো ওপাশে পপ্‌লার গাছগুলো ঝিমোচ্ছে অলসভাবে। একটা নীরব অথচ অদম্য আকুতি স্তেপানের মনটাকে আচ্ছন্ন করে।

শেষরাতের দিকে বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু ভোর হতেই মেঘগুলো সরে গেল। দুঘণ্টা বাদে শুধু গাড়ির চাকায় লেগে-থাকা আধা-শুকনো কাদার দলা ছাড়া বৃষ্টির আর কোনো চিহ্নই রইল না। সকালবেলায় স্তেপান ঘোড়ায় চড়ে এল ইয়াগদ্‌নয়েতে। মনে উত্তেজনা নিয়ে ফটকের কাছে ঘোড়া বাঁধল. বাড়ির ভেতর ঢুকল মুখে আনাড়ির মতো একটা খুশির ভাব দেখাবার চেষ্টা করে। ঘাসে ঢাকা প্রকাণ্ড উঠোনটায় জনমানুষ নেই। আস্তাবলের ধারে মুরগির বাচ্চারা গোবরগাদা খুঁটছে। ধসে-পড়া বেড়ার কাছে পায়চারি করছে দাঁড়কাকের মতো কালো মোরগ। গাড়ি-ঘরের ছায়ায় শুয়ে আছে একটা মোটা বর্জোই কুকুর। ছিটফোঁটওয়ালা ছ'টা কালো শুয়োর-ছানা তাদের মাকে কাত করে ফেলে দুধ খাচ্ছে আর পা ছুঁড়ছে। বাড়ির ছায়াঢাকা দিকটায় লোহার ছাদে চিক্‌চিক্‌ করছে শিশির।

ভালো করে চারদিকটা দেখে নিয়ে স্তেপান চাকরদের ঘরে ঢুকল। মোটা রাঁধুনিকে জিজ্ঞেস করল—আক্‌সিনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারব?

ঘাম-ভেজা দাগভরা মুখখানা আঙরাখা দিয়ে মুছে লুকেরিয়া জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে তা জানতে পারি?

—সে দিয়ে তোমার কোনো দরকার নেই। আক্‌সিনিয়া কোথায়?

—কর্তার ঘরে। সবুর করো!

স্তেপান বসল। হাঁটুর ওপর টুপিটা রাখল দারুণ অবসাদের ভঙ্গি করে। ওর দিকে আর নজর না দিয়ে রাঁধুনি রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত রইল। দই আর গাঁজিয়ে-ওঠা দুধের টক গন্ধে ম' ম' করছে ঘরটা। উনোন, দেয়াল, আর ময়দামাখা টেবিলের ওপর জটলা পাকিয়ে মাছি বসেছে কালো কালো। স্তেপান অপেক্ষা করে। কান পেতে শোনে। আক্‌সিনিয়ার পরিচিত পায়ের শব্দটা কানে যেতেই ও চমকে বেঞ্চি ছেড়ে ওঠে। দাঁড়াতে গিয়ে হাঁটু থেকে টুপিটা পড়ে যায়।

আক্‌সিনিয়া ঢুকল এক রাশ প্লেট নিয়ে। স্তেপানের ওপর নজর পড়তেই ওর মুখখানা হয়ে গেল মড়ার মতো ফ্যাকাশে, ঠোঁটের কোণাদুটো কেঁপে উঠল। অসহায়-ভাবে বুকের ওপর প্লেটগুলো চেপে ধরে ও ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। স্তেপানের মুখের ওপর থেকে ওর সবিস্ময় দৃষ্টি সরিয়ে নিল না একবারও। তারপর যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গাটা ছেড়ে কোনো রকমে সরে গেল, চট্‌ করে টেবিলের কাছে গিয়ে প্লেটগুলো নামিয়ে রেখে সম্ভাষণ জানাল স্তেপানকে।

স্তেপান ধীরে ধীরে, টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল—যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। জোর করে মুখে হাসি টেনে রেখেছে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে। কথা না বলে সামনে ঝুঁকে হাতখানা বাড়িয়ে দিল আক্‌সিনিয়ার দিকে।

হাত ইশারা করে আক্‌সিনিয়া বললে—আমার ঘরে এসো।

স্তেপান এমন ভঙ্গি করে টুপিটা তুলে নেয় যেন কতো ভারী সেটা। ওর মাথায় রক্ত ওঠে আসে, চোখদুটোও ছাপিয়ে ওঠে যেন। আক্‌সিনিয়ার ঘরে ঢুকে টেবিলের দুপাশে দু'জন বসতেই আক্‌সিনিয়া শুকনো ঠোঁট চেটে ধরা-গলায় বলে—

—কোত্থেকে এলে?

স্তেপান মাতালের মতো হাত নাড়ে। অস্বাভাবিক উদ্দেশ্যহীন ফুর্তির ভাব দেখায়। ওর মুখে এখনো লেগে রয়েছে আনন্দ আর বেদনার সেই হাসিটা।

—এসেছি জার্মানির কয়েদখানা থেকে।...তোমায় দেখতে এলাম আক্‌সিনিয়া...।

বেয়াড়া ভঙ্গিতে ছট্‌ফট্‌ করে ও। লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে একটা ছোট পুলিন্দা বের করে ওপরের কাপড়টা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলে। বেসামাল হয়ে কাঁপছে ওর আঙুলগুলো। একটা শস্তা নীল পাথর-বসানো মেয়েদের রুপোর কব্জি-ঘড়ি বের করে। ঘামভেজা হাতের তেলোয় রেখে জিনিসটা এগিয়ে দেয় আক্‌সিনিয়ার দিকে। আক্‌সিনিয়া কিন্তু ওর কষ্টকৃত বিনীত হাসিমাখা মুখটার দিকেই এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, যেন সে মুখখানা তার কতো অপরিচিত।

—নাও না। তোমার জন্যই রেখেছি জিনিসটা।...একসঙ্গেই তো ঘর করেছিলাম...।

—এ নিয়ে আমার কী হবে? রাখো! অসাড় ঠোঁট দুটো নেড়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে আক্‌সিনিয়া।

—নাও, নাও।...রাগ কোরো না। আগের সে সব বোকামির কথা এবার ভুলে যাও।

হাত দিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আক্‌সিনিয়া উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায় চুল্লীর দিকে।

—তুমি নাকি মরে গেছ ওরা বলছিল...!

—মরলে খুশি হতে?

কোনো জবাব দেয় না আক্‌সিনিয়া, শুধু আরো শান্তভাবে খুঁটিয়ে দ্যাখে ওর স্বামীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সাবধানে ইস্ত্রি-করা স্কার্টের ভাঁজগুলো ঠিক করে

নিতান্ত অপ্রয়োজনেই। হাতদুটো পেছনে রেখে বলে—আনিকুশ্‌কার বউকে তুমি পাঠিয়েছিলে? ও বলল তুমি ওকে পাঠিয়েছ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য...তোমার সঙ্গে থাকবার জন্য...।

—আসবে তুমি? কথার মাঝখানে বলে স্তেপান।

—না! সংক্ষিপ্ত জবাব আক্‌সিনিয়ার—না, আমি যাব না।

—কেন নয়?

—সেভাবে চলার অভ্যেস আর আমার নেই। আর, তাছাড়া, খুব দেরিও হয়ে গেছে,...বড্ডো দেরি।

—কিন্তু আমি যে বাড়িটাকে ফের গুছিয়ে নিতে চাই। জার্মানি থেকে ফেরার সময় সারা রাস্তা এই কথাই ভেবেছি। যদ্দিন ওখানে ছিলাম কেবল এই কথাই ভাবতাম। তুমি কি করবে আক্‌সিনিয়া? গ্রিগর কি তোমায় ছেড়ে গেছে, না অন্য কাউকে ধরেছ? তোমার সঙ্গে এখানকার কর্তার ছেলের নাম জড়িয়ে কিছু কিছু গল্প শুনলাম.. সত্যি নাকি?

আক্‌সিনিয়ার গাল দুটো লাল হয়ে ওঠে, চোখের পাতার নিচে জমে ওঠে সলজ্জ কান্না।

—খুব সত্যি। আমি ওর সঙ্গেই আছি।

—ভেবো না যে তার জন্য আমি অনুযোগ করছি—ঘাবড়ে যায় স্তেপান—বলতে যাচ্ছিলাম যে, তুমি হয়তো এখনো নিজের জীবন সম্পর্কে কিছু ঠিক করতে পারোনি। ও তো তোমাকে বেশিদিন চাইবে না, এখন শুধু খেলছে তোমাকে নিয়ে। তোমার চোখের নিচে চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। ওর সব আশটুকু মিটে গেলেই তোমায় তাড়িয়ে দেবে। তখন কোথায় যাবে? গোলামি করে তো অনেকদিন কাটালে, তাই না? ভেবে দ্যাখো একবার. টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়েই ফিরেছি আমি, যুদ্ধ শেষ হবার পরও বেশ ভালোভাবেই চলে যেত। ভেবেছিলাম আবার আমরা একসঙ্গে থাকব। তাছাড়া আগের সব কথাও ভুলে যেতে চাই আমি।

—কিন্তু আদরের বন্ধু স্তেপান আমার, তখন তুমি কী ভেবেছিলে মনে করে দেখ? —চোখের জলের ফাঁকে খুশিভরা গলায় বলে আক্‌সিনিয়া। একটু যেন কেঁপে ওঠে। চুল্লীর কাছ থেকে সরে সোজা এগিয়ে আসে টেবিলের সামনে—যখন আমার কাঁচা বয়েসের জীবনটাকে তুমি ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিলে তখন কী ভেবেছিলে? আমাকে জোর করে ঠেলে দিলে গ্রিশ্‌কার কোলে। আমার বুকের সব রস নিংড়ে নিলে তুমি। মনে আছে কী ব্যবহার তুমি করেছিলে আমার সঙ্গে?

—আমি এখানে হিসেব-নিকেশ করতে তো আসিনি। তুমি...কি করে জানবে, হয়তো আমি খারাপ ব্যবহারই করেছিলাম।—টেবিলের ওপর ছড়ানো নিজের হাত দুটোর দিকে তাকায় স্তেপান। আস্তে আস্তে বলে, যেন মুখ থেকে ঠেলে বের করে দিচ্ছে কথাগুলো—সব সময় আমি তোমার কথাই ভেবেছি। বুকে রক্ত জমে গেছে...তবু দিনে রাতে একবারও ভুলিনি তোমার কথা।...ওখানে এক জার্মান বিধবার সঙ্গে থাকতাম. ছিলাম ভালোই, তবু ছেড়ে এলাম তাকে। মন পড়ে ছিল বাড়ির দিকে...।

—আর এখন বেশ শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন চাই, এই তো?—আক্‌সিনিয়া প্রশ্ন করে। ওর নাকের ফুটো কেঁপে ওঠে উত্তেজনায়—এখন জমি জিরেত নিয়ে কাজে লাগবে এই তো ইচ্ছে? হয়তো বা ছেলেপুলেও চাইবে, বউ চাইবে যে তোমাকে নাওয়াবে, খাওয়াবে,

তাই না?—হাসে আক্সিনিয়া, অস্বস্তিকর ছায়ামলিন হাসি—না, না, ওসব আমার দ্বারা হবে না, যীশুর দোহাই! আমি তো বুড়ী, চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। আর ছেলেপুলে পেটে ধরতেও ভুলে গেছি। আমি এখন রক্ষিতা। রক্ষিতাদের ছেলেপুলে হতে নেই। তোমার কি এমন মানুষে মন উঠবে?

—বড়ো তিতোবিরক্ত হয়ে উঠেছ...।

—আমি যেমন আছি তেমনই আছি।

—তাহলে তুমি বলছ 'না'?

—আমি বলছি 'না', আমি যাব না! না!

—বেশ, তাহলে আসি।—স্তেপান দাঁড়ায়, কি করবে ভাবতে না পেরে কব্জি-ঘড়িটা হাতের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার টেবিলের ওপর রেখে দেয়। তারপর ফের বলে—ভেবে দেখো, দরকার হলে খবর দিও।

আক্সিনিয়া ফটক অবধি এগিয়ে দেয় ওকে। গাড়ির চাকায় ধুলো উঠে যতক্ষণ না স্তেপানের চওড়া কাঁধজোড়া চোখের আড়াল হয়ে যায় ততোক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থাকে। অসুখী কান্নাটাকে চেপে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু যা কোনোদিন ঘটল না তারই বেদনাময় স্মৃতি ওকে খানিকটা কাঁদায়, ওর জীবনটা আরেকবার ধুলোয় লুটিয়ে গেল ভেবে চোখে জল আসে ওর। ইউজিনের কাছে ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে এটা জানার পর যখন শুনেছিল ওর স্বামী ফিরে এসেছে তখন মনে মনে ঠিক করেছিল স্বামীর কাছেই ও যাবে, যে সুখ থেকে ও চিরদিনই বঞ্চিত রইল তা আবার জোড়াতালি দিয়ে কোনোরকমে গড়ে তুলবে। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ও স্তেপানের পথ চেয়ে বসেছিল। কিন্তু যখন স্তেপানকে দেখল হীনতা আর পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আসতে তখন ওর আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। ইয়াগদ্নয়েতে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকা তার সহ্য হয়নি যে অভিমানের বশে সেই অভিমানই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ওর কথা আর আচরণের পেছনে কাজ করল একটা কুটিল আর অদম্য এষণা। অতীতের লাঞ্ছনার কথা ওর মনে পড়ল, এ লোকটার হাতে সে কী দুর্ভোগ সয়েছিল সে সবই তার মনে পড়ে গেল। তারপর মনের ইচ্ছাকে অতিক্রম করেই, যা বলছে তাতে নিজের অন্তরে শঙ্কিত হয়েই ও বলে ফেলল কতগুলো হুল-বেঁধানো কথা, "না, আমি যাব না! না!"

দূরে সরে যাওয়া গাড়িটার দিকে আরেকবার তাকায় আক্সিনিয়া। চাবুক হাঁকিয়ে স্তেপান অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তার পাশের ছোট ছোট নীলচে-লাল সোমরাজ ঝোপের আড়ালে।

পরদিন মাইনে পেল আক্সিনিয়া। তল্পিতল্পা গুটিয়ে ইউজিনের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

—আমাকে তুমি ভুল বুঝো না ইউজিন নিখোলায়েভিচ্।

—না, না, নিশ্চয় না সবকিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।—মনের অস্বস্তিকে চাপা দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে ওর গলাটাকে শোনালো কৃত্রিম উল্লাসে ভরা।

বিদায় নিল আক্সিনিয়া। সন্ধ্যে লাগার মুখে এসে হাজির হল তাতারস্কে। ফটকের সামনে এগিয়ে এল স্তেপান।

হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল—এলে তাহলে? চিরদিনের জন্য তো? আবার চলে যাবে না আশা করতে পারি এবার?

—যাব না।—সংক্ষেপে জবাব দিল আক্‌সিনিয়া। আদ্ধেক ধ্বসে-পড়া বাড়িটা আর আগাছা জঙ্গলভর্তি উঠোনটার দিকে চোখ বুলিয়ে ওর মনটা বড়ো ক্লিষ্ট হয়ে উঠল।

॥ সাত ॥

বেশ কিছুদিন এগোবার পর অবশেষে পশ্চাদপসরণকারী লাল-রক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হল ভিয়েশেন্‌স্কা রেজিমেণ্টের। একদিন দুপুরবেলায় গ্রিগর মেলেখফের স্কোয়াড্রনটা ঘন সবুজ বাগানঘেরা একটা ছোট্ট গ্রাম দখল করল। গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে গেছে একটা অগভীর নালা। তারই পাশে উইলো গাছের ছায়ায় গ্রিগরের ফৌজের কসাকরা ঘোড়া থেকে নামল। কাছোপিঠেই কোথাও কালো এঁটেল মাটির ভেতর দিয়ে কল্‌কল্‌ করে ছুটেছে ঝরণা। জলটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। কসাকরা ব্যগ্র হয়ে মুখে দেয়; টুপির মধ্যে জল তুলে ঘামভরা মাথায় থাবড়া মেরে বসিয়ে দেয় আর মহাখুশিতে হৈ-হৈ করে ওঠে। মাথার ওপর খাড়া সূর্য। প্রচণ্ড বিষাক্ত গরমে ঘাস আর উইলোপাতা নেতিয়ে আছে; কিন্তু সোঁতার ধারের ছায়ায় এখনো বেশ ঠাণ্ডা। বন-ওকড়াব উজ্জ্বল সবুজ, ছোট ছোট খাড়ির ফাঁক দিয়ে গুঁড়িপানার লাজুক কুমারী হাসি। একটা বাঁক পেরিয়ে ওপাশে পাতিহাঁসের দল জল ছিটোচ্ছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে। ঘোড়াগুলো নাক দিয়ে আওয়াজ করে জোর করে এগিয়ে চলল জলের দিকে। সওয়ারদের হাতের লাগাম টেনে নিয়ে স্রোতের একেবারে মাঝখানে গিয়ে পড়ল ওরা। খুঁচিয়ে কাদা ঘেঁটে তোলার পর ঠোঁট বাড়াতে লাগল আরো টাটকা জলের খোঁজে। গরম হাওয়ার তোড়ে ছিটে ছিটে পড়তে লাগল ওদের মুখের জল। কাদা-মাটি থেকে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে, উইলো গাছের জলে-ভেজা পচে-ওঠা শেকড় থেকে একটা তেতো-মিষ্টি বাস পাওয়া যাচ্ছে।

বন-ওকড়ার ঝোপের আড়ালে কসাকরা সবেমাত্র গা এলিয়ে গল্প আর ধূমপান শুরু করেছে এমন সময় ওদের টহলদারী সেপাইরা ফিরে এল। লাল ফৌজ!—কথাটা শুনেই ওরা লাফিয়ে উঠল। ঘোড়াদের জিন-সাজ এঁটে আবার গেল সোঁতার কাছে। জল খেয়ে বোতলগুলো ভরে নেবে। প্রত্যেকেই ভাবছিল—কে জানে হয়তো বা এই শেষবারের মতো শিশুর চোখের-জলের মতো তাজা এই জল খেয়ে নিচ্ছি।

সোঁতার ওপর দিয়ে রাস্তা ধরে চলল ওরা। একেবারে ওপারে গিয়ে থামল। গাঁয়ের ওপাশে প্রায় মাইলখানেক দূরে শত্রুপক্ষের আটজন ঘোড়সওয়ার টহলদার সাবধানে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসছিল সোমরাজে-ছাওয়া বালিভরা ধূসর উঁচু জমিটা ডিঙিয়ে।

মিৎকা করশুনভ গ্রিগরকে জানালে—ওদের আমরা বন্দী করব। কেমন তো?

আদ্ধেক সেপাই নিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল টহলদার দলটাকে পাশ থেকে ছেঁকে ধরবে বলে। কিন্তু লালরক্ষীরা ঠিক সময় মতো কসাকদের দেখে ফেলল। ফিরে চলে গেল তারা।

ঘণ্টাখানেক পরে ভিয়েশেন্স্কা রেজিমেণ্টের আর দুটো স্কোয়াড্রন এসে পড়তেই ওরা আবার এগিয়ে চলল। টহলদাররা খবর নিয়ে এসেছে, প্রায় হাজারখানেক লালরক্ষী নাকি ওদের মোকাবেলা করতে আসছে। ভিয়েশেন্স্কা পল্টনের স্কোয়াড্রনগুলো ডান-দিকের তেত্রিশ নম্বর যুকানভ্স্কি রেজিমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। তবু ঠিক হল শত্রুর সঙ্গে লড়াই দিতে হবে। উচুঁ জমিটার মাথায় উঠে ওরা ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়াগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল একটা নিচু প্রশস্ত খাদমতো জায়গায় যেটা একেবারে গ্রাম অবধি নেমে গেছে। ডানপাশে কোথায় যেন টহলদারী সেপাইরা এর মধ্যেই যুদ্ধে নেমে পড়েছে। হাত-মেশিনগানের কট্‌কট্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওরা।

একটুবাদেই লালফৌজের পাতলা ব্যূহটা নজরে পড়ল। টিলার মাথায় গ্রিগর তার নিজের স্কোয়াড্রনের লোকদের মজুত রেখেছিল। মুড়োঘাস বোঝাই টিলার চুড়ো বরাবর শুয়ে আছে কসাকরা। একটা ঠুঁটো টক-আপেল গাছের তলা দিয়ে গ্রিগর দূরবিন লাগিয়ে দেখছে দূরে শত্রুব্যূহের রেখা। প্রথম দুটো সারি তো ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তার ওপাশে আরেকদল সেপাই মাঠে পড়ে থাকা কাটা ফসলের বাদামি আঁটিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে লাইন ধরে বসে যাচ্ছে।

প্রথম সারির সামনেই একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখে অবাক হয়ে গেল গ্রিগর আর ওর সঙ্গীরা—লোকটা ওদের অধিনায়কই হবে নিশ্চয়। দ্বিতীয় সারির সামনে আরও দুজন ওইরকম। তৃতীয় সারি পরিচালনা করছে একজন অফিসার। তার পাশে একটা নিশান পত্‌পত্ করে উড়ছে মাঠের ময়লাটে হলদে পটে একটা ছোট লাল রঙের ছোপের মতো।

মিৎকা করশুনভ বিদ্রূপভরা গলায় তারিফ করলে, ওদের সেনাপতিরা তো দেখছি একেবারে সামনেই থাকে! খুব বাহাদুর বলতে হবে!

কসাকরা প্রায় সকলেই উঁচু হয়ে ওঠে দেখবার জন্য। কপালে হাত রাখে। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। এবার স্তেপের প্রান্তর আর উপত্যকার ওপর ধীর, মৃদু মেঘের ছায়ার মতো নেমে আসে একটা কঠিন সুগম্ভীর নৈঃশব্দ্য মৃত্যু-দূতের মতো।

গ্রিগর পেছনে তাকায়। নিচে, গাঁয়ের পাশে ছাইরঙ উইলো বনের ওধারে ধুলোর ঝড় উঠেছে: শত্রুকে ঘিরে ফেলবার জন্য দু'নম্বর স্কোয়াড্রনটা চলেছে ঘোড়া ছুটিয়ে। কিছুক্ষণের জন্য ওদের চলার গতিটা আড়াল হল একটা উপত্যকার পেছনে, কিন্তু তারপরেই মাইল চারেক দূরে স্কোয়াড্রনটাকে দেখা গেল একটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে, ছড়িয়ে। গ্রিগর মনে মনে হিসেব করল শত্রুর পাশের সারির বরাবর সামিল হতে ওদের কতো সময় লাগবে, কোন্ জায়গাটায় ওদের মোকাবিলা হবে।

নিজের সেপাইদের কাছে ফিরে আসে ও। গরমে ধুলোয় কালসিটে পড়া চিক্‌চিকে মুখগুলো ফিরিয়ে ওর দিকে তাকায় কসাকরা। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে শুয়ে পড়ে। "তৈয়ার!"— হুকুম হতেই রাইফেল-বল্টু খোলার একটা হিংস্র কট্‌কট্ আওয়াজ ওঠে। ওপর থেকে গ্রিগর শুধু দেখতে পায় ওদের ছড়ানো পা, টুপির মাথাগুলো আর ধুলোভরা কোর্তার পিঠ, ঘামে-ভেজা কাঁধের রেখা। কসাকরা মাঝে মাঝে হামাগুড়ি

দিয়ে জায়গা বদল করে আড়াল খোঁজে কিংবা আরো সুবিধাজনক জায়গা দ্যাখে। কেউ কেউ তলোয়ার দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে গর্ত করতেও চেষ্টা করে।

এমন সময় পাহাড়ের এপাশে বাতাসে ভেসে আসে গানের অস্পষ্ট সুর। লাল-রক্ষীদের সারিগুলো এলোমেলো এগোচ্ছে। অস্পষ্ট ওদের গলার আওয়াজ, স্তেপ-প্রান্তরের উত্তপ্ত বিস্তৃতির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রিগর টের পায় ওর বুকটা ভয়ানক ধড়াস ধড়াস করছে, কখনো জোরে, কখনো আস্তে। এ বেদনার্ত গান ও আগেও শুনেছে! গ্লুবকাতে দেখেছিল জাহাজীরা টুপি খুলে পরম ভক্তিভরে এ গান গাইছে, আবেগে জ্বলজ্বল করছিল ওদের চোখ। হঠাৎ একটা ব্যথাতুর উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে ওর মনে।

বুড়োমতো একজন কসাক সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল—ওরা কী বলে চ্যাঁচাচ্ছে?

আন্দ্রেই কাশুলিন ওর গায়ের কাছেই দাঁড়িয়ে-থাকা গ্রিগরের দিকে বে-আদবের মতো তাকিয়ে বললে—গ্রিগর, তুমি তো ওদের দলে ছিলে। ওরা কী গাইছে জানো নিশ্চয়, তাই না? বোধহয় তুমি নিজেও গেয়েছ ও গান।

ঠিক সেই মুহূর্তে দু'দলের ব্যবধানটুকু ডিঙিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ এল—"..জয় করেছি এ দুনিয়া "। তারপরেই আবার স্তেপের বুকে আগের সেই নিস্তব্ধতা। কসাকরা মজা পেয়ে গেল। সারির মাঝখান থেকে একজন তো হো-হো করেই হেসে ফেলল।

মিৎকা করশুনভ মুখ বাঁকিয়ে কুৎসিত খিস্তি করে বলল—শুনতে পেয়েছ কি বলে? বেটারা দুনিয়া জয় করতে চায়! গ্রিগর পান্তালিয়েভ! ওই যে ঘোড়াওয়ালাটা, ওটাকে দেব নাকি ঘোড়া থেকে নামিয়ে?

অনুমতির অপেক্ষা না করেই গুলি ছুঁড়ল ও।

বুলেটের আওয়াজে চঞ্চল হয়ে সওয়ার ঘোড়া থেকে নামল, একজন সেপাইয়ের জিম্মায় ঘোড়াটা দিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল নিজের দলের কাছে। লোকটার খোলা তলোয়ার ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠেছে।

কসাকরা এবার গুলি চালাতে শুরু করে লালরক্ষীরা মাটিতে শুয়ে পড়ে। গ্রিগর মেশিনগানওয়ালাদের হুকুম দেয় গুলি ছুঁড়তে। দু'রাউন্ড ছুঁড়তেই লালরক্ষীদের সামনের সারির সেপাইরা এক দৌড়ে প্রায় তিরিশ গজ এগিয়ে এসে ফের শুয়ে পড়ল। দুরবিনে গ্রিগর দেখল পরিখা খোঁড়ার খন্তা চালিয়ে গর্ত খুঁড়ে ওরা তার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। নীল্‌চে ধুলো উঠ্‌ছে ওদের মাথার ওপর, আর সামনে ছুঁচোর ঢিবির মতো ছোট ছোট একেকটা মাটির স্তূপ গড়ে উঠছে। ঢিবির ওপাশ থেকে এলোপাথাড়ি কতগুলো তোপের আওয়াজ এল। ভয় হচ্ছে যুদ্ধটা বোধহয় বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়েই চলবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই কসাকদের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হল: পয়লা নম্বর ফৌজী-দলের একজন সাংঘাতিক জখম, আরো তিনজন হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে গেল নিচে ঘোড়াগুলোর কাছে। দ্বিতীয় স্কোয়াড্রনটা তখন শত্রুর পাশের দিকে এসে পড়েছে, তারা জোরে ঘোড়া চালিয়ে আক্রমণ করল। মেশিনগানের সাহায্যে আক্রমণটা ফিরিয়ে দিল ওরা; আর কসাকরা আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হয়ে একসঙ্গে কয়েকজন মিলে একেকটা ঘোড়ায় চেপে ছুটে পালিয়ে এল। স্কোয়াড্রনটা নতুন করে জড়ো হয়ে আবার নীরবে এগিয়ে চলল। আবারও মেশিনগানের গুলি ওদের ফিরিয়ে দিল ঝড়ের মুখে গাছের পাতার মতো।

কিন্তু আক্রমণের ফলে লালরক্ষীদের মনে ভয় ধরে গেছে। প্রথম দুটো লাইন বিশৃঙ্খল হয়ে পেছু হটতে শুরু করেছে।

গুলি চালানো বন্ধ না করে গ্রিগর নিজের স্কোয়াড্রনকে আবার যথাস্থানে দাঁড় করালো। কসাকরা এগোতে লাগল, শুয়ে পড়ার জন্য একবারও থামল না। গোড়ার দিকের সেই সংকল্পের অভাবটা এখন কেটে গেছে, গোলন্দাজদের ফের নিজের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড়াতে দেখে ওদের সাহস বেড়ে গেল। প্রথম কামানটা বসিয়ে গোলা ছোঁড়া হল। গ্রিগর একজন লোককে পাঠাল নিচের কসাকদের ঘোড়া নিয়ে উঠতে হুকুম দিয়ে। আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে গ্রিগর। টক-আপেলের গাছের পাশে যেখান থেকে ও লড়াইয়ের শুরুটা দেখেছিল সেখানে বসেছে তিন নম্বর কামান। কামান সারি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে একজন পর্যবেক্ষক আর সিনিয়র অফিসার। দূরবিনের ভেতর দিয়ে তারা পেছু হটে-যাওয়া লালরক্ষীদের দেখছে। টেলিফোনওয়ালারা গোলন্দাজদের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ঘাঁটির যোগাযোগ করিয়ে দেবে বলে টেলিফোনের তার নিয়ে ছোটাছুটি করছে।

একটা বিকট কান-ফাটানো আওয়াজ হল। গ্রিগর লক্ষ্য করতে লাগল গোলাটা কোথায় গিয়ে পড়ে। মাঠের ওপর পড়ে-থাকা গমের আঁটিগুলোর ওপর দিয়ে চলে যায় প্রথম শ্রাপ্নেলটা, আর নীল পশ্চাৎপটের সামনে একটা সাদা, তুলোর পাঁজের মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে থাকে। কাটা গমের আঁটিগুলোর ভেতর চারটে কামান পর পর গোলা ছোঁড়ে, কিন্তু গ্রিগর যা ভেবেছিল তার উল্টো, লালদের সারির মধ্যে তেমন কোনো বিশৃঙ্খলাই চোখে পড়ল না। ওরা আগের মতোই ধীরে সুস্থে, সংযতভাবে পশ্চাদ-পসরণ করে একটা উপত্যকার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এখন আক্রমণ করা নেহাৎই অর্থহীন বুঝতে পেরেও গ্রিগর ঠিক করল গোলন্দাজদের অধিনায়কের সঙ্গে এ নিয়ে সলাপরামর্শ করবে। সে আসাতে গ্রিগর বেশ মনের জোর ফিরে পেয়েছে যেন। বেয়াড়া ভঙ্গিতে অফিসারটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে তার গোঁফের ডগাটা ছুঁয়ে একটু মিষ্টি হেসে বলল—ভেবেছিলাম আমার সেপাইদের নিয়ে হামলা চালাব।

—হামলা চালাতেন কেমন করে?—ভয়ানকভাবে মাথা নেড়ে কপাল থেকে হাতের পিঠ দিয়ে ঘাম মুছে ক্যাপ্টেন বললে—দেখতেই তো পাচ্ছেন হারামীগুলো কেমন মাথা ঠাণ্ডা রেখে সরে পড়ছে! বাগ মানবে না কিছুতেই। আর মানবেই বা কেন বলুন: ওদের যে-সব অধিনায়ক অফিসারকে সাধারণ সেপাই থেকে ওপরে তোলা হয়েছে, সব ওই দলটার মধ্যে আছে। আমার এক পুরনো সাগরেদও আছে ওখানে...

অবিশ্বাসভরে গ্রিগর জিজ্ঞেস করলে—কেমন করে জানলেন?

—যারা পালিয়ে এসেছে তাদের মুখে শুনলাম। গোলা বন্ধ করো!—সেপাইদের হুকুম দিয়ে ক্যাপ্টেন যেন হুকুমের মানেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই গ্রিগরকে বললে: গোলা ছুঁড়ে তো কোনো কাজ হচ্ছে না, তার ওপর গোলা ফুরিয়েও এসেছে। আপনি তো মেলেখফ, তাই না? আমার নাম পল্তাভ্‌ৎসেভ্‌। ঘামে-ভেজা প্রকাণ্ড হাতখানা গ্রিগরের হাতে মিলিয়ে পকেট থেকে কয়েকটা সিগারেট বের করল ক্যাপ্টেন।—সিগারেট চলবে?—গ্রিগরকে দিল একটা।

চাপা গুর্‌গুর্‌ আওয়াজ করে তলা থেকে কামানের আলাদা আলাদা অংশগুলো ওপরে তুলে আনছিল সওয়াররা। গ্রিগর ঘোড়ায় চেপে নিজের স্কোয়াড্রন নিয়ে এগিয়ে চলল লালরক্ষীদের পেছু পেছু। শত্রুপক্ষ পরের গ্রামটা দখল করেছিল, কিন্তু লড়াই

না দিয়েই সেটা হাতছাড়া করে দিল। ভিয়েশেন্‌স্কা রেজিমেণ্টের কামান আর তিনটে স্কোয়াড্রন ছড়িয়ে পড়ল গাঁয়ের মধ্যে। ভয়ে গাঁয়ের লোকরা ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে না। কসাকরা খাবারের খোঁজে দলে দলে উঠোন চড়াও হতে লাগল। গ্রিগর একটা বাড়ির কাছেই ঘোড়া থেকে নামে। ঘোড়াটাকে উঠোনে ঢুকিয়ে দরজার পাশে বাঁধে। বাড়ির কর্তা কসাক, ঢ্যাঙা বুড়োমতো। বিছানায় শুয়ে ক'কাচ্ছিল আর শরীরের অনুপাতে একটু বেশি ছোট মাথাটা নোংরা বালিশে এপাশ-ওপাশ করছিল।

গ্রিগর হাসিমুখে বললে—অসুখ করেছে?

—হ্যাঁ, পড়েছি।

কিন্তু লোকটা আসলে ব্যারামের ভান করছিল। সহজভাবে তাকাতে পারছে না। দেখে বোঝা গেল, গ্রিগর যে ওর কথায় বিশ্বাস করেনি সেটা আন্দাজ করেছে।

গ্রিগর প্রায় হুকুমের সুরেই বললে—আমার কসাক সেপাইদের কিছু খেতে দেবে?

—ক'জন আছে?

—পাঁচজন।

—বেশ, আনো ওদের। ভগবান্‌ যা দিয়েছেন তাই ওদের দেওয়া যাবে।

কসাকদের সঙ্গে খাওয়া সেরে গ্রিগর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ই'দারার পাশে কামানগুলোকে পুরোদস্তুর লড়াইয়ের কায়দায় সাজানো হয়েছে। ঝুড়ি থেকে যব খাচ্ছে ঘোড়াগুলো। সওয়ার আর গোলন্দাজরা রোদের আড়াল পাবার জন্য গোলাবারুদের বাক্সগুলোর ঠাণ্ডা ছায়ায় বসেছে। কেউ কেউ কামানের কাছেই বসে অথবা শুয়ে। একজন গোলন্দাজ পায়ের ওপর পা রেখে লম্বা হয়ে ঘুম দিচ্ছে, কাঁধদুটো সিটিয়ে উঠছে তার। বোধহয় ছায়াতেই ঘুমিয়েছিল, তারপর ছায়া সরে গিয়ে রোদ এসে পড়েছে। খোলা মাথার কোঁকড়া চুলগুলো এখন যেন তেতে আগুন। চুলে লেগে আছে খড়ের কুটো।

গোলন্দাজ ফৌজের অফিসাররা আর কমাণ্ডার ই'দারার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে মাটিতে বসে ধূমপান করছিল। ওদের কাছেই একদল কসাক পোড়া ঘাসগুলোর ওপর শুয়ে আছে ছ'কোণা তারার মতো। কলসি থেকে টক দুধ খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে দুধের ভেতর মিশে-থাকা যবের দানা থু-থু করে ফেলে দিচ্ছে।

সূর্যের নির্মম তেজ। গাঁয়ের রাস্তাগুলো প্রায় খালি। কসাকরা গোলাঘরের নিচে, চালাঘরের ছাদের তলায় আর বেড়ার ধারের বন-ওকড়া ঝোপের হলদে ছায়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে! কাঠরার পাশে জিন-আঁটা ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। প্রচণ্ড গরমে ওরা হাঁপিয়ে উঠেছে। একজন কসাক ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল চাবুকটা ঘোড়ার পিঠ বরাবর তুলে। তারপর আবার গ্রামটা ঝিমিয়ে পড়ল স্তেপের বুকে হারিয়ে-যাওয়া রাস্তার মতো। কামান আর এই ক্লান্ত ঘুমন্ত লোকগুলোকে নেহাতই দৈবাৎ এসে-পড়া অনাবশ্যক বলে মনে হচ্ছে।

করার মতো কিছু না পেয়ে মেজাজ খারাপ করে গ্রিগর ফিরে যাচ্ছিল বাড়ির দিকে; কিন্তু আরেকটা স্কোয়াড্রনের তিনজন ঘোড়সওয়ার সেপাই ঠিক সেই সময় লাল-রক্ষীদের ছোট একটা দলকে ধরে নিয়ে আসতে লাগল। গোলন্দাজরা চঞ্চল হয়ে কোট পাৎলুনের ধুলো ঝেড়ে উঠে বসল। কাছেপিঠের বাড়ি থেকে ঘুমচোখে বেরিয়ে এল কসাকরা।

বন্দীরা এগিয়ে আসে—ঘর্মাক্ত, ধুলোমাখা চেহারার আটজন অল্পবয়েসী ছেলে। সমস্ত ভিড় ছেঁকে ধরেছে ওদের।

গোলন্দাজ কমান্ডার নিস্পৃহ কৌতূহলের সঙ্গে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে বললে—কোথায় ধরলে ওদের? পাহারাদারদের একজন গলার আওয়াজে বেশ একটু হামবড়াই ভাব এনে বললে :

—গাঁয়ের পাশে সূর্যমুখী খেতের ভেতর পেয়েছি। চিলের হাত থেকে যেমন তিতির বাঁচবার চেষ্টা করে তেমনি করে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। ঘোড়া থেকে দেখতে পেয়ে ঘেরাও করে ফেললাম। একটাকে সাবাড়ও করেছি...।

লালরক্ষীরা ভয়ে ভয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়ায়। বোঝাই যাচ্ছে, একসঙ্গে সবাই খুন হবে ভেবে ওরা ঘাবড়ে গেছে। অসহায়ভাবে কসাকদের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। ওদের মধ্যে শুধু একজন, বয়েসে অন্যদের চেয়ে একটু বড়োই হবে, বিদ্রূপভরে কালো-কালো চোখ মেলে ওদের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে ছিল। মুখটা রোদে-পোড়া বাদামি। তেলমাখা উর্দি আর পট্টি ছিঁড়ে ফালাফালা। ঠোঁট দুটো চেপে রেখেছে। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চওড়া-কাঁধওয়ালা মানুষ। ঘোড়ার বালামচির মতো মোটা মোটা কালো চুলের ওপর একটা টুপি, নিশ্চয় জার্মান যুদ্ধের আমলের। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। নখের ওপর শুকনো রক্ত লেগে-থাকা মোটা মোটা আঙুলগুলো বোতাম-খোলা কোর্তার কলার আর দাড়িগজানো টুঁটির ওপর চলাফেরা করছে। বাইরে থেকে সম্পূর্ণ শান্তই মনে হচ্ছিল ওকে, কিন্তু একটা পায়ের একটু পেছনে হাঁটু অবধি পট্টি প্যাঁচানো আরেকখানা প্রকাণ্ড মোটা পা কাঁপছিল থরথর করে। অন্য লোকগুলো ফ্যাকাশে, চেহারায় কারুর বৈশিষ্ট্য নেই। শুধু ওই লোকটাই তার শক্ত চওড়া কাঁধজোড়া আর তেজীয়ান তাতার মুখটার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বোধহয় এই কারণেই গোলন্দাজ কমান্ডার ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল—তুমি কে?

লোকটার ছোট ছোট চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে ওঠে জ্বলন্ত কয়লার টুকরোর মতো। প্রায় অলক্ষ্যে অথচ বেশ স্বচ্ছন্দে এগিয়ে আসে সামনে।

—লাল রক্ষী। রাশিয়ান।

—জন্ম কোথায়?

—পেন্‌জা প্রদেশে।

—স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এসেছিস, তাই নারে কালসাপ?

—মোটেই না। সাবেকী ফৌজে আমি ছিলাম সিনিয়ার কমিশনহীন অফিসার। ১৯১৭ সালে ঢুকলাম লাল-রক্ষী বাহিনীতে, তখন থেকেই রয়ে গিয়েছি ওদের সঙ্গে।...

পাহারাদারদের একজন কথার মাঝখানে বাধা দেয়। অফিসারকে জানিয়ে দেয়—বেটা শুয়োর আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়েছিল।

চটে ভুরু কোঁচকালো ক্যাপ্টেন—গুলি ছুঁড়েছে?—উল্টোদিকে দাঁড়ানো গ্রিগরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চোখ দিয়ে ইশারা করে বন্দীকে দেখাল—আচ্ছা...লোক তো! কিরে, কসাকদের গুলি করেছিলি নাকি রে? ধরা পড়তে পারিস সে-কথা মনে হয়নি? ধর্ যদি এখখুনি এইখানেই তোর হেস্তনেস্ত করে ফেলি?

বিদ্রূপের হাসি জেগে উঠল লোকটার কাটা ঠোঁটে—আমি নিজেই গুলি খেয়ে মরতে যাচ্ছিলাম।

—কী চীজ্ একখানা! তা মরলে না কেন?

—সবগুলো বুলেট চালিয়েছিলাম...

—আহা-হা!—ক্যাপ্টেনের চোখদুটো আবেগহীন, কিন্তু সৈনিকটার দিকে যেভাবে তাকাল তাতে পরিষ্কার খুশির ভাব ফুটে উঠল। তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে একেবারে অন্য সুরে প্রশ্ন করল—আর তোরা, কুত্তীর বাচ্চারা, তোরা কোত্থেকে এসেছিস?

আমরা হুজুর সারাতভ্ থেকে এসেছি বেলেশভ্ থেকে।—লম্বা গলা ঢ্যাঙা এক ছোকরা চোখ পিট্‌পিট করে মাথা চুলকে গেঙিয়ে গেঙিয়ে বলল।

গ্রিগর সকৌতূহলে লক্ষ্য করছিল ছেলেগুলোর সাদাসিধে চাষীদের মতো চেহারা। পদাতিক-দলে নাম লিখিয়েছে সেটা ওদের দেখলেই বোঝা যায়। শুধু কালো-চুলওয়ালা লোকটাই গ্রিগরের মেজাজ খিঁচড়ে দিল। বেশ একটু রেগে গিয়েই ও জিজ্ঞেস করল:

—এই মাত্র তুমি কেন বললে কসাকদের দিকে গুলি ছুঁড়েছিলে? একটা লাল ফৌজী কোম্পানী তো তোমারই জিম্মায় ছিল, তাই না? তুমি কমান্ডার? কমিউনিস্ট তো? বলছ সবগুলো বুলেটই খরচা করেছিলে? বেশ, আমরা যদি এই মুহূর্তে তোমার ঘাড়ে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দিই? তা হলে?

থেঁতলে-যাওয়া নাকের ফুটোগুলো কাঁপছিল লালরক্ষীটার। আরো বুক চিতিয়ে বলল:

—বাহাদুরি দেখাবার জন্য সেকথা বলিনি। গোপন করতে যাব কেন? যদি ওদের দিকে গুলি ছুঁড়েই থাকি তা স্বীকার করতে আপত্তি কি? আমার হল এই কথা। আর অন্য সবকিছুর জন্য...যদি ইচ্ছে হয় তলোয়ারের কোপ বসাতে পারেন। আপনাদের কাছে দয়ার প্রত্যাশা করি না।—আবার হাসল লোকটা - আপনাদের কসাকদের আর এর চেয়ে বেশি কি করার আছে!

দলের মধ্যে একটা তারিফের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সেপাইটার সুচিন্তিত বক্তব্যে নরম হয়ে গ্রিগর ফিরে চলল। দেখল বন্দীরা ইঁদারার দিকে চলেছে জল খাবার জন্য। এক কোম্পানি কসাক লড়াকু ফৌজ রাস্তার মোড়টার কাছে সার বেঁধে মার্চ করে যাচ্ছে।

পরে যখন রেজিমেন্টগুলো একটানা লড়াইয়ের পর্যায়ে এল আর আঁকা-বাঁকা লাইন ধরে রণাঙ্গন বিস্তৃততর হল তখন হরদমই শত্রুর সঙ্গে মোলাকাত হতে লাগল গ্রিগরের। ওদের একেবারে কাছেপিঠে থাকলে গ্রিগর কেবলই বলশেভিকদের সম্পর্কে আর যে-সব রুশ সৈন্যদের সঙ্গে কোনো বিশেষ কারণে ওকে যুদ্ধে নামতে হয়েছে, তাদের সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড অতৃপ্ত কৌতূহল অনুভব করত। জার্মান যুদ্ধের প্রথম দিকটায় যখন ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সৈন্যদের প্রথম দ্যাখে তখন যে সরল বালকোচিত অনুভূতি ওর মনে জেগেছিল সে-অনুভূতি যেন চিরকালের মতো দাগ কেটে গেছে। লোকগুলো কেমন ধারার? প্রশ্ন জাগে ওর মনে। লালরক্ষীদের হয়ে একবার চরনেৎসভ্ ফৌজীদলের সঙ্গে ওকে লড়তে হয়েছিল গ্লুবকা-তে। ওর জীবনের সে অধ্যায়টা হয়তো কোনোদিন নাও আসতে পারত। কিন্তু শত্রুপক্ষের চেহারার আদল সেবার ওর বিলক্ষণ জানাই ছিল: বেশির ভাগই ডন এলাকার অফিসার, কসাক। এখন সমস্যাটা রুশ সেপাইদের নিয়ে, একেবারে আলাদা জাতের মানুষ। সমস্যাটা তাদের নিয়ে যারা লাখে লাখে সোভিয়েত সরকারকে সমর্থন করছে, লড়ছে কসাকদের জমি আর সম্পত্তি কেড়ে নেবার জন্য—অবশ্য ওর নিজের তাই ধারণা। লড়াই করতে করতে আরেকবার লালরক্ষীদের প্রায় মুখোমুখি পড়েছিল ও। টহলদার একদল সেপাই নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল একটা পাহাড়ী খাদের তলা দিয়ে এমন সময় হঠাৎ শোনে রুশ ভাষায় গালিগালাজ আর পায়ের শব্দ।

কয়েকজন লালরক্ষী, তাদের মধ্যে একজন চীনাও আছে, ছুটে এল টিলার মাথায়, তারপর আচম্‌কা কসাকদের দেখেই ওরা একেবারে হতভম্ব, এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একজন ভীতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—কসাক!

চীনাটা একটা গুলি ছুঁড়ল। একজন কসাক পড়ে যেতেই সে কর্কশ ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল :

—কমরেড! ম্যাক্‌সিম্‌টা তোলো! কসাকদের দিকে!

রিভলবারের এক গুলিতে মিৎকা করশুনভ চীনাকে ধরাশায়ী করলে। ঘোড়াটাকে সাঁ করে ঘুরিয়ে নিয়ে ওই প্রথম ছুটে এল খাদের পাশ দিয়ে। অন্যরা ছুটল পেছন পেছন। চেষ্টা করতে লাগল একজন আরেজনকে ছাড়িয়ে যাবার। পেছনে মেশিনগানের জোরালো আওয়াজ। পাহাড়ের গায়ের কাঁটাগাছ যার হথর্ন পাতার ভেতর দিয়ে শিস্ কেটে ছুটল বুলেট, খাদের নিচের পাথুরে জমি চিরে যেতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে বলশেভিকদের ওপর ঘৃণায় ভরে উঠতে থাকে গ্রিগরের মন। ওর জীবনের মধ্যে ওরা আচম্‌কা এসেছে দুশমনের মতো, ওকে দেশছাড়া করেছে তারা। গ্রিগর লক্ষ্য করে অন্য কসাকদের অনুভূতিও ঠিক ওর মতোই। ওদের সবারই মনে হতে থাকে বলশেভিকরা ডন প্রদেশ আক্রমণ করেছিল বলেই তো যুদ্ধটা হল। আ-কাটা গমের আঁটিগুলোর দিকে তাকিয়ে, ঘোড়ার পায়ের নিচে মাঠের ফসল নষ্ট হতে দেখে ওদের প্রত্যেকেরই মনে পড়ে নিজের জমির কথা, ঘরের মেয়েরা সেখানে সাধ্যে না কুলোলেও ভূতের মতো খাটছে। আর তখন রাগে যেন বুক জ্বলে যায় ওদের। মাঝে মাঝে গ্রিগর ভাবে, ওর শত্রুদের মধ্যে যারা তাম্‌বভ, রিয়াজান, সারাতভের চাষী, তাদেরও নিশ্চয় জমির টান একইরকম পাগল করে তোলে। গ্রিগর ভাবে—আমরা জমি নিয়ে লড়ছি না তো যেন কোনো মেয়েমানুষ নিয়ে লড়ছি।

এখন বন্দী করা হচ্ছে কম। বেশির ভাগ সময় তখন-তখনি ধরে একসঙ্গে মাথা নেওয়া হচ্ছে। লুঠের রাজত্ব শুরু হয়েছে রণাঙ্গনে : কসাকরা লালরক্ষী আর বলশেভিক-সমর্থক বলে যাদের সন্দেহ হয় তাদের ঘরে গিয়ে চালাচ্ছে লুঠতরাজ। বন্দীদের পর্যন্ত কাপড়চোপড় খুলে উলঙ্গ করছে। নিচ্ছে সবকিছুই, ঘোড়া গাড়ি থেকে আরম্ভ করে অতি তুচ্ছ সব জিনিসও। কসাকরা, অফিসাররা, সবাই চুরি করে। মালপত্রের ট্রেনগুলো লুঠের মালে বোঝাই : কাপড়, সামোভার, সেলাইকল, ঘোড়ার সাজ, যার সামান্য কিছু মূল্য যাচ্ছে সবই। রসদ ট্রেন থেকে সরাসরি বাড়ির দিকে চলেছে জিনিসগুলো একটানা স্রোতের মতো। লড়াইয়ের ময়দানে স্বেচ্ছায় গুলিগোলা আর রসদ নিয়ে আসছে আত্মীয়স্বজনরা আর লুঠের জিনিসে তাদের গাড়িগুলো ভর্তি করে নিচ্ছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বল্‌গাহীন ঘোড়সওয়ার ফৌজগুলো, সংখ্যায়ও তারাই বেশি। একটা থলি ছাড়া পদাতিক সৈন্যদের আর নেওয়ার জায়গা নেই, কিন্তু ঘোড়সওয়াররা তাদের জিন-থলি ভরতে পারে, বোঝাই করতে পারে জিনটাও, পেছন দিকে বাণ্ডিল বাঁধতে পারে—শেষ পর্যন্ত ঘোড়াগুলোকে আর লড়াইয়ের ঘোড়া মনে হয় না, দ্যাখায় বোঝা-বওয়া খচ্চরের মতো। যুদ্ধের সময় লুটতরাজ করা কসাকদের একটা চিরকালের দস্তুর। আগেকার দিনের গল্প শুনে আর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সেটা ভালো করেই জানা হয়ে গেছে গ্রিগরের। এমন কি জার্মান যুদ্ধের আমলেও একবার ওর রেজিমেণ্টটা প্রাশিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল; ব্রিগেড কমাণ্ডারটি এমনিতে বেশ সম্মানী সৎ মানুষ হলে কি হয় পাহাড়ের

নিচে একটা ছোট্ট শহরের দিকে চাবুক দেখিয়ে সে বলেছিল সেপাইদের : দখল করে নাও ওটা! দু'ঘণ্টার জন্য শহর রইল তোমাদের জিম্মায়। কিন্তু দু'ঘণ্টা পরে কাউকে লুঠ-তরাজ করতে দেখলে কপালে সাজা আছে!

গ্রিগর কোনোদিনই অন্য কসাকদের মতো চলতে পারল না। শুধু ঘোড়াটির জন্য আর নিজের জন্য খাবার নেয়, ব্যস্, আর কিছু হাত দিয়ে ছোঁয়ও না, লুঠ করাটাকে ও ঘেন্না করে। বিশেষ করে ওর নিজের কসাক সেপাইরা যখন লুঠতরাজ করে তখন ওর পিত্তি জ্বলে যায়। স্কোয়াড্রনের ওপর ওর কড়া হুকুম আছে। সেপাইরা যদি-বা কখনো কিছু নেয়, সেও খুব গোপনে আর কালেভদ্রে। বন্দীদের জামা-কাপড় কেড়ে নেওয়া বা খুন করার হুকুম ও দেয় না। ওর এই অস্বাভাবিক ভালোমানুষিতার জন্য কসাকরা আর রেজিমেন্টের বড়োকর্তারা মনে মনে চটে যায়। বিভাগীয় সেনাপতিদের কাছে এ জন্য জবাবদিহিও করতে হয় ওকে। সেনাপতিমণ্ডলীর একজন কর্তা কর্কশভাবে বললে—তোমার স্কোয়াড্রনটাকে কেন গোল্লায় দিচ্ছ? এসব উদারতা দেখানোর কারণ কি? যদি অবস্থা বদলে যায় তাই আগেভাগেই রাস্তা পরিষ্কার রাখছো, নাকি? পুরনো দিনের কথা ভেবে দু'পক্ষকেই খুশি রাখা, তাই না? আবার তর্ক করছ! নিজের শৃঙ্খলা বোধটাও নেই? কী? অন্য লোক নিতে বলছ? তা নেবই তো! আজকেই হুকুম দিচ্ছি স্কোয়াড্রনের ভার বুঝিয়ে দেবার জন্য, তখন আর গাঁইগুঁই শুনব না হে!

ট্রুপ * কমাণ্ডারের পদে নামিয়ে দেওয়া হল ওকে। ওদের রেজিমেণ্টটা একটা গ্রাম দখল করেছিল। নিজের সেপাইদের নিয়ে গ্রিগর তার জন্য বরাদ্দ বাড়িটা দখল করল। বাড়ির মালিক লাল বাহিনীর সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছে। তার বয়স্কা স্ত্রী আর তরুণী মেয়েটি ওদের ফরমায়েশ খাটলো মুখ বুজে। বড়ো কামরাটায় ঢুকে চারদিকে তাকাল গ্রিগর : বাসিন্দারা বেশ সচ্ছলই বলতে হবে, মেঝেটা রং করা, ভিয়েনার চেয়ার, আয়না, দেয়ালে মামুলি ফটোগ্রাফ আর কালো ফ্রেমে বাঁধানো একটা স্কুল সার্টি-ফিকেট, অনেক ভালো ভালো কথা লেখা আছে তাতে। গ্রিগর ভিজে বর্ষাতি কোটটা চুল্লীর ধারে শুকোতে দিয়ে একটা সিগারেট পাকিয়ে নেয়। ঘরে ঢোকে প্রোখর জাইকভ, বিছানার পাশে রাইফেলটা রেখে নিস্পৃহভাবে খবর দেয় :

—তাতারস্ক থেকে ঘোড়ার গাড়ি এসেছে, তোমার বাবাও সে দলে আছেন, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্!

—হ্যাঁ, আরো কিছু বানিয়ে বলো!

—সত্যি বলছি। আমাদের গাঁ থেকে ছটা গাড়ি এসেছে।

জোব্বাকোটটা চাপিয়ে গ্রিগর বেরিয়ে গেল। দেখল ওর বাপ উঠোনের ফটক দিয়ে তার ঘোড়াটাকে টেনে আনছে। গাড়ির মধ্যে বসে আছে দারিয়া, গায়ে ঘরে-তৈরি কোট, হাতে নিয়েছে লাগাম জোড়া, মাথা-ঢাকা কোটের তলা দিয়ে একজোড়া হাসিভরা চোখ গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে আছে, মুখে আর্দ্র হাসি।

বাপের দিকে চেয়ে হেসে বলে উঠল গ্রিগর—তুমি এখানে এলে যে?

আহা, তুই বেঁচে আছিস্ খোকা, কতো যে আনন্দ হচ্ছে। তুই তো ডাকিস্‌নি, তবু তোর অতিথি হয়ে দেখতে এলাম...।

বাপের চওড়া কাঁধ দুটো জড়িয়ে ধরে গ্রিগর। তারপর গাড়ি থেকে ঘোড়ার বাঁধন

* ষাটজন অশ্বারোহী সেপাইয়ের দলকে "ট্রুপ" বলে—এইরকম দুটি "ট্রুপ" নিয়ে হয় "স্কোয়াড্রন"—অঃ

খুলতে শুরু করে। ঘোড়ার সাজ নামাতে নামাতে ওদের ভেতর টুকরো টুকরো কথাবার্তা হতে থাকে। ওর বাপ বলে—লড়াইয়ে দরকার হবে বলে তোর জন্য গোলাগুলি কিছু এনেছি।—দারিয়া গাড়ি থেকে ঘোড়ার দানা বের করছিল।

গ্রিগর ওকে বলে—তুমিও এলে যে?

—আমি বাবার সঙ্গে এলাম। বাবার শরীর ভালো যাচ্ছে না। বিদেশ বিভুঁয়ে একা একা যদি কিছু হয় তাই মা তো ভেবেই সারা।

পান্তালিমন এক আঁটি সবুজ ঘাস ছুঁড়ে দেয় ঘোড়াদের দিকে তারপর গ্রিগরের কাছে এগিয়ে গিয়ে কালো রক্তাভ চোখদুটো উৎকণ্ঠাভরে বড়ো বড়ো করে ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে :

—তারপর খবর-টবর কি?

—ভালোই। লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

—শুনলুম নাকি কসাকরা প্রদেশের সীমানা ডিঙিয়ে ওদিকে আর যাচ্ছে না। সত্যি?

—ও শুধু গল্প। এড়াবার মতো জবাব দেয় গ্রিগর।

বুড়ো একটু বিরক্ত আর উদ্বিগ্ন গলায় বলে—হ্যাঁরে এসবের কি মানে বল্ তো? এ কিন্তু তোদের করা উচিত নয়। আমাদের বুড়োদের বড়ো আশা...তোরা না হলে আমাদের ডন-বাবাকে বাঁচাবে কে? তোরাই যদি লড়তে না চাস্ ভগবান না করুন...। তোর সেপাইরাই কিন্তু বলছিল আমাকে।..হতভাগা কুত্তীর বাচ্চারা গুজব রটাচ্ছে।

বাড়ির মধ্যে ঢোকে ওরা। কসাকরা গাঁয়ের খবর শুনবার জন্য জড়ো হয়। বাড়ির কর্ত্রীর সঙ্গে খানিকক্ষণ ফিসফিসিয়ে আলাপ করে দারিয়া খাবারের থলি খোলে। তারপর সন্ধ্যের খাবার তৈরি করার যোগাড় করে।

পান্তালিমন জিজ্ঞেস করে—শুনলাম স্কোয়াড্রন কমান্ডারের পদ থেকে তাকে নামিয়ে দিয়েছে?

—আমি এখন ট্রুপ কমান্ডার।—গ্রিগরের নিস্পৃহ জবাবে বুড়ো চটে যায়। ভুরুর ওপর বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে টেবিলের কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটু প্রার্থনা সেরে নেয়। তারপর কোটের কিনারা দিয়ে একটা চামচে মুছে ক্ষুণ্ণ গলায় বলে :

—কী করে সেটা হল? বড়োকর্তাদের খুশি করতে পারিস্নি বুঝি?

কসাকদের সামনে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল না গ্রিগরের। বিরক্ত হয়ে কাঁধ উঁচু করে। বলে—নতুন একজন কমান্ডারকে নিয়েছে ওরা, শিক্ষিত মানুষ।

—তবু যেন তাকে মান্য করে চলিস, বুঝলি রে! ওদের শিক্ষার দৌড় তো জানি! জার্মান যুদ্ধের সময় তুই সত্যিকারের শিক্ষা পেয়েছিলি, ওইসব চশমাধারী অফিসাররা তার কাছে নগণ্য।—বুড়ো সত্যি-সত্যিই বড়ো রেগে গেছে। কিন্তু গ্রিগর ভুরু কুঁচকে আড়চোখে দ্যাখে কসাকদের, ওরা কেউ হাসছে কিনা।

পদাবনতি ঘটেছে বলে ওর মনে ক্ষোভ নেই। নিজের গ্রামের লোকদের জীবনের দায়িত্ব এবার থেকে আর ওর ঘাড়ে নেই এইটুকু বুঝে খুশি হয়েই স্কোয়াড্রনের ভার বুঝিয়ে দিয়েছে। তবু আত্মমর্যাদায় একটু ঘা লেগেছিল বই কি। বাপের মন্তব্যে অজান্তেই মনে মনে চটে উঠল।

পান্তালিমনের দলের সঙ্গে ওর পাড়াপড়শি বোগার্তিরিয়েভও এসেছিল। বাড়ির গিন্নি রান্নাঘরে ঢুকতে বোগার্তিরিয়েভের মুখে সম্মতির আভাস পেয়ে পান্তালিমন ফের আরম্ভ করল সেই আগের কথা।

ঘরের সমস্ত কসাককেই মোটামুটি লক্ষ্য করে ও জিজ্ঞেস করল—তাহলে এটা সত্যি যে তোমরা দেশের সীমানার ওধারে যেতে চাও না?

প্রোখর জাইখভ কুতকুতে নরম চোখদুটো পিটপিট করে নীরবে মিটমিটিয়ে হাসতে লাগল। পাথরের কাছে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছিল মিৎকা করশুনভ, সে সিগারেটটা শেষ করলে। অন্য তিনজন কসাকও কেউ বেঞ্চে বসে আছে কিংবা শুয়ে, কিন্তু কেউ জবাব দিল না প্রশ্নের। বোগার্তিরিয়েভ বিরক্তিভরে হাতটা নাড়লে।

মোটা ভারি গলায় বললে—এসব নিয়ে ওদের মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

কসাকদের একজন অলসভাবে জবাব দেয়—আরো দূরে কেন যাব শুনি? কেন যাব? আমার বউ মরেছে, অনাথ ছেলেপুলে রেখে গেছে, আর আমি বেফজুল নিজের প্রাণটা দেব বেঘোরে?

আরেকজন কসাক জোরের সঙ্গে সায় দিয়ে বলে—আমরা ওদের কসাক দেশ থেকে তাড়াব, ব্যস্, তারপর ফিরে যাব যে যার ঘরে!

মিৎকা করশুনভ চোখ দুটো দিয়ে হাসল। সরু গোঁফটায় তা দিয়ে বললে—আমি আরো পাঁচবছর লড়তে পারি! আমার ভালোই লাগে!

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের উঠোনে একটা চিৎকার শোনা গেল—বেরিয়ে এসো! ঘোড়ায় চাপো সবাই!

যে কসাকটি প্রথম কথা বলছিল সে হতাশভাবে বলে উঠল—দেখলে তো এবার। বৃষ্টিতে ভিজে এখনো শুকোল না গা, অথচ চ্যাঁচাচ্ছে 'বেরিয়ে এসো!' তার মানে আবার সেই আগের জায়গায়। আর তোমরা বলছিলে সীমানার কথা। সীমানাটা আছে কোথায়? আমাদের বাড়ি ফেরাই উচিত। উচিত সন্ধির জন্য চেষ্টা করা। আর তোমরা বলছ...।

বিপদের হুঁশিয়ারিটা নিতান্তই অকারণ। গ্রিগর রেগে গিয়ে নিজের ঘোড়াটা ফের উঠোনে টেনে আনে আর অকারণেই সেটার কুঁচকিতে লাথি মেরে ঘোঁত ঘোঁত করে বলে:

—সিধে হয়ে হাঁট্ না, হতভাগা!

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিল পান্তালিমন, কসাকরা ঢুকতেই জিজ্ঞেস করল—কিসের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল?

—হুঁশিয়ারি! হুঃ...একপাল গরু দেখে ভেবেছিল লাল সেপাই!

কোট খুলে টেবিলের পাশে বসল গ্রিগর। অন্য কসাকরা বেঞ্চের ওপর তলোয়ার, রাইফেল আর কার্তুজের বেল্ট্ খুলে রাখল। অন্যরা সবাই শুয়ে পড়তে পান্তালিমন গ্রিগরকে ডেকে নিল উঠোনে। সিঁড়ির ওপর বসল দুজনে।

গ্রিগরের হাঁটু ছুঁয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বুড়ো বলল—তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল। হপ্তাখানেক আগে পিয়োত্রাকে দেখতে গিয়েছিলাম। বেশ ভালোই কাটল সেখানে, বুঝলি। খেতখামারের দিকে পিয়োত্রার সত্যিই বেশ নজর আছে। আমাকে কাপড় দিয়েছে একটা, ঘোড়া দিয়েছে, চিনি দিয়েছে...চমৎকার ঘোড়াটা...।

—সবুর! —রূঢ়ভাবে কথার মাঝখানে বাধা দিল গ্রিগর। বুড়োর কথার ঝোঁকটা কোন্ দিকে বুঝতে পেরে ও একেবারে আগুন হয়ে উঠেছে—এখানেও তুমি সেই মতলবেই এসেছ নাকি?

—কেন নয়?

—'কেন নয়' মানে, কি বলতে চাও?

—অন্য লোকও তো এটা-সেটা নেয়, গ্রিগর...।

অন্য লোক! এটা-সেটা নেয়!—রাগে কথা খুঁজে না পেয়ে আওড়াতে থাকে গ্রিগর—নিজেদের ঘরে জিনিসের অভাব আছে তাদের? তুমি একটি রাক্ষস! জার্মান যুদ্ধের সময় এই ব্যাপার হলে গুলি করে মারত।...

অতো শত কথা বলিসনি!—নিস্পৃহভাবে গ্রিগরকে থামিয়ে দেয় ওর বাপ—আমি তোর কাছে ভিক্ষে চাইছি না। আমার কিছুর দরকার নেই। আজ বেঁচে আছি, কাল কবরে। তুই তো খালি নিজের কথাই ভাবিস্। যখন বাড়ি ফিরে আসবি তখন দেখবি কী? একটা ছোট্ট ঘোড়ার গাড়ি, আর তাও...। যারা 'লাল'দের দলে গিয়ে জুটেছে তাদেরটা নিবিই না বা কেন? না নিলেই বরং পাপ হবে। প্রত্যেকটা কুটোগাছ বাড়ির কাজে লাগবে...।

-ব্যস্, হয়েছে, থামো! নইলে তল্পিতল্পা সমেত ভাগিয়ে দেব! কসাকদের এজন্য আচ্ছামতো শিক্ষা দিলাম আর আমার বাপ এলেন লোকের বাড়িঘর লুঠতরাজী করতে!—কাঁপছিল আর হাঁপাচ্ছিল গ্রিগর।

বাপ মুখ বেঁকিয়ে বললে—সেজন্যেই বুঝি স্কোয়াড্রন কমান্ডারের পদ থেকে অধঃপতন হল!

—হ্যাঁ। আর ট্রুপও আমি ছেড়ে দেব।

এক মুহূর্ত দুজনেই চুপচাপ। সিগারেটটা জ্বালতেই দেশলাইয়ের আলোয় পলকের মধ্যে বাপের বিব্রত, অপমানিত মুখটার দিকে নজর পড়ল গ্রিগরের। এতক্ষণে ও বুঝতে পেরেছে বাপের আসার আসল উদ্দেশ্য।—ওই জন্যই হতচ্ছাড়া বুড়োটা দারিয়াকে নিয়ে এসেছে! লুটের মালের ওপর নজর রাখবার জন্য।

পান্তালিমন শান্তভাবে জানায়—স্তেপান আস্তাখভ ফিরে এসেছে। শুনেছ সে কথা?

কী বললে? গ্রিগরের হাত থেকে সিগারেটটা খসে পড়ে।

মনে হয় স্তেপান বন্দী হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরেনি। কাপড়চোপড় জিনিসপত্র নিয়ে ফিরেছে, বিশ্বাস করো চাই না করো। দু'গাড়ি বোঝাই মাল এনেছে! -বুড়ো এমন জাঁক করে মিথ্যে কথাগুলো বলে যেন স্তেপান ওর ঘরেরই লোক। —ইয়াগদ্নয়ে থেকে আক্সিনিয়াকে ফিরিয়ে এনেছে, তারপর গেছে ফৌজে। ওকে বেশ ভালো একটা চাকরি দিয়েছে ওরা· কাজান্স্কা না কোথাকার যেন স্টোর-কীপার।

তোমার নাতিরা সব কেমন আছে?—আলাপটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল গ্রিগর।

-ওঃ, তোফা! ওদের একটা উপহার-টুপহার দিও কিন্তু।

—লড়াইয়ের ময়দান থেকে উপহার পাঠাব? করুণভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রিগর, কিন্তু ওর মন আছে আক্সিনিয়া আর স্তেপানের দিকে।

—তোমার তো বাড়তি রাইফেল নেই, না?

—ও দিয়ে তোমার কী দরকার?

—বাড়ির জন্য। জানোয়ার আর চোরছ্যাঁচড় তাড়াবার কাজে। ধর যদি তেমন কিছু হয়। পুরো এক বাক্স কার্তুজ আছে। গাড়িতে গোলাবারুদ পার করবার সময় হাতিয়ে রেখেছিলাম।

—গাড়ি থেকে একটা রাইফেল নিয়ে নিও। ওধরনের উপহার আমাদের হাতে

অঢেল আছে।—বিষণ্ণভাবে হাসে গ্রিগর।—তাহলে এবার শুতে যাও। সেপাইদের ঘাঁটি-গুলো একবার দেখে আসতে হবে আমাকে।

* * * *

পরদিন সকালে রেজিমেণ্টের একটা অংশ গ্রাম ছেড়ে সরে গেল—তার মধ্যে গ্রিগরের স্কোয়াড্রনটাও আছে। গ্রিগর স্থির বিশ্বাস নিয়ে গেছে যে, ওর বাপকে বেশ জব্দ করা গেল, এবার বুড়ো খালি হাতে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু কসাকদের বিদায় দিয়েই পান্তালিমন এমনভাবে গোলাঘরটার ভেতর ঢুকল যেন ও-ই বাড়ির কর্তা। পেরেকে ঝোলানো ঘোড়ার গলাবন্ধ আর সাজগুলো নামিয়ে নিজের গাড়িতে তুলল। বাড়ির গিন্নি ওর পেছন পেছন এল চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে। বুড়োর কাঁধ চেপে ধরে বলল :

—বাবা গো ! ভালো মানুষ গো! তোমার কি পাপের ডর নেই গো? অনাথ ছেলেপেলেদের কেন কষ্ট দিচ্ছ? গলাবন্ধগুলো ফিরিয়ে দাও আমায়। ভগবানের দোহাই লাগে ওগুলো দাও আমায়!

—নে, রাখ্। ভগবান্ টগবান্ আর টানিস্‌নি এর মধ্যে।—পান্তালিমন ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়—তোর স্বামী জিনিসগুলো নিয়ে নেবে'খন আমাদের কাছ থেকে। তোদের কমিসারদের তো জানি! তোর যা তা আমারই. তাই চুপ কর্!

তারপর অন্য গাড়িওয়ালাদের নীরব সমর্থনসূচক দৃষ্টির সামনেই সে সিন্দুকের তালা ভেঙে ফেলে। কয়েকটা নতুন প্যাণ্টলুন আর কোট বেছে নিয়ে আলোর সামনে ধরে. কালো কালো হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করে গাঁট বাঁধে।

দুপুর নাগাদ পান্তালিমন আর দারিয়া রওনা হয় বাড়িমুখো। গাড়িটা মালে বোঝাই. ঠোঁটদুটো চেপে গাঁটরিগুলোর ওপর বসে আছে দারিয়া। ওর পেছনে মাথা উঁচু করে আছে একটা বয়লার—পান্তালিমন সেটা বার-বাড়ির ভিত থেকে টেনে তুলেছিল। গাড়ির কাছে সেটাকে অতিকষ্টে টেনে আনবার সময় দারিয়া তিরস্কারের সুরে বলেছিল—তুমি তো দেখছি কিছুই বাদ দেবে না বাবা! বুড়ো তখন খাপ্পা হয়ে জবাব দিয়েছিল :

• চুপ কর্ তো! বয়লারটা ওদের কাছে ছেড়ে দিয়ে যাব? তুই তো দেখছি গ্রিগরের মতোই পাকা গিন্নি. হ্যাঁরে হতচ্ছাড়ি! বয়লারটা আমার ভালো লেগেছে. ব্যস্। তুই মুখ বুজে থাক্।

পেছন থেকে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েমানুষটি যখন ফটক বন্ধ করল, বুড়ো খুব দরদ দেখিয়ে বললে :

—ও মেয়ে. এবার চলি। রাগ কোরো না। দু'একদিনের মধ্যে আরো তো কতো পেয়েই যাবে।

আট ॥

একটানা দিনগুলো—শেকলের কড়ার মতো একের সঙ্গে এক গাঁথা। পথ চলা, যুদ্ধ, বিশ্রাম। গরম আর বাদলা। ঘোড়ার ঘামের সঙ্গে জিনের গরম চামড়ার গন্ধের মেশামেশি। একটানা কাজের চাপে শিরার রক্ত ফুটে ওঠে টগবগ করে। ঘুমের অভাবে গ্রিগরের মাথাটাকে মনে হয় ছ'ইঞ্চি কামানের গোলার মতো ভারী—ও বিশ্রাম খোঁজে, ঘুম চায়। তারপর চায় লাঙলচষা নরম মাটির দাগ ধরে হাঁটতে, বলদগুলোকে শিস্ দিয়ে ডাকতে, কান পেতে শুনতে সারসের তীক্ষ্ণ চিৎকার। ও চায় গালের ওপর উড়ে এসে পড়া মাকড়সার রুপোলি জাল হাত দিয়ে সরাতে, আর লাঙলের ফলায় উঠে আসা মাটির শারদ সৌগন্ধ্য বুক ভরে টেনে নিতে।

কিন্তু তার বদলে, ফসলী খেতের ভেতর দিয়ে তলোয়ারের কোপের মতো কেটে চলে রাস্তা। রাস্তায় চলে কাতারে কাতারে বন্দী—পরনে পোশাক নেই, ধুলোয় পাঁশুটে রঙ। ঘোড়সওয়ার ফৌজ পথ দিয়ে যায়, লোহার নালে মাড়িয়ে দেয় ফসল। গ্রামে গ্রামে পশ্চাদপসরণকারী লাল সৈনিকদের পরিবারের ওপর চলে জুলুম, ওদের মা বউদের মারা হয় চাবুক।

একঘেয়েমির অবসাদের ভেতর দিয়ে কাটে দিনগুলো। স্মৃতি থেকে মিলিয়ে যায় তারা, একটা ঘটনাও মনে দাগ কাটে না, এমনকি গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনাও নয়। জার্মান অভিযানের দিনগুলোর চেয়েও বেশি বিমর্ষ মনে হয় যুদ্ধের এই দৈনন্দিন জীবন। হয়তো বা সবকিছুই আগে জানা হয়ে গেছে, তাই। যারা আগের যুদ্ধটায় যোগ দিয়েছিল তারা এ যুদ্ধটাকে দ্যাখে বিদ্রুপের চোখে : জার্মান যুদ্ধের তুলনায় এর পরিধি এর দাপট, এর ক্ষয়ক্ষতি সবই নিতান্ত সামান্য। শুধু মৃত্যু—প্রাশিয়ার রণাঙ্গনের মতো শুধু মৃত্যুই আছে তার সবটুকু ভয়াল আতঙ্কময় মূর্তি নিয়ে মাথা উঁচিয়ে। মৃত্যু একটা আত্মরক্ষার জৈব তাগিদ এনে দিচ্ছে।

—একে যুদ্ধ বলো? এ তো নকল লড়াই। জার্মান যুদ্ধের সময় জার্মানরা যখন একটা কামান থেকে গোলা ছুঁড়ত তখন গোটা রেজিমেণ্ট একেবারে গোড়াশুদ্ধ উপড়ে যেত, আর এখন এক কোম্পানি সেপাইয়ের ভেতর দু'জন মরলেই বলি কী ক্ষতিই না হল!—লড়াইয়ের ময়দানের সৈন্যদের ধারণাটা এই রকম। কিন্তু এই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলাটাও ওদের বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে। জমে উঠছে অসন্তোষ, ক্লান্তি, ক্ষোভ। গ্রিগরের স্কোয়াড্রনের কসাকরা ক্রমেই বেশি করে দাবি তুলতে থাকে : লালদের আমরা দেশ থেকে খেদিয়ে তবে ক্ষান্তি দিচ্ছি। তার বেশি আর যাবো না। রাশিয়া তার নিজের ঘর সামলাক, আমরাও আমাদেরটা সামলাচ্ছি। আমাদের সমাজের ব্যাপার আমরা ওদের ঘাড়ে জোর করে চাপাতে চাই না।

সারা শরৎকাল ধরে মন্থরগতিতে লড়াই চলে। সামরিক গুরুত্বের আসল কেন্দ্র হল জারিৎসিন। লাল আর শ্বেতরক্ষী দু'দলই তাদের সেরা বাহিনীগুলোকে লাগিয়েছে সেই দিকে। তার ফলে উত্তর রণাঙ্গনে কারুরই তেমন আধিপত্য দেখা যাচ্ছে না। কসাকদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীটা প্রকাণ্ড, তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তারা দুদিক থেকে তৎপরতা দেখাচ্ছে, শত্রুর পাশ দিয়ে সৈন্য-চালনা করছে, তাদের পেছনদিকেও হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু কসাকরা সুবিধা করতে পারছে শুধু তখনই যখন ফ্রণ্টের ঠিক পেছনের এলাকা থেকে প্রধানত লালফৌজের নতুন সেপাই দিয়ে গড়া ডিভিশনগুলোই ওদের মোকাবিলা করছে, কারণ তাদের মনোবলের স্থিরতা নেই। সারাতভ্ আর তাম্বভের লোকেরা দলে-দলে আত্মসমর্পণ করছে। কিন্তু লাল সামরিক কর্তৃপক্ষ যখনই একটা মজুর রেজিমেণ্ট কিংবা জাহাজী ফৌজীদল নামাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা যাচ্ছে পাল্টে, লড়াইয়ের উদ্যোগ চলে আসছে হাতে হাতে, একেক পক্ষের যা জিত হচ্ছে তার গুরুত্ব নেহাতই স্থানীয়।

লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে গ্রিগর, সেই সঙ্গে ধীরভাবে লড়াইয়ের গতিও লক্ষ্য করে যাচ্ছে। ওর এখন স্থির ধারণা, শীতের আগে রণাঙ্গন বলে আর কিছু থাকবে না। ও জানে কসাকদের ঝোঁক এখন শান্তির দিকে, দীর্ঘ সংগ্রাম চালানোর কথা আর চলবে না। খবরের কাগজ তো পারতপক্ষে যুদ্ধের ময়দানের দিকে আসেই না। এক আধখানা যখন আসে, গ্রিগর প্যাকিং কাগজে ছাপা হলদে কাগজটা তুলে নিয়ে চোখ বুলোয় সামরিক বিবৃতিগুলোর ওপর আর দাঁতে দাঁত ঘষে। কসাকরা ওকে ঘিরে ধরে ফুর্তিতে হো-হো করে হাসে যখন কৃত্রিম উৎফুল্লতায় ভরা বড়ো বড়ো লাইনগুলো ও জোরে জোরে পড়ে শোনায় :

"২৭শে সেপ্টেম্বর। ফিলোমিনভ এলাকায় বিচিত্র সাফল্য। ২৬ তারিখ রাত্রিতে দুর্ধর্ষ ভিয়েশেন্স্কা বাহিনী শত্রুকে একটি গ্রাম হইতে বিতাড়িত করে, এবং এই সাফল্যের পরেই লুকিয়ানভ্স্কে প্রবেশ করে। অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হইয়াছে, অসংখ্য বন্দী ধরা পড়িয়াছে। ছত্রভঙ্গ লাল সৈনিকরা পশ্চাদপসরণ করিতেছে। কসাকদের মনোবল চমৎকার। নূতন বিজয়ের আশায় ডনের কসাকরা উদ্গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।"

– কতো বন্দী আমরা ধরেছি? অসংখ্য? হা-হা-হা! কুত্তীর বাচ্চাগুলো! ঠিক বত্রিশটা ধরেছি। আর এরা বলছে ..।

—কোমরে হাত রেখে মিৎকা দুলে দুলে হাসে, ওর মুখের প্রকাণ্ড হাঁ একেবারে আকর্ণবিস্তৃত হয়ে ওঠে।

সাইবেরিয়া আর কুবানে ক্যাডেটদের সাফল্যের খবর কসাকরা বিশ্বাস করে না। খবরের কাগজে নির্লজ্জ মিথ্যা, একেবারে বল্গা-ছাড়া। গ্রিগরের দলের একজন কসাক চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিদ্রোহের একটা খবর পড়ছিল। গ্রিগরের কানের কাছেই সে বলে উঠল :

—লাল রক্ষীরা চেকদের একেবারে ছাতু করে দেবে, তারপর সমস্ত ফৌজ পাঠাবে আমাদের দিকে। যতোক্ষণ না একেবারে পিষে থক্থকে হয়ে যাই ততোক্ষণ নিংড়ে ছাড়বে।

প্রোখর জাইকভ বলে—খালি ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা কোরো না! এসব বোকার মতো কথা বলে বলে একেবারে পচে তো গিয়েছ!

কিন্তু সিগারেট পাকাতে পাকাতে গ্রিগর মনে মনে নীরব বিদ্বেষের সঙ্গে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করে নেয়—ঠিকই বলেছে ও, প্রোখর।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ জড়োসড়ো হয়ে টেবিলের সামনে বসে থাকে গ্রিগর। শার্টের কলারের বোতাম খোলা। রোদ-পোড়া মুখের ওপর একটা রুক্ষ ভাব, গালের হাড়ের ওপর অস্বাস্থ্যকর নিটোল মাংসের স্ফীতি। কী ভাবতে ভাবতে রোদে ফ্যাকাশে হয়ে-যাওয়া গোঁফের ডগা দুটো মোচড়ায়। তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। এই ক' বছরে ওর চোখদুটো যেন অনেক নিরুত্তেজ আর কুটিল হয়ে উঠেছে। বসে গভীরভাবে ভাবতে থাকে ও। ভাবতে অস্বাভাবিক রকম কষ্ট হয়। তারপর শুতে গিয়ে নিজের মনেই যেন সকলের হয়ে এক ঢালাও প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলে ওঠে—

—পালিয়ে ঠাঁই পাবার জায়গা কোথাও নেই।

গ্রিগরের ভাগ্যতারকা যে এখনো একটা অনুজ্জ্বল শিখার মতো ধিকিধিকি জ্বলছে তাতে সন্দেহ নেই। কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে গিয়ে আকাশটাকে শীতল মুমূর্ষু আলোয় পুড়িয়ে দিয়ে যাবে সে-সময় এখনো তার হয়নি নিশ্চয়ই। এক শরৎকালের মধ্যেই ওর জিনের তলায় তিন-তিনটে ঘোড়া মারা গেছে, পাঁচ জায়গায় ফুটো হয়েছে কোর্তাখানা। মৃত্যু যেন কালো ডানার নিচে জড়িয়ে ধরে ওকে নিয়ে খেলছে। একদিন এক বুলেট এসে ওর তলোয়ারের তামার হাতলটা অবধি ফুটো করে গেল, ঘোড়ার পায়ের নিচে তলোয়ারের বাঁটটা পড়ে গেল কাটা টুকরোর মতো।

মিৎকা করশুনভ বলেছিল—তোমার জন্য কেউ নিশ্চয় মনে-প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকছে, গ্রিগর। কিন্তু গ্রিগরের বিমর্ষ হাসি দেখে ও অবাক হয়ে গিয়েছিল।

রণাঙ্গন সরে এসেছে রেললাইন পার হয়ে। রসদ-চলাচলের গাড়িতে রোজই কাঁটা-তারের বাণ্ডিল আসছে। রোজই টেলিগ্রাফ মারফত সারা রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ছে নির্দেশ · "এখন যে-কোনদিনই মিত্রবাহিনী এসে পড়তে পারে। যতোক্ষণ না নতুন ফৌজ সামিল হয় ততোক্ষণ প্রদেশের সীমারেখায় নিজেদের শক্তি সুসংহত করা এবং যে-কোনো মূল্যে লালরক্ষীদের চাপ ঠেকিয়ে রাখা দরকার।"

জেলার বাসিন্দারা জড়ো হয়ে মাটি কুপিয়েছে, গড়খাই খুঁড়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করেছে পরিখাগুলোকে। কিন্তু রাতে যখন কসাকরা পরিখা ছেড়ে গ্রামে ঢুকল গা গরম করতে, সেই ফাঁকে লালরক্ষীদের আগাম দল এলো কসাকদের পরিখায়, রক্ষাপ্রাচীর ভেঙে দিয়ে তারের বেড়ার মরচে-ধরা কাঁটার ওপর একেকটা ছাপা ইস্তাহার ঝুলিয়ে দিয়ে গেল কসাকদের উদ্দেশে। কসাকরা পরম আগ্রহে পড়ে দেখল ইস্তাহারগুলো, যেন ওদের ঘরের চিঠি এসেছে। এ অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না তা পরিষ্কার। তুষার পড়ছে। মাঝে মাঝে গলে যাচ্ছে, তারপরেই আবার প্রচণ্ডভাবে পড়ছে। বরফে ভরে যাচ্ছে পরিখাগুলো। এক ঘণ্টাও ভেতরে শুয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছে। শীতে জমে যাচ্ছে কসাকরা, হাত পা তুষারে জখম। পদাতিক আর কসাকদের ছোট-ছোট লড়িয়ে ফৌজীদলের অনেকের পায়েই জুতো নেই; কেউ কেউ লড়াইয়ের ময়দানে গেছে খামার-বাড়িতে যাবার মতো জুতো আর পাতলা সুতীর পাৎলুন পরে। 'মিত্রশক্তি'র উপর কোনো

ভরসা ওদের নেই। গ্রিগরের সেপাইদের একজন একদিন তিক্ত মন্তব্য করে—ওরা তো ঘোড়ায় চড়ে না, গুবরে-পোকায় চড়ে।

নভেম্বরের শেষ দিকে আক্রমণ শুরু করে লালবাহিনী। দুর্বার বেগে তারা রেল-লাইনের দিকে ঠেলে নিয়ে আসে কসাক ডিভিশনগুলোকে। একটানা লড়াইয়ের পর ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে লাল ঘোড়সওয়ারবাহিনী ৩৩ নম্বর কসাক রেজিমেণ্টকে হটিয়ে দেয়; কিন্তু ভিয়েশেনস্কা রেজিমেণ্ট যে-অংশটাতে মোতায়েন ছিল সেখানে তারা এক মরীয়া প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। উঠোনের বরফ-ছাওয়া বেড়ার ওপাশ থেকে রেজি-মেণ্টের মেশিনগান-চালকরা শত্রুর পদাতিকবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানায় এক ঝাঁক বুলেট ছুঁড়ে। ডানপাশে মেশিনগান মৃত্যুবর্ষণ করছে, আর বাঁদিকে কয়েকটা স্কোয়াড্রন তখন পাশ থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে।

মন্থরগতিতে লালবাহিনীর যে দলটা এগোচ্ছিল, সন্ধ্যের দিকে তাদের জায়গায় আনা হল সদ্য আগত একটা জাহাজী ফৌজীদল। মেশিনগানের মুখোমুখি আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা একবারও মাটিতে না শুয়ে না চেঁচিয়ে।

একনাগাড়ে গুলি চালায় গ্রিগর যতোক্ষণ না রাইফেলটা তেতে আগুন হয়ে ওঠে আর হাতে ছ্যাঁকা লাগে। রাইফেলটা ঠাণ্ডা করে নিয়ে ফের কার্তুজ পোরে। চোখ কুঁচকে তাক করতে থাকে দূরের ছোট-ছোট কালো মূর্তিগুলোর দিকে।

কসাকদের রক্ষাব্যূহ ভেদ করল জাহাজীরা। ঘোড়া ছুটিয়ে স্কোয়াড্রনগুলো দৌড়লো গাঁয়ের ভেতর দিয়ে, ওপাশের টিলা ডিঙিয়ে। গ্রিগর পেছন ফিরে তাকিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতের রাশটা ছেড়ে দেয়। টিলার পাশ থেকে ও দেখতে পায় সুবিস্তীর্ণ বিষণ্ণ স্তেপভূমি তুষারে ঢাকা, তারই মাঝে মাঝে বরফ-ছাওয়া ছোট ছোট ঝোপ, নিচু ঢালু জায়গার কিনারা দিয়ে সন্ধ্যার নীলচে-বেগুনি ছায়া। স্তেপের ওপর প্রায় মাইল-খানেক জায়গা জুড়ে মেশিনগানের গুলিতে মরা জাহাজীদের দেহ—খালাসী-কোর্তা আর চামড়ার জারকিনে ওদের দেখাচ্ছে অনেকটা মাঠে বসে-থাকা গোরুর মতো।

ছত্রভঙ্গ স্কোয়াড্রনগুলো দু'পাশের রেজিমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে সন্ধ্যের সময় দুটো গ্রামে এসে থামে আজকের রাতটার মতো। বুজুলুক নদীর একটা ছোট উপনদীর ধারে গ্রামদুটো। গ্রিগরের স্কোয়াড্রন যে গ্রামটায় ঘাঁটি করেছিল সারারাত ধরে সেখান দিয়ে রসদের গাড়ি চলে। একসার কামান অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়। গা গরম করবার জন্য গোলন্দাজ আর সেনাপতিদের আরদালিরা গ্রিগরের ঘরে এসে ঢুকেছে। দুপুর রাতে হঠাৎ গোলন্দাজ অধিনায়কদের তিনজন হুড়মুড় করে ঢুকে ঘুম ভাঙালো ঘরের মনিবদের আর কসাকদের। গাঁয়ের খুব কাছেই নদীটার মধ্যে ওদের কামান আটকে গেছে। রাতের মতো ওটা ওইখানেই ফেলে রাখা সাব্যস্ত করেছে ওরা, সকাল হলে বলদ দিয়ে টেনে তুলবে। জেগে উঠে গ্রিগর চেয়ে থাকে গোলন্দাজদের দিকে,—বুট থেকে চট্‌চটে কাদা মুছে, কাপড়জামা খুলে, পায়ের পট্টিগুলো ঝুলিয়ে দিচ্ছে শুকোবার জন্য। একটু বাদে এলো একজন গোলন্দাজ অফিসার। কান অবধি তার কাদার ছিটে লেগেছে। রাতটার মতো এখানে কাটাবার অনুমতি চেয়ে সে জোব্বা-কোটখানা খুলল, তারপর একটা নির্বিকার ভাব করে উর্দির হাতা দিয়ে কাদার ছিটেগুলো মুছতে গিয়ে সারা মুখে মাখিয়ে ফেলল।

ক্লান্ত ঘোড়ার মতো স্তিমিত চোখে গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে লোকটা বললে—আমাদের আনা হল সদ্য আগত একটা জাহাজী ফৌজীদল। মেশিনগানের মুখোমুখি আক্রমণে

একটা কামান খোয়া গেছে। দুবার গোলা ছুঁড়বার পর ওরা আমাদের নাগাল পেয়ে গেল। একটা বাড়ির উঠোনে রেখেছিলাম কামানটা, লুকোবার অতো ভালো জায়গা আর হয় না...। প্রত্যেকটা কথার শেষে একেবারে অজান্তেই একটা করে অশ্রাব্য গালিগালাজ জুড়ে দিচ্ছে লোকটা— আপনি বুঝি ভিয়েশেন্‌স্কা রেজিমেন্টের? চা চলবে নাকি? এই যে, বাড়ির গিন্নি, একটা সামোভার হবে না, অ্যা?

অফিসারটা বড্ডো বাচাল, সঙ্গী হিসাবে অসহ্য। চা খাওয়াতে তার ক্লান্তি নেই। আধঘণ্টার মধ্যেই গ্রিগর জেনে নিল লোকটার জন্ম প্লাতোভ্‌স্কি জেলায়, জার্মান যুদ্ধে গিয়েছিল, দু'দুবার বিয়ে করে ব্যর্থমনোরথ হয়েছে।

জিভ দিয়ে ঠোঁটের ঘাম চেটে লোকটা বললে—ডন ফৌজের এখন নাভিশ্বাস। যুদ্ধ তো প্রায় খতম হয়ে এল। কালই ফ্রন্টে ভাঙন ধরবে, পনের দিনের মধ্যে আমরা ফিরে যাব নভোচেরকাসে। খালি-পা কসাকদের দিয়ে রাশিয়া দখল করে নেবো এই ছিল আমাদের সাধ! আমরা সব আহাম্মক না তো কি? আর অধিনায়ক অফিসাররা হল বদমায়েশ। তুমি তো কসাক, তাই না? অ্যাঁ? আর ওরা চেয়েছিল তোমাদের দিয়ে কাজ উদ্ধার করে নিতে। অথচ লড়াইয়ের ময়দানের পেছনে বেটারা নিজেরা খাচ্ছে-দাচ্ছে মজা লুটছে।

কটা রঙের চোখদুটো পিট্‌পিট্‌ করছে লোকটার, সারা গা এলিয়ে দিয়েছে টেবিলের ওপর, ঠোঁটের কোণাদুটো বিষণ্ণভাবে বেঁকিয়ে রেখেছে অজান্তেই। এদিকে মুখটার মধ্যে এখনো একটা ক্লান্ত ঘোড়ার মতো বিনম্র ভাব। ঘুম-চোখে গ্রিগর লক্ষ্য করে লোকটার মাংসল কাঁধ আর হাতের ভার-মন্থর নড়াচড়া। মুখ থেকে লাল জিভটা বেরিয়ে আসছে আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। ওপর-পড়া এই হাঁদা গোছের অফিসারটার ওপর মনে মনে চটে উঠছিল গ্রিগর। ও চাইছিল ঘুমোতে। লোকটার গায়ের ঘামের গন্ধে ওর বমি উঠে আসছিল যেন।

সকালবেলায় একটা অস্বস্তির অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভাঙল গ্রিগরের। কী যেন একটা কাজ পড়ে আছে যার সমাধান হল না। শরতের সময়ই নতুন ভাবান্তরটা ও প্রত্যাশা করেছিল, কিন্তু তবু তার আকস্মিক আগমনে ও কম বিস্মিত হল না, যুদ্ধের সম্পর্কে যে অসন্তোষটা জেগে উঠছিল তা ও গ্রাহ্য করেনি গোড়াতে। সে অসন্তোষ প্রথম প্রথম ছোট ছোট জল-ধারার মতো রেজিমেন্ট আর স্কোয়াড্রনগুলোর ভেতর ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু তারপরে প্রায় অলক্ষ্যেই সেই ধারাগুলো মিলে এক প্রকাণ্ড বন্যার রূপ নিল। এখন ও কেবলি দেখতে পাচ্ছে সেই বন্যা, ভয়ংকর ব্যগ্রতায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সারা রণাঙ্গনকে।

পরদিন সারাদিন ধরেই রেজিমেন্ট পেছু হটে। রসদগাড়িগুলো জোর কদমে চলে রাস্তা দিয়ে। ডানদিকে দিগন্ত-ঢাকা ধূসর মেঘের ওপাশে কোথা থেকে যেন কামানের গর্জন ভেসে আসছে। বরফ-গলা রাস্তার ওপর দিয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে স্কোয়াড্রনগুলো চলে যায়, ঘোড়াদের খুরের ধাক্কায় জোলো বরফ ছিট্‌কে ওঠে। রাস্তার কিনারা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় আরদালিরা। কাকগুলো নিঃশব্দে রাস্তার পাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে ঘোড়া থেকে-নামা সওয়ারদের মতো আড়ষ্ট ভঙ্গি করে। পেছু-হটা কসাক স্কোয়াড্রন, সম্মুখ-যোদ্ধা আর রসদগাড়ির সারিগুলোকে ওরা দেখছে বেশ গুরুগম্ভীর ভাব করে, যেন কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছে।

গ্রিগর বুঝতে পারল এখন আর পেছু-হটা রুখবে এমন সাধ্য কারুর নেই।

সেদিনই রাত্রে, একটা স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছুতে পেরেছে এই আনন্দে ভরপুর হয়ে ফৌজ ছেড়ে পালাল গ্রিগর।

গ্রিগর যখন জোব্বাকোট চাপিয়ে তলোয়ার-বেল্‌ট্‌ আর রিভলবারের খাপটা আঁটছে, মিৎকা করশুনভ হাসিমুখে ওকে লক্ষ্য করে বলল—কোথায় চললে হে গ্রিগর?

—তা জেনে তোমার কাজ কি?

—এই কৌতূহল হচ্ছিল আর কি।

গ্রিগরের মুখে ভাবান্তর এসেছিল, কিন্তু চোখ টিপে খুশি ভরা গলায় জবাব দিলে

—যাচ্ছি 'নিজের চরকায় তেল দাও' রাজ্যে। বুঝলে তো? বেরিয়ে পড়ল ও।

ঘোড়ায় জিন আঁটাই ছিল। ভোর অবধি বরফ-জমা খেতের আলের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছোটালো। আগের দিনও যাদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়েছে তাদের কথা হঠাৎ মনে পড়ে ওর—একদম বাড়িতে গিয়ে থামব, ওরা যাবার সময় খবর তো পাব, তখন আবার রেজিমেণ্টে যোগ দিলেই হবে।—দু'শো মাইল পথ ভেঙে ক্লান্ত অবসন্ন ঘোড়াটাকে পরদিন সন্ধ্যে নাগাদ গ্রিগর ওর বাবার বাড়ির উঠোনে নিয়ে তুলল।

নয় ॥

এক হপ্তা বাদে পুরোপুরির ভেঙে পড়ল ফ্রণ্ট। প্রথম যারা রণাঙ্গন ছেড়ে সরে এল, ২৮ নম্বর রেজিমেণ্ট,—তাতে কাজ করত পিয়োত্রা মেলেখফ। উল্টো তরফের শত্রুপক্ষের অধিনায়কদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করে কসাকরা ঠিক করেছিল নিজেরা সরে দাঁড়াবে আর লালফৌজকে বিনা বাধায় উত্তর ডন এলাকার ভেতর দিয়ে চলে যেতে দেবে। বিদ্রোহী কসাকদের নেতা হয়েছে ইয়াকভ ফোমিন নামে সংকীর্ণমনা অদূরদর্শী এক কসাক, আসলে কিন্তু ফোমিন হাতের-পুতুলমাত্র, ওর পেছনে থেকে বলশেভিক-ভাবাপন্ন একদল কসাকই আন্দোলনটা চালাচ্ছে।

তুমুল হট্টগোল করে এক সভা হল। অফিসাররা পেছন থেকে গুলি খাবার ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোঝালো লড়াই চালিয়ে যাওয়া দরকার। এদিকে কসাকরা প্রচণ্ডভাবে যার যেমন খুশি হৈ-চৈ করে দাবি তুলতে লাগল যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই, বলশেভিকদের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে। তারপর পেছু হটতে শুরু করল রেজিমেণ্ট। প্রথম দিনের মার্চের পর কমাণ্ডার আর বেশিরভাগ অফিসারই রেজিমেণ্ট ছেড়ে চলে গেল, তারা গিয়ে যোগ দিল আরেকটা ব্রিগেডে।

আটাশ নম্বর রেজিমেণ্টের দেখাদেখি ছত্রিশ নম্বর রেজিমেণ্টও ঘাঁটি ছেড়ে চলে এল। পুরো দলবল নিয়ে অফিসার সমেত তারা কাজান্‌স্কায় এসে পেঁছুল। ঘোড়-সওয়ার পরিবৃত হয়ে কমাণ্ডার এগিয়ে গেল যে-বাড়িটায় জেলা অধিনায়ক থাকতেন সেই বাড়ির সামনে। ঘোড়া থেকে নেমে বে-পরোয়া চালে চাবুক দোলাতে দোলাতে ঢুকল কমাণ্ডার।

—এখানকার অধিনায়ক কে? জিজ্ঞেস করল সে।

স্তেপান আস্তাখফ দাঁড়িয়ে মর্যাদাব্যঞ্জক সুরে জবাব দিলে—আমি তাঁর সহকারী। দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

—আমি ছত্রিশ নম্বর রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার। আমার নাম নাউমভ...সসম্মানে নিবেদন করছি...আমার সেপাইদের নতুন উর্দি আর বুট দিতে হবে। ওদের পরনে ছেঁড়া কাপড়, পায়ে জুতা নেই। শুনতে পাচ্ছো?

—অধিনায়ক এখানে নেই। তাঁর হুকুম ছাড়া রসদখানা থেকে একজোড়া জুতোও বের করে দিতে পারব না।

—কী বললে?

—যা বললুম তাই!

—ও...কার সঙ্গে কথা বলছ জানো? হতভাগা, তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করব! সেপাইরা, পাকড়াও! রসদখানার চাবি কোথায় রেখেছিস্ রে, খিড়কিঘরের ইঁদুর!—টেবিলের ওপর চাবুকটা সপাং করে মারল অফিসার, রাগে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। লোমের টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে বলল—চাবিটা আমাকে দাও, আর একটি কথাও নয়!

আধঘণ্টার মধ্যে গাঁটকে গাঁট লোমের কোর্তা, ফেল্ট্ জুতো, চামড়ার বুট রসদখানার দরজা দিয়ে উড়ে এসে পড়তে লাগল বরফে, হাতে হাতে পাচার হল চিনির বস্তা। চত্বরের মধ্যে জেগে উঠল ফুর্তিভরা গলায় চিৎকার আর কোলাহল।

* *

আটাশ নম্বর রেজিমেণ্ট এর মধ্যে তাদের নতুন নেতা সার্জেণ্ট ফোমিনকে নিয়ে একেবারে ভিয়েশেন্স্কা জেলা পর্যন্ত হটে এল। ওদের কুড়ি মাইল পেছনে লালরক্ষী ডিভিশন, উত্তর রণাঙ্গনের সত্তর মাইল জায়গার ফাঁকটা তারা এবার ভরে ফেলছে। বন্দুকের আওয়াজ নেই, মেশিনগান নিশ্চুপ। আটাশ নম্বর রেজিমেণ্ট ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় মনমরা হয়ে দক্ষিণ ডন এলাকার কসাকরাও লড়াই না দিয়ে পেছু হটতে লাগল। লালরক্ষীরা খুব সাবধানে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, ওদের টহলদারী সেপাইরা সামনে দিকের গ্রামগুলোর ওপর খুব সতর্ক নজর রাখছে।

ছত্রভঙ্গের এই দিনগুলোতে কসাকরা আর তাদের অফিসারদের ভেতর যে-শত্রুতা সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আমল থেকেই অদৃশ্য একটা ব্যবধান গড়ে তুলেছিল, তা এবার আগের চেয়েও বেশি ব্যাপক হয়ে উঠল। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে কসাক রেজিমেণ্ট-গুলো যখন ধীরে ধীরে ডনের দিকে ফিরে আসছিল তখনো অফিসারদের খুন করা অথবা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার তেমন রেওয়াজ হয়নি। কিন্তু এক বছর বাদে সেটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। কসাকরা তাদের অফিসারদের জোর করে বাধ্য করত লালরক্ষী অফিসারদের মতো লড়াইয়ের সামনে থাকতে, তারপর পেছন থেকে তাদের চুপিসারে গুলি করে মারত। পিয়োত্র মেলেখফ এর অনেক আগেই তার চতুর, প্রখর বুদ্ধিতে বুঝে নিয়েছিল কসাকদের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়ার মানে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। বিদ্রোহের একেবারে শুরু থেকেই সে অফিসার হিসাবে তার নিজের আর সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে পার্থক্যটা খুব সাবধানে ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। সুযোগ সুবিধা বুঝলেই ওদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যুদ্ধের অর্থহীনতার কথা তুলত।

বলার মধ্যে অবশ্য নিষ্ঠা থাকত না, অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এসব কথা বলতে হত, কিন্তু ওরা তা ধরতে পারত না। বলশেভিক রঙ চড়াতে শুরু করল নিজের ওপর। তারপর যখনই দেখল ইয়াকভ ফোমিন রেজিমেণ্টের নায়ক হতে চলেছে তখন বেশ মতলব করেই তার সুনজরে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। অন্য কসাকদের মতো পিয়োত্রাও যখন-তখন অফিসারদের গালিগালাজ করে, বন্দীদের ছেড়ে দেয়, যদিও ওর মন জুড়ে থাকে দারুণ ঘৃণা আর হাত উৎসুক হয়ে ওঠে ওদের মারার জন্য, খুন করার জন্য। এইভাবে ও কসাকদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে, আর ওদের চোখের সামনেই নিজের আসল চেহারাটাকে চাপা দেয়।

রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার যখন অফিসারদের নিয়ে সরে পড়ল পিয়োত্রা তখনও পেছনেই রয়ে গেছে। ধীরস্থিরভাবে, সব সময় নিজেকে একটু আড়ালে রেখে আর বেশ সমঝে সামলে ও রেজিমেণ্টের সঙ্গে ভিয়েশেন্স্কায় এসে পৌঁছুল। কিন্তু সেখানে দুদিন কাটাবার পর ও আর স্থির থাকতে পারল না। ফোমিন কিংবা অফিসারদের কাউকে খবর না দিয়ে পালিয়ে এল নিজের বাড়িতে।

সেদিন ভোর থেকেই একটা সভা হচ্ছিল ভিয়েশেন্স্কা বাজারের চত্বরে, পুরনো গির্জাটার পাশে। লালফৌজ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি আসবে তারই অপেক্ষা করছিল রেজিমেণ্ট। কসাকরা জটলা বেঁধে ঘোরাঘুরি করছে, ওদের পরনে গ্রেটকোট, লোমের ছোট কোর্তা, ওভারকোট ছেঁটে তৈরি করা কোট, কিংবা পশমী আস্তর-লাগানো কোট। বিশ্বাস করা অসম্ভব যে ছন্নছাড়া এই বিরাট জনতাই আটাশ নম্বর রেজিমেণ্ট। পিয়োত্রা হতাশভাবে এক দল থেকে আরেক দলের ভেতর ঘোরাঘুরি করে, কসাকদের মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করে। লড়াইয়ের ময়দানে ওদের উর্দির ছাঁদ ওর নজরেই পড়েনি বলতে গেলে : আসলে একসঙ্গে জোট-বাঁধা অবস্থায় গোটা রেজিমেণ্টটা ও আগে কোনদিন দ্যাখেনি। এখন, গোঁফের ডগাদুটো কামড়ায় আর গায়ে জ্বালা ধরে ওর—তাকিয়ে থাকে নানা বিচিত্র গড়নের লোম-টুপি ,হ্যাট আর ঘোমটা-ঢাকা মাথাগুলোর দিকে, দ্যাখে ওদের দেহের দিকে চেয়ে। তেমনি রকমারি ওদের ফেল্ট জুতো, চামড়ার বুট, আর লাল-রক্ষীদের কাছ থেকে নেওয়া খাটো বুটের ওপর বাঁধা পট্টি। নিষ্ফল আক্রোশে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে—যতোসব পেছন-ছেঁড়া চাষার গুষ্টি' জাত-খোয়ানি'

রাস্তায় ভিয়েশেন্স্কার বাসিন্দা একজনকেও দেখা যায় না। গোটা জায়গাটাই যেন লুকিয়ে অপেক্ষা করছে। গলিগুলো যেখানে মিলেছে তারই ফাঁক দিয়ে তুষার-বাহিত ডনের সাদা বুকটা দেখা যায়, ওপারের বন ঘন কালো, যেন কাজল কালিতে আঁকা। গির্জার ধূসর পাথর স্তূপের আশেপাশে এক পাল ভেড়ার মতো জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের মেয়েরা। ওরা দেখতে এসেছে স্বামীদের।

পিয়োত্রা ফারের আস্তর-দেয়া কোর্তা পরেছে, বুকের ওপর প্রকাণ্ড একটা পকেট। মাথায় অফিসারদের সেই অভিশপ্ত আস্ত্রাখান চুড়ো-তোলা টুপি যা নিয়ে এই সেদিনও ওর কতো গর্বই না ছিল। সবসময় বুঝতে পারছে ওর ওপর অনেক তির্যক কঠিন দৃষ্টি এসে পড়ছে। মনটা ওর এমনিতেই উদ্বিগ্ন উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে ছিল, এসবের ফলে সেটা আরো বাড়ল। ভালো একটা গ্রেটকোট আর নতুন ফারের টুপি পরে লালফৌজের একজন সেপাই চত্বরের মাঝখানে একটা পিপের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল। ও খানিকক্ষণ দাঁড়াল শুনবার জন্য। লোমের দস্তানা-পরা হাত দিয়ে লোকটা ঘাড়ের ওপরের স্কার্ফটা ঠিক করে চারিদিকটা দেখে নিল।

—কমরেড কসাকগণ... চাপা, শীতার্ত গলার আওয়াজটা পিয়োত্রার কানে এল। ও একবার আশেপাশে চেয়ে দেখল, কসাকরা অনভ্যস্ত "কমরেড" সম্বোধনে অস্বস্তি বোধ করছে, উত্তেজিতভাবে এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। লালফৌজের লোকটি অনেকক্ষণ ধরে সোভিয়েত সরকার, লালফৌজ আর কসাকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা আলোচনা করল। কথার মধ্যে মধ্যে হৈরদমই চিৎকার উঠছিল :

—কমরেড, 'কমিউন' বলতে কী বোঝাচ্ছ তাই বলো!

—আর কমিউনিস্ট পার্টিটাই বা কী?

বুকের ওপর হাত রেখে ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করতে লাগল বক্তা :

—কমরেডগণ! কমিউনিস্ট পার্টি একটা স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় তারাই এ পার্টিতে যোগ দেয় যারা ধনিক আর জমিদারদের পীড়ন থেকে মজুর আর কিসানদের মুক্ত করার বিরাট কর্তব্য নিয়ে লড়াই করতে চায়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরেকজন কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে :

—কমিউনিস্ট আর কমিসার ব্যাপারটা একবার বুঝিয়ে বলা হোক্।

লোকটি তার ব্যাখ্যা সবে শেষ করেছে অমনি আরেকটি চিৎকার ওঠে :

—কি বলছ বুঝতে পারছি না। আমরা এখানে সবাই অজ্ঞ মানুষ। আরো সোজা কথায় বলো।

লালফৌজের লোকটির বলা শেষ হতে ইয়াকভ ফোমিন উঠে লম্বা এক ক্লান্তিকর বক্তৃতা শুরু করলে। শুনতে শুনতে পিয়োত্রার মনে হতে লাগল প্রথম যেদিন ফোমিনকে ও ফৌজে দেখেছিল; পেত্রোগ্রাদের পথে দারিয়া ওকে যেদিন স্টেশনে বিদায় দিতে এসেছিল সেদিনটির কথা। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল আতামান রেজিমেন্টের সেই পলাতক সৈনিকের কঠিন, ভিজে চক্‌চকে চোখদুটো, কাঁধের পটির ওপর "৫২" লেখা সেই গ্রেটকোট আর ভালুকের মতো হেলে-দুলে চলা। পিয়োত্রার মনে পড়ছে কথাগুলো : "আর থাকা পোষাল না ভাই! ক্রিস্তোনিয়ার মতো গর্দভ, দল-পালানো সেপাই,—সেই হল কিনা রেজিমেন্টের কমাণ্ডার আর আমি বেচারা ফেল্‌না হয়ে গেলাম!" পিয়োত্রার মনে পড়ে কথাগুলো, চোখদুটো তিক্ত অনুভূতিতে চক্‌চকে হয়ে ওঠে।

ঘরেই হন্‌হন্ করে ছোটে ও নিজের আস্তানার দিকে। ঘোড়ার পিঠে জিন চাপায় আর শোনে কসাকরা ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে—গাঁয়ে ফেরার সময় বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে জানান দিচ্ছে ফৌজের সেপাইদের চিরকালের প্রথা অনুযায়ী।

॥ দশ ॥

ফসল-তোলার দিনগুলোর চেয়েও লম্বা মনে হয় এখনকার এই ভয়ংকর রকম নিঃঝুম, ছোট দিনগুলোকে। পদস্পর্শহীন কুমারী স্তেপমাটির মতো পড়ে আছে গ্রামগুলো। ডন অববাহিকার সমস্ত জেলাগুলো যেন মরে গেছে, মড়ক লেগে পল্লীর

বসতি অঞ্চল একেবারে ছারখার হয়ে গেলে যেমন হয়। আর মনে হয় যেন কালো ঘন ডানা মেলে ছড়িয়ে পড়ছে মেঘ; নীরবে, ভয়ঙ্করভাবে ঢেকে ফেলছে সারা ডন এলাকা। এর পরই বুঝি একটা ঝড় উঠে পপ্‌লারের মাথাগুলোকে নুইয়ে দেবে মাটিতে, কর্কশ আওয়াজ করে প্রচণ্ড বজ্রপাত হবে, ডনের ওপারের সাদা বনটা অবধি ছুটে গিয়ে গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে সব, খড়িমাটি পাহাড়ের ওপর থেকে ছিটকে পড়বে হিংস্র পাথর, গর্জে উঠবে বাজের ধ্বংস-মুখর আওয়াজে।...

সকাল থেকেই একটা কুয়াশা। তাতারস্ক আর স্তেপ ঢেকে গেছে। পাহাড়ের দিক থেকে গুর্‌গুর্‌ আওয়াজ উঠছে, তার মানে তুষারপাত আসন্ন। বেলা দুপুরের আগে কুয়াশার জট ছাড়িয়ে সূর্য উঠল বটে কিন্তু তবু ফর্সা হল না বড়ো একটা। উদ্দেশ্য-হীনভাবে ডন-পাড়ের পাহাড়ের মাথায়-মাথায় ঘুরে বেড়াল কুয়াশাটা, তারপর জমল গিয়ে উপত্যকার ভেতরে। খড়িমাটির শেওলা-ধরা গায়ে আর বরফ-ঢাকা উন্মুক্ত টিলার ওপর একটা সাদা ধুলোর আস্তর রেখে সেখানেই মিলিয়ে গেল সে-কুয়াশা।

সন্ধ্যের দিকে আগুন-লাল চাঁদের থালাটা ওঠে নগ্ন অরণ্যতলের ওপাশ থেকে। কুয়াশা-ঢাকা চাঁদ নিস্তব্ধ গ্রামগুলোর ওপর ছড়িয়ে দিয়ে যায় যুদ্ধের রক্তবীজ আর ঘর-জ্বালানো আগুন। আর সেই চাঁদের ক্ষীণ করুণ আলোয় মানুষের বুকে বুকে জেগে ওঠে একটা অব্যক্ত আতঙ্ক। জানোয়ারগুলো উৎকণ্ঠায় ছট্‌ফট্‌ করে; ঘোড়া বলদ ঘুমোতে পারে না, ভোর অবধি উঠোনে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। কুকুরগুলো কঁকিয়ে কঁকিয়ে চিৎকার করে, মোরগরা একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডাকতে শুরু করে মাঝরাত হবার অনেক আগে থেকেই। একটা অদৃশ্য ঘোড়সওয়ার সেনাদল হয়তো বা রেকাব আর হাতিয়ারের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ তুলে ডন নদীর বাঁ পাড় দিয়ে এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে অন্ধকার বন আর ধূসর কুয়াশা ভেদ করে।

উত্তর রণাঙ্গনে যে-সব তাতারস্কবাসী কসাক ছিল তারা প্রায় সবাই ফিরেছে গাঁয়ে, ডনের দিকে আস্তে আস্তে পেছু হটার মুখে তারা রেজিমেণ্ট ছেড়ে চলে এসেছে। কেউ কেউ ফিরে এসে অনেক দিনের জন্যে ঘোড়ার জিন খুলে রেখেছে। তারা অপেক্ষা করছে কবে লালফৌজ আসবে। লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম তারা লুকিয়ে রেখেছে খড়ের গাদার নিচে কিংবা চালাঘরের ছাঞ্চিতে। বাকি সবাই কিন্তু ঘোড়াগুলোকে উঠোনে টেনে এনে রাত কাটিয়ে গেছে বৌদের সঙ্গে, তার পরদিন সকালে ফের তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়েছে স্তেপের রাস্তা ধরে, আর পাহাড়ের চুড়ো থেকে শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখেছে ডন-নদীর সাদা নিষ্প্রাণ স্রোতরেখাটা, দেখেছে তাদের পল্লীগ্রাম—হয়তো-বা চিরকালের জন্য এ-গ্রাম ছেড়ে চলল এবার।

সাধ করে কারা মরতে যায়? মানুষের এ পথের শেষ কোথায় তাই বা কে জানে? কষ্টেসৃষ্টে গ্রাম ছেড়ে চলে ঘোড়াগুলো। আড়ষ্ট হয়ে-ওঠা বুক থেকে কসাকরা প্রাণপণে টেনে সরিয়ে দেয় প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা। আর এই রাস্তা ধরে অনেকেই কল্পনার ডানায় ভর করে ফেরে নিজের বাড়িতে। এ পথ জুড়ে কতো না ভারাক্রান্ত ভাবনার রোমন্থন। আর হয়তো-বা রক্তের মতো নোন্‌তা চোখের জলও ঝরে পড়ে জিন বেয়ে, পড়ে রেকাব ছুঁয়ে খুর-দাগানো রাস্তার বুকে।

ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে পিয়োত্রা ফিরে আসার পরের দিন রাতে মেলেখফ-বাড়িতে একটা পারিবারিক বৈঠক বসে।

পিয়োত্রা দরজার চৌকাঠ ডিঙোতেই পান্তালিমন জিজ্ঞেস করে—এ কী ব্যাপার?

অনেক লড়েছ বুঝি? অফিসারের তক্‌মা না এ'টেই ফিরে এলে যে বড়ো? যাও, যাও, মা-ভাইদের সঙ্গে দেখা করোগে। ওদের একটু উৎসাহ দাও। তোমার বউ তো তোমার জন্য এদিকে হেদিয়ে মরছে। সাবাস্ ছেলে, পিয়োত্রা! ওরে গ্রিগর! পাহাড়ী ই'দুরের মতো চুল্লীর ধারে শুয়ে আছিস্ যে? নেমে আয়।

খালি পা দুটো ঝুলিয়ে দেয় গ্রিগর। হাসিমুখে লোমশ বুকটা চুলকোতে থাকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে দাদা কোমর থেকে তলোয়ারের ফাঁস খুলছে। ঠাণ্ডায় আঙুল জমে গেছে ওর, মাথার কাপড়ের ফিতে খুলতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। মুখে একটি কথাও না বলে দারিয়া ওর স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসছিল আর ভেড়ার-চামড়ার কোর্তাটার বোতাম খুলে দিচ্ছিল। পিয়োত্রার ডানদিকটা ও সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছে, রিভলবার-খাপটার পাশাপাশি সেদিকে একটা হাতবোমাও বাঁধা আছে বেল্টের সঙ্গে।

দুনিয়া ওর দাদার গোঁফে একটা চুমু দিয়েই দৌড়ে গেল তার ঘোড়াটাকে দেখতে। ইলিনিচ্‌না আঙ্‌রাখা দিয়ে ঠোঁট মুছে তৈরি হল তার "প্রথম-সন্তান"কে চুমু দেবার জন্য। নাতালিয়া চুল্লীর কাছে ঘোরাফেরা করছিল, বাচ্চারা ছে'কে ধরেছে ওকে। সবাই অপেক্ষা করছে পিয়োত্রার কথা শুনবে বলে। ও কিন্তু দরজার গোড়া থেকেই সবাইকে ভাঙা গলায় একটু সম্ভাষণ জানিয়ে চুপচাপ বাইরের পোশাকটা খুলতে থাকে। অনেকটা সময় কেটে যায় শনের নুড়ো দিয়ে বুটজোড়া ঘষে সাফ করতে। তারপর সোজা হয়ে বসতেই হঠাৎ ওর ঠোঁটদুটো কে'পে ওঠে। খাটের কিনারায় মাথাটা ক্লান্তভাবে এলিয়ে দেয় ও। সবাই দ্যাখে ওর হিম-জমা কাল্‌চে গালের ওপর চোখের জল চক্‌চক্ করছে।

—এই যে, সেপাই! ব্যাপার কী?—মনের আশঙ্কাটা তামাশার আড়ালে চেপে রাখার চেষ্টা করে ওর বাপ।

—আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে, বাবা!—বে'কে গেল পিয়োত্রার ঠোঁটদুটো। ওর সাদা ভুরুগুলো কাঁপে। চোখ দুটো ঢেকে নোংরা হাতের তেলোয় নাক ঝাড়ে ও।

গ্রিগরের গায়ে গা ঘষছিল বেড়ালটা, গ্রিগর তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল, ঘোঁত করে লাফ দিয়ে নামল চুল্লীর ওপর থেকে। ওর মা ফু'পিয়ে কে'দে উঠে পিয়োত্রার উকুন-ভরা মাথাটায় চুমু খেয়েই ঝাঁ করে আবার সরে গেল।

—বাছা রে আমার! আহা, একটু দই এনে দি' তোর জন্য? যা, বোস্ গে। ওদিকে তোর ঝোল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে, নারে?

টেবিলের সামনে হাঁটুর ওপর ভাইপোটিকে বসিয়ে নাচাতে নাচাতে পিয়োত্রার মনটা খুশি হয়ে উঠল। মনের চাঞ্চল্য চেপে রেখে ও রণাঙ্গন থেকে আটাশ নম্বর রেজিমেণ্ট হটিয়ে আনার কথা, অফিসারদের পালানোর কথা, ফোমিনের কথা আর ভিয়েশেন্‌স্কার সেই শেষ সভাটার কথা শোনাল।

মেয়ের মাথার ওপর হাত রেখে গ্রিগর জিজ্ঞেস করল—এসব ব্যাপার দেখে তোমার কী মনে হয়?

—মনে হওয়ার আর কী আছে। কালকের দিনটা বাড়িতে কাটাব, রাত হলে ঘোড়ায় চেপে রওনা হব। আমার কিছু খাবার রেখো মা।—মায়ের দিকে ফিরল পিয়োত্রা।

—তার মানে তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ? পান্তালিমন তামাকের থলির ভেতর আঙুল পুরে এক চিমটি তামাক তুলে দাঁড়িয়ে রইল পিয়োত্রার জবাবের অপেক্ষায়।

পিয়োত্রা উঠে ক্রুশ-নমস্কার করে বাপের দিকে কঠিন নিষ্করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে

—দোহাই খ্রীস্টের, অনেক আক্কেল হয়েছে আমার! বলছ বেরিয়ে যাচ্ছি কিনা! তাছাড়া আর কি? কেন পেছনে পড়ে থাকব? 'লাল-পেটগুলো' এসে আমায় জবাই করুক সেইজন্যে? তোমরা বোধহয় এখানেই থাকবে ঠিক করেছ, কিন্তু আমি থাকছি না! অফিসারদের ওপর ওরা কোনো দয়ামায়া দেখাবে না।

—কিন্তু তোমার বাড়ির কি হবে? ছেড়ে যাচ্ছ তাহলে?

বাপের প্রশ্ন শুনে কাঁধটা শুধু ঝাঁকালো পিয়োত্রা। কিন্তু দারিয়া আর বলার লোভ সামলাতে পারল না।

—তুমি তো চলে যাচ্ছ, আর আমাদের থাকতে হবে? বেশ কথা যাহোক! আমরা এখানে পড়ে থাকব তোমার সুবিধে দেখবার জন্য! আর তোমার জন্যই হয়তো মরব, কি বল! চুলোয় যাও তুমি। আমি এখানে থাকছি না!

নাতালিয়া কথার মাঝখানে ফোঁড়ন দেয়। দারিয়ার মিন্‌মিনে গলার ওপর নিজের গলা চড়িয়ে সে বলে ওঠে:

—গাঁয়ের মাটিতে ওদের পা পড়লে আমরা আর থাকছি না। আমরা হেঁটেই চলে যাব।

—বোকা কোথাকার! হাঁদা কুত্তীর দল!—পান্তালিমন খেপে উঠে গজরায়, চোখ পাকিয়ে নিজের অজান্তেই লাঠিগাছটা খুঁজতে থাকে।—চুপ কর্ শয়তান-মাগীরা! এ হচ্ছে মরদের ব্যাপার। তোরা নাক গলাচ্ছিস কেন! ধর্ যদি আমরা ছেড়েছুড়ে যেদিক দু'পা যায় সেদিকে চলে যাই? তাহলে গরুভেড়াগুলোর কী হবে? পকেটে পুরব সেগুলো? বাড়িটার কী দশা হবে?

ইলিনিচ্না সতেজে স্বামীর কথায় সায় দিয়ে বলে—তোদের মনে তো খুব লাগে! খামারটা গড়ে তুলতে তোদের গতর খাটাতে হয়নি, তাই তোদের পক্ষে ছেড়ে-যাওয়া খুব সোজা। কিন্তু আমি আর বুড়ো দিনরাত খেটেছি। আমরা এখান থেকে নড়ছি না!—ঠোঁট দুটো চেপে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে বুড়ি—তোরা যা, আমি যাচ্ছি না। বরং নিজের দরজা গোড়ায় পড়ে খুন হব, তবু পরের বাড়ির চাবুক খেয়ে মরব না।

মিনিটখানেক সবাই চুপচাপ। দুনিয়া একটা মোজা বুনছিল, এবার সে মাথা তুলে ফিস্‌ফিস্ করে বললে:

—গরু-ভেড়া তো আমরা সঙ্গে করেই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। গরু-ভেড়ার জন্য পেছনে পড়ে থাকার মানে হয় না।

আবার খেপে উঠল বুড়ো। অনেকক্ষণ একটা মর্দা ঘোড়াকে আস্তাবলে রেখে দিলে যেমন হয় তেমনি করে পা দাপাল, উনোনের কাছে শুয়ে-থাকা একটা বাচ্চার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ার জোগাড়। দুনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে গাঁক্-গাঁক্ করে উঠল:

—তাড়িয়ে নিয়ে যাব!...আর বুড়ি গাইটার? তার কি দশা হবে? তাকে নিয়ে যাবি কোন্ ভাগাড়ে? তোর পাপের ফল তুই ভুগবি! পেলে-পুষে তোকে বড়ো করেছি! উকুনের বাচ্চি! আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে এখন বেটির কথা শোনো! ভেড়াগুলোর কি হবে শুনি? ভেড়াগুলোর তুই কী বিহিত করবি? কুত্তীর বাচ্চি কোথাকার! জিভ সামলা!

গ্রিগর আড়চোখে পিয়োত্রার দিকে তাকায়। দ্যাখে সেই আগের দিনের মতোই ভাইয়ের চোখে দুষ্টুমি আর হেঁয়ালি অথচ ভক্তিভরা একটা হাসি। সোনালি গোঁফের ডগা আগের মতোই কুঁচকে উঠেছে। পিয়োত্রা চোখ মটকায়, শরীর দুলে ওঠে ওর জোর করে হাসি চেপে রাখতে গিয়ে। খুশি হয়ে ওঠে গ্রিগর, বুঝতে পারে ওর নিজেরও

ভীষণ হাসতে ইচ্ছে করছে। এ ক'বছরে হাসি জিনিসটাই তো ও ভুলে গিয়েছিল। হো-হো করে দরাজ গলায় খোলাখুলি হেসে ওঠে গ্রিগর।

—ওই দ্যাখো! হায় ভগবান...এদিকে আমরা কথা বলছিলাম...। বুড়ো কটমট করে গ্রিগরের দিকে তাকায়, তারপর তুষার-ঢাকা জানলাটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে।

শেষ অবধি মাঝ-রাতে ওরা সবাই একমত হল—তিনজন কসাক তাতারস্ক ছেড়ে চলে যাবে, আর মেয়েরা এখানেই থাকবে ঘর আর জমি-জিরেত দেখবার জন্য।

সূর্য ওঠার অনেক আগে ইলিনিচ্না উনোন ধরায়, সকাল হবার আগেই রুটি বানিয়ে দুঝুড়ি পিঠে ভেজে ফেলে। উনোনের পাশে বসে বুড়ো প্রাতরাশ সারল। ভোরে বেরিয়ে গেল গরু-ভেড়াগুলোকে জড়ো করতে। যাওয়ার জন্য শ্লেজগাড়ি সাজাতে হবে। অনেকক্ষণ গোলাঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো। তারপর গমের জালার মধ্যে হাত ঢুকোয়। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে গমের দানা। তারপর এমনভাবে সে বাইরে বেরিয়ে আসে যেন ঘরে একটা মড়া ফেলে এসেছে--টুপি খুলে আস্তে করে পেছন দিকে ভেজিয়ে দেয় দরজাটা।

চালাবাড়ির নিচে শ্লেজের পাশে ঘুরঘুর করছে, এমন সময় রাস্তায় দেখা গেল আনিকুশ্কাকে। গরু নিয়ে চলেছে জল খাওয়াতে। দুজন দুজনকে নমস্কার জানায়।

পান্তালিমন বলে--তুমিও সরে পড়ছ তো আনিকুশ্কা?

—সরে পড়ব আমি? ল্যাংটোর আবার কোমরে গেরো! আমার যা তা এই শরীরটার মধ্যেই আছে!

—খবর-টবর পেলে কিছু?

—অনেক খবর, প্রকোফিচ!

—কী? উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে পান্তালিমন, শ্লেজের একপাশে কুড়ুলটা ঢুকিয়ে দেয়।

—লাল সেপাইরা তো এসে পড়ল বলে! ভিয়োশেনস্কার কাছাকাছি এসে পড়েছে। বলশয় গ্রোমক্-এর একজন লোক ওদের দেখেছে, বলল ওরা নাকি মানুষ খুন করতে করতে এগিয়ে আসছে। ওদের মধ্যে চীনে আছে, ইহুদি আছে।

—মানুষ খুন?

—হ্যাঁ, গন্ধ পেলেই হল!—হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলছে আনিকুশ্কা আর গালমন্দ করছে--গাঁয়ের মেয়েগুলো ভদকা বানিয়ে ওদের খাওয়াচ্ছে যাতে ওরা গায়ে হাত না তোলে: এমনি করে সব মাতাল হচ্ছে আবার এগিয়ে গিয়ে আরেকটা গাঁ দখল করে নিচ্ছে, হন্যে হয়ে ছুটছে ওরা।

চালার চারদিকটা দেখে নেয় বুড়ো, ওর নিজের হাতে তৈরি প্রত্যেকটা খাঁটি আর বেড়া দ্যাখে। তারপর যায় মাড়াই-উঠোনে খড় আনতে, রাস্তায় খাবার দরকার হবে। একটা লোহার আঁকড়া নামিয়ে নেয়। ওরা যে চলে যাবেই সেটা যেন বুড়ো এখনো বুঝে উঠতে পারছে না, তাই রদ্দি খড়গুলো টেনে বের করতে শুরু করে (ভালো খড়গুলো সে বরাবরই জমিয়ে রাখে শীতের শেষে জমিতে লাঙল দেবার সময় কাজে লাগবে বলে)। কিন্তু কী ভেবে মন বদলায় ফের, নিজের ওপর চটে উঠে আরেকটা গাদার দিকে এগিয়ে যায়। খেয়ালই হয় না যে, আর ক'ঘণ্টার মধ্যেই খামার ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে সে দক্ষিণের কোনো দিকে চলে যাবে, আর ফিরবেই না হয়তো কোনোদিনও। কিছু খড় টেনে নামিয়ে

আবার আগের অভ্যাসমতো ছড়িয়ে-যাওয়া আঁটিগুলো তুলে রাখতে যায়। কিন্তু বিদেটায় হাত দিতে গিয়ে যেন ছ্যাঁকা লেগেছে এমনিভাবে হাতটা সরিয়ে নেয়, কপালের ঘাম মুছে জোরে জোরে বলে ওঠে :

—এখন আর এসব দেখতেই বা যাচ্ছি কেন? শেষ অবধি তো সব ঘোড়ার পায়ের নিচেই যাবে; ওরাই খাবে, পোড়াবে। বয়েসের ভারে ভারি পা দুটো টেনে টেনে, পিঠটা বেঁকিয়ে বুড়ো দাঁত কিড়মিড় করে। খড়ের উকোনটা তুলে নেয়।

ঘরের ভেতর না ঢুকে খোলা দরজার গোড়া থেকেই চ্যাঁচায় :

- ওরে, তৈরি হ'! এক মিনিটের ভেতর ঘোড়া সাজিয়ে নিচ্ছি। যাওয়ার মুখে দোর ওয়াই ভালো।

ঘোড়াগুলোর পিঠের ওপর জিন-সাজ চড়ায় স্লেজের পেছনদিকে এক থলি জই রাখে। ছেলেরা এখনো বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় সাজ চড়াচ্ছে না দেখে অবাক হয়ে ও বাড়ির ভেতর ঢোকে।

রান্নাঘরে দ্যাখে এক অদ্ভুত দৃশ্য : পিয়োত্র বাঁধাছাঁদা করে-রাখা পুঁটলিগুলো ফের রেগেমেগে খুলছে, পাৎলুন, কোর্তা, মেয়েদের পালা-পার্বনে পরার গয়না সব ছুঁড়ে ফেলছে মেঝেতে।

বুড়ো একেবারে হতভম্ব হয়ে বলে—এসব কী? মাথার টুপিটাও খুলে ফেলে সে।

পিয়োত্র কাঁধের ওপর দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে মেয়েদের দেখায়—ওই ওদের জিজ্ঞেস করো! গজর গজর করছে সব! কোথাও কখখনো যায় না! একজন যদি যাবে তো সবাই যাবে, আর নয়তো কেউই যাবে না, ব্যস্! বলছে লাল সেপাইরা এসে ওদের বেইজ্জত করবে আর আমরা এদিকে সম্পত্তি বাঁচাবার জন্য সরে পড়ছি। বলছে যদি ওদের মারে তো ওরা মরেই যাবে, ব্যস্ তখন সব খতম!

—বাবা, তোমার জামাজুতো খোলো!—হাসতে হাসতে গ্রিগর নিজের জোব্বাকোট আর টুপি খোলে। নাতালিয়া কাঁদছিল। এবার পেছন থেকে গ্রিগরের হাতটা চেপে ধরে চুমু খায়, আর দুনিয়া খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে।

বুড়ো মাথায় টুপি দেয়, কিন্তু তখুনি আবার ফস করে সেটা খুলে মাতৃমূর্তির কাছে এগিয়ে গিয়ে মহা বিনয়াবনত ভঙ্গিতে ক্রুশ প্রণাম করে। তিনবার মাথা নুইয়ে ফের হাঁটু সোজা করে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকটা দ্যাখে।

—বেশ, তা যদি হয় তাহলে থাকলাম! হে স্বর্গের দেবী, আমাদের তুমি আশ্রয় দিও, রক্ষা কোরো! আমি চললাম ঘোড়ার সাজ খুলতে।

ঠিক সেই সময়টা এসে পড়ল আনিকুশ্‌কা। মেলেখফ পরিবারের সবাইকে খুশি হয়ে হাসতে দেখে ও অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার?

সকলের হয়ে জবাব দিল দারিয়া—আমাদের কসাক মরদরা কেউ যাচ্ছে না।

—তাই বলো! এবার বুঝি সুবুদ্ধি হল?

—সুবুদ্ধি হল!—অনিচ্ছার সঙ্গে দাঁত খিঁচিয়ে গ্রিগর চোখ টিপল—বাইরে গিয়ে মরণ ডেকে কী লাভ, যম আমাদের এখানেই পাবে।

—অফিসাররাই যদি না যায় তাহলে তো ভগবানের আদেশ আমরা পেয়েই গিয়েছি কী করতে হবে।—বলে উঠল আনিকুশ্‌কা, তারপর এমন খট্‌মট্ করে ছুটে বেরিয়ে গেল যেন পায়ে ওর ঘোড়ার নাল লাগানো।

॥ এগারো ॥

শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়াই ঠিক হয়েছে বলে নতুন করে মনে জোর পেল পান্তালিমন, ভালমন্দ জ্ঞানটাও ফিরে এল ওর। সন্ধ্যের সময় গরু-ভেড়াগুলোকে দেখাশুনা করতে গিয়ে একটুও ইতস্তত না করে ঠিক সেই রদ্দি খড়ের আঁটিগুলোই টেনে বার করল। আঁধার হয়ে আসা উঠোনে গাইটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব দিক থেকে, তারপর খুশি হয়ে মনে মনে ভাবল—খুব তো ভারি হয়ে উঠেছে। তাহলে কি ভগবান এবার জোড়া বাছুর দিলেন? কয়েক মিনিট বাদেই দেখা গেল দুনিয়াকে বুড়ো ধমকাচ্ছে সে ভুষিগুলো ছড়িয়েছে আর জলডুঙ্গিতে বরফ ভেঙে দেয়নি বলে। আক্‌সিনিয়া ওদের ঘরের খড়খড়ি ভেজিয়ে দেবার জন্য বাইরে বেরিয়েছিল। বুড়ো তাকে জিজ্ঞেস করল স্তেপান চলে যাবার কথা ভাবছে কিনা। ওড়নাটা গায়ে জড়িয়ে আক্‌সিনিয়া সুর করে জবাব দিল :

—না, না, যাবে কোথায়? কেমন জ্বর-জ্বর হয়েছে, তাই নিয়ে শুয়ে আছে চুল্লীর ধারে। মাথা দপ্‌দপ্‌ করছে। যা অসুখে পড়েছে, যাবে কেমন করে?

—আমরাও যাচ্ছি না। এতে ভালো হল কি মন্দ হল, সে শয়তানই জানে।

রাত হয়। ডনের ওপারে, ধূসর বাঁকটা ছাড়িয়ে বনের ওধারে আকাশের সবুজাভ গভীরে জেগে আছে ধ্রুবতারা। পুবের আকাশ হয়ে উঠেছে লালচে বেগুনি। পশ্চিমে সূর্যাস্তের আভা। পপ্‌লারের ছড়ানো ডালের ফাঁক দিয়ে উঠে এসেছে চাঁদের ফালি। তুষার স্তূপের গায়ে ছায়াগুলো গভীরতর হয়ে পড়ে। এত নিস্তব্ধ যে পান্তালিমন শুনতে পায় ডনের ধারে কে যেন বরফ ভাঙছে।

ঘরে বাতি জ্বলছিল। আলো আর জানলার মাঝখান দিয়ে চলাফেরা করছে নাতালিয়া। পান্তালিমন উষ্ণতার একটা আকর্ষণ অনুভব করে। দ্যাখে ভেতরে বাড়ির সবাই জড়ো হয়েছে। ক্রিস্তোনিয়ার বউয়ের সঙ্গে দেখা করে এইমাত্র ফিরেছে দুনিয়া। ধার করে আনা খামিরের ভাঁড়ের বাটিটা সে খালি করল। পাছে কেউ বাগড়া দেয় তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেলল শেষ খবরগুলো।

বড়ো ঘরটায় বসে গ্রিগর রাইফেল, রিভলবার আর তলোয়ারে চর্বি ঘষে। ক্যানভাসে দূরবীনটা জড়িয়ে রেখে পিয়োত্রাকে ডাকে।

—নিজের অস্তরগুলো একজায়গায় করে রেখেছ তো? ওগুলো লুকিয়ে রাখতে হবে।

—কিন্তু যদি ধরো নিজেদের বাঁচাবার জন্য ফের ওগুলোর দরকার হয়?

গ্রিগর হেসে ফেলে—চুপচাপ থাকাই বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যদি ওদের হাতে পড়ে ওগুলো, আমাদের সবাইকে পাৎলুন বেঁধে ফটকের ওপর ঝুলিয়ে রাখবে।

উঠোনের মধ্যে আসে সবাই। কী এক দুর্বোধ্য কারণে ওরা যে-যার হাতিয়ার

আলাদা-আলাদা লুকিয়ে রাখে। গ্রিগর কিন্তু ওর নতুন কালো রিভলবারটা গুঁজে রাখল বালিশের তলায়।

রাতের খাওয়া সেরে সবে ওরা বিছানায় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় উঠোনে বেঁধে রাখা কুকুরটা ডেকে উঠল। শেকল টানাটানি করে বগলশে গলা এঁটে খড়মড় করছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্য বাইরে গেল বুড়ো। ফিরে আসার সময় ওর সঙ্গে ঢুকল আরেকজন, ঘোমটা-কোটখানা চোখের উপর অনেকখানি টেনে দিয়েছে লোকটা। পরনে পুরোদস্তুর সামরিক উর্দি। ঢুকবার সময় ক্রুশ প্রণাম করল। বরফ-জড়ানো গোঁফ থেকে ভাপ উঠছে ধোঁয়ার মতো।

লোকটা বললে—আমাকে চিনতে পারছ না তোমরা?

দারিয়া বলে উঠল—ওমা, এ যে আমাদের মাকার ভাই!

এতক্ষণে পিয়োত্রারা সবাই চিনতে পেরেছে ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় মাকার নগাইৎসেভকে। সিন্‌গিন গাঁয়ের কসাক, সারা জেলায় ওর নামডাক আর চমৎকার গানের গলা আর বেলেল্লা মাতলামির জন্য।

জায়গা থেকে না নড়ে পিয়োত্রা শুধু হাসল।—কি মনে করে এখানে?

গোঁফ থেকে একটা বরফের চিল্‌তে খুঁটে নিয়ে দরজার পাশে ছুঁড়ে দিল নগাইৎসেভ। মস্কোর ফেল্‌ট্‌-জুতোওয়ালা পা দুটো দাপিয়ে ধীরে সুস্থে বাইরের পোশাকটা খুলতে লাগল।

—একা একা গাঁ ছেড়ে চলে যেতে ভালো লাগছিল না, তাই ভাবলাম একবার এসে তোমাদের ডাকি। শুনেছিলাম তোমরা দু-ভাইই বাড়িতে আছ। বউকে তাই বললাম, গিয়ে মেলেখভদেরও সঙ্গে ভিড়িয়ে নিই, তাহলে দলবল নিয়ে বেশ ফুর্তি করা যাবে।

রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে চুল্লীর কাছে কাঁটাওয়ালা উনুন-খুঁচুনিগুলোর পাশে রাখতেই মেয়েরা সবাই হেসে উঠল। পুঁটলিটা সে চুল্লীর নিচে চালান করে দিল, কিন্তু তলোয়ার আর চাবুকটা খুব সাবধানে বিছানার ওপর রাখল। নিঃশ্বাসে ওর বরাবরকার মতো ঘরে-চোলাই করা ভদ্‌কার গন্ধ। চোখদুটো মাতালের মতো।

—কসাকরা সবাই সিনগিন ছেড়ে চলে যাচ্ছে নাকি? তামাকের থলিটা বাড়িয়ে ধরে গ্রিগর বললে। অতিথি ওর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

—না ধন্যবাদ। তামাক আমি খাই না। কসাকরা? হ্যাঁ, কেউ কেউ যাচ্ছে, কেউ আবার লুকোবার আস্তানা খুঁজছে। তোমরাও যাচ্ছ তো?

ইলিনিচ্‌না ভয় পেয়ে বললে—আমাদের মরদরা কেউ যাবে না। তুমি ওদের নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না বাছা।

—সে কি! তোমরা পেছনে পড়ে থাকবে? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না। হ্যাঁ ভাই গ্রিগর। সত্যি? তোমরা কিন্তু গোলমাল ডেকে আনছ ভাই।

—যা হবার তা...।—পিয়োত্রা নিঃশ্বাস ফেলে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললে- গ্রিগর? তোর কি মনে হয়? মত বদলাস্‌নি তো? যাবি তাহলে?

—এখন আর নয়।—তামাকের ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী গ্রিগরকে ঘিরে ওর কোঁকড়া-চুলওয়ালা মাথাটার ওপর ঝুলে থাকে।

কিছু ঠিক করতে না পেরে পিয়োত্রা জিজ্ঞেস করল মাকারকে—বাবা তাহলে তোমার ঘোড়াটাকে একটু দেখুক?

একটানা নীরবতা। ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে শুধু দুনিয়ার তাঁত বোনার সঙ্গে সঙ্গে টাকুর ধুপ্‌ধুপ্‌ খট্‌খট্‌ আওয়াজ। ভোর অবধি বসে রইল নগাইৎসেভ। ওর সঙ্গে দনিয়েৎস্‌ নদীর ওপারে যাবার জন্য মেলেখফ-ভাইদের অনেক করে বোঝাতে লাগল। রাতে পিয়োত্রা দুদুবার ছুটে বেরিয়ে এসেছিল ঘোড়ায় জিন চড়াতে, কিন্তু প্রত্যেকবারই দারিয়ার চোখের শাসানিতে আবার ফিরে গিয়ে জিন খুলে নিয়েছে।

ভোর হল। অতিথি তৈরি হতে লাগল যাবার জন্য। পুরো পোশাক পরে সে অর্থপূর্ণভাবে গলা খাঁকারি দিল, তারপর একটা চাপা ধমকানির সুরে বলল :

—হয়তো তোমরা যে রাস্তা ধরেছ সেটা আরো ভালো, কিন্তু পরে তো মন বদলাতেও পারো। তবে যদি কোনোদিন আমরা ফিরে আসি তাহলে ডনে ঢুকবার জন্য যারা লালদের দরজা খুলে দিয়েছে আর তাদের সেবা করতে এখানেই রয়ে গেছে তাদের আমরা দেখে নেব।

* *

একেবারে ভোর থেকেই প্রচণ্ড বরফ পড়ছে। গ্রিগর উঠোনে ঢুকে দেখল ডনের ওপারে অনেক মানুষের একটা কালো ভিড় এগিয়ে আসছে পারঘাটার দিকে। আটটা করে ঘোড়া জুতে নিয়ে কী যেন একটা জিনিস টানা হচ্ছে। কথাবার্তা, ঘোড়ার ডাক আর গালিগালাজ কানে আসছে গ্রিগরের। কুয়াশার মতো তুষারপাতের ভেতর দিয়ে মানুষ আর ঘোড়াগুলোর ধূসর চেহারা নজরে আসে। যেভাবে ঘোড়াগুলোকে জুতে-নেওয়া হয়েছে তাতে গ্রিগরের মনে হল ওটা নিশ্চয় কামানের সারি।-- লালরক্ষী নয় তো?—সে সম্ভাবনার কথা ভেবে গ্রিগরের বুকটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করে ওঠে, কিন্তু তারপরেই আবার কি ভেবে আশ্বস্ত হয় ও।

এলোমেলো ভিড়টা গ্রামের কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু নদীর ঘাটে আসতেই একেবারে সামনের কামানটার একখানা চাকা ভেঙে বরফের মধ্যে বসে গেল। চালকদের চেঁচামেচি, বরফ ভাঙার মড়মড় আওয়াজ আর পিছলে যাওয়া ঘোড়ার খুরের অস্থির দাপাদাপির শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। বাড়ির পেছনে গরুর খাটালের মধ্যে ঢুকে সাবধানে উঁকি দিতে লাগল গ্রিগর। চেহারা দেখেই এখন বোঝা যাচ্ছে ওরা সব কসাক। কয়েক মিনিট বাদে একটা উঁচু চওড়া-পিঠওয়ালা ঘোড়ায় চেপে মেলেখফ-বাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকল একজন বয়স্ক গোলন্দাজ। সিঁড়ির কাছে ঘোড়া থেকে নেমে আলিসার পিলপেয় লাগাম বেঁধে লোকটা বাড়ির ভেতর ঢুকল।

সবাইকে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করল---বাড়ির কর্তা কে?

প্রশ্নটার জন্য উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছিল পান্তালিমন। বললে—আমি। তা আপনার কসাক সেপাইরা ফিরে এলো কেন?

জুলফির ওপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে গোলন্দাজটা অনুরোধ করলে :

—খ্রীষ্টের দোহাই, একবার এসে কামানটা তুলতে সাহায্য করুন। নদীর একেবারে কিনারায় চাকার অর্ধেকটা বসে গেছে। আপনাদের বলদ আছে? এ গাঁয়ের নাম কি? বরফের জন্য পথের নিশানা করতে পারিনি। এদিকে লাল সেপাইরা ফেউয়ের মতো পেছনে লেগে রয়েছে।

বুড়ো ইতস্তত করলে—আমি জানি না...

—কী জানো না? বেশ চমৎকার কসাক তো! আমাদের কিছু লোক চাই একটু সাহায্য করবে।

পান্তালিমন মিথ্যে কথা বলে—আমার শরীর খারাপ।

গোলন্দাজটা ঘাড় না বেঁকিয়ে এর ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল নেকড়ের মতো। গলার আওয়াজটা আগের চেয়েও জোরালো আর তেজী হয়ে উঠেছে :

তোমরা কসাক নও? মিলিটারির সম্পত্তি এভাবে নষ্ট হতে দিতে পারছ? ফৌজের কমান্ডারের জায়গায় আমাকে বসিয়ে দিয়েছে। অফিসাররা সবাই পালিয়েছে, এক হপ্তারও বেশি হল ঘোড়া থেকে একবার নামতে অবধি পারিনি, ঠান্ডায় জমে গিয়েছি, তুষারে জখম হয়ে এক পায়ের ডগা খোয়া গেছে, কিন্তু তবু ফৌজ আমি ছাড়ছি না। আর তোমরা...। যদি না মদদ দাও, আমি কসাকদের ডাকব, তারপর...।—রেগে গিয়েছে লোকটা তবু কান্নাভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল—তোমাদের আমরা,...হতভাগা কুত্তীর বাচ্চাগুলো! বলশেভিক! ওরে বুড়ো, তোর ওপর আমরা লাগাম চড়াব তাই যদি তোর ইচ্ছে হয়। যা, আরো কিছু লোক ডেকে আন্, আর যদি না আসে তো ভগবান সাক্ষী, তোদের গাঁ আমি উড়িয়ে ছাতু করে দেব!...

নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি আস্থা না থাকলে যেভাবে লোকে কথা বলে ওর বলার ধরনও তেমনি। লোকটার জন্য দুঃখ হতে লাগল গ্রিগরের। গোলন্দাজের তলোয়ারটা চেপে ধরে, তার উত্তেজিত মুখটার দিকে না তাকিয়েই কড়া গলায় বললে :

—মেলা চেঁচিও না! তোমাদের আমরা সাহায্য করব, তারপর চুপচাপ নিজের রাস্তা ধরে চলে যেও।

তখুনি একদল লোক জুটে গেল যারা সাহায্য করতে রাজি। গোলন্দাজ ফৌজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আনিকুশ্কা, তমিলিন, ক্রিস্তোনিয়, মেলেখভরা সবাই এবং আরো দশবারোজন মেয়ে ছিটে-বেড়া পেতে ফিল্ড্-কামান আর গোলাবারুদের বাক্সগুলো টেনে তুলল। ঘোড়াগুলোকে আবার চলার সুবিধে করে দিল ওরা। ঠান্ডায় জমে-যাওয়া চাকাগুলো কিছুতেই ঘুরতে চায় না, কেবলি পিছলে যায় বরফের ওপর। হয়রাণ ঘোড়াগুলো সামান্য ওঠার চেষ্টা করতেও হাঁপিয়ে ওঠে। সওয়ারদের মাথা প্রায় খারাপ হবার যোগাড়, ওরা হেঁটেই চলে। গোলন্দাজ-সেপাইটা টুপি খুলে মাথা নুইয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানায়। তারপর জিনের ওপর ঘুরে বসে নিচু গলায় ফৌজকে হুকুম দেয় ওর পেছন পেছন চলার জন্য।

শ্রদ্ধা আর বিস্ময়-মিশ্রিত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে গ্রিগর তাকিয়ে থাকে লোকটার দিকে। পিয়োত্রা এগিয়ে আসে। গ্রিগরের অব্যক্ত চিন্তাটারই যেন একটা জবাব দিয়ে ও গোঁফের ডগা কামড়াতে কামড়াতে মন্তব্য করে :

সবাই যদি এর মতো হতে পারত! দেশের মাটিকে কীভাবে বাঁচাতে হয় তাই দেখিয়ে দিল!

ক্রিস্তোনিয়া বললে—ওই গোলন্দাজটার কথা বলছ? দ্যাখো না কামানগুলোকে কেমন করে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তো হাতই লাগাতে চাইনি। তবে কেমন ভয় হল। কিন্তু ওই হাঁদাটার কাছে কামানগুলোর কী দাম আছে বল! ঠিক গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা একটা পাগলা শুয়োরের মতো। গুঁড়িটা ভারি, ওর কাছে সেটার দামও নেই, অথচ তবু টেনে নিয়ে চলেছে!

নীরব হেসে কসাকরা যে যার পথে পা বাড়ায়।

* * *

ডন পেরিয়ে অনেকটা দূরে। রাতের খাওয়ার সময় উত্রে গেছে অনেকক্ষণ। একটা মেশিনগানে দু'বার চাপা কটকট আওয়াজ ওঠল। তারপর সব নিশ্চুপ।

আধঘণ্টা বাদে বেরিয়ে এল গ্রিগর। সারাদিন শোবার ঘরের জানলার কাছে কাটিয়েছে। মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর।

বলল—এই এসে পড়ল!

ইলিনিচ্না বিকৃত গলায় একটা আওয়াজ করে জানলার দিকে ছুটে গেল। রাস্তা দিয়ে আসছে আটজন ঘোড়সওয়ার। মেলেখভ-বাড়ির উঠোনের কাছে এসে ডনের পার-ঘাটার দিকে একবার চেয়ে দেখল, তারপর পেছন ফিরে চলে গেল। দানা-পানিখাওয়া হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াগুলো বেঁড়ে লেজ নাড়ছে, খুর ঘষে ঘষে বরফের দলা ছিটোচ্ছে।

শত্রুফৌজ আসার এই প্রথম মুহূর্তটা ভয়ানক হলে কি হয়, হাসিখুশি দুনিয়া তবু নিজেকে সামলাতে পারছে না। টহলদার ঘোড়সওয়ার দলটা ঘুরে চলে যেতেই সে ফ্যাক্ করে হেসে আঁচলে মুখ গুঁজল। ছুটে পালাল রান্নাঘরে। নাতালিয়া ভয় পেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

—কি হল রে, অ্যাঁ?

—উঃ নাতালিয়া...গেলুম...কেমন করে ঘোড়া চালায় ওরা দেখেছ! একজন তো জিনের ওপর বসে একবার সামনে, একবার পেছনে, একবার সামনে, একবার পেছনে এমনি এমনি করে দুলছিল...আর হাত আর কনুই-জোড়া খটাখট্ লাগছিল দু'পাশে।

লালফৌজের সেপাইদের জিনের ওপর দুলুনি-খাওয়াটা এমন চমৎকার নকল করে দুনিয়া যে কোনোরকমে হাসি চেপে নাতালিয়া ছুটে যায় বিছানায়। বালিশের ওপর উপুড় হয়ে মুখ লুকিয়ে থাকে যাতে শাশুড়ি আবার দেখে চটে না যায়। দারিয়ার ভুরু দুটো কেঁপে ওঠে চাপা হাসির দমকে। হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলতে থাকে:

—ওরা বোধহয় ঘষে ঘষে পাৎলুনই খয়ে ফেলবে রে। বলে কিনা ঘোড়সওয়ার, ছ্যাঃ...'

মুখ কালো করে বড়োঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল পিয়োত্রা। ওদের ফুর্তি দেখে সে নিজেও মুহূর্তের জন্য খুশি হয়ে উঠল।

বলল—ওদের ঘোড়ায় চড়া দেখতে সত্যিই অদ্ভুত লাগে। কিন্তু তাতে ওদের কোনো ভাবনা নেই। একটা ঘোড়ার শিরদাঁড়া যদি ভেঙে যায় তো আরেকটা জোগাড় করে নেবে! যতো সব চাষা!—দারুণ অবজ্ঞার ভঙ্গিতে হাতটা নাড়ল পিয়োত্রা।

এক ঘণ্টা বাদে পায়ের শব্দ, অপরিচিত ভাষা আর কুকুরের ডাকে ভরে উঠল তাতারস্ক্। স্লেজের ওপর বসানো মেশিনগান, রসদগাড়ি, আর ফৌজী রসুইখানার সরঞ্জাম নিয়ে একটা পদাতিক দল ডন পেরিয়ে গ্রামে এসে ঢুকেছে। সেপাইরা সব দলে দলে রাস্তায় বেরিয়েছে, একেকটা ভাগ হয়ে বাড়ি বাড়ি ঢুকছে। পাঁচজন এলো মেলেখফ-বাড়ির ফটকে। ওদের সর্দার একজন গাঁটাগোট্টা, বয়স্ক ধরনের দাড়িগোঁফ-কামানো সেপাই, নাকের ফুটো চ্যাপ্টা, বড়ো বড়ো। লোকটা নিশ্চয় ঘাঘু জঙ্গী সেপাই। সিঁড়ির কাছে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, দেখল কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করছে, শেকলের টানে গলা বুজে যাবার জোগাড়। রাইফেলটা সে কাঁধ থেকে নামাল। বাড়ির ছাদের ওপর থেকে বরফের একটা সাদা বাষ্প ছিটকে উঠল গুলির আঘাতে। গ্রিগর শার্টের

আঁটসাট কলারটা ঠিক করতে করতে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলে বরফমাখা রক্তের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে কুকুরটা, মৃত্যুযন্ত্রণায় দেহের জখম জায়গা আর লোহার শেকলটা কামড়াচ্ছে। বাড়ির মেয়েদের ফ্যাকাশে মুখগুলো, আর মায়ের শূন্য চোখদুটোর ওপর নজর পড়ে ওর। খালি মাথায় লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় সিঁড়ির চাঁদনির দিকে।

অদ্ভুত গলার স্বর করে পেছন থেকে ওর বাপ ডাকলে—থাম্!

সামনের দরজাটা খুলে দিল গ্রিগর। দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ চাইলে—কুকুরটাকে মেরেছ কেন? ও তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করেনি!

লালফৌজের লোকটা নাকের বড়ো বড়ো ফুটো দিয়ে সজোরে নিঃশ্বাস টেনে পাতলা ঠোঁটের কোণাদুটো কোঁচকালো। চারদিকে চোখ বুলিয়ে বাগিয়ে ধরল রাইফেল।

—তা দিয়ে তোমার দরকার? ভেবেছ দয়া দেখাতে এসেছি? তোমার গতরে বুলেট ফুঁড়ে দিতে একটুও দঃখ হবে না আমার। দেব নাকি বলো?

ঢ্যাঙা লাল-চুলো একজন লালরক্ষী এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললে—ব্যস্ ব্যস্, এখন রাখো আলেক্সান্দর। নমস্কার কর্তা! আগে কখনো লালদের দ্যাখেননি? আমাদের একটু আস্তানা চাই। ও বুঝি আপনার কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে? কোনো প্রয়োজন ছিল না! কমরেডরা, তোমরা তাহলে ভেতরে যাও!

বাড়ির ভেতর একেবারে শেষে ঢুকল গ্রিগর। দেখল লালফৌজের সেপাইরা বাড়ির বাসিন্দাদের খুব ফুর্তির সঙ্গে নমস্কার জানাচ্ছে। বোঝাগুলো নামিয়ে জাপানী চামড়ার কার্তুজ বেল্‌ট্ খুলছে। জোব্বাকোট, আস্তর-দেওয়া কোট আর টুপিগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে বিছানার ওপর। রান্নাঘরটা দেখতে দেখতে সেপাইদের গায়ের মদো গন্ধে, ঘাম, তামাক, শস্তা সাবান, বন্দুকের চর্বি আর দীর্ঘ পথচলার কটু গন্ধে ভরে গেল।

আলেক্সান্দর নামের সেই লোকটা টেবিলের পাশে বসেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে যেন আগেরই কোনও আলোচনার জের টেনে চলেছে এমনি সুরে গ্রিগরকে প্রশ্ন করে:

—শ্বেতরক্ষীদের দলে ছিলে?

—হ্যাঁ।

—তাই বল! ডানার ঝাপ্‌টা শুনেই প্যাঁচার জাত বলে দিতে পারি, তোমাকে তো শিকনি দেখেই চিনে ফেলেছি। শ্বেতরক্ষী! অফিসার ছিলে নিশ্চয়ই? সোনার চাপরাশ ছিল তো?—নাকের দু' ফুটো দিয়ে দুটো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের করে দেয় লোকটা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল গ্রিগর। হাসিহীন কঠিন চোখদুটো তার দিকে ফিরিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ে তামাকের দাগ-ধরা ফুলো ফুলো আঙুল দিয়ে।

—তুমি তো অফিসারই ছিলে, তাই না? স্বীকার করো! তোমার ধরনধারণ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। আমি নিজেও জার্মান যুদ্ধে ছিলাম।

জোর করে হাসে গ্রিগর—হ্যাঁ অফিসারই ছিলাম বটে। ভয়ার্ত আবেদনভরা চোখে নাতালিয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে কপাল কোঁচকায় ও, ভুরুদুটো কেঁপে ওঠে নিজের হাসিতে ও নিজেই বিরক্ত হয়েছে।

—দুঃখের কথা! কুকুরটাকে গুলি না করলেই বোধহয় ভালো হত মনে হচ্ছে —গ্রিগরের পায়ের কাছে সিগারেটের শেষটুকু ফেলে দিয়ে লোকটা নিজের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার গ্রিগরের ঠোঁটদুটো কুঁচকে উঠল একটা ক্ষুব্ধ, সানন্দ

হাসিতে। নিজের দুর্বলতার এই অনিচ্ছাকৃত, অদম্য অভিব্যক্তিতে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ও। মনিবের সামনে বাধ্য পোষা কুকুরটির মতো!— চিন্তাটা ওর মনের ভেতর যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয়, মুহূর্তের জন্য ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে মরা কুকুরটার সেই কুকড়ে-ওঠা ঠোঁটদুটো—যখন তার মনিব গ্রিগর এগিয়ে গেল তার দিকে আর চিৎ হয়ে সে লোমশ-লাল লেজটা নাড়তে লাগল।

পান্তলিমন সেই একই রকম অস্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করে--বোধহয় রাতে আপনাদের কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে?

জবাবের অপেক্ষা না করে ইলিনিচ্‌না উনোনের দিকে এগিয়ে যায়। উনোন-খুন্তিটা ওর হাতের মধ্যে কেঁপে ওঠে। কপির ঝোলের পাত্রটা অতি কষ্টে তোলে সে। চোখদুটো নামিয়ে টেবিল সাজায় দারিয়া। লালফৌজের সেপাইরা খেতে বসে, কিন্তু ক্রুশ প্রণাম করে না। বুড়ো পান্তালিমন ভয়ে-ভয়ে একটা চাপা ঘৃণার সঙ্গে ওদের লক্ষ্য করছিল। শেষ পর্যন্ত সে আর চুপ থাকতে পারল না। জিজ্ঞেস করে বসল:

—তাহলে তোমরা ঈশ্বরের নাম নাও না?

আলেক্‌সান্দরের ঠোঁটে একটা অতি ক্ষীণ হাসির মতো রেখা ফুটে উঠল। অন্যদের সশব্দ হাসির মধ্যে সে জবাব দিল:

—বুড়ো কত্তা, তোমাকে আমি কোনোটাই করতে বলি না! আমাদের ঈশ্বরদের তো আমরা অনেককাল হল শয়তানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।—ভ্রূকুটি করল সে--ঈশ্বর বলে কিছু নেই, কিন্তু বোকারা তা বিশ্বাস করে না, এই কাঠের টুকরোগুলোকেই চোখ বুজে পুজো করে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ...তা অবিশ্যি শিক্ষিত বিদ্বান লোকেরা..।—পান্তালিমন উৎকণ্ঠাভরে তাড়াতাড়ি সায় দেয়।

প্রত্যেকের জন্য একটা করে চামচে দিয়েছিল দারিয়া, কিন্তু আলেক্‌সান্দর তারটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

—কাঠের ছাড়া আর কোনো কিছুর চামচে তোমাদের নেই? আমরা ব্যারাম বাধাতে চাই না। এটাকে কি তোমরা চামচ বলো?

দারিয়া চটে গেল। বলে উঠল--আমাদেরটা যদি পছন্দ না হয় তো নিজেদেরটা সঙ্গে করে আনলেই হত!

—তুমি মুখ বুজে থাকো তো! আর অন্য চামচ তোমাদের নেই? তাহলে একটা পরিষ্কার তোয়ালে দাও, এটা মুছে ফেলি।

ইলিনিচ্‌না একটা গামলায় করে ঝোল আনল টেবিলে। লোকটা তাকে বলল:

—তুমিই একটু চেখে দাও না প্রথমে!

—আমি কেন চাখতে যাব? নুনে পুড়ে গিয়েছে নাকি?—বুড়ি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে।

—যখন বলা হয়েছে চাখতে, চাখো। চাখোই না! হয়তো বা তোমাদের অতিথিদের জন্য কোনো গুঁড়া-টুড়ো কি অন্য কিছু দিয়েছ এতে...।

—নাও না, এক চামচে চেখেই দ্যাখো! —কড়া গলায় হুকুম দিয়ে পান্তালিমন ঠোঁট কামড়াল। তারপর জুতো সারবার সময় অ্যালডার কাঠের যে গুঁড়িটাকে সে পিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করত সেটাকে ঠেলে নিয়ে গেল জানলার নিচে, একখানা পুরনো বুট হাতে নিয়ে সেটার ওপর বসল। কথাবার্তায় আর যোগ দিল না সে।

বড়ো ঘরটাতেই রয়ে গিয়েছে পিয়োত্রা, আর মুখ দেখায়নি। নাতালিয়াও সেখানে গিয়ে বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে বসল। দুনিয়া উনোনের পাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে একটা মোজা বুনছিল, কিন্তু লালফৌজের একজন সেপাই যখন ওকে 'ভদ্রমহিলা' বলে সম্বোধন করে ওদের সঙ্গে বসে খেতে বলল তখন সেও সরে পড়ল। কথাবার্তা আর চলল না। খাওয়াদাওয়ার পর অতিথিরা ধরাল সিগারেট।

একজন বললে—ধূমপান করতে পারি?

গ্রিগরকে সিগারেট দিতে চাইল কিন্তু নিল না গ্রিগর। ভেতরে-ভেতরে ও কাঁপছিল: কুকুরটাকে মেরেছিল যে লোকটা তার দিকে তাকিয়ে ওর হৃৎপিণ্ড কঠিন হয়ে ওঠে। একটা বে-পরোয়া মারমুখো ভাব আসে লোকটার সম্পর্কে। লোকটা যে গোলমাল বাধাবার তাল খুঁজছে তাতে সন্দেহ নেই, হরদমই চেষ্টা করছে গ্রিগরকে কথাবার্তার মধ্যে টানতে।

—তা আপনি মশাই কোন্ রেজিমেণ্টে কাজ করতেন?

—অনেক রেজিমেণ্টে।

—আমাদের দলের কতো লোককে আপনি মেরেছেন?

—যুদ্ধের সময় গোনা মুশকিল। আপনি তাই বলে ভাববেন না কমরেড যে আমি অফিসার হয়েই জন্মেছিলাম। জার্মান যুদ্ধের সময় গায়ে খেটে কমিশন লাভ করেছি। লড়াইয়ের সময় আমার কাজকর্মে খুশি হয়ে ওরা দিয়েছিল...

—কোনো অফিসারের আমি 'কমরেড' নই। তোমার মতো লোকদের আমরা দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারি। আমি নিজেই অনেকগুলোকে তাক করেছি।

—কমরেড, আমি যা বলছি তা এই। আপনার ব্যবহারে বিশেষ ভদ্রতা প্রকাশ পাচ্ছে না, এমন ভাব করছেন যেন আপনারা গ্রামটাকে জোর করে দখল করেছেন। আমরা নিজেরাই ফ্রণ্ট ছেড়ে পালিয়ে এসে আপনাদের ঢোকবার পথ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা এমনভাবে এলেন যেন একটা হেরে-যাওয়া দেশে ঢুকেছেন. একটা কুকুরকে তো যে-কেউই মারতে পারে, আর নিরস্ত্র লোককে খুন করা কিংবা তাদের অপমান করাও কিছু বুদ্ধির কাজ নয়. .।

—আমাকে কি করতে হবে সে কথা তোমার বলার দরকার নেই! আমরা তোমাদের চিনি! 'ফ্রণ্ট ছেড়ে পালিয়ে এসেছি!'—হুঁ! না হেরে গেলে আর পালিয়ে আসতে না। আমার যা খুশি তাই তোমাকে বলব!

লাল চুলওয়ালা লোকটি বললে—চুপ করো তো, আলেক্সান্দর! তোমার বকবকানি আমরা অনেক শুনেছি!

কিন্তু আলেকসান্দর সোজা এগিয়ে গেল গ্রিগরের সামনে। নাকের ফুটো বড়ো বড়ো করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

—আমায় তুমি চটিয়ে দিও না অফিসার, তাহলে তোমার খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু!

—আমি তোমাকে চটাচ্ছি না!

—হ্যাঁ, চটাচ্ছ, আলবৎ!

সামনের ঘরের দরজাটা সামান্য ফাঁক করে নাতালিয়া গ্রিগরকে ডাকলে। সামনে দাঁড়ানো লোকটার পাশ দিয়ে ঘুরে এগিয়ে গেল গ্রিগর। দরজার ওপর দাঁড়িয়ে মাতালের মতো টলতে লাগল। পিয়োত্রা ওকে ভেতরে ডেকে নিয়ে করুণ বিকৃত গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল :

—কী, খেলা পেয়েছিস্ হ্যাঁ? কেন মুখে মুখে জবাব দিতে গেলি? তুই

নিজেদের সর্বনাশ করবি, সেইসঙ্গে আমাদেরও! বোস্ দিকি!—গ্রিগরকে একটা বাক্সের ওপর জোর করে ঠেলে বসিয়ে দিল পিয়োত্রা, তারপর চলে গেল রান্নাঘরে। গ্রিগর বসে বসে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল মুখ ভরে; ওর গাল আর চোখ দুটো লাল হয়ে সামান্য চিক্‌চিক্ করে উঠেছে।

নাতালিয়া আকুল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল—ওগো! আমার মাথা খাও! ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে যেয়ো না তুমি!—ছেলেপিলেগুলো প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল আর কি, ওদের মুখের ওপর হাত চেপে ধরল নাতালিয়া।

—তখনই কেন যে বেরিয়ে গেলাম না!—করুণ চোখে নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে গ্রিগর বললে—তুমি ভেবো না, আমি ঝগড়ার মধ্যে যাব না। কিন্তু মুখ বুজে থাকো! আমি আর সইতে পারছি না!

একটু বাদে আসে আরো তিনজন লালফৌজের সেপাই। একজন উঁচু কালো ফারের টুপি পরা। কমাণ্ডারই হবে। জিজ্ঞেস করে ঃ

—তোমরা ক'জন এখানে আস্তানা নিয়েছ?

—সাতজন।—সকলের হয়ে জবাব দিলে লাল চুলওয়ালা।

—এখানে একটা মেশিনগানের ঘাঁটি বসাচ্ছি। ওদের জন্য জায়গা করে দাও।

বেরিয়ে যায় তিনজন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফটফটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে ওঠে। উঠোনে ঢোকে দুটো গাড়ি। একটা মেশিনগান টেনে আনা হয় সিঁড়িমুখের চাঁদনিতে। কে একজন দেশলাই ঠুকে অন্ধকারের মধ্যেই গালিগালাজ করে। চালার নিচে মেশিনগান-ওয়ালারা সিগারেট খায়। টেনে খড়গুলো নামিয়ে ফসল মাড়াইয়ের মেঝেয় আগুন জ্বালায়। কিন্তু বাড়ির বাসিন্দা কেউ যায় না ওদের কাছে।

পান্তালিমনের পাশ দিয়ে যাবার সময় ইলিনিচ্‌না ফিস্‌ফিস করে বলল—একজন কেউ গিয়ে ঘোড়াগুলোকে দেখে এলে পারত। কিন্তু পান্তালিমন খালি কাঁধটা ঝাঁকল, নড়বার কোনো চেষ্টাই দেখাল না সে। সারারাত দরজাগুলো দুম্‌দাম করতে লাগল। সামনের ঘরের মেঝেতে বিছানা করেছে লাল সেপাইরা। গ্রিগর ওদের জন্য কম্বল এনে বিছিয়ে দিয়েছে, নিজের ভেড়ার চামড়ার কোটটা দিয়ে ওদের বালিশ বানিয়েছে।

আমি নিজেও ফৌজে ছিলাম তো, তাই এসব আমার জানা আছে। —যে লোকটা ওকে শত্রু বলে ধরে নিয়েছিল তাকেই ঠাণ্ডা করবার জন্য হেসে হেসে বলল গ্রিগর। কিন্তু আলেকসান্দ্‌রের চওড়া নাকের ফুটোগুলো আরো ফুলে উঠল, ওর চোখ দুটো গ্রিগরকে লক্ষ্য করতে লাগল কোনো আপস না করে।

সেই ঘরে বিছানা করে শুয়েছে গ্রিগর আর নাতালিয়া। মাথার কাছে রাইফেল রেখে কম্বলের ওপর গুটিশুটি হয়ে শুলো লালফৌজের সেপাইরা। নাতালিয়া যেই বাতিটা নিবিয়ে দিতে গেছে, অমনি ধমক দিয়ে বলে উঠল ওরা ঃ

—বাতি নেবাতে কে বলল তোমাকে? খবরদার ছুঁয়ো না! সল্‌তেটা নামিয়ে দাও, আলো সারারাত জ্বলবে।

নাতালিয়া বাচ্চাদের শুইয়ে দিয়েছে পায়ের কাছে। কাপড় না ছেড়েই দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। গ্রিগর নিঃশব্দে ওর পাশে লম্বা হয়ে গা এলিয়ে দিল।

দাঁতে দাঁত চেপে ও ভাবতে লাগল—যদি চলে যেতাম, যদি গাঁ ছেড়ে সরে পড়তাম, তাহলে তো এরা এই বিছানার ওপরেই এতক্ষণে নাতালিয়াকে চিৎ করে ফেলে মজা লুটে নিত। যেমন ফ্রানিয়া বেলায় ওরা করেছিল পোলাণ্ডে।

লাল সেপাইদের একজন একটা গল্প বলতে শ্বর্ করে। কিন্তু আধা-অন্ধকারের মধ্যে আরেকটা পরিচিত গলা ওর কাথয় মাঝখানে বেপরোয়া বাগড়া দিতে থাকে ঃ

—আঃ, মেয়েমান্ষ না থাকলে জীবনটাই বৃথা! কিন্তু আমাদের কর্তা তো আবার অফিসার কিনা! উনি আমাদের মতো চুনোপ্টি ইল্লতেদের কি আর বউয়ের ভাগ দেবেন। শ্নেছ হে কত্তা?

কথার মাঝখানে শোনা যায় লাল-চুলো লোকটার ধমক :

—আলেকসান্দর, অনেকবার তোমাকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। যে বাড়িতেই ওঠা যায় সেখানেই এক ব্যাপার। গ্ন্ডার মতো একটা কিছ্ হৈ-চৈ বাধাবেই, লাল-ফৌজের বদনাম করে ছাড়বে। এ কিন্তু মোটেই ভালো হচ্ছে না! আমি সোজা চললাম কমিশারের কাছে, নয়তো কোম্পানি কমান্ডারের কাছে। শ্নতে পেয়েছে? তোমাকে যা বলবার তিনিই বলবেন!

সবাই নিথর নিশ্চুপ। ,শ্ধ্ শোনা যাচ্ছে লাল-চুলো সেপাইটির ব্ট পরার শব্দ, রাগে ফোঁস ফোঁস করছে লোকটা। মিনিট দ্য়েকবাদে সে সশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেল।

নাতালিয়া আর সামলাতে পারে না, ডুকরে কেঁদে ওঠে। গ্রিগর এক হাতে ওর মাথা, ঘামে ভেজা কপাল আর ভিজে ম্খটা ব্লোয়। হাতটা ওর কাঁপছে। অন্য হাতটা যন্ত্রের মতো ওর ব্লাউসের বোতাম খোলে আর আঁটে।

প্রায় শোনাই যায় না এমনিভাবে ফিসফিস করে নাতালিয়াকে বলে গ্রিগর—চুপ আস্তে!—ঠিক এই ম্হ্র্তটাতেই ও নিঃসন্দেহে জেনে গেছে যে নিজের কিংবা প্রিয়জনদের জীবন বাঁচাবার জন্য যে কোনো পরীক্ষা, যে কোনো অপমান ও সহ্য করতে প্রস্তুত।

দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বলে উঠল। দেখা গেল আলেকসান্দরকে। বসে বসে সিগারেট টানছে। নিচু গলায় বিড়বিড় করছে আর পোশাক আঁটছে।

গ্রিগর অধীর হয়ে কান পেতে ছিল। লাল-চুলো লোকটার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় ওর মন ভরে উঠেছে। বাইরে জানলার নিচে পায়ের শব্দ শ্নে আনন্দে নেচে ওঠে ও একটা ক্রুদ্ধকণ্ঠ শোনা যায়—সব সময় আছে খালি গোলমাল বাধাবার চেষ্টায়...ব্ঝলে কমরেড কমিশার।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। দরজাটা ক্যাঁচ্ করে খ্লে যায়। কে যেন তারণে ব্যঞ্জক হ্কুমের স্রে ধমক দেয় :

—আলেকসান্দর তিউরনিকফ, পোশাক পরে এক্ষ্নি বেরিয়ে এসো। রাতটা তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। সকালে তোমার বিচার হবে লালফৌজের সৈনিকের অন্পয্ক্ত ব্যবহার দেখিয়েছ বলে।

লাল-চুলো সেপাইয়ের পাশে দাঁড়ানো কালো চামড়ার কোর্তা পরা লোকটির কঠোর দৃষ্টির সঙ্গে চোখ মেলে গ্রিগরের। বোঝাই যায় লোকটির বয়েস কম, কড়া মেজাজটা কম বয়েসেরই। অনাবশ্যক দ্ঢ়তার সঙ্গে ঠোঁটদ্টো চেপে রয়েছে। সামান্য একটু হেসে গ্রিগরকে বললে—তাহলে কমরেড, আপনার দেখছি ঝামেলাবাজ এক অতিথি জ্টেছিল এবার তাহলে নিশ্চিন্তে ঘ্মোতে পারবেন: কাল আমরা ওকে ঠান্ডা করে দেব। আচ্ছা চলো হে তিউরনিকফ!

ওরা বেরিয়ে গেল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রিগর। পরদিন সকালে লাল-চুলো লোকটার রাতের থাকা আর খোরাকির খরচা দেবার সময় ইচ্ছে করেই এক দাঁড়িয়ে গেল। বললে :

—তাহলে কর্তারা যেন আমাদের ওপর রাগ করবেন না। আমাদের ওই আলেক-সান্দরটার মাথায় একটু ছিট্ আছে। গত বছর লুগান্স্কে (লুগান্স্কেরই বাসিন্দা ও) কয়েকজন অফিসার ওর চোখের সামনেই ওর মাকে বোনকে গুলি করে মেরেছিল। সেইজন্যই অমনধারা হয়ে গেছে। আচ্ছা আসি তবে, ধন্যবাদ। ওহো, বাচ্চাগুলোর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম আরেকটু হলে!—পুলিন্দা থেকে দুটো নোংরা কাল্‌চেপানা মিছরির দলা বের করে দুটি যমজ খোকার হাতে গুঁজে দিতে ওরা তো ভীষণ খুশি হয়ে উঠল।

পান্তালিমন নাতিদের দিকে চেয়ে আবেগভরে বলে ওঠে :

—ওই নে রে দাদু, তোদের দিয়েছে! প্রায় আঠারো মাস হল আমরা তো চিনির মুখই দেখিনি। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন্ কমরেড! খুড়োকে পেন্নাম কর্ বাছারা। ওরে পলিয়া, ধন্যবাদ জানা! হাবার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

লালফৌজের সেপাই বেরিয়ে গেল। বুড়ো ঘরে দাঁড়িয়েই ধমকাল নাতালিয়াকে :

—কী! আদবকেতা সব ভুলে গেছ? রাস্তায় খাবার মতো একটা সুজীর পিঠেও তো দিতে পারতে ওকে? ভালো মানুষটাকে আমাদের যা হোক কিছু অন্তত দেয়া তো উচিত ছিল।

গ্রিগর হুকুম দিলে—ছুটে গিয়ে ধরো এখুনি!

মাথায় রুমাল বেঁধে নাতালিয়া ছুটল। বেতের বেড়ার কাছে এসেই ধরে ফেলল লোকটাকে। কী করবে বুঝতে না পেরে লাল হয়ে উঠে ওর জোব্বাকোটটার মস্ত পকেটের মধ্যে চালান করে দিল একটা সুজীর পিঠে।

* * * *

ভর-দুপুরে লাল ঘোড়াসওয়ার ফৌজের একটা রেজিমেণ্ট গ্রামের ভেতর দিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মার্চ করে গেল. যাবার পথে কয়েকজন কসাকের ফৌজী ঘোড়া দখল করে নিল। পাহাড়ের ওপাশে অনেক দূর থেকে আসছে কামানের আওয়াজ।

সন্ধ্যে হয়ে আসতে বারে বারে উঠোনে যাওয়া আসা শুরু করল গ্রিগর আর পিয়োত্রা। কিন্তু কামানের গর্জন আর ডনের ওপার থেকে মেশিনগানের মৃদু কট্‌কট্ আওয়াজ ওদের কানে আসছে।

—ওদিকে তো জোর লড়ছে ওরা!—হাঁটু আর ফার টুপির ওপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে পিয়োত্রা মন্তব্য করে। তারপর কিছু না ভেবে এমনিই যেন যোগ করে দেয় :

—আমাদের ঘোড়াগুলো ওরা নেবে। তোমার ঘোড়াটা যে ফৌজী ঘোড়া তা ওরা দেখেই চিনতে পারবে। নিয়ে নেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বুড়ো কিন্তু আগেই সেটা বুঝেছিল। রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিগর গেল ঘোড়া দুটোকে বের করতে। নদীতে নিয়ে জল খাওয়াবে। আস্তাবল থেকে বাইরে নিয়ে আসতেই গ্রিগরের নজরে পড়ল দুটোই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। সামনের পাগুলো নেংচা। ভাইকে ডেকে আনতে গেল ও।

—ঘোড়াদুটো তো খোঁড়াচ্ছে। তোমারটার ডানদিকের সামনের পা, আমারটার বাঁদিকে। অথচ কোথাও কিছু জখমের চিহ্ন নেই।

ঘোড়াদুটো দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যের আবছা তারার আলোয়, ছায়াঢাকা বরফের ওপর, একটু নড়ছে না। পিয়োত্রা একটা লণ্ঠন জ্বালায়। কিন্তু ওর বাপ ফসল মাড়াইয়ের আঙিনা থেকে বেরিয়ে এসে ওকে বাধা দেয় :

—বাতি আবার কিসের জন্য?

—ঘোড়াগুলো খোঁড়া হয়ে গেছে বাবা।

—হ্যাঁ, হয়েছে তো খুব কষ্ট হচ্ছে? কেন, চাষীবেটাদের কেউ এসে যদি জিন চাপিয়ে নিয়ে যেত তাহলে বড়ো ভালো হত, নাকি?

—তাহলে খারাপ হয়নি বলছ?

—আমিই করেছি খোঁড়া। হাতুড়ি দিয়ে ওদের পায়ের গিঁটের নিচে একেকটা গজাল ঠুকে দিয়েছি। যতোদিন না লাল সেপাইগুলো চলে যায় ততোদিন ল্যাংচাবে।

পিয়োত্রা মাথা নেড়ে গোঁফের ডগা কামড়ায়। কিন্তু বুড়োর ওষুধে সত্যিই ঘোড়াগুলো বেঁচেছে। সে রাতে আবার গায়ে সেপাইদের হৈ হল্লা। ঘোড়সওয়ার ফৌজ রাস্তা দিয়ে কদম চালে ছোটে, কামানগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় স্কোয়ারে সারি দিয়ে সাজাবার জন্য। ক্রিস্তোনিয়া মেলেখফদের বাড়ি এসে আসন পিঁড়ি হয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বসল।

বলল—তোমাদের এখানে কেউ আস্তানা নেয়নি?

—ভগবান তো এখন অবধি রক্ষে করছেন। কয়েকজন এসেছিল। ওদের চাষাড়ে দুর্গন্ধে ঘর ম-ম করছিল যেন। ওই জন্যই বোধহয় তো বলি 'ভোম্‌রা গন্ধ রুশ! ও নাম ওদেরই যুগ্যি।—ইলিনিচ্‌না বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে।

—ওরা আমার বাড়িতেও এসেছিল।—ক্রিস্তোনিয়ার গলা বুজে আসে, প্রকাণ্ড হাত দিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল মোছে। কিন্তু তারপরেই মাথাটা নেড়ে গুঙিয়ে ওঠে, কান্নার জন্য লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হয়।

পিয়োত্রা জীবনে এই প্রথম ক্রিস্তোনিয়ার চোখে জল দেখছে। হাসতে হাসতে বলল—কী ব্যাপার হে ক্রিস্তোনিয়া?

—ওরা আমার ঘোড়াটা নিয়ে নিয়েছে...ওর পিঠে চেপে আমি জার্মান যুদ্ধে গিয়েছিলাম। একসঙ্গে কতো কষ্ট সয়েছি। ঠিক মানুষের মতো ছিল, মানুষের চেয়েও বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল বেশি। নিজে নিজেই জিন আঁটত। আমি বলতাম 'জিন চাপা!'—কিন্তু ও গেরাহ্যিই করত না। আমি বলতাম, 'কীরে, সারা জীবন তোর পিঠে জিন চাপিয়েই আমার কাটবে? নিজে নিজেই চাপা'। তখন ও পিঠের ওপর জিনটা চাপিয়ে নিত...। —বলতে বলতে ওর গলাটা ফ্যাঁসফেঁসে সরু শিসের মতো হয়ে ওঠে : এখন তো আস্তাবলের ভেতরটা আমার তাকাতেই গা ছম্‌ছম্‌ করে। উঠোনটা যেন মরার উঠোন।

গ্রিগর কান খাড়া করে। জানলার বাইরে বরফের চুড়মুড় আওয়াজ, ঠুং করে তলোয়ারের শব্দ।

—আমাদের এখানেই আসছে। হয়তো কেউ বলে দিয়েছে...।—হাতদুটো কচলাতে থাকে পান্তালিমন, ও দুটো নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না।

—কর্তা আছো নাকি। একবার বাইরে এসো!—চিৎকার ওঠে একটা।

পিয়োত্রা ভেড়ার-চামড়ার কোটখানা কাঁধে চাপিয়ে বেরিয়ে যায়।

তিনজন ঘোড়সওয়ার। ওদের সর্দার হুকুম করে—কোথায় তোমাদের ঘোড়া? নিয়ে এসো!

—আমাদের আপত্তি নেই কমরেড, কিন্তু ওরা যে খোঁড়া।

—দেখি কোথায় খোঁড়া, নিয়ে এসো তো! ভয় নেই, খোঁড়া হলে আমরা নেব না।

পিয়োত্রা একে একে ঘোড়া দুটোকে বার করে আনে।

একজন সেপাই আস্তাবলের ভেতরে লণ্ঠনের আলো ফেলে বলে—আরো একটা তো রয়েছে দেখছি। ওটাকে কেন বার করে নিয়ে এলে না?

—ওটা ঘুড়ী, বাচ্চা দেবে। তা ছাড়া বুড়িও হয়ে গেছে, একশো বছর বয়েস।

—জিনগুলো আনো তো। সবুর, ঠিকই বলেছ, খোঁড়াই তো দেখছি। হা খোদা, এই ঠুঁটোগুলোকে কোথায় নিয়ে চললে? ফিরিয়ে নাও!—লণ্ঠন হাতে লোকটা ভয়ানক চটে গিয়ে চেঁচাতে থাকে। পিয়োত্রা রাশ ধরে টানে। কুঁচকে-ওঠা ঠোঁটটা আলো থেকে সরিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—তোমাদের জিন রেকাব কোথায়?

—আজই সকালে কমরেডরা নিয়ে গেছে।

—মিছে কথা বলছ কসাক! কে নিয়েছে?

—সত্যি বলছি...ঈশ্বরের দিব্যি, ওরা নিয়ে গেছে। একটা ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্ট গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাবার সময় নিয়ে গেছে। জিন, গলাসিদুটো অবধি।

তিন ঘোড়সওয়ার গালমন্দ করতে করতে চলে যায়। ঘোড়ার ঘাম আর প্রস্রাবের গন্ধ গায়ে মেখে পিয়োত্রা ঢোকে বাড়ির মধ্যে। ক্রিস্তোনিয়ার কাঁধের ওপর চাপড় মেরে গর্ব করে বলে :

—এই হচ্ছে কায়দা! আমরা তো ঘোড়াগুলো নিজেরাই খোঁড়া করে রাখলাম, ওরাও তার আগেই জিনগুলো নিয়ে নিয়েছে, ব্যস্...। আঃ তুই একটা আস্ত হাঁদা!—বলতে বলতে পিয়োত্রার শক্ত ঠোঁটদুটো কেঁপে ওঠে।

ইলিনিচ্না বাতি নিবিয়ে অন্ধকারেই বিছানা পাততে যায়। বলে – আঁধারেই বসে থাকতে হবে, নয়তো আলো দেখে যতো হাবাতে অতিথ্ এসে জুটবে।

* * * * *

সে রাতে আনিকুশ্কার বাড়িতে আমোদ হৈ-হল্লা চলছে। ওর ওখানে যে-সব লালরক্ষী উঠেছিল তারাই ওকে বলেছিল কসাক পড়শিদের পান-ভোজনে নেমন্তন্ন করতে। আনিকুশ্কা এলো মেলেখভদের ডাকতে।

বললে—ওরা 'লাল' সেই কথা বলছ? হলেই বা লাল। বলি ওদের ধম্মে তো দীক্ষা হয়েছিল? ওরা আমাদেরই মতো রুশ। মাইরি, বিশ্বাস করো চাই না করো, ওদের জন্য আমার দুঃখু হয়। ওদের ভেতর একজন আছে ইহুদি। কিন্তু সে-ও তো মানুষই রে বাবা। আমরা পোলাণ্ডে ইহুদিদের মেরেছি, জানি সে কথা। কিন্তু এ যে আমাকে এক গেলাস ভদ্কা দিয়েছে। ইহুদিদের আমি পছন্দ করি। এসো হে গ্রিগর, পিয়োত্রা!

প্রথমে গ্রিগর যেতে চায়নি। কিন্তু ওর বাপ উপদেশ দিলে :

—যা না, যা। নয়তো ভাববে আমরা ওদের ছোট মনে করি। যা যা, ওদের পুরনো কেচ্ছা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করিস্নি।

আনিকুশ্কার সঙ্গে উঠোনে নামল পিয়োত্রা আর গ্রিগর। গরম রাতে পরিষ্কার আবহাওয়ার আভাস। ছাই আর পোড়া ঘুঁটের গন্ধ বাতাসে। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়ায় তিনজন কসাক, তারপর চলতে শুরু করে। ফটকের পাল্লাদরজার কাছে আসতেই দারিয়া ওদের ধরে ফেলে। চাঁদের মৃদু আলোয় ওর ধনুকের মতো বাঁকা তুলি-আঁকা ভুরু উজ্জ্বল মখমল-কালো দেখাচ্ছে।

আনিকুশ্‌কা বিড়বিড় করে বলে—ওরা আমার বউকে খুব মদ গেলাচ্ছে। কিন্তু যা চাচ্ছে তা ওরা পাবেনা। আমার নজর আছে...।—নিজের ঘরে চোলাই করা ভদ্‌কা টেনেছে আনিকুশ্‌কা। তারই নেশায় ও বেড়ার ওপর গড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রাস্তার পাশে। ওদের পায়ের তলায় নীল দানাদানা বরফ চিনির মতো মড়মড় করে ওঠে। বাতাসের দমকে পাক খেয়ে ছিট্‌কে যায়। সাদা মেঘ আর নির্জীব মাটি লক্ষ্য করে লোভীর মতো ছুটে যাচ্ছে তুষার, ঢেকে ফেলছে গ্রাম, পথঘাট, স্তেপের মাঠ আর মানুষ বা ঘোড়ার সবরকম চিহ্ন।

আনিকুশ্‌কার ঘরের হাওয়া আজ এমন গুমোট যে নিঃশ্বাস নেওয়াই দায়। বাতির শিখায় পাক খেয়ে উঠছে ঝুলকালির ঘন কালো শিষ। তামাকের ধোঁয়ার কুয়াশা ভেদ করে কিছুই দেখা যায় না। টেবিলের ওপর একটা মুখ খোলা জগ। সারা ঘরটায় সুরাসারের গন্ধ। টেবিলের কাপড়টা হয়েছে নোংরা ন্যাকড়ার মতো। লম্বা পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে লালফৌজী একজন এ্যাকর্ডিয়ন-বাদক মহা উৎসাহে বাজনার 'বেলো' কষছিল। আনিকুশ্‌কার বউকে আদর করছিল হৃষ্টপুষ্ট চেহারার এক বুড়ো। লোকটার পরনে আস্তর-দেওয়া খাকি ট্রাউজার, বুট জুতোর সঙ্গে এমন প্রকাণ্ড দুটো রেকাব লাগানো যেগুলো দেখলে মনে হয় কোনো জাদুঘর থেকে আনা। মাথার পেছন দিকে টুপিটা ঠেলে দিয়েছে, বাদামি মুখটা ঘর্মাক্ত। একটা ভিজে হাত দিয়ে চেপে ধরেছে আনিকুশ্‌কার বউয়ের পিঠ। বউটি এর মধ্যেই নেশায় চুর হয়ে গেছে। যদি পারত তাহলে হয়তো সরে যেত, কিন্তু সে শক্তি নেই ওর। স্বামীর চোখে ওর চোখ পড়ে। অন্য মেয়েদের মুখ-টিপে হাসা ও লক্ষ্যই করে না। কিন্তু পিঠের ওপর থেকে সবল হাতখানা সরিয়ে দেবে এমন জোরও ওর গায়ে নেই। বসে বসে হাসতে থাকে মাতাল দুর্বল হাসি।

ঘরের মাঝখানে এক ঘোড়সওয়ারী ফৌজ-কমাণ্ডার ব্রিচেস্‌ আর বাদামী বুট পরে সবুজ সাপের মতো দেহটাকে মোচড় দিয়ে দিয়ে নাচছিল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে লোকটার বুট আর ব্রিচেসের দিকে তাকিয়ে গ্রিগর ভাবছিল : অফিসার বানিয়েছে দেখ!—লোকটার মুখের দিকে তাকায় ও। কালচে রঙ, ঘাম ঝরছে দরদর করে, বড়ো বড়ো গোল কানদুটো বেরিয়ে আছে, পুরু ভারি ঠোঁট। গ্রিগর ভাবে—লোকটা ইহুদি, কিন্তু নাচে তো বেশ দড়ো।—পিয়োত্রা আর গ্রিগরের দিকে ঘরচোলাই ভদ্‌কা এগিয়ে দেয় ওরা। গ্রিগর নিজে কতোখানি খাচ্ছে খেয়াল আছে ওর, কিন্তু পিয়োত্রা মাতাল হয়ে পড়ল চট্‌ করে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পিয়োত্রা মাটির মেঝের ওপর "কসাক" নাচ শুরু করে দিলে; গোড়ালি দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ঘ্যাঁসঘেসে গলায় অ্যাকর্ডিয়ন-বাদককে বলতে লাগল আরো দ্রুতলয়ে বাজাবার জন্য। টেবিলের ধারে বসে গ্রিগর কুমড়োর বিচি ছাড়াচ্ছে। ওর পাশেই বসে সাইবেরিয়ার বাসিন্দা এক মেশিনগান-চালক।

গ্রিগরকে সে বললে—কলচাক্‌কে আমরা ছাতু বানিয়ে দিয়েছি। এবার তোমাদের ওই ক্রাস্‌নভটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব, ব্যস্‌ সব ঠাণ্ডা হবে! তখন বাড়ি ফিরে লাঙল চালাতে পারবে, জমিতে ফসল বুনবে, আম-জাম ফলাবে। মাটি হল মেয়েমানুষের মতো, নিজের ইচ্ছেয় ফলাবে না, জোর করে আদায় করে নিতে হবে। আর কেউ যদি বাগড়া দিতে আসে তো খতম করে দাও তাকে! আমরা তো তোমাদের জমি চাই না। আমরা চাই শুধু প্রত্যেকের মধ্যে সমান করে ভাগবাঁটরা করে নিতে।

গ্রিগর সায় দেয়, কিন্তু সমস্তক্ষণই ও চুপচাপ খুঁটিয়ে নজর করে যাচ্ছে লাল-ফৌজের সেপাইদের। আশঙ্কার কোনো কারণ আছে বলে মনে হচ্ছিল না। সবাই

পিয়োত্রাকে দেখছে, ওর নাচের কৌশলের তারিফ করছে। একজন মহাফুর্তিতে চেঁচিয়ে বলে উঠল—আচ্ছা ওস্তাদ তো! বাহবা, বেড়ে হচ্ছে!—কিন্তু গ্রিগরের হঠাৎ নজরে পড়ল কোঁকড়া-চুল একজন লাল-সেপাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গেল ও। আর মদ ছুঁলো না।

অ্যাকর্ডিয়ন-বাদক এবার ধরেছে পল্‌কা-নাচের সুর। লাল-সেপাইরা যার যার কসাক মেয়ে-জুটিদের হাত ধরলে। একজন মাতাল হয়ে টলতে টলতে ক্রিস্তোনিয়ার পড়শি একটি অল্পবয়েসী বউকে ডাকলে জুটি হবার জন্য। কিন্তু রাজি হল না সে। ঘাগরাটা তুলে ছুটে এল গ্রিগরের দিকে।

গ্রিগরকে বলল—নাচবে, এসো।

—ইচ্ছে নেই।

—এসো গ্রিগর, আমার আসমানী ফুল!

—আঃ কী বোকার মত করছ! আমি যাব না।

জোর করে মুখে হাসি টেনে মেয়েটি ওর আস্তিন ধরে টানতে লাগল। গ্রিগর ভুরু কুঁচকে বাধা দিল কিন্তু মেয়েটিকে চোখ টিপে ইশারা করতে দেখে শেষ অবধি হার মানল। বার দুয়েক পাক খাবার পর নাচের মাঝখানে একবার বিরতির সুযোগে গ্রিগরের কাঁধে মাথা রেখে মেয়েটি ফিস্‌ফিস্ করে প্রায় শোনাই যায় না এমনিভাবে বললে :

—তোমাকে ওরা খুন করার মতলব করেছে...কে যেন ওদের বলে দিয়েছে তুমি অফিসার। এখান থেকে পালাও।

তারপর জোরে জোরে বলে উঠল—উঃ মাথাটা যা ঘুরছে!

গ্রিগর ওকে একটা আসনে বসিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেলে টেবিলের কাছে এসে এক পেয়ালা ভদ্‌কা খেলে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দারিয়াকে বললে :

—পিয়োত্রা মাতাল হয়ে পড়েছে?

—প্রায় তাই।

—ওকে বাড়ি নিয়ে যাও!

পিয়োত্রাকে বের করে নিয়ে গেল দারিয়া, পুরুষের মতো শক্তি দিয়ে ওকে ঠেকাতে হল পিয়োত্রার হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি আর হুমড়ি খেয়ে-পড়া। পেছন পেছন চলল গ্রিগর।

—এ্যাই কোথায় চললে? না না, যেও না!—গ্রিগরের পেছনে ছুটে এল আনিকুশ্‌কা, কিন্তু এমনভাবে গ্রিগর তাকাল ওর দিকে যে আনিকুশ্‌কা হাত আলগা করে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পেছিয়ে গেল।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গ্রিগর টুপিটা নাড়ল। বিড়বিড় করে বলল—সাধুদের সঙ্গই বটে!

চুলকোঁকড়া সেই লালরক্ষীটি বেল্‌ট্ এঁটে বেরিয়ে এল গ্রিগরের পেছু-পেছু। সিঁড়ির ওপর এসে গ্রিগরের মুখের ওপর নিঃশ্বাস ছেড়ে লোকটা ফিস্‌ফিসিয়ে বললে :

—কোথায় চললে?—গ্রিগরের জোব্বাকোটের আস্তিন চেপে ধরল সে।

না থেমেই লোকটাকে সঙ্গে টানতে টানতে গ্রিগর জবাব দিলে—বাড়ি যাচ্ছি! উল্লসিত উত্তেজনার সঙ্গে ও মনে মনে সংকল্প করে ফেলেছে—আমাকে জ্যান্ত ধরা তোমার কম্ম নয়!

ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে, বাঁ হাতে গ্রিগরের কনুই চেপে ধরে লালরক্ষীটা ওর পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। পাল্লা-ফটকের কাছে এসে ওরা দাঁড়ায়। গ্রিগর শুনল

দরজাটা ওদের পেছনে ঝপ্ করে বন্ধ হল। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর নজরে পড়ল লাল-রক্ষীটার ডান হাতটা খপ্ করে ওর কোমর চেপে ধরল, আর শুনতে পেল রিভলবারের খাপের ওপর লোকটার নখের আঁচড়ের শব্দ। এক সেকেন্ডের জন্য গ্রিগর দেখল ওর মুখের দিকে লোকটা তাকিয়ে আছে দুশমনীভরা চোখে। ধাঁ করে ঘুরেই ও খাপের ঢাকনার ওপর আঁচড়াতে-থাকা হাতটা ধরে ফেলে। কব্জি চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে ও লোকটার হাতটা নিজের ডান কাঁধের ওপর টেনে নেয়। তারপর ঝুঁকে পড়ে ওর আগেকার সেই কৌশল খাটিয়ে প্রকাণ্ড দেহটাকে কাঁধের ওপর তুলে নেয়, আর হাতটাকে টানতে থাকে নিচের দিকে। শুনতে পায় কনুইয়ের জোড়াটায় মট্‌মট্ আওয়াজ হচ্ছে। লোকটার মাথা নিচে ঝুলে পড়ে বরফ ছোঁয়। তারপর একগাদা বরফের মধ্যে ডুবে যায়।

বেড়ার পেছনে নিচু হয়ে ঝুঁকে গ্রিগর একটা ছোট গলি ধরে ছুটে যায় ডনের দিকে। লাফাতে লাফাতে ছোটে ও, রাস্তাটা যেখানে পাড়ের ঢাল বেয়ে নেমেছে সেই জায়গাটা খুঁজতে থাকে। ভাবে—যতোক্ষণ না এখানে কোনো ঘাঁটি বসছে...। একমুহূর্ত থামে ও। পেছন থেকে আনিকুশ্‌কার বাড়ির আঙিনার সম্পূর্ণটাই নজরে আসে। একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পায় গ্রিগর। হিংস্র শিস্ কেটে বুলেটটা ওর পাশ দিয়ে চলে যায়। আবার গুলির শব্দ। ও মনে মনে ঠিক করে—টিলার নিচে ডনের পাড় ধরে যাবে। পারঘাটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় আসতেই একটা বুলেট একেবারে ওর গা ঘেঁষে ছুটে গিয়ে বরফের মধ্যে গেঁথে যায়। ছিট্‌কে ওঠে বরফের টুকরো। নদীর ওপার থেকে আবার পেছন ফিরে তাকায় গ্রিগর। চরানিদারের চাবুকের মতো এখনো সাঁই সাঁই করে গুলি ছুটছে। পালিয়ে এসেও কোনো আনন্দের অনুভূতি নেই গ্রিগরের, বরং সমস্ত ঘটনাটা সম্পর্কে একটা ঔদাসীন্যের ভাবই ওকে বেশি করে পীড়া দিচ্ছে। আরেকবার থেমে ও যন্ত্রচালিতের মতো ভাবে—হয়তো বা ওরা কোনো জন্তুজানোয়ারই শিকার করছিল। আমাকে ওরা খুঁজবে না। জঙ্গলে আসতে ভয় পাবে। লোকটার হাতে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছি যে চিরকাল আমাকে মনে রাখবে। হতচ্ছাড়াটা ভেবেছিল খালি হাতেই একজন কসাককে পাকড়াতে পারবে!

শীতের সময় জড়ো করে রাখা আগাছার গাদাগুলোর দিকে এগোতে থাকে ও। কিন্তু তারপরেই কী আশঙ্কা করে সেগুলো এড়িয়ে খরগোশের মতো চলে দীর্ঘ জটিল গলিঘুঁজি ধরে। শুকনো জলাঘাসের একটা পোড়ো গাদার মধ্যে রাতটা কাটাবে ঠিক করে। ওপরে উঠে গর্ত করতে থাকে। পায়ের তলা দিয়ে একটা বেজি ছুটে যায়। পচাগন্ধওয়ালা জলাঘাসের মধ্যে মাথা-সমান গর্ত খুঁড়ে জিরিয়ে নেয় গ্রিগর। শরীর কাঁপছে। কোনো চিন্তা করতে পারছে না, কোনো মতলব ঠাওরাতে পারছে না। মাথার মধ্যে শুধু সামান্য একটা ইঙ্গিত খেলে যাচ্ছে—কাল কি তাহলে ঘোড়ায় জিন এঁটে নিজের দলের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেব? কিন্তু কোনো জবাব খুঁজে পায় না ও নিজের কাছে। শুয়ে থাকে চুপচাপ।

সকালের দিকে ওর হাত-পা ঠাণ্ডায় জমে যায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে: মাথার ওপর ভোরের আলো খুশিতে ঝলমল করছে, কালচে-নীল আকাশের গভীর গহনে যেন ডন নদী-তলের মতোই একটা তলদেশের সন্ধান পাচ্ছে ও: মাঝ আকাশে প্রত্যূষের ধোঁয়াটে হাল্‌কা আশমানী রঙ আর তারই ধার দিয়ে দিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে-আসা এক মুঠো তারার ছিটে।

॥ বারো ॥

তাতারস্কের ওপারে সরে গেছে লড়াইয়ের ময়দান। মিলিয়ে গেছে যুদ্ধের ঝনৎকার। শেষদিন যেদিন গ্রামে পল্টনরা আস্তানা গাড়লো, সেদিন অশ্বারোহী ফৌজের মেশিনগান-চালকরা মখোভের গ্রামোফোনটাকে একটা চওড়া স্লেজগাড়ির ওপর বসিয়ে ঘোড়া দাবড়াতে লাগল রাস্তার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। গ্রামোফোনটা ক্যাঁ ক্যাঁ করে চিৎকার করছে, আর ঘোড়ার খুরের গুঁতোয় ছিটকে-ওঠা বরফ গ্রামোফোনের মস্তো চোঙটার মধ্যে ঢুকছে। মেশিনগান-ওয়ালারাও চট্‌পট্‌ চোঙটাকে ঝেড়েপুঁছে এমনভাবে হাতল ঘোরাচ্ছে যেন এ-ও ওদের মেশিনগানের মতোই হাতের পাঁচ। এক পাল ছাইরঙা চড়ুইয়ের মতো গ্রামের ছেলেছোকরারা ওদের পেছন পেছন ছুটছে আর স্লেজটাকে আঁকড়ে ধরে চেঁচাচ্ছে: ও দাদামনি, ওই শিস্‌ বাজানো যন্তরটা বাজাও না গো! ও দাদামনি,আট্টু বাজাও! —দুজন মহাসৌভাগ্যবান ছেলে বসেছে এক মেশিনগান-চালকের হাঁটুর ওপর। যখন গ্রামোফোনের হাতলটা ঘোরাতে হচ্ছে না তখন বেশ রয়ে-সয়ে সাবধানে লোকটা ছোট ছেলেটার পোঁটা-গলা নাকখানা মুছে দিচ্ছে।

এর পর লড়াইয়ের আওয়াজ আরো দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রসদগাড়িগুলো ধীরে ধীরে তাতারস্কের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল—দক্ষিণ রণাঙ্গনে তারা লালফৌজের জন্য গোলাবারুদ আর রসদ সরবরাহ করছে।

তৃতীয় দিনে খবর-বাহকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কসাকদের বলে এল গ্রামের এক পঞ্চায়েতে আসবার জন্য।

ঠাট্টা করে পান্তালিমনকে বললে একজন—আমরা ক্রাস্‌নভকে 'আতামান' করে নেব।

—আতামান আমরা বাছাই করে নিতে পারব? নাকি ওরাই ওপর থেকে একজনকে চাপিয়ে দেবে? জিজ্ঞেস করে পান্তালিমন।

—দেখাই যাবে!

সভায় যায় গ্রিগর আর পিয়োত্রা। জোয়ান কসাকরা সবাই এসেছে, কেউ বাদ যায়নি। বুড়োরা আসেনি। শুধু হামবড়া আভ্‌দেয়িচ একটা ছোটখাটো কসাকের দল সঙ্গে জুটিয়ে নিয়ে তাদের শোনাচ্ছে কেমন করে এক 'লাল' কমিসার ওর সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল, আর ওকে ডেকে নিয়ে একটা হোমরাচোমরা পদে বসাতে চেয়েছিল।

কসাকরা চত্বরের ওপর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসেছে। গ্রিগর ওর পুরনো বন্ধু মিশ্‌কা কশেভয়কে সেই বসন্তকালের সময় রংরুটের পর থেকে আর দ্যাখেনি, তাই এখন নজরে পড়তেই ও এগিয়ে গিয়ে হাত চেপে ধরল তার। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল:

—এই যে মিশ্‌কা, কোথায় ডুব মেরেছিলে এতদিন? কোন্‌ ঝাণ্ডার সেবা করছ এখন?

—ওহো! আগে তো চরানিদারের কাজ করছিলাম। তারপর আমায় ওরা কলচার ফ্রণ্টে এক পিটুনি ফৌজী কোম্পানীতে ঢুকিয়ে দিল। আমি তো পালিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম লড়াইয়ে গিয়ে লালদের সঙ্গে যোগ দেব বলে। ওরা কিন্তু আমাকে কড়া নজরে রাখলে, মা তার কুমারী মেয়েকে যেমন নজরে রাখে, তার চেয়েও বেশি। তারপর সেদিন এল ইভান আলেক্‌সিয়েভিচ্, পরনে পুরোদস্তুর উর্দি। বললে: রাইফেলটা ঠিকঠাক করে চলে এসো! আমি তখন সবে বাড়ি এসেছি। জিজ্ঞেস করলাম: 'তুমি পালিয়ে যাচ্ছ না তো হে?' কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে সে বললে, 'শুনলাম ওরা একজন আতামান পাঠাচ্ছে আমাদের জন্য'। বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমি ভাবলাম সে সত্যিই বুঝি চলে গেছে। কিন্তু পরদিন একটা লাল রেজিমেণ্ট এলো গাঁয়ে, ওকেও দেখলাম তাদের সঙ্গে। ওই তো, এখানেই রয়েছে দেখছি! ইভান আলেক্‌সিয়েভিচ!—চিৎকার করে চত্বরের এপাশ থেকে ডাকল ও।

ইভান এগিয়ে আসে। ওর সঙ্গে কলঘরের মজুর দাভিদ। তেল-পিছল হাতে গ্রিগরের হাতটা চেপে ধরে ও চুমকুড়ি কাটে:

—সে কি গ্রিগর, তুমি কেমন করে এখানে রয়ে গেলে?

—আর তুমি?

—আরে আমার ব্যাপারটা তো আলাদা।

গ্রিগর বলে—আমার অফিসারের চাকরির কথা ভাবছ? সে ঝুঁকি নিয়েই তো রয়ে গেলাম এখানে। কাল প্রায় খুন হবার জোগাড় হয়েছিলাম। লাল সেপাইরা আমাকে তাড়া করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। কেন যে পালিয়ে যাইনি সেকথা ভেবে আফশোষ হচ্ছিল। কিন্তু এখন আর আফশোষ নেই।

—কী নিয়ে হয়েছিল ব্যাপারটা?

—আনিকুশ্‌কার বাড়িতে গিয়েছিলাম। কে যেন ওদের বলে দিয়েছিল আমি একজন অফিসার। পালিয়ে গেলাম ডনের ওপারে, যাবার আগে অবিশ্যি ওদের এক-জনকে এমন শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি যে, অনেকদিন মনে রাখবে আমাকে। বদলা নেবার জন্য ওরা আমাদের বাড়িতে ঢুকেছিল। ট্রাউজার, কোট, যথাসর্বস্ব সব নিয়ে গেছে। আমার পরনে যা দেখছ এই একমাত্র সম্বল এখন।

—যখন সুযোগ পেয়েছিলাম তখনই আমাদের উচিত ছিল পালিয়ে লালরক্ষীদের কাছে চলে যাওয়া।—ইভান আলেকসিয়েভিচ কাষ্ঠহাসি হেসে সিগারেট ফুঁকতে শুরু করে।

শুরু হয় সভা। ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে ফোমিনের দলের একজন নিশান-বরদার এসেছে, সেই প্রথম আরম্ভ করে:

—কসাক বন্ধুগণ! সোভিয়েত সরকার আজ আমাদের জেলায় শিকড় গেড়ে বসল। এবার একটা শাসনযন্ত্র তৈরি করা দরকার। দরকার কার্যনির্বাহক কমিটি, একজন সভাপতি আর একজন সহসভাপতি নির্বাচন করা। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হল, আঞ্চলিক সোভিয়েত থেকে আমি হুকুম নিয়ে এসেছি—সমস্ত বন্দুক-পিস্তল আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সঁপে দিতে হবে সরকারের হাতে।

পেছন থেকে কে একজন গলায় বিষ ঢেলে বললে—চমৎকার! তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

—এসব ধরনের মন্তব্য কোনো কাজের নয় কমরেড।—ভারপ্রাপ্ত সেপাইটি সামনে এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর ফারের টুপিখানা রাখে।—অস্ত্রশস্ত্র নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতে হবে,

কারণ আপনাদের ঘরকন্নার কাজে তার প্রয়োজন নেই। কেউ যদি সোভিয়েতকে রক্ষার কাজে সাহায্য করতে চায় তো তাকে হাতিয়ার দেয় তিনদিনের মধ্যে রাইফেল হাজির করা চাই। এখন আমাদের নির্বাচন হবে।

—ওরাই তো আমাদের অস্ত্র দিয়েছিল, এখন আবার কেন ফিরিয়ে নিতে চায়?—যে বলছিল কথাটা সে শেষ না করতেই সবগুলো চোখ তার দিকে ফেরে। লোকটা জাখার করোনিয়ভ।

ক্রিস্তোনিয়া সাধাসিধেভাবে জিজ্ঞেস করে—অস্ত্রগুলো তোমার রাখার দরকার কি?

—দরকার আমার নেই। তবে লালফৌজকে যখন আমরা আমাদের প্রদেশে ঢুকতে দি তখন এমন কোনো চুক্তি ছিল না যে তারা হাতিয়ার কেড়ে নেবে।

—সে কথা সত্যি। আমরা আমাদের তলোয়ার সাফ করে রেখেছি নিজেদের খরচায়।

—জার্মান যুদ্ধ থেকে আমি আমার রাইফেলটা নিয়ে ফিরেছিলাম, আর এখন সেটা আমাকে হাতছাড়া করে দিতে হবে? ওরা আমাদেরটা লুটে নিতে চায়। হাতিয়ার না থাকলে আমাদের কী দশা হবে? দশা হবে ছেঁড়া ঘাগরাপরা মেয়েমানুষের মতো : তখন আমি ল্যাংটো।

মিশ্‌কা কশেভয় কিছু বলতে চাইছিল। চেঁচিয়ে বলে উঠল ঃ

—ঢের হয়েছে কমরেড, আর নয়! আপনাদের কথাবার্তার ধরনে আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমাদের জেলায় এখন যুদ্ধের অবস্থা? না কি তা নয়? যদি যুদ্ধের অবস্থাই হয় তাহলে এ বিষয় তর্কাতর্কির কোনো কারণ দেখি না। হাতিয়ার দিয়ে দিন! আমরা যখন উক্রেইনীয়দের গ্রাম দখল করেছিলাম তখন আমরাও কি তাই করিনি?

ভারপ্রাপ্ত সেপাইটি তার ফারের টুপিটার দিকে তাকিয়ে থেকে জোর গলায় বলে উঠল :

—তিনদিনের মধ্যে যারা হাতিয়ার ফিরিয়ে দেবে না তাদের বিপ্লবী আদালতের কাছে সোপর্দ করা হবে, বিপ্লব-বিরোধী বলে তাদের গুলি করে মারা হবে।

সামান্য নীরবতার পর তমিলিন গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠল :

—নির্বাচনের কাজ চলুক তাহলে।

একসঙ্গে প্রায় ডজনখানেক নাম উঠল। ছোকরাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল 'আভদেয়িচ্' বলে, কিন্তু রসিকতাটা মাঠে মারা গেল। ইভান আলেক্‌সিয়েভিচের নামটাই প্রথম উঠল ভোটের জন্য। সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হল সে।

সভার পর বাড়ি ফেরার পথে পিয়োত্রা গ্রিগর আর ক্রিস্তোনিয়ার সঙ্গে দেখা হল আনিকুশ্‌কার। বগলের নিচে বয়ে এনেছে রাইফেলটা আর বউয়ের আঙরাখায় জড়ানো কার্তুজগুলো। কসাকদের দেখেই ও হতভম্ব হয়ে পাশের একটা গলির মধ্যে সরে পড়ল। পিয়োত্রা তাকাল গ্রিগরের দিকে, গ্রিগর তাকাল ক্রিস্তোনিয়া দিকে, একসঙ্গে সবাই হাসল।

॥ তেরো ॥

স্তেপের প্রান্তরে পূবালী হাওয়ার দমক। নিচু জায়গা আর গর্তগুলো ভরাট হয়ে বুজে গেছে বরফে। না দেখা যায় চওড়া রাস্তা, না পায়ে-হাঁটা পথ। যেদিকে দুচোখ যায় শুধু তৃণহীন সাদা, হাওয়া-ঝাপটানো সমতলের বিস্তার। স্তেপের মরা মাটি। মাঝে মাঝে শুধু একেকটা কাক বরফের ওপর দিয়ে উড়ে যায় আর উড়তে উড়তেই ডাকে। বুড়ো স্তেপের মতোই ওরাও যেন অনেককালের বুড়ো। স্তেপের ওপর অনেক দূর পর্যন্ত হাওয়ায় ভর দিয়ে ছড়িয়ে যায় ওদের ডাক, আর তার দীর্ঘ করুণ রেশটুকু জেগে থাকে রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সহসা মোটা খাদের তারে ঝঙ্কার জেগে ওঠার মতো।

কিন্তু বরফের নিচে স্তেপ এখনো সজীব। যেখানে রূপালি তুষারের জমাট-বাঁধা ঢেউ হয়ে চষা-জমিগুলো পড়ে আছে, যেখানে শরৎকালের পর থেকে মরা-ঢেউ বুকে জড়িয়ে শুয়ে আছে মাটি,—সেখানেই আবার লোভাতুর জীবন্ত শিকড় দিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে রয়েছে শীতের রাই ফসল। জমাট শিশিরের কান্না নিয়ে রেশমি সবুজ গাছগুলো চিড়-ধরা কালো মাটির গায়ে আল্‌তো লেগে আছে, কালো মাটির জীবন-রস কালো রক্ত শুষে বেঁচে আছে তারা আর পথ চেয়ে আছে বসন্তের, সূর্যের—কবে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে, সূক্ষ্ম হীরা-বসানো তুষারের পরতটুকু ভেঙে আবার সতেজ সবুজে উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠবে মে-মাসে। সময় হলেই মাথা তুলে দাঁড়াবে। তিতির এসে তার ঝোপে ঝাড়ে ঢু' মারবে, এপ্রিলের ভারুই পাখি মাথার ওপর গান গাইবে। রোদের তেজ লাগবে। হাওয়ায় দোলা দেবে, তারপর চাষী-মনিবের কাস্তের মুখে মাটিতে নামবে তাদের পুরোট পাকা শীষ। মাড়াইয়ের আঙিনায় নির্বিবাদে ছড়িয়ে যাবে ফসলের দানাগুলো।

সারা ডন জেলা বেঁচে আছে একটা গোপন নিষ্পিষ্ট অস্তিত্ব নিয়ে। শুরু হয়েছে বিষণ্ণ দিন। একটা ভয়ানক গুজব ছড়িয়ে পড়ছে ডনের উজান এলাকায়, ডনের উপনদী ধরে, চিরা খপার ইয়েলান্‌কা ধরে সে-গুজব ছড়িয়ে পড়ছে ছোট বড়ো নানা নদীর আশেপাশে ছড়ানো-ছিটানো কসাক গ্রামগুলোতে। জনরব, দনিয়েৎজ্‌ নদীর পার অবধি ধেয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে রণাঙ্গন, আর সমস্ত এলাকাটা নাকি 'বিশেষ কমিশন' আর 'সামরিক আদালতের' কঠিন পাল্লায় পড়েছে। যে কোনো দিন নাকি ওরা কসাক জেলাগুলোতে এসে পড়তে পারে। এর মধ্যেই মিগুলিন আর কাজান্‌স্কা জেলায় নাকি এসেও পড়েছে। যে-সব কসাক শ্বেতরক্ষীদের দলে কাজ করেছিল তাদের তারা সংক্ষিপ্ত বে-আইনি আদালতে বিচার করছে। বোঝাই যাচ্ছে যে উত্তর ডন এলাকায় কসাকদের নিজেদের ইচ্ছায় রণাঙ্গন ছেড়ে আসাটাকে তারা তাদের পক্ষের যুক্তি হিসাবে মেনে নিচ্ছে না। আদালতের কাজও ভয়াবহ রকমের সহজ : অভিযোগ, সামান্য জেরা, দণ্ডাজ্ঞা—তারপর মেশিনগানের সামনে মৃত্যু। শোনা যাচ্ছে, কাজান্‌স্কা আর শুমিলিন্‌স্কে নাকি

এর মধ্যেই বাদা বনে অনেক কসাকের বেওয়ারিশ মুণ্ডু গড়াচ্ছে। রণাঙ্গনের সেপাইরা শুনে হাসে। রসিকতা করে বলে : মিছে কথা! ওসব অফিসারদের বানানো গল্প! ক্যাডেটরা তো চিরকালই আমাদের এসব আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাতে চেয়েছে!

তাতারস্কে সন্ধ্যের সময় কসাকরা অলিতে গলিতে জড়ো হয়ে এই সব খবর নিয়ে জল্পনা করে, তারপর ঘরে চোলাই-করা ভদ্‌কা খেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। নীরব তিক্ততা নিয়ে বেঁচে আছে গ্রামটা। শ্রোভ্-টাইডের উৎসবের দিনে শুধু একটি মাত্র বিয়েতে স্লেজের ঘণ্টা শোনা গিয়েছিল—মিশ্‌কা কশেভয় তার বোনের বিয়ে দিচ্ছিল। আর এ বিয়ে নিয়ে পাড়াপড়শিরা মুখ সিঁটকে বলাবলি করেছিল : বিয়েরই সময় বটে এখন! কে জানে হয়তো 'না হয়ে উপায় ছিল না', তাই!

* *

নির্বাচনের পরের দিন গাঁয়ে বাড়িকে-বাড়ি হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হতে থাকে। মখভের বাড়ির দরজা-সিঁড়ি আর গলিবারান্দায় অস্ত্রশস্ত্র পাঁজা করে রাখা হয়েছে। সেখানেই এখন বিপ্লবীর কমিটির ঘাঁটি। পিয়োত্রা মেলেখফ ওর নিজের আর গ্রিগরের রাইফেল, দুটো রিভলবার আর একখানা তলোয়ার ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যেগুলো সে জার্মান যুদ্ধের আমলে নিয়ে এসেছিল সেগুলোই শুধু হাতছাড়া করেছে, অফিসারের রিভলবারগুলো সব রেখেছে নিজের কাছে। একটা স্বস্তির ভাব নিয়ে বাড়ি ফিরল পিয়োত্রা। দেখল গ্রিগর বসে আছে সিঁড়ি দরজায়। কনুই অবধি জামার হাতা গুটিয়ে দুটো রাইফেলের মরচেধরা কলকব্‌জা আলাদা আলাদা করে প্যারাফিন ঘষে সাফ করছে।

—ওগুলো আবার কোন্ চুলো থেকে আবিষ্কার করলে? —বিস্ময়ে গোঁফ ঝুলে পড়েছে পিয়োত্রার।

—বাবা যখন ফিলোনোভোয় গিয়েছিল আমাকে দেখতে, সেই সময় এনেছিল। —গ্রিগরের চোখদুটো চক্‌চক্ করে, প্যারাফিন-মাখা হাত দুটো দিয়ে কোমর চাপড়ে হো-হো করে হেসে ওঠে ও। তারপর ঠিক তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়, নেকড়ের মতো দাঁত খিঁচিয়ে বলে:

—রাইফেল দেখ্‌ছ? এ আর এমন কি! জানো?—ওর গলার আওয়াজটা চাপা হয়ে ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে, যদিও বাড়িতে কোনো বাইরের দ্বিতীয় লোক নেই—জানো, আজ বাবা বললে তার কাছে একটা মেশিনগানও আছে। —আবার গ্রিগরের ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে।

—মিছে কথা! কোথায় পেল বাবা? কেন রেখেছে?

—বললে কোন্ রসদগাড়ির কসাক নাকি দিয়েছিল দইয়ের বদলে। কিন্তু আমার মনে হয় বুড়ো ফাঁকি দিচ্ছে! আসলে বোধহয় চুরি করেছিল। একেবারে গুবরে পোকা! যা হাতের কাছে পাবে তাই টেনে আনবে। আমায় কানে কানে বললে: মাড়াই ঘরের মেঝের নিচে একটা মেশিনগান পুঁতে রেখেছি। স্প্রিংটা দিয়ে চমৎকার আঁকড়া তৈরি হতে পারে তবে আমি জিনিসটা ছুঁইওনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম: মেশিনগানটা দিয়ে তোমার কী দরকার? জবাব দিলে: স্প্রিংটা আমার ভারি পছন্দ হয়েছিল। কোনো কাজে হয়তো লেগে যাবে ভেবেছিলাম।

পিয়োত্রা ভয়ানক চটে গেল, ভাবল এখুনি বাপের কাছে গিয়ে এ নিয়ে কথা বলবে। কিন্তু গ্রিগর ওকে রুখল:

—একটু সবুর! এগুলো একটু সাফসুফ করে জোড়া লাগাতে সাহায্য কর। কী বলবে তাকে?

রাইফেলের বল্টুটা পরিষ্কার করতে করতে ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলল পিয়োত্রা, কিন্তু একটু বাদেই কী যেন ভাবতে ভাবতে বললেঃ

—হয়তো বাবা ঠিকই করেছে। কোনো কাজে লেগে যেতে পারে। যেমন আছে তেমনিই থাক্ জিনিসটা।

সেদিন ইভান তমিলিন এলো আরেক গুজব
চলেছে। চুল্লীর ধারে বসে ওরা ধূমপান আর গল্পগুজব করতে লাগল। পিয়োত্রা ভুরু দুটো ঘোঁচ করে বসে আছে। দারুণভাবে কিছু ভাবছে। তমিলিন চলে যাবার পর বললঃ

—রুবিয়েঝিনে গিয়ে আমি ইয়াকভ ফোমিনের সঙ্গে দেখা করব। শুনলাম সে ঘরে ফিরেছে। সেই নাকি আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিটির সংগঠক। যদি কিছু হয় তো ওকেই বলব এখানে এসে দেখতে।

পান্তালিমন যখন স্লেজে ঘোড়া জুতছে সেই সময় দারিয়া একটা নতুন ভেড়ার চামড়া গায়ে জড়িয়ে ইলিনিচ্নাকে ফিস্ফিস্ করে কী যেন বললে। দুজন একসঙ্গে ঢুকল ভাঁড়ার ঘরে, একটা পুলিন্দা বের করে আনল।

বুড়ো জিজ্ঞেস করল—ওটা আবার কি?

পিয়োত্রা চুপ করে রইল, কিন্তু ইলিনিচ্না তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বললেঃ

—কিছু মাখন জমিয়ে রেখেছিলাম যদি কোনোদিন নিজেদের দরকার হয় তাই। কিন্তু এখন তো মাখনের কথা ভাববার সময় নয়, তাই দারিয়াকে দিলাম। ফোমিনকে দেবার জন্য নিয়ে যাক্। হয়তো পিয়োত্রার কথা শুনবে লোকটা।—বলতে বলতে কেঁদে ফেলল ইলিনিচ্না—ওরা খেটেছিল, খেটে তবে অফিসার হয়েছিল। আর এখন সবাই ওদের পদকের দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছে।...

—প্যান্প্যানানি থামাও দিকি্—পান্তালিমন চটে গিয়ে শ্লেজের তলায় চাবুকটা ছুঁড়ে দিল। এগিয়ে গেল পিয়োত্রার কাছে।

বলল—ওর জন্যে কিছু গমও নিয়ে যেও।

পিয়োত্রা ফুঁশে উঠল—গম দিয়ে তার কোন্ দরকারটা আছে শুনি? তার চেয়ে বরং আনিকুশ্কার বাড়ি গিয়ে যদি একটু ভদ্কা নিয়ে আসতে, তো কাজ হত; কিন্তু গম দিয়ে...

পান্তালিমন সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মিনিট কয়েক বাদে ফিরে এল একটা মস্ত জগ বগলদাবা করে। জগটা নামিয়ে রাখবার সময় তারিফ করে বললে—

—খাশা ভদ্কা এনেছি, সেই জারের আমলের জিনিস।

ইলিনিচ্না শুনিয়ে দিলে—বুড়ো ডালকুত্তা, এর মধ্যেই চাখা হয়ে গেছে! —কিন্তু বুড়োর নিশ্চয় কানে যায়নি ওর কথা। জোয়ান ছোকরার মতো লাফ মেরে ঘরে ঢুকল আস্তিনে ঠোঁট মুছতে মুছতে আর খোশমেজাজে চোখদুটো মিট্মিট্ করতে করতে।

ভদ্কা ছাড়াও পিয়োত্রা সঙ্গে নিল যুদ্ধের আগের আমলের এক টুকরো চেভিয়ট টুইড কাপড়, একজোড়া বুট, আর পাউন্ডখানেক দামি চা। ওর পূর্বতন সেপাই-সহকর্মী আজ এত ক্ষমতাপন্ন লোক হয়েছে, তাকে উপহার দিতে হবে। এসব জিনিস আর এ-ছাড়াও আরো অনেক কিছু সে লুঠের ভাগ হিসাবে পেয়েছিল ২৮ নম্বর রেজিমেন্ট

লেস্ক্-এর রেলস্টেশন দখল করে যখন ওয়াগন আর গুদামঘরগুলো লুঠ করেছিল সেই সময়। বুড়ো বাপ যখন রণাঙ্গনে ছেলেকে দেখতে গিয়েছিল সেই সময় সে তার হাতে এগুলো পাঠায়। পান্তালিমন বাড়ি ফেরার পর দারিয়া এমন চটকদার অন্তর্বাস পরতে লাগল যে নাতালিয়া আর দুনিয়ারও চোখ টাটালো, গাঁয়ের কেউ কোনোদিন জন্মেও দ্যাখেনি এমন জিনিস। সবচেয়ে সেরা বিলিতি লিনেনে তৈরি, ধবধবে সাদা, প্রত্যেকটা ছোট জিনিসেই কামদার নক্শা আর নামের আদ্যক্ষর। দারিয়ার পাজামার লেস্ ডন নদীর ফেনার চেয়েও পেলব।

ভিয়েশেন্স্কা থেকে পিয়োত্রার ফেরার পর প্রথম রাতে দারিয়া পাজামা পরেই বিছানায় গিয়েছিল। আলোটা নেবাবার আগে পিয়োত্রা অনুকম্পার সঙ্গে হেসে বলেছিল—কোনো বেটাছেলের পাৎলুন জোগাড় করে নিয়েছ তাহলে?

ঘুম-ঘুম গলায় দারিয়া জবাব দিলে—পরতে বেশ আরাম আর গরম লাগে। এগুলো যে বেটাছেলের তা কেন ভাবলে তুমি? পুরুষের হলে তো লম্বা হত, তাছাড়া লেস্ দিয়েই বা তাদের কী কাজ?

—হয়তো বা লর্ড বাদশারা পাৎলুনে লেস্ লাগায়। কিন্তু সে মরুক্‌গে যাক্। যদি শখ হয় তো পরো। ঘুমের ঘোরে গা চুলকে জবাব দিলে পিয়োত্রা।

কিন্তু পরের রাতে আবার বউয়ের পাশে শুতে গিয়ে ভয় পেয়ে সরে এল ও, অনিচ্ছুক সম্ভ্রম আর অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে রইল লেস্‌টার দিকে। জিনিসটা ছুঁতে ওর ভয় হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল দারিয়া বুঝি ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। তৃতীয় রাতে সে বিলক্ষণ চটেই গেল। কোনো ওজর-আপত্তি শুনবে না এমনি কড়া গলায় হুকুম করলে :

—তোমার ওই পাৎলুন খুলে চুলোয় ফেলে দাও গে' যাও! ও জিনিস মেয়েদের পরার মতো নয়, মেয়েদের পোশাকও নয় ওটা। তুমি তো একেবারে লেডী সেজে শুয়ে আছ। ও পরলে তুমি অন্যরকম মেয়েমানুষ হয়ে যাও।

পরদিন সকালে দারিয়া ওঠার আগেই ও ঘুম থেকে ওঠে। গা খাঁকারি দিয়ে, কপাল কুঁচকে পাজামাটা পরতে চেষ্টা করে নিজেই। সিল্কের দড়ি, লেস্ আর হাঁটুর নিচে নিজের লোমশ মোজাহীন পা দুটোর দিকে অনেকক্ষণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঘুরে দাঁড়াতেই নজর যায় আয়নায় নিজের চেহারাটার দিকে, পাছার কাছে চমৎকার খোঁচ পাকিয়ে আছে পাজামাটা। ভালুকের মতো হামা দিয়ে পোশাকটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আর থুতু ফেলে গালাগাল ঝাড়তে থাকে। ওর প্রকাণ্ড পায়ের ডগা আটকে গেছে দড়িতে, তোরঙ্গটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কি। এবার সত্যি সত্যিই খেপে গিয়ে পিয়োত্রা বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে, তারপর ছাড়া পায়। দারিয়া ঘুমের ঘোরে জিজ্ঞেস করে : কী করছ গো তুমি?—কিন্তু পিয়োত্রা একটা আহত ভাব নিয়ে চুপ মেরে থাকে, শুধু ফোঁসফোঁস করে আর থুতু ফেলে। সেদিনই সকালে দারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাজামাটা বেঁধেছেঁদে তোরঙ্গে ঢুকিয়ে রেখে দেয়। এর মধ্যেই এরকম অনেক জিনিস ও বেঁধে তুলে রেখেছে যা কোনো স্ত্রীলোকের কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু স্কার্টগুলোর ও সদ্ব্যবহার করেছে। যদিও সেগুলো অতিরিক্ত খাটো তবু দারিয়া কায়দা করে এমনভাবে সেগুলো পরত যে ওর নিজের লম্বা ঘাগরার নিচেও তলার স্কার্ট বেরিয়ে থাকত, প্রায় ইঞ্চিটাক নিচে ঝুলত লেস্। এইভাবে সেজেগুজে ও বেড়াতে বেরুত, আর ডাচ্ লেসের পাড় দিয়ে মাটির মেঝে ঝেঁটিয়ে চলত।

স্বামীর সঙ্গে গাড়ি চেপে ফোমিনের কাছে যাচ্ছে দারিয়া। চমৎকার সাজগোজ করে পোশাক পরেছে। ওর ভেড়ার-চামড়ার বড়ো কোটের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে লেসের পাড়। পশমী কোটটাও ভালো, আনকোরা জিনিস। ফোমিনের বউ কুঁড়েঘর থেকে রাজ-বাড়িতে উঠেছে, সে এবার বুঝবে দারিয়া যেমন-তেমন কসাক বউ নয়, হাজার হলেও সে একজন অফিসারের স্ত্রী।

পিয়োত্রা চাবুক নাচিয়ে ঠোঁট দিয়ে 'চক্‌চক্‌' আওয়াজ করে। পেটমোটা বুড়ি ঘুড়ীটা ডনের ধারের রাস্তা ধরে কদম চালে ছুটেছে। যখন ওরা রুবিয়েঝিনে এসে পৌঁছোয় তখন রাতের খাওয়ার সময় হয়েছে। ফোমিন বেশ বহাল তবিয়তেই ছিল। পিয়োত্রাকে আদর করে ডেকে নিয়ে টেবিলের ধারে বসাল। পিয়োত্রার শ্লেজ থেকে ওর বাপ সেই ভাঁড়খানা বের করে আনতেই লালচে গালপাট্টার তলায় হাসি ফুটে উঠল।

দারিয়ার দিকে বড়ো বড়ো কামনাতুর চোখদুটোর তেরছা নজর বুলিয়ে, ভারিক্কি-চালে গোঁপে তা দিয়ে আস্তে আস্তে বললে—তারপর, ভাই, এতদিন দেখিনি যে বড়ো। ফোমিনের গলার আওয়াজটা মিঠে আর মোটা।

—কেন জানো ইয়াকভ ইয়েফেমিচ! আমাদের রেজিমেণ্টগুলো যে পেছু হটে গেল। যা কঠিন দিনকাল...

—ঠিক কথা, তা বটে! কিছু কুমড়োর চাটনি আর কপি, কিংবা একটু শুটকি মাছ আনলে পারতে কিন্তু আমাদের জন্য।...

ছোট্ট ঘরখানা এমন গরম যে দম ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। একটু মদ খেয়ে পিয়োত্রা কাজের ব্যাপারে মন দেয়। বলে :

—গাঁয়ে খুব গুজব রটেছে 'চেকা' (গোয়েন্দা পুলিশ) এসেছে বলে, তারা নাকি কসাকদের মারধোর করছে।

—ভিয়েশেন্‌স্কায় একটা লাল-ফৌজী আদালত বসেছে। কিন্তু তাতে হয়েছে কি? এ নিয়ে তোমাদের এত মাথাব্যথা কিসের?

—বুঝলে তো ইয়াকভ ইয়েফিমিচ, ওরা আমাকে অফিসার ঠাউরে নিয়েছে। আর সেটা সবাই নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছে কিনা।

—হ্যাঁ, তাতেই বা কি হল? ফোমিনের মনে হয় ওর হাতে এখন অসীম ক্ষমতা। সামান্য নেশার ঘোরে বেশ উঁচু ধারণা হয়েছে নিজের সম্পর্কে, কাউকে এখন পরোয়া করে না। গোঁফে তা দিয়ে পিয়োত্রার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল মস্ত মাতব্বরের মতো ভঙ্গি করে।

পিয়োত্রা তোয়াজ করে ওকে, চালচলনে খুব বিনয়ী আর বংশবদ ভাব দেখায় যদিও সুরটা ওর আরো যেন একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে :

—তুমি আর আমি তো একসঙ্গেই চাকরি করতাম। তুমি আমার সম্পর্কে নিশ্চয় খারাপ কিছু বলতে পারবে না। কখনো তোমাদের শত্রুতা করেছি? কখ্‌খনো না। ভগবান সাক্ষী, যা কিছু করেছি, কসাকদের পক্ষে হয়েই করেছি বরাবর।

—সে আমরা জানি। তুমি ভয় পেয়ো না পিয়োত্রা পান্তালিয়েভিচ! আমরা ওদের হাড়ে হাড়েই চিনি। তোমাকে ওরা ছোঁবেও না। কিন্তু কেউ কেউ আছে যাদের গায়ে আমরা হাত তুলবই! এখনো অনেক কালসাপ আড়ালে হাতিয়ার ছিপিয়ে রেখেছে।.. তোমাদেরগুলো সব ফিরিয়ে দিয়েছ তো? অ্যাঁ?

ফোমিনের ঢিমে-তেতালা কথাগুলো বদলে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি তাগিদভরা জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়ায় যে, প্রথমটা পিয়োত্রা বেসামাল হয়ে পড়ে, মুখটা ওর লাল হয়ে ওঠে

টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে ফোমিন আবার জেরা করে—ফিরিয়ে দিয়েছ তো ওগুলো? কী, চুপ করে রইলে যে?

—হ্যাঁ, তা তো দিয়েছি ইয়াকভ ইয়েফিমিচ। দিইনি ভেবেছ...খোলা মনেই...।

—খোলা মনে! তোমাদের খোলা মন আমাদের জানা আছে! আমি তো এখান-কারই মানুষ হে! নেশার ঘোরে চোখ পিট্পিট্ করে ও—এক হাত পয়সাওয়ালা কসাকদের হাতে মেলানো, অন্য হাতে ছোরা...। যতোসব কুত্তা! এখানে কোনো খোলা মন-টন নেই হে। জীবনে তো অনেক মানুষই ঘাঁটিয়ে দেখলাম। যত বেইমান! যাক্, তুমি কিন্তু ঘাবড়িও না, ওরা তোমাদের ছোঁবেও না। আমার কথার দাম আছে!

সন্ধ্যের মুখেই বাড়ির দিকে রওনা হয় পিয়োত্রা। মেজাজ ওর চাঙা হয়ে উঠেছে, আবার নতুন করে আশা জাগছে মনে।

* * *

পিয়োত্রাকে বিদায় দিয়ে পান্তালিমন গিয়েছিল বুড়ো করশুনভের সঙ্গে দেখা করতে। লালফৌজ আসার ঠিক আগেই সে পেঁছিলো করশুনভের ঘরে। মিৎকা পালাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, লুকিনিচ্না তাই গোছগাছ করে দিচ্ছে। লণ্ডভণ্ড অবস্থা ঘরের। হয়তো ওদের অসুবিধা হবে এই ভেবে পান্তালিমন বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু পরে আবার ভাবল, গিয়ে একবার দেখেই আসা যাক ওরা কেমন আছে। বসে দু'দণ্ড আলাপ করা যাবে দিনকালের অবস্থা নিয়ে।

উঠোনে দেখা হল গ্রিশাকার সঙ্গে! খুনখুনে দুর্বল মানুষ, অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেছে। আজ রবিবার, তাই সাঁঝের ধর্মমঙ্গল শুনতে যাচ্ছে। বুড়োকে দেখে পান্তালিমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তুর্কী-লড়াইয়ের আমলে যতো ক্রস্ আর পদক সে পেয়েছিল সব তার ভেড়ার-চামড়ার কোটের তলায় ঝক্মক্ করছে, সাবেকী আমলের উর্দি'র খাড়া কলারে উদ্ধতভবে জেল্লা দিচ্ছে ছোট ছোট লাল কাঁধ-বুটি। পুরনো ডোরাদার পাৎলুন যত্ন করে গুঁজে নিয়েছে সাদা মোজার মধ্যে। মাথায় সামরিক টুপি, তাতে একটা চুড়ো বসানো।

–এ কী ঠাকুরদা! তোমার মাথার ঠিক আছে তো? এই অসময়ে মেডেল ঝুলিয়েছ, চুড়োতোলা টুপি পরেছ?—বুড়ো কানের পাশে হাত রেখে বললে—অ্যা?

—বলছি ওই চুড়োটুপি হটাও। ওসব মেডেল-কুরুশ খুলে ফেল। এভাবে বেরুলে ওরা তোমার গ্রেপ্তার করবে যে। সোভিয়েত সরকারের আমলে এসব চলবে না, ওদের আইনে এ সবের হুকুম নেই।

—কতো ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে সাদা জারের সেবা করেছি, বুঝলে বাছা। আর এ গবর্ন-মেণ্টের পেছন তো ভগবান নেই। একে গবর্নমেণ্ট বলে মানিই না আমি। আমি শপথ নিয়েছিলাম জার আলেক্জান্দারের কাছে, চাষীদের কাছে নয়!—ফ্যাকাশে ঠোঁট-দুটো চুষে বুড়ো ছড়ি উঁচিয়ে বাড়ির দিকে দেখালে—মিরনকে চাই? সে বাড়িতেই আছে। কিন্তু মিৎকাকে সরে পড়তে হল। হে স্বর্গের দেবী, ওকে একটু দেখো! তোমার ছেলেরা তো সবাই রয়ে গেল, তাই না? কী চমৎকার কসাক হয়েছেন সব! শপথ নেবার বেলায় ঠিকই নিয়েছিল, আর এখন যখন ফৌজের দরকার পড়ল তখন বউয়ের আঁচল ধরা। নাতালিয়া ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ। কিন্তু ক্রস্‌গুলো খুলে ফেল! হা ভগবান—তুমি যে বড়ো নরম হয়ে গেলে গো ঠাকুরদা!

—ঈশ্বর তোমার সহায় হোন! আমাকে শেখাবার বয়েস তোমার এখনো হয়নি' পান্তালিমনের দিকে সোজা ধেয়ে এল বুড়ো। মেলেখফ নিরাশভাবে মাথা নেড়ে একপাশে বরফের মধ্যে সরে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

মিরন গ্রিগরিয়েভিচ এল পান্তালিমনের সঙ্গে দেখা করতে—আমাদের বুড়ো সেপাইকে দেখলে? মাথায় বিপদ ডেকে আনার ফিকির করেছে বেশ! মেডেল এঁটে, মাথায় টুপি চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল! একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা কথা বুঝতে চায় না।

লুকিনিচ্‌না এসে বসল কসাকদের মধ্যে—করুক গে' যাতে শান্তি পায়। বেশিদিন তো আর নয়!—তিক্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলল কথাটা। —তারপর তোমাদের খবর কি? শুনলুম নাকি বাউণ্ডুলেগুলো গ্রিশ্‌কাকে তাড়া করেছিল? আমাদের চারটে ঘোড়া নিয়ে গেছে। শুধু মাদী আর বাচ্চাটাকে রেখে গেছে। সবই তো লুটে নিলে আমাদের।

মিরন এমনভাবে চোখদুটো কুঁচকে রইল যেন কারুর দিকে তাক্‌ করছে। নতুন ধরনের একটা সবজান্তা ঢঙে সে বললে—আমাদের জীবনটা যে গোল্লায় যাচ্ছে তার কারণটা কী? কে এর জন্য দায়ী? সব এই শয়তান গভর্নমেণ্টের কাজ। সবাইকে সমান করে দেওয়াটা বুদ্ধির কাজ হল? আমার প্রাণটাও যদি টেনে বের করে নাও তবু আমি মানতে পারব না এ জিনিস। সারা জীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেললাম, আর আজ কিনা বলছে আমায় সমান হতে হবে,—যারা কোনোদিন প্রয়োজনের খাতিরে কুটো-গাছটি নাড়ল না, সমান হতে হবে তাদের সঙ্গে। না, না, সবুর করো আর কিছুদিন' এই গভর্নমেণ্ট সৎ চাষী জোতদারের রক্তের শিরা কেটে তবে ছাড়বে। তখন আমরা কাজ করব কোন্‌ দুঃখে ,কার জন্যই বা খাটব? দনিয়েৎসের ধারে এখন লড়াইয়ের আঙিনা সরে গেছে। কিন্তু ওখানেই কি থামবে ভাবো? যাদের ওপর আমি ভরসা করতে পারি, তাদের আমি বলি, দনিয়েৎসের ওপারে আমাদের যে-সব কসাক ভাই রয়েছে তাদের সাহায্য করা উচিত।...

পান্তালিমন সাবধানে, কোনো কারণে গলার আওয়াজটা খুব নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—কিন্তু কেমন করে তা হবে?

—কেমন করে ? কেন, এ গভর্নমেণ্টকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে! হ্যাঁ, এমন জোর লাথি মারতে হবে যে ওরা আবার ফিরে যাবে তাম্‌বভ প্রদেশে। সাম্য করতে হয় তো সেখানকার চাষীদের সঙ্গে করুক গে' যাক্‌। আমি আমার শেষ সুতোগাছি সম্বলটুকু পর্যন্ত দেব এই দুশমনগুলোকে খতম করবার জন্যে। এখনই তো সময়, নয়তো এর পর অনেক দেরি হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, হঠাৎ ওদের ওপর হামলা চালানো চাই! রেজিমেণ্টগুলো তো সব চলে গেছে, গাঁয়ের পরিষদসভ্যরা শুধু রয়েছে। ওদের নিকেশ করা খুব কঠিন কাজ হবে না!

পান্তালিমন সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সাবধানে প্রত্যেকটা কথা ওজন করে মিরনকে উপদেশ দেয় উৎকণ্ঠার সঙ্গে :

—তবে যেন গলতি না হয় খেয়াল রেখো! নয়তো নিজেই খাল কেটে কুমীর ডেকে আনবে। একবার যদি কসাকগলো মন বেঁকিয়ে বসল তো কোথায় তার শেষ তা শয়তানই জানে। আজকালকার দিনে এসব কথা সকলের কাছে না বলাই ভালো।

ছোকরা কসাকগুলোর হালচাল তো আমি একেবারে বুঝতেই পারি না। কেউ কেউ সরে পড়ল, কেউ কেউ রয়ে গেল। বড্ডো কঠিন দিনকাল। জীবন তো আঁধার হয়ে উঠল।

মিরন হেসে মেনে নিল কথাটা—কিছু ঘাবড়িও না! আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি না। লোক তো সব ভেড়া ঃ যেদিকে সর্দার ভেড়া যাবে, গোটা পালটাই যাবে সেদিকে। আমাদের দেখাতে হবে রাস্তাটা। এ গভর্নমেণ্টের সম্পর্কে লোকের চোখ খুলে দিতে হবে। যেখানে মেঘ নেই, সেখানে বাজও নেই। আমি তো কসাকদের সরাসরিই বলি—তাদের বিদ্রোহ করতে হবে। এই শুনলাম নাকি সমস্ত কসাককে ওরা ফাঁসিতে ঝোলাবার হুকুম দিয়েছে। আমরা এ জিনিস কীভাবে মেনে নেব?

পান্তালিমন বাড়ি ফিরল আরো বিভ্রান্ত হয়ে, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ও। এতক্ষণে ও বুঝতে পারছে কী বিসদৃশ প্রতিকূল কতগুলো শক্তি আজ জীবনের নিয়ন্তা হতে চলেছে। ভবিষ্যৎ কুয়াশার আঁধারে। অভিজ্ঞতার ম্লান আলোয় অতীতের আভাস। এই তো মিরন করশুনভ—এক কালে সে ছিল সারা তল্লাটের সবচেয়ে ধনী কসাক। গেল তিন বছরে কোথায় নেমে গেছে তার অতো দাপট! চাষী মুনিষরা চলে গেছে, ফসলও সে বুনছে আগের চেয়ে কম, বলদ আর ঘোড়াগুলোকে পড়ে-যাওয়া টাকার দরে কী হাস্যকর দামেই না বেচতে হয়েছে তাকে। শুধু বাড়ির কারু-কাজ-করা ঝুল-বারান্দা আর নকশা মুছে-যাওয়া কার্নিশগুলোই যা সাক্ষী তার অতীত মহিমার। মিরন গ্রিগরিয়েভিচের মধ্যেও দুটো শক্তির সংঘাত চলছেঃ ওর টগবগে রক্তে বিদ্রোহের আগুন, তারই তাগিদে ও খাটে, খেতে ফসল বোনে, চালাঘর তোলে, চাষের যন্ত্রপাতি মেরামত করে, রোজগার করে টাকা। কিন্তু একটা বিষয় ওকে ক্রমেই বেশি করে ভাবিয়ে তোলেঃ যদি সবই ধুলোয় মিশে গেল তো বড়লোক হয়ে কী লাভ? —তখন সবকিছুর মধ্যেই এসে পড়ে উদাসীনতার মৃত্যু-পাণ্ডুর বিবর্ণতা। ওর জবরদস্ত হাতগুলো আর আগের দিনের মতো হাতুড়ি বা হাত-করাত চেপে ধরে না, হাঁটুর ওপর নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। অকালেই বার্ধক্য এসে যায়। এমন-কি অমন যে জমি তারও আজ আকর্ষণ নেই ওর কাছে। বসন্তের সময় যেন নেহাৎই অভ্যাসের বশে জমির কাজে লাগে—ভালো-না-বাসা বউয়ের কাছে কর্তব্যের খাতিরে যাবার মতো। নতুন নতুন সম্পত্তি হাতে এসেছে, তবু আনন্দ পায়নি, আবার যখন তা হারিয়েছে আগের মতো তীব্র আপশোসও জাগেনি মনে। লালফৌজ যখন তার ঘোড়াগুলো নিয়ে গেল, তখন সে নিজে একবারও বের হয়নি পর্যন্ত। অথচ দুবছর আগে হলে, বলদে সামান্য শণের খেত মাড়িয়েছে বলে বউকে ঠেকোনঠেঙা দিয়ে প্রায় মেরেই বসত আর কি।

পান্তালিমন খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে। তলপেটে একটা মোড়ানো ব্যথা অনুভব করছে, গলায় বমি ঠেলে উঠছে। রাতের খাওয়ার পর বউকে বলল একটু নুন-জরানো তরমুজ দিতে। তারপরেই শুরু হয় খিঁচুনি, ঘরটুকু পেরিয়ে চুল্লীর কাছে যাওয়াই কঠিন হয়ে ওঠে তার পক্ষে। ভোরের দিকে বিকারের ঘোরে ছটফট করতে থাকে টাইফাসের জ্বরের তাড়সে। ঠোঁট ফাটে, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখের সাদা অংশটুকু বিবর্ণ হয়ে ওঠে নীলের ছোঁয়া লেগে। বুড়ী দুর্ঝদিখা এসে রক্ত-মোক্ষণ করায়, শিরা থেকে দুটো সুপের বাটিতে ঘন কালো তরল রক্ত বের করে নেয়। কিন্তু তবু জ্ঞান ফেরে না পান্তালিমনের। আরো সাদা হয়ে ওঠে মুখটা, নিঃশ্বাস নেবার জন্য আঁকুপাঁকু করতে থাকে হাঁ-করা মুখটা।

॥ চোদ্দ ॥

ফেব্রুয়ারির ছ' তারিখে ইভান আলেক্সিয়েভিচ্‌কে ভিয়েশেন্‌স্কায় ডাকা হল জেলা বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে। সেদিনই সন্ধ্যায় তার তাতারস্কে ফিরে আসার কথা। মখোভের খালি বাড়িতে ওর অপেক্ষায় মিশ্‌কা কশেভয় বসে রইল পুরনো মালিকের সাবেকী অফিসে প্রকান্ড দপ্তর-টেবিলখানার পাশে। জানলার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভিয়েশেনস্কার এক মিলিশিয়া-সেপাই (ঘরে চেয়ার বলতে একখানাই আছে)। লোকটার নাম অল্‌শানভ। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সে কামরার এ ধার থেকে ওধার থুতু ছুঁড়ে ফেলছে। জানলার বাইরে মিলিয়ে যাচ্ছে সূর্যাস্তের আকাশ তারাভরা রাতের বুকে। মিশ্‌কা একটা হুকুমনামা লিখছিল স্তেপান আস্তাখভের বাড়ি খানাতল্লাসী করার, আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল তুষার-ঢাকা জানলাটার দিকে।

কে যেন বারান্দা দিয়ে হেঁটে সিঁড়ি-দরজার মুখে এল। ফেল্‌ট্‌বুটের মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ।

—এই বুঝি এল!—মিশা দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গলিবারান্দায় অচেনা পায়ের শব্দ, অজানা গলা-খাঁকারি। তারপরেই ঘরে ঢুকল গ্রিগর মেলেখভ। তুষারের ঠাণ্ডায় লাল হয়ে উঠেছে, ভুরু আর জুলফির ওপর বরফের দানা।

মিশকা বলে—এই যে! এসো এসো!

—এলাম একটা কথা বলতে। আমাদের গাড়ি চালানোর কাজে পাঠিও না। ঘোড়া-গুলো সব খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে।

—কিন্তু তোমাদের বলদগুলো? —আড়চোখে গ্রিগরের দিকে তাকালো মিশ্‌কা।

—বলদ তো আর রসদ টানার কাজে লাগবে না!

কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে, বাইরে বরফ-ঢাকা তক্তায় পায়ের খস্‌খস্‌ শব্দ। পর মুহূর্তেই ঘরের ভেতর ছুটে আসে ইভান আলেক্সিয়েভিচ।

চেঁচিয়ে বলে—উঃ ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেলাম রে! এই যে গ্রিগর! রাত-বিরেতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে যে বড়ো? উঃ, এ কোটখানা বুঝি শয়তানেই বানিয়েছিল—চালুনির মতো, হু-হু করে বাতাস ঢোকে!

জোব্বাকোটটা খোলার সময় ইভান আলেক্সিয়েভিচের চোখদুটো চক্‌চক্‌ করে ওঠে, ও বলেঃ চেয়ারম্যানের সঙ্গে তো দেখা হল, বুঝলে। তাঁর অফিসে ঢুকলুম, করমর্দন করে উনি বললেন—বসুন কমরেড!—খেয়াল কোরো, উনি জেলার চেয়ারম্যান! আর আগের আমল হলে কেমন হত? উনি হতেন মেজর-জেনারেল আর তোমাকে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত কুচকাওয়াজী ঢঙে। তাহলেই দ্যাখো, আমাদের এখনকার গভর্ণমেণ্ট কেমন—প্রত্যেকে সমান, ছোট বড়ো নেই।

ইভানের খুশিতে উপচে-ওঠা মুখখানা আর উল্লাসভরা কথাগুলোর কোনো অর্থই খুঁজে পেল না গ্রিগর। জিজ্ঞেস করল—এত খুশি হয়ে ওঠার কী হল ইভান আলেক্সিয়েভিচ?

ইভানের টোল-খাওয়া থুতনিটা কেঁপে ওঠে—খুশি হবার কী হল? উনি আমাকে মানুষ বলে মেনে নিলেন—খুশি হবো না কেন বলো? তাঁর সমান বলে ধরে নিয়ে হাতে হাত মেলালেন, বসতে বললেন...

—আজকাল তো জেনারেলরাও চটের বস্তার তৈরি শার্ট গায়ে দেয়—জুলফিতে হাত বুলোয় গ্রিগর—একজন অফিসারকে দেখেছি পেন্সিলে আঁকা পদকচিহ্ন পরতে। কসাকদের সঙ্গে তারাও করমর্দন করে...

—জেনারেলরা এসব করে, না-করলেই নয় তাই। কিন্তু এরা করছে নিজের স্বভাব থেকে। তফাতটা বুঝতে পারছ?

—কোনো তফাতই নেই। —মাথা নাড়ে গ্রিগর।

—তুমি কি ভাবো গভর্নমেণ্টও সেই একই রকম আছে? কী জন্য লড়াই করেছিলে? জেনারেলের জন্য? বলছ কোনো তফাতই নেই!

—আমি লড়েছি নিজের জন্য, জেনারেলদের জন্য নয়। সত্যি কথা বলতে কি এদের কাউকেই আমার পছন্দ নয়—না এরা, না ওরা।

—তাহলে কা'কে তোমার পছন্দ?

—কাউকেও না।

মিলিশিয়ার সেপাই অলশানভ্ কামরার এ পাশ থেকে ওপাশে সোজা থুতু ছোঁড়ে। গ্রিগরের কথায় সায় দিয়ে হাসে। ওরও যে কাউকেই পছন্দ নয় তা পরিষ্কার।

গ্রিগরকে ইচ্ছে করে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে মিশ্‌কা মন্তব্য করে—আগে তোমার এ ধরণের মতামত ছিল বলে তো জানতাম না।—কিন্তু গ্রিগর এমন ভাবই দেখাল না যে লক্ষ্যটা ওর মর্মস্থলে গিয়ে বিঁধেছে।

ও বললে—এক সময় তুমি আর আমি একরকম ভাবেই ভাবতাম।...

ইভান আলেক্সিয়েভিচ উদ্‌গ্রীব হয়ে ভাবছিল কখন গ্রিগর চলে যায়, তা হলে মিশকাকে বলতে পারবে ওর যাওয়ার কথা, জেলা চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথা। কিন্তু এ আলোচনাটা বড়ো বিব্রত করতে শুরু করল ওকে। ভিয়েশেন্‌স্কাতে ও যা দেখেছে আর শুনেছে তারই প্রভাবে জড়িয়ে পড়ল তর্কাতর্কির মধ্যে।

বলল—তুমি এখানে এসেছ আমাদের পেছনে লাগবার জন্য! গ্রিগর, তুমি নিজেই জানো না তুমি কী চাও।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সত্যিই আমি জানি না।—গ্রিগর ইচ্ছে করেই কথাটা মেনে নিলে।

—এ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে তোমার নালিশটা কী?

—তুমিই বা তাদের হয়ে বলছ কেন? এত 'লাল' কবে থেকে হলে?

—সে কথা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি না আমরা। এখনকার কথা বলো। আর গভর্নমেণ্টের ব্যাপার নিয়ে অতো বেশি বক্‌বক্ কোরো না, কারণ আমিই গ্রামের চেয়ারম্যান। তোমার সঙ্গে এখানে বসে তর্ক করা আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

—তা'হলে ছাড়ান দাও। আমি এসেছিলাম গাড়ি জবরদখল করার ব্যাপার নিয়ে বলতে। তোমাদের এ গভর্নমেণ্টের কথা যাই বলো না কেন, এ এক নচ্ছার গভর্নমেণ্ট।

আর তোমরা তার তারিফ করো যেন মা তার ছেলের কথা বলছে ঃ 'এটি আমার হতকুচ্ছিত খুদে বাচ্চা, তবু তো আমাদেরই ছেলে গো।' আচ্ছা সোজাসুজি আমায় বলো তো, সব মিটে যাক্ ঃ আমাদের কসাকদের কী উপকারটা এতে হচ্ছে?

—কোন্ কসাকদের? কসাক তো অনেক কিসিমের।

—যতো কসাক আছে সব্বার কথাই ধরো।

—মুক্তি, সমান অধিকার...সবুর...

—ওসব তো ওরা বলত ১৯১৭ সালে. এখন কিছু ভালো জিনিস শোনাক্!—গ্রিগর বাধা দিয়ে বললে—ওরা কি আমাদের জমি দিচ্ছে? নাকি স্বাধীনতা? সবাইকে কি ওরা সমান করে দিচ্ছে? আমাদের এত জমি আছে যা দিয়ে আমাদের রাজা করে দেওয়া যায়। যা আছে তার চেয়ে বেশি স্বাধীনতারও দরকার নেই আমাদের। আগে আমরা নিজেরা আতামান বেছে নিতাম. এখন আমাদের ঘাড়ের ওপর তাদের চাপানো হচ্ছে। কসাকদের অপকার করা ছাড়া আর কিছুই এ গভর্নমেণ্ট করবে না। এ তো চাষীদের গভর্নমেণ্ট। আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই এ গভর্নমেণ্টের। সাবেকী জেনারেলদেরও আমরা চাই না। কমিউনিস্ট আর জেনারেল, ও সবই এক ঃ আমাদের ঘাড়ের ওপর ওরা জোয়াল বই আর কিছু নয়।

—ধনী কসাকদের না-হয় দরকার নেই, কিন্তু অন্যদের বেলায়? তুমি একটি আকাট! গাঁয়ে ধনী কসাক আছে তিনজন, আর কতো জন গরিব? তারপর মজুর-মনিষদের কথা ভাবতে হবে না? না হে, তোমার মত আমরা মেনে নিতে পারছি না। ধনী কসাকরা তাদের নিজেদের ভাগ থেকে খানিকটা ছেড়ে দিক গরিবদের হাতে। তা যদি না দেয়, তাহলে আমরাই নিয়ে নেব, সেইসঙ্গে ওদের ছাল-চামড়াও ছাড়িয়ে নেব! আমাদের মাথার ওপর বসে ওদের মাতব্বরি ফলানো আমরা অনেক সয়েছি! ওরা জমি চুরি করেছে...

—চুরি করেনি. লড়াই করে জিতে নিয়েছে। আমাদের বাপ-দাদারা জমির জন্য রক্ত ঢেলেছিল, তাই বুঝি এ মাটি এত কালো।

—তাতে কিছু আসে যায় না। যাদের এ জমির প্রয়োজন আছে তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে।...কিন্তু তুমি...তুমি হলে বাড়ির ছাদের মোরগ-কলের মতো—যখন যেদিকে হাওয়া, তখন সেদিকে ঝোঁকো। তোমাদের মতো মানুষই যতো গণ্ডগোল পাকায়।

—আমাকে গালাগালিটা না দিলেও চলত! আমি এসেছিলাম আমাদের আগেকার বন্ধুত্বের খাতিরে। আমার মনের ভেতর যা তোলপাড় করছে তাই খুলে বলতে। তোমরা বল 'সমান অধিকার'। নিরীহ মুখ্য মানুষদের এই ভাবেই বলশেভিকরা বশ করেছে। সুন্দর সুন্দর কথা বলে শেষে মাছের মতো জালে আটকে ফেলে তারা। কোথায় আছে তোমার সমান অধিকার?' লালফৌজের কথাই ধর। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলে গেল; পল্টনী অফিসারদের পায়ে পাকা চামড়ার বুট আর 'রামা-শ্যামার' পায়ে সেই ন্যাকড়ার পট্টি! কমিসারদের সবাইকে দেখলাম চামড়ার পোশাকে ঃ পাতলুন, কোট, সবকিছু। আর অন্যদের একজোড়া জুতো বানাবার মতো চামড়াও জোটেনি। এইতো সোভিয়েত সরকার এক বছর হল হয়েছে, গদিতে বেশ কায়েম হয়েই বসেছে। কিন্তু তাদের সমান অধিকারটা কোথায়? লড়াইয়ের ময়দানে আমরা বলতাম অফিসার আর সেপাইদের মাইনে হবে সমান। কিন্তু বড়োলোক যতো পাজিই হোক্ চাষা বড়োলোক হলে দশগুণ পাজি হয়। পুরনো অফিসাররা খারাপ ছিল সত্যি কথা. কিন্তু একজন কসাক যখন অফিসার হয় তখন চোখ বুজে যমের বাড়ির রাস্তা ধরতে পারো. ওর চেয়ে খারাপ আর হতেই পারেনা। আর-

দশটা কসাকের মতোই বিদ্যের দৌড়, বলদের লেজ মুড়িয়ে ধরতেই শিখেছিল, অথচ আজ তার দাপট দ্যাখো! দুনিয়ায় নিজের রাস্তা করে নিয়েছে, দেমাকের চোটে অন্ধকার দেখছে, নিজের গদিটা বজায় রাখবার জন্য পারলে যে-কোনো জ্যান্ত লোকের চামড়া ছাড়িয়ে নেয়।

—তোমার কথাগুলো বিপ্লবের শত্রুদের মতো—কঠিন গলায় ইভান আলেক্সিয়েভিচ বলে, গ্রিগরের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। —তোমার রাস্তায় আমাকে নেবার চেষ্টা কোরো না, আমিও তোমাকে শেখাতে চাই না। তোমার সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয়েছিল তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। তুমি যে বদলে গেছ সে কথা সামনাসামনিই বলছি। তুমি সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের শত্রু।

—তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি। তার মানে যদি গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে কিছু ভাবি তো সেটা বিপ্লবের শত্রুতা হবে, তাই নাকি?

অলশানভের তামাকের থলিটা চেয়ে নিয়ে আরেকটু মোলায়েম সুরে বললে—

—তোমাকে বোঝাই কি করে বলো তো? মানুষ নিজেদের মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে এ সব বুঝে নেয়। কথা দিয়ে বোঝাতে হলে আমি পেরে উঠি না, কারণ তুমিও কিছু জানো না, আমিও অশিক্ষিত মানুষ। অনেক ব্যাপার বুঝতে হলে আমার নিজেরই খুঁজেপেতে হাতড়ে বেড়াতে হয়...

মিশ্‌কা চটে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে : এ সব কথা ঢের শুনেছি!

সকলে একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ে। গ্রিগর চুপচাপ। বিদায় নেবার সময় ইভান আলেক্সিয়েভিচ বলে :

—তুমি যা ভাবো তা বাইরে প্রকাশ নাই-বা করলে। নয়তো হবে কি জানো, যদিও আমি তোমাকে জানি তবু তোমার মুখ বন্ধ করার রাস্তা আমায় দেখতে হবে। কসাকদের মনে খট্‌কা এনে দেবার চেষ্টা কোরো না, ওরা এমনিতেই টাল-মাটাল করছে। আর আমাদের ব্যাঘাত ঘটাতেও এসো না, তাহলে তোমাকে পিষে ফেলব। তাহলে আসি।

গ্রিগর চলে যাবার সময় এইটুকু বুঝে নিল যে ওর সামনে আর দ্বিতীয় রাস্তা খোলা নেই। আগে যা অনিশ্চিত ছিল এখন তা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। অনেক দিন ধরে ও মনে মনে যা ভেবে এসেছিল তাই আজ খোলাখুলি বলল এই মাত্র। দুটো পথের মাঝখানে দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই এমন একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ওর মনে যা কখনো নীরব থাকবে না।

মিশকা আর ইভান একসঙ্গেই চলল। জেলা সভাপতির সঙ্গে দেখা হবার ব্যাপারটা বলতে শুরু করে ইভান, কিন্তু বলার সময় ঘটনাটার সমস্ত বর্ণাঢ্যতা আর তাৎপর্য যেন ফিকে হয়ে আসে। আগের সেই আনন্দমুখর ভাবটা আবার ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ও, কিন্তু পারে না। কী যেন একটা বাধা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। ওর বাঁচার আনন্দটুকু কেড়ে নিয়ে ওকে তাজা তুহিনস্নিগ্ধ হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। গ্রিগর আর তার কথাবার্তাগুলোই হয়েছে এই বাধা। আলোচনার কথাগুলো মনে পড়তেই ঘৃণাভরা গলায় ও বলতে থাকে :

—গ্রিগরের মতো এই সব হতভাগা খালি বাগড়া দেবে। আপদ বিশেষ! কোনো-কালেও ডাঙায় উঠবে না, গোবরের মতো কেবল স্রোতেই ভেসে চলবে। আরেকবার আসুক না, আচ্ছামতো দিয়ে দেব! আর যদি গোলমাল ছড়াতে শুরু করে তো শাস্তিতে কবরের নিচে থাকার ব্যবস্থা করে দেব। কী বলো হে তুমি? তারপর কেমন চলছে, মিশ্‌কা?

মিশ্‌কা ওর দিকে মুখ ফেরায়, মেয়েলি ঠোঁটে মুচ্‌কি হাসির রেখাঃ

—রাজনীতি যে কী বিচ্ছিরি এক জিনিস, রামোঃ! যা খুশি তাই নিয়ে হাজার রকম কথা বলতে পারো, কিন্তু রাজনীতি এমন চীজ যে নিজের ভাইকেও দুশমন বানিয়ে দেয়। এই ধরো না গ্রিগরঃ সেই যখন আমরা ইস্কুলে পড়ি তখন থেকে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব, আমার নিজের ভাইয়ের মতো। আর এখন দ্যাখো কথা বলতে শুরু করলাম তো মেজাজ আমার এমন খিঁচড়ে গেল যে রাগে হৃৎপিণ্ডটা তরমুজের মতো ফেটে পড়ে আর কি! মনে হচ্ছিল যেন আমার কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিতে চায়। রাহাজানি! কথা বলতে বলতে আমি বোধ হয় ওকে খুনই করে ফেলতে পারতাম। এ যুদ্ধে ভাই বা বন্ধুর ঠাঁই নেই। সিধে রাস্তা বেছে নাও, ব্যস্‌ তাই ধরে চলো।—অসহ্য আঘাতের অনুভূতিতে কাঁপতে থাকে মিশকার গলা—আমার মেয়ে-বন্ধুদের ও হাত করে নিয়েছে তাতেও আমি এতটা চটিনি যতোটা চটেছি ওর কথাবার্তায়। তাহলেই বোঝো কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা!

* *

বরফ পড়ে-পড়ে গলে যায়। দুপুর বেলায় পাহাড়ের গায়ে জড়ো হয়ে-থাকা বরফ ভোঁতা গুর্‌গুর্‌ আওয়াজ করে নিচে গড়িয়ে আসতে থাকে। ওকগাছের গুঁড়ি থেকে তুষারের আস্তর খসে পড়েছে। ফোঁটা ফোঁটা জল ডাল থেকে ঝরে সিধে বরফ ফুঁড়ে মাটি অবধি চলে যায়। বসন্তের মাদকতাময় তৃণগন্ধ এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে, বাগবাগিচায় চেরীফলের সৌরভ। ডনের বরফ আস্তরে গর্ত ফুটে উঠছে, নদীর পাড় থেকে সরে গেছে বরফ, স্বচ্ছ সবুজ জল গর্তগুলোর কিনারা দিয়ে উপচে পড়ছে।

গোলাবারুদ নিয়ে এক সার রসদগাড়ি দনিয়েৎস্‌ রণাঙ্গনের দিকে যাচ্ছিল। তাতারস্কে শ্লেজ বদল করতে এল ওরা। সঙ্গে যেসব লালফৌজী সেপাই রয়েছে তারা সবাই ফুর্তিবাজ ছেলে। ওদের অধিনায়ক বিপ্লবী কমিটির বাড়িতেই রয়ে গেল ইভান আলেক্সিয়েভিচের ওপর নজর রাখার জন্য। বললে—তোমার সঙ্গেই আমি থাকব, নয়তো টের পাবার আগেই কখন হয়তো কেটে পড়বে তুমি। অন্যরা গেল শ্লেজ জোগাড় করতে। সাতচল্লিশটা জোড়া-ঘোড়ায়-টানা শ্লেজ দরকার।

মখভের পুরনো কোচোয়ান ইয়েমেলিয়ান মেলেখভদের বাড়ি এসে দেখা করল পিয়োত্রার সঙ্গে।

বললে—বকোভায়ায় গোলাবারুদ নিয়ে যাবার জন্য ঘোড়া তৈরি রাখো হে।

চুলের ডগাটি অবধি না ফিরিয়ে পিয়োত্রা ঘোঁত ঘোঁত করে বললে—

ঘোড়াগুলো সব খোঁড়া। কাল ঘুড়ীটাকে নিয়ে ভিয়েশেন্‌স্কায় গিয়েছিলাম জখম লোকদের পার করে দেবার জন্য।

ইয়েমেলিয়ান আর দ্বিতীয় কথা না বলে বোঁ করে ঘুরেই ছুটল আস্তাবলের দিকে। ওর পেছন পেছন ছুটল পিয়োত্রা। চেঁচাতে লাগল—

—এই, শুনতে পাচ্ছিস? একটু দাঁড়া...

পিয়োত্রার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে ইয়েমেলিয়ান বললে—ওসব ভাঁড়ামি এখন রাখো! তোমার ঘোড়া আমি দেখতেও চাইনে। নিজেই খোঁড়া করে রেখেছ সে আমি আন্দাজ করেছি আগেই। আমার চোখে ধুলো দেয়া তোমার কম্ম নয়। তুমি জীবনে

যতো ঘোড়ার নাদ দেখেছ তার চেয়ে বেশি ঘোড়া দেখেছি আমি। ওদের সাজ পরাও ঃ ঘোড়াই হোক্ আর বলদই হোক্, আমার কাছে সব সমান।

গ্রিগর রসদগাড়ির সঙ্গে চলল। যাবার আগে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে বাচ্চাকাচ্চাদের চুমু খেয়ে তড়বড় করে বললে ঃ

—তোদের জন্য চমৎকার একটা জিনিস নিয়ে আসব, কিন্তু ভালোভাবে থাকবি আর মা যা বলে তা শুনবি। —পিয়োত্রাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বললে—আমার জন্য চিন্তা কোরো না। বেশিদূর যাব না। যদি বকোভায়ারও ওধারে যেতে বলে তো বলদগুলো ফেলেই চলে আসব। তবে গ্রামে হয়তো আর নাও ফিরে আসতে পারি। ভাবছি একবার সিন্‌গিনে আমাদের পিসিমার ওখানে যাব। এখানে পড়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না।—হাসল গ্রিগর—তাহলে আসি।

ঢিমে তালে পায়ে-পায়ে চলা বলদগুলোর পেছনে শ্লেজে হেলান দিয়ে বসে গ্রিগর ভাবছিল—জীবন যাতে আরো উন্নত হয় তার জন্য লালফৌজ লড়ছে, কিন্তু উন্নত জীবনের জন্য আমরা তো আগেই লড়েছি। এ জীবনে একমাত্র ধ্রুব সত্য বলে কিছু নেই। অন্যের ওপর খবরদারি করতে গেলেই ভুগতে হবে নিজেকে। আর আমি কিনা বোকার মতো সত্যের খোঁজ করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে গেলাম, একবার এটাকে একবার ওটাকে আঁকড়ে ধরলাম। সেকালের সেই তাতাররা ডন দখল করেছিল, আমাদের গোলাম বানাতে চেয়েছিল। আর আজ রাশিয়ার পালা। ওদের সঙ্গে আমাদের শান্তিতে থাকা চলবে না। আমার কাছে কিংবা যে কোনো কসাকের কাছেই ওরা কাফের। আমরা লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়েছি, এখন সকলেই আমাদের মতো পালাবার কথা ভাবছে কিন্তু এখন আর সময় যে নেই।

মাঝে মাঝে অলসভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলদগুলোকে তাড়া লাগায় আর ঝিমোয় গ্রিগর। গোলাবারুদের বাক্সগুলোর ধারে গুটিশুটি মেরে বসে আছে। একটা সিগারেট শেষ করে ও খড়ের মধ্যে নাক গোঁজে। শুকনো তেপাতা আর জুলাই-দিনের মিষ্টি সোঁদা গন্ধ ওতে। ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়ে ও। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে আকসিনিয়ার সঙ্গে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথা-উঁচিয়ে থাকা ফসলের খেতের ভেতর দিয়ে। আকসিনিয়ার কোলে একটি ছেলে, তাকে খুব সাবধানে নিয়ে চলেছে ও। গ্রিগরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। গ্রিগর নিজের বুকের ধুক্‌ধুক্ আওয়াজটুকু অবধি শুনতে পাচ্ছে যেন, আর কানে আসছে গমের শীষের মর্মর সঙ্গীত। দেখতে পাচ্ছে খেতের অর্গ ধরে উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের রেখা, আকাশের গাঢ় নীল। আবার আগের সেই উজাড়-করা ভালোবাসা দিয়ে ও আক্‌সিনিয়াকে ভালোবাসে। সারা দেহ আর হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন দিয়ে ওকে ভালোবাসার অনুভূতি জাগে গ্রিগরের মনে। কিন্তু একই সঙ্গে ও বুঝতে পারে এ তো সত্যি নয়, স্বপ্ন। চোখের সামনে যে রঙের সম্ভার দেখছে, এ তো স্বপ্নরাজ্যের মৃত্যু বর্ণাভা। তবু এ স্বপ্নে ও উল্লসিত হয়ে ওঠে, এটাকেই জীবন বলে ধরে নেয়। পাঁচ বছর আগে আক্‌সিনিয়া যেমন ছিল তেমনই আছে, কেবল আরো সংযত, আরো নিরুত্তাপ হয়েছে এই যা।..

শ্লেজের ঝাঁকুনিতে হঠাৎ গ্রিগরের ঘুম ভেঙে গেল। অনেকগুলো গলার আওয়াজ শুনে ও সামলে নিল নিজেকে। তাকিয়ে দ্যাখে লম্বা এক সার রসদবাহী শ্লেজ ওদের পাশ কাটিয়ে পেছন দিকে চলে যাচ্ছে।

গ্রিগরের সামনে ছিল বদোভ্‌স্কভ্। ঘড়ঘড়ে গলায় ও জিজ্ঞেস করে—গাড়িতে কী আছে হে দোস্ত?

শ্লেজের পাটা ক্যাঁচক্যাঁচ্ করে ওঠে, বরফে মুচমুচ্ আওয়াজ তোলে বলদের জোড়া-খুরগুলো। অনেকক্ষণ অবধি চুপচাপ, কেউ কোনো জবাব দেয় না। অবশেষে চালকদের মধ্যে একজন বলে :

—মড়া আছে। টাইফাস্ হয়ে মরেছিল...

গ্রিগর চোখ তুলে দ্যাখে। তেরপল-ঢাকা সব লাশ পড়ে আছে পাশ কাটিয়ে যাওয়া শ্লেজগুলোর ওপর। গ্রিগরের নিজের শ্লেজের গরাদগুলো গুঁতো খায় তেরপলের তলা থেকে বেরিয়ে-আসা একখানা হাতের সঙ্গে। মানুষের মাংসের একটা ভ্যাপ্সা, লোহা লোহা গন্ধ বেরোয়। গ্রিগর উদাসীনভাবে মাথা ঘুরিয়ে নেয়।

তেপাতা ঘাসের মাদকতাময় মন-টানা গন্ধে আবার ঘুম আসতে চায়, আধেক-ভুলে-যাওয়া সেই আগের কথা আবার মনে পড়িয়ে দেয় এ গন্ধ। নতুন করে আগের সেই সুখের অনুভূতি জাগে। বুক-ফাটা অথচ মধুর একটা বেদনাবোধ নিয়ে ও শ্লেজের ওপর গা এলিয়ে দেয়। তেপাতার হলদে ডাঁটির ছোঁয়া লাগে গালে। কিন্তু বুকটা ওর ভয়ানক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে, ঘুম আসে বড়ো দেরিতে।

॥ পনেরো ॥

❋

তাতারস্ক্ বিপ্লবী কমিটির দপ্তরে জড়ো হয়েছে অল্প কয়েকজন মানুষ। দাভিদ আছে, তিমোফেই, মখোভের পুরনো কোচোয়ান ইয়েমেলিয়ান আর মুখে বসন্তের দাগওয়ালা মুচি ফিল্কাও আছে। এই দলটার ওপরেই ইভান আলেক্সিয়েভিচকে নির্ভর করতে হচ্ছে তার দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে, কারণ ও জানে একটা অদৃশ্য দেওয়াল গড়ে উঠছে ওর আর গাঁয়ের বাকি সকলের মধ্যে। কসাকরা মিটিঙে আসা বন্ধ করেছে। এলেও সেই যতোক্ষণ না দাভিদ বাড়ি-বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করে সবাইকে খবর দিচ্ছে ততোক্ষণ আসে না। তারপর আবার এসে মুখ বুজে সবতাতেই সায় দেয়। এসব মিটিঙে যুবক কসাকরাই বেশি থাকে সংখ্যায়। কিন্তু তাদের মধ্যেও কোনো দরদী সমর্থক নেই। পাথরের মতো মুখ, অবিশ্বাসের দৃষ্টি আর চোখ নামিয়ে নেওয়া—সভার কাজ চালাতে গিয়ে এই সবই নজরে পড়ে ইভানের। বুকটা ওর কঠিন হয়ে ওঠে, চোখ দুটোয় কাতর দৃষ্টি ফুটে ওঠে, দুর্বল গলার আওয়াজে আত্মবিশ্বাসের অভাব। একদিন মুখে বসন্তের দাগওয়ালা ফিল্কা খোলাখুলি বলে ফেলে :

—গাঁয়ে তো একেবারে একঘরে হয়ে গিয়েছি কমরেড ইভান। লোকগুলো সব শয়তান হয়েছে। কাল লালফৌজের জখম সেপাইদের ভিয়েশেন্স্কাতে নেবার জন্য শ্লেজ খুঁজতে গেলাম, কিন্তু কেউ যেতে চায় না।

ইয়েমেলিয়ান বলে ওঠে—এদিকে কিন্তু দারুণ মদ চালাচ্ছে! ঘরে ঘরে ভদ্‌কা চোলাই।

ভুরু কোঁচকায়। নিজের মনের ভাবটা চেপে রাখে। কিন্তু সন্ধ্যের সময় যখন ওরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে তখন ইভান আলেক্সিয়েভিচকে বলে :

—আমায় একটা রাইফেল দাও।

—কি জন্যে?

—খালি হাতে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে না। কেন, তুমি কি কিছু লক্ষ্য করোনি? কাউকে গ্রেপ্তার করা দরকার বলে মনে হচ্ছে আমার...গ্রিগর মেলেখভ, বুড়ো বল্‌দিরেভ মাৎভেই কাশুলিন আর মিরন করশুনভদের গ্রেপ্তার করতে হবে। ওরা কসাকদের কানে মন্তর দিচ্ছে, গোখরোর ঝাড় সব। দনিয়েৎস্‌ থেকে নিজেদের দলের লোক আসবে সেই আশায় আছে।

ইভান আলেক্সিয়েভিচ সদুঃখে হাত নাড়ে। - অতোজনকে যদি আমরা গ্রেপ্তার করতে শুরু করি, তাহলে সবাইকেই গারদে পুরতে হয়। কয়েকজন আছে যারা আমাদের দরদী, কিন্তু ওরা কেবল করশুনভের দিকে নজর রাখে। ভয় পায় পাছে তার ছেলে মিৎকা দনিয়েৎস্‌ থেকে ফিরে এসে তাদের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেয়।

ইভানের কাজটা কিন্তু আপনা থেকেই নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে সমাধা হয়ে গেল। পরদিন ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে একজন একটা জরুরি নির্দেশ জানিয়ে গেল--সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলোর ওপর কর বসাতে হবে। গ্রাম থেকে জোগাড় হবে চল্লিশ হাজার রুবল। প্রত্যেক পরিবারকে কতো দিতে হবে সেটা বিপ্লবী কমিটিই সাব্যস্ত করল। পরদিন দুথলি টাকা, মানে সবশুদ্ধ প্রায় আঠারো হাজার রুবল সংগ্রহ করা হল। ইভান আলেক্সিয়েভিচ লিখে জানালো জেলা কমিটিকে। জবাবে তিনজন মিলিশিয়া সেপাই হুকুম নিয়ে এলঃ যারা কর দেয়নি তাদের গ্রেপ্তার করে সঙ্গে পাহারা দিয়ে ভিয়েশেনস্কায় পাঠাও। চারজন বুড়োকে তখুনি ধরা হল। মখভের ভাঁড়ারঘরে যেখানে আগে শীতের আপেল রাখা হতো সেখানেই সাময়িকভাবে আটকে রাখা হল ওদের।

গাঁয়ের অবস্থা ঢিল-পড়া মৌচাকের মতো। করশুনভ সিধেসাধি টাকা দিতে অস্বীকার করলো। তা হলে কি হয়, আগে অত সুখে-স্বচ্ছন্দে কীভাবে কাটাতো তার এখন জবাবদিহি করতে হবে তাকে। ভিয়েশেন্‌স্কার এক তরুণ কসাক আটাশ নম্বর রেজিমেণ্টে কাজ করত—সেই এল খোঁজ-খবর করতে। ইভানকে সে 'বিপ্লবী আদালতের' হুকুমনামা দেখিয়ে দপ্তরঘরের মধ্যে গোপনে বৈঠক করল। তদারককারী কর্মচারীর সঙ্গী একজন বয়স্ক দাড়িগোঁপ-কামানো লোক। সে গম্ভীরভাবে বললেঃ

—জেলায় হাঙ্গামা চলেছে। যে সব শ্বেতরক্ষী দেশের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল তারা এখন মাথা তুলছে, মেহনতী কসাকদের ওপর তারা জুলুম করতে শুরু করেছে। যারা আমাদের সবচেয়ে বেশি শত্রু তাদের সরাতে হবেঃ অফিসার, পুরুত, জারের পুলিস, মোটের ওপর যারা আমাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়েছিল তাদের সবাইকে সরাতে হবে। আমরা একটা তালিকা বানিয়ে ফেলব। আপনারা তদারককারীকে সব রকম সাহায্য দেবেন। কয়েকজনকে উনি আগে থেকেই চেনেন অবিশ্যি।

লোকটার পরিষ্কার কামানো মুখের দিকে ইভান তাকিয়ে দেখল, তারপর এক এক করে পরিবারগুলোর নাম বলে গেল। পিয়োত্রা মেলেখভের নামও সে বলল, কিন্তু তদারককারী অফিসার মাথা নাড়লঃ

—উঁহু, সে আমাদের লোক। ফোমিন বলেছে ওর গায়ে যেন হাত না তোলা হয়। বলশেভিকদের সঙ্গে ওর খাতির আছে। আটাশ নম্বরে আমিও ওর সঙ্গে কাজ করেছি।

কয়েক ঘণ্টা বাদে মখোভের চওড়া উঠোনে মিলিশিয়া-সেপাইদের পাহারায় বন্দী-কসাকরা বসে রয়েছে; অপেক্ষা করছে ওদের পরিবারের কাছ থেকে খাবার, কাপড়-চোপড় আর দরকারী জিনিস আসবে বলে। একেবারে আনকোরা পোশাক পরে মিরন গ্রিগর্যেভিচ বসে আছে বুড়ো বোগাতিরিয়েভ আর মাতভেই কাশুলিনের পাশে একাধারটিতে, যেন মৃত্যুর জন্য তৈরি হচ্ছে সে। চালিয়াত আভ্‌দেয়িচ উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারি করছে উঠোনে, মাঝে মাঝে শূন্য চোখে কুয়োর ভেতরটা দেখছে কিংবা শেকলটা ধরে টানছে, তারপরেই আবার সিঁড়ি-দরজা থেকে পাল্লা-ফটক অবধি হেঁটে চলে যাচ্ছে আর আস্তিন দিয়ে ঘামভরা কাল্‌চে মুখখানা মুছছে। অন্যরা সবাই চুপচাপ মাথা নিচু করে বরফের ওপর লাঠি দিয়ে নক্‌শা কাটছে। থলি আর পুলিন্দা নিয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠোনের ভেতর ছুটোছুটি করছিল ওদের ঘরের মেয়েরা। লুকিনিচ্‌না তার বুড়োর গায়ে ভেড়ার-চামড়ার কোর্তাটা জড়িয়ে বোতাম এঁটে, বড়ো রুমালখানা তার কলারে বাঁধতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। বুড়োর ফ্যাকাশে চোখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বলে উঠল:

—দুঃখু কোরো না মিরন! হয়তো সবই ঠিক হয়ে যাবে। হা ভগবান! —বুড়ির মুখখানা কান্নায় বিকৃত হয়ে লম্বাটে হয়ে গেল। তবু ঠোঁটদুটো চেটে সে ফিসফিস্ করে বলল—আসব তোমাকে দেখতে। ব্যাঙের ছাতাও নিয়ে যাব তোমার জন্য। তুমি তো খুব ভালবাসো ওগুলো।

ফটকের কাছে মিলিশিয়ার সেপাই চেঁচাল:

—স্লেজ এসে গেছে। মালপত্র তুলে নিয়ে এবার চলো! মেয়েমানুষ সব পিছু হটো; এখন প্যানপ্যানানির সময় নয়। জীবনে এই প্রথম লুকিনিচ্‌না মিরনের লোমশ হাতে চুমু খেল, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। চৌরাস্তার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে বলদ-টানা স্লেজগুলো চলল ডনের দিকে। সাতজন বন্দী আর দুজন মিলিশিয়া-সেপাই ওদের পেছন পেছন হেঁটে চলেছে। আভ্‌দেয়িচ দাঁড়িয়ে পড়ল ওর জুতোর ফিতে বাঁধবার জন্য, তারপর আবার জোয়ান ছেলের মতো ছুটল ওদের নাগাল ধরতে। মাইদান্‌নিকভ আর করোলিয়ভ সিগারেট ফুঁকছিল। মিরন করশুনভ লেগে রইল স্লেজের সঙ্গে। বাকি সকলের পেছনে আসছে বুড়ো বোগাতিরিয়েভ গম্ভীর ভারিক্কি চালে হাঁটতে হাঁটতে। উলটো দিক থেকে হাওয়া এসে ওর সাদা, বুড়ো ঠাকুরদার মতো দাড়ির ডগা পেছন দিকে উড়িয়ে নিচ্ছে আর কাঁধের ওপর উড়ুনিটা পত্‌পত্‌ করছে বিদায়ের ইশারা জানিয়ে।

ফেব্রুয়ারির ঠিক সেই মেঘলা দিনটিতেই আরেকটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেল তাতারস্কে। ইদানিং জেলা থেকে কর্মচারীদের আনাগোনায় গাঁয়ের লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাই দুঘোড়ার স্লেজখানা যখন চালকের পাশে একজন অপরিচিত সওয়ারীকে নিয়ে চত্বরটা পার হয়ে গেল তখন কেউ খেয়ালও করল না। মখভের বাড়ির বাইরে স্লেজটা থামতে লোকটি নেমে এল। একটু বয়েস হয়েছে। চালচলনে মনে হল

ধীরস্থির। লম্বা ঘোড়সওয়ারী কোটখানা ভালো করে টেনে নিয়ে লালফৌজের ঘোড়-সওয়ারী টুপির কান-ঢাকা-দুটো কানের ওপর থেকে তুলে, 'মসার' পিস্তলের কাঠের খাপটা চেপে ধরে লোকটা আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

বিপ্লবী কমিটির দপ্তরে ইভান আলেক্সিয়েভিচ আর দু'জন মিলিশিয়া-সেপাই। দরজায় টোকা না দিয়েই ভেতরে ঢোকে আগন্তুক। লোহার মতো কালচে ছোট দাড়িটায় হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করার সুরে বলেঃ

—চেয়ারম্যানকে আমার চাই।

হাতলে আঁচড় কাটে।

চোখ বড়ো বড়ো করে বক্তার দিকে তাকায় ইভান, আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে যায়। কিন্তু পারে না। শুধু মাছের মতো ঠোঁট দুটো নাড়ে আর আঙুল দিয়ে চেয়ারের

কসাক ঘোড়সওয়ারী টুপির তলা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে স্তকমান। এক মুহূর্তের জন্য স্তকমানের চোখটা কুঁচকে ওঠে, ইভানের দিকে এমনভাবে স্থিরনিবদ্ধ হয়ে থাকে যে চিনতে পেরেছে বলে মনেই হয় না। তারপরেই চোখদুটো যেন জ্বলজ্বল করে ওঠে চোখের কোণা থেকে ছোট ছোট ভাঁজগুলো একটানা রেখার মতো রগ অবধি ছড়িয়ে পড়ে। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় ইভানের দিকে। ইভানকে জড়িয়ে ধরে ভিজে দাড়িতে ওর গাল ঘষে চুমু খায়। অবাক হয়ে বলে ওঠেঃ

—আমি জানতাম! জানতাম যে ইভান যদি এখনো বেঁচে থাকে তাহলে নিশ্চয় দেখব সে তাতারস্কে চেয়ারম্যান হয়ে বসেছে!

—অসিপ দাভিদোভিচ, আমায় চিমটি কাটো! এ হতভাগা শুয়োরটাকে একবার চিমটি কাটো! আমি যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না! —ইভান প্রায় কেঁদেই ফেলে।

ইভানের হাত থেকে নিজের হাতটা আস্তে করে ছাড়িয়ে নিয়ে স্তকমান জবাব দেয়—একেবারে জলজ্যান্ত সত্যি কিন্তু! তা, তোমার এখানে বসার-মতো কিছু নেই নাকি?

—এই নাও, এই চেয়ারে বোসো। কিন্তু তুমি এলে কোত্থেকে? আমায় বলো সব কথা।

—লাল ফৌজের রাজনৈতিক বিভাগের সঙ্গে আছি। তুমি দেখছি এখনো বিশ্বাস করতে পারছো না আমিই সেই স্তকমান! আশ্চর্য ছেলে তো! কিন্তু এ তো ভাই জলের মতো সোজা। ওরা আমাকে এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্বাসনে পাঠাল। সেই-খানেই বিপ্লবের দীক্ষা। আমি আর আরেকজন কমরেড মিলে একটা লাল-রক্ষী বাহিনী গড়ে কলচাকের সঙ্গে লড়লাম। সে এক মজার দিন গেছে ভাই! তারপর তো কলচাককে উরালের ওপারে খেদিয়ে দিয়ে এসেছি। এখন আমি তোমাদের ফ্রণ্টে। আট নম্বর ফৌজের রাজনৈতিক বিভাগ তোমাদের জেলায় কাজ করবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে—এখানেই একসময় থাকতাম আর এখানকার অবস্থাও আমার জানা আছে, সেই সুবাদে। ভিয়েশেনস্কায় এসে বিপ্লবী কমিটির লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ঠিক করলাম তাতারস্কেই প্রথমে আসব। ভাবলাম এখানে এসে থাকব, কাজ করব, তোমাদের সংগঠনের ব্যাপারে সাহায্য করব, তারপর চলে যাব আর কোথাও। আমাদের পুরনো বন্ধুত্বের কথা আমি ভুলিনি। কিন্তু সে কথায় পরে আসছি; প্রথমে এসো তোমাদের কথাই শুনি, তোমাদের এখানকার অবস্থা কি? সকলের কথাই বলো। তোমাদের সঙ্গে কে কাজ করছে? কে কে এখনো বেঁচে আছে? (মিলিশিয়ার সেপাইদের দিকে ঘুরে বললে) কমরেড, আমাকে

আর চেয়ারম্যানকে ঘণ্টাখানেকের মতো একলা ছেড়ে দেবে? উঃ, ঝামেলা! যখন গাঁয়ের ভেতর আসি, আগের দিনের সেই পুরনো গন্ধ যেন নাকে আসে।...সময়টা তখন যেন কাটতেই চাইত না, সত্যি।...যাক্, বলো এবার।

ঘণ্টা তিনেক বাদে মিশ্কা কশেভয় আর ইভান ট্যারা লুকেরিয়ার সঙ্গে স্তকমানকে নিয়ে চলল তার পুরনো ডেরার দিকে। রাস্তার বাদামি মাটির ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল ওরা। মিশ্কা মাঝে মাঝে স্তকমানের আস্তিন চেপে ধরে, ভাবখানা যেন চোখের সামনে থেকে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে কিংবা দেখা যাবে সে অশরীরী ভূত। চেরী-পাতার নির্যাস দিয়ে বানানো 'চা' খেয়ে স্তকমান চুল্লীর ধারে শুয়ে পড়ল। মিশ্কা আর ইভানের এলোমেলো গল্পগুলো শুনছিল ও আর সিগারেটের নল্‌চেটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করছিল। ভোরের আগেই তন্দ্রায় ওর চোখ বুজে এল। সিগারেটটা ছুঁড়ে দিল নোংরা ফ্লানেল শার্টের দিকে। আরো দশ মিনিট ধরে ইভান বক্‌বক্ করে যখন দেখল নাক ডাকার শব্দ ছাড়া স্তকমানের আর কোনো সাড়া নেই তখন নীরবে পা টিপে-টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। কাশি চাপতে গিয়ে ওর চোখে প্রায় জল এসে পড়ে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মিশ্কা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল—এখন ভালো মনে হচ্ছে?

* * *

অল্‌শানভ বন্দীদের সঙ্গে ভিয়েশেন্‌স্কা অবধি গিয়ে মাঝরাতেই আবার ফিরে আসে। ইভান আলেক্সিয়েভিচ যে ছোট ঘরটায় ঘুমুচ্ছিল তারই জানলায় অনেকক্ষণ টোকা দেবার পর অবশেষে ইভানের ঘুম ভাঙল।

ঘুমিয়ে চোখমুখ ফুলেছে ইভানের। বললে—কী চাই? চিঠি এনেছ, নাকি?

অলশানভ্ চাবুকটা নাড়াচাড়া করছিল। বলল—কসাকদের গুলি করে মেরেছে।

—মিছে কথা বলছ!

—ওরা যাওয়ামাত্র সবাইকে জেরা করল, তারপর সন্ধ্যে হবার আগেই একটা পাইন বনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। নিজের চোখে দেখেছি।

হাত কাঁপছিল ইভানের। কোনো রকমে ফেল্ট্ জুতো আর পোশাকটা পরে নিয়েই ও ছোটে স্তকমানের কাছে।

সখেদে বলে ওঠে—ভিয়েশেন্‌স্কাতে আজ কয়েকজন বন্দীকে পাঠিয়েছিলাম, ওদের গুলি করে মারা হয়েছে। আমি তো ভেবেছিলাম ওদের কয়েদ করে রাখা হবে, কিন্তু এ যে দেখছি অন্য ব্যাপার। এ ভাবে কিছুই করা যাবে না কখনো। লোকে আমাদের ওপর খাপ্পা হয়ে যাবে! কেন মারল ওদের? এখন কী হবে?

ইভান ভেবেছিল ঘটনার কথা শুনে স্তকমানও ওর মতোই উত্তেজিত হয়ে চটে উঠবে, কিন্তু আস্তে আস্তে গায়ে শার্টটা গলাতে গলাতে স্তকমান জবাব দিলেঃ

—আঃ চুপ করো তো এখন! লুকেরিয়ার ঘুম চটিয়ে দেবে! —পোশাক পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে আরেকবার গ্রেপ্তারের কারণগুলো জিজ্ঞেস করে নিল, তারপর ঈষৎ-কঠিন গলায় বললে—তোমার মাথায় ভালো করে ঢুকিয়ে নেওয়া উচিত ছিল ব্যাপারটা! যুদ্ধক্ষেত্র এখান থেকে একশো কুড়ি মাইল দূরে। কসাকদের বেশির ভাগই আমাদের বিরুদ্ধে, তার কারণ হল তোমাদের এই ধনী কসাক চাষী, তোমাদের আতামান

আর মোড়লদের দোর্দণ্ড প্রতাপ মেহনতি কসাকদের মধ্যে। কেন এই প্রতিপত্তি? এ প্রশ্নের জবাব তো তোমারই দিতে পারা উচিত ছিল। কসাকরা বিশেষ ধরনের এক সামরিক জাত। জারের আমলে ওদের মধ্যে এই কর্তাভজা আর 'সেনাপতি-বাপ' ভরসা ভাবগুলো ঢুকেছে। আর এই 'সেনাপতি-বাপেরাই' কসাকদের হুকুম দিত মজুরদের ধর্মঘট ভাঙতে। তিন শো বছর ধরে তারা কসাকদের ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। তার ওপর শোনো! রিয়াজান প্রদেশের ধনী চাষী কসাকদের সঙ্গে ডনের ধনী কসাক চাষীদের মস্ত বড়ো তফাত! রিয়াজানের ধনী চাষীদের শোষণ করা হয়েছে, তারা অসহায়, ওদের তরফ থেকে বিপদের ভয় আপাতত নেই। কিন্তু ডনের ধনী চাষীদের হাতে অস্ত্র আছে। তারা সাপের মতো বিষাক্ত, ভয়ংকর। তারা শুধু আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা গুজবই রটাবে না, যেমন তোমার কাছে শুনলাম করশুনভরা করেছে—ওরা খোলাখুলি আমাদের ওপর হামলা চালাতেও চেষ্টা করবে। নিশ্চয়ই করবে! রাইফেল তুলে সরাসরি গুলি চালাবে আমাদের ওপর। তোমাকে তারা খুন করবে। অন্য কসাকদের জড়ো করতে চেষ্টা করবে—যাদের অবস্থা কিছুটা ভালো, কিংবা হয়তো গরিব যারা, তাদেরও দলে টানবে। ধরো এখানকার ঘটনাই। অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছিল? আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগ ছিল তাদের সম্পর্কে? বেশ তো! অতো কথার কি দরকার, দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে দাও, ব্যস্! 'আহা কতো ভালো মানুষ', হ্যানো-ত্যানো, বলে ন্যাকা কান্নারও দরকার নেই...।

ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ হাত নাড়ে—আমি যে খুব দুঃখ পেয়েছি তা মনে কোরো না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এতে আর সবাই আমাদের বিরুদ্ধে লাগবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত স্তকমান বাইরে অন্তত একটা শান্তভাব বজায় রেখেছিল। কিন্তু এবার ফেটে পড়ল সে। ইভানের শার্টের কলার গায়ের জোরে চেপে ধরে কাছে টেনে নিয়ে প্রায় গর্জন করেই বলল:

—কেউ আমাদের বিরুদ্ধে লাগবে না যদি ওদের ভেতর আমাদের শ্রেণীসত্যটুকু ঢুকিয়ে দিতে পারি। মেহনতী কসাকদের একমাত্র সাথী আমরাই যার ওপর ওরা ভরসা করতে পারে, ধনী চাষীরা নয়। আর তুমি কি না...হায় রে খোদা! ধনী চাষীরা তাদের খাটিয়ে খায়, নিজেদের পেট মোটা করে, তাই না? উঃ, এ যে দেখছি তোমাকেই আমায় শায়েস্তা করতে হবে। তোমার মতো একজন মজুর, সেও কিনা বুদ্ধিজীবীদের মতো প্যানপ্যানানি গাইছে...ঠিক ওই ইস্কুলে খুদে সমাজ-বিপ্লবীদের মতো! আঃ ইভান!

কলারটা ছেড়ে দিয়ে, অল্প একটু হেসে স্তকমান মাথা নাড়লে, তারপর আরো নরম সুরে বললে:

—জেলার সবচেয়ে সক্রিয় শত্রুগুলোকে যদি না ধরি তাহলে ওরা মাথা চাড়া দেবে। সময়মতো ওদের আলাদা করে ফেলতে পারলে বিদ্রোহ হবে না। যদি সবাইকে গুলি করার প্রয়োজন হয় তো শুধু পাণ্ডাগুলোকেই খতম করে দেব, বাদবাকিদের পাঠাব রাশিয়ার একেবারে মাঝখানে। কিন্তু দুশমনদের সঙ্গে কোনো খাতির নেই। লেনিন বলেছেন, হাতে দস্তানা লাগিয়ে বিপ্লব করা যায় না। এই ব্যাপারটায় এতগুলো লোককে গুলি করে মারার কি সত্যিই দরকার ছিল? আমার মনে হয়, ছিল। হয়তো সকলকে নয়, তবে করশুনভকে তো বটেই। সেটা পরিষ্কার। তারপর এখন ধরো গ্রিগর মেলেখভ। আপাতত সে পালিয়েছে। হাতে-নাতেই ধরা উচিত ছিল তাকে। আর-

সবাইকে এক জায়গায় করলে যা হয় তার চেয়েও সাংঘাতিক সে। তোমার সঙ্গে যে-আলোচনা সে করেছিল তা করতে পারে একমাত্র এমন লোক যে কালই শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আর এখানে যা হচ্ছে এ তো কিছুই নয় ধরতে গেলে। লড়াইয়ের ময়দানে মজুর শ্রেণীর সবচেয়ে সেরা মানুষগুলো প্রাণ দিচ্ছে, মরছে হাজারে হাজারে। আমাদের দুঃখ হওয়া উচিত তাদের জন্য। যারা তাদের মারছে কিংবা আমাদের পেছন থেকে ছুরি মারার সুযোগ খুঁজছে তাদের জন্য আমাদের শোক করার নেই। এবার তো সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, তাই না ইভান?

ষোলো ॥

গরুবাছুরগুলোকে জড়ো করে বাড়িতে এনে সবে রান্নাঘরে ঢুকেছে পিয়োত্রা। এমন সময় বাইরের দরজার শেকলটায় আওয়াজ হল। কালো শাল মুড়ি দিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে এল লুকিনিচ্না। একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে গেল নাতালিয়ার কাছে। তার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লঃ

—মা! মা গো! কী হল?—নাতালিয়ার গলার আওয়াজটা একেবারে যেন চেনাই যায় না। মায়ের ভারী দেহটাকে তুলবার জন্য সে নিচু হল।

জবাব না দিয়ে মেঝেয় মাথা ঠোকে লুকিনিচ্না; ভাঙা-ভাঙা ভোঁতা গলায় বলে ওঠেঃ

—ওগো! তুমি আমায় ফেলে চলে গেলে কার মুখ চেয়ে!

দু'জন মেয়েমানুষ একসঙ্গে এমন আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে আর সেই সঙ্গে বাচ্চারাও এমন সুর তুলে কাঁদতে থাকে যে পিয়োত্রা চুল্লীর ধার থেকে তামাকের থলিটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে সিঁড়ির দরজায়। কী হয়েছে তা সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করে ফেলে ও। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ধূমপান করতে থাকে। রান্নাঘরে এতক্ষণে চেঁচামেচিটা থেমেছে। পিয়োত্রা ফিরে আসে, পিঠ বেয়ে যেন একটা অস্বস্তিকর ঠান্ডা কাঁপুনি নেমে গেল ওর। ভিজে রুমালে মুখ গুঁজে লুকিনিচ্না তখন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিলঃ

—আমার মিরন গ্রিগরিয়েভিচ্কে ওরা খুন করেছে রে! আমার প্রাণপাখি যে চলে গেল...। এখন কে ভরসা!... মুরগির বাচ্চাটাও যে এখন ঠোকরাবে আমাদের।—গলার আওয়াজ এবার মরাকান্না হয়ে দাঁড়াল—ওরে, সাধের চোখদুটো আজ বন্ধ হল' আর কোনোদিন খুলবে না, দিনের আলো আর দেখবে না গো!

নাতালিয়ার অচেতন দেহের ওপর দারিয়া জল ছিটোচ্ছিল। ইলিনিচ্না আঙরাখায় গাল মোছে। সামনের ঘরে পান্তালিমন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, সেখান থেকে কাশি আর কাতরানির আওয়াজ আসে।

পিয়োত্রার হাতটা টেনে পাগলের মতো বুকের ওপর চেপে ধরে লুকিনিচ্না—দোহাই খ্রীষ্টের। দোহাই ঈশ্বরের, তুই এক্ষুনি ছুটে যা ভিয়েশেন্স্কায়। যদি মরেও

গিয়ে থাকে তবু ফিরিয়ে নিয়ে আয় তাকে। ফিরিয়ে আন্। হে স্বর্গের দেবি! ওখানে বিনা সৎকারে কবর হয়ে পচুক সে আমি চাই না গো।

লুকিনিচ্না যেন প্লেগের রুগী এমনিভাবে তার কাছ থেকে ছিটকে সরে এল পিয়োত্রা—কী ভেবেছ তুমি? তাকে খুঁজতে গিয়ে আমি মরি আর কি! বেশ! আমার নিজের জানের দাম তার চেয়ে ঢের বেশি!

—আমায় তুই ফেরাস্নি রে পিয়োত্রা! যীশুর দোহাই।...খৃীষ্টে যদি তোর মতি থাকে...

পিয়োত্রা গোঁফ কামড়াতে কামড়াতে শেষ অবধি যেতে রাজি হল। ভিয়েশেন্স্কায় ওর বাপের চেনা-জানা এক কসাকের বাড়িতে যাবে ঠিক করল। মিরনের মৃতদেহ খুঁজে বের করতে তারই সাহায্য নেবে। রাতে গাড়ি হাঁকিয়ে রওনা হল পিয়োত্রা। গাঁয়ের ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, প্রত্যেক রসুইঘরে প্রাণদণ্ড নিয়ে আলোচনা। বাপের পুরনো পল্টন দলের বন্ধুর বাড়িতে এসে পিয়োত্রা তার সাহায্য চায়। নিজে থেকেই রাজি হয়ে কসাকটি বলে :

—আমি জানি কোথায় ওদের কবর হয়েছে। মাটির খুব বেশি তলায় নয়। এক-মাত্র অসুবিধা ওকে খুঁজে বের করা। ও তো আর একাই নয়। কাল এক ডজন লোককে মারা হয়েছিল। আমার শুধু একটি শর্ত আছে: পাওয়া গেলে এক বোতল ভদ্কা খাওয়াতে হবে। রাজি?

মাঝরাতে কোদাল আর ইমারতী মাল-বওয়ার একটা খাটিয়া নিয়ে ওরা কবরখানার ভেতর দিয়ে চলল পাইন বনে যেখানে ওদের গুলি করে মারা হয়েছিল। ঝিরঝির করে বরফ পড়ছিল। পিয়োত্রা কান পেতে প্রত্যেকটা আওয়াজ শোনে, মনে মনে গাল পাড়ে এভাবে আসতে হল বলে, গাল দেয় লুকিনিচ্নাকে, এমনকি বুড়ো মিরনকেও। বালির একটা লম্বা ঢিবির কাছে এসে কসাক লোকটা দাঁড়াল। বলল—এখানেই কোথাও নিশ্চয় আছে লাশগুলো।

আরো একশো পা এগিয়ে গেল ওরা। একপাল কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে গেল। পিয়োত্রা স্ট্রেচারটা ফেলে দিয়ে ভাঙা গলায় ফিস্ফিস্ করে বলল ঃ

—আমি ফিরে চললাম। চুলোয় যাক্ বুড়ো! এত লোকের মধ্যে তাকে কী করে খুঁজে বের করি এখন? বুড়োর ভূতই নিশ্চয় ঘাড়ে চেপে একাজ করাচ্ছে আমাকে দিয়ে!

কসাক হেসে বললে—কিসের ভয় এত? এসো এসো!

ওরা এগিয়ে চলে। এক জায়গায় আসে যেখানে বরফটা খুব করে পায়ে দলানো, বালির সঙ্গে মিশে গেছে। একটা বুড়ো উইলো ঝোপের ধার ঘেঁষে জায়গাটা। ওরা খুঁড়তে শুরু করে।

পিয়োত্রা মিরনের লাল দাড়ি দেখে চিনতে পারে। বেল্ট্ থেকে দেহটা টেনে বের করে স্ট্রেচারের ওপর উল্টে ফেলে দেয়। স্ট্রেচারের হাতল ধরে তোলে কসাকটা, আর বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে বলে :

—একটা শ্লেজ নিয়ে পাইন বন অবধি যেতে পারলে ভালো ছিল। আমরা মুখ্যু! ওজন তো ওর পাক্কা সওয়া এক মণ! তাছাড়া বরফের ওপর দিয়ে চলাও চাট্টিখানি কথা নয়।

স্ট্রেচারের কিনারায় বেরিয়ে-আসা পা দুটো আলাদা করে ছাড়িয়ে দিয়ে হাতল চেপে ধরে পিয়োত্রা।

* *

সেই ভোর অবধি কসাকের ঘরে বসে দু'জনে মদ খায়। মিরন গ্রিগরিয়েভিচ কম্বল-জড়ানো অবস্থায় বাইরে শ্লেজের মধ্যে পড়ে আছে। শ্লেজের সঙ্গে ঘোড়াটাকে জুতে রেখে এসেছিল পিয়োত্রা। সারাক্ষণ জানোয়ারটা সজোরে লাগাম টানছে, আর কান খাড়া করে ফোঁসাচ্ছে। মড়ার গন্ধ পেয়েছে, তাই শ্লেজের ওপর রাখা খড়ের কাছে যেতে চাইছে না।

পিয়োত্রা যখন তাতারস্কে এল তখন ভোরের আকাশ ধূসর হয়ে উঠছে। মাঠের রাস্তা ধরেছিল ও, একদমে ঘোড়া দাবড়িয়ে নিয়ে এল। পেছনে শ্লেজের পাটাতনে মিরনের মাথাটা খট্‌খট্‌ করছিল, দু'দুবার গাড়ি থামিয়ে পিয়োত্রা মাঠের ভিজে ঘাস মাথার নিচে গুঁজে দিয়েছে। সোজা লাশটাকে বাড়ি নিয়ে আসে পিয়োত্রা। মিরনের আদরের মেয়ে আগ্রিপিনা মৃত কর্তার জন্য ফটক খুলে দেয়, শ্লেজের কাছ থেকে ছুটে যায় পাশের জমে-থাকা বরফের মধ্যে। এক বস্তা ময়দার মতো লাশখানা ঘাড়ের ওপর তোলে পিয়োত্রা, রান্নাঘরে বয়ে এনে সাবধানে টেবিলের ওপর শুইয়ে দেয়। টেবিলে সাদা একখানা সুতীর চাদর পাতা হয়েছিল। হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে লুকিনিচ্‌না হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল স্বামীর পায়ের কাছে :

—কোথায় ভেবেছিলেম তুমি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরবে, তা না তোমায় কাঁধে করে বয়ে আনতে হল! —ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে লুকিনিচ্‌না আর ফোঁপাচ্ছে, অদ্ভুত খল্‌বলে হাসির মতো, প্রায় শোনাই যায় না এমনি। পিয়োত্রা বুড়ো গ্রিশকার হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসে। বুড়োর সর্বাঙ্গ কাঁপছে। কিন্তু তবু শক্ত পায়ে টেবিলের কাছে হেঁটে এসে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে :

—বাছা মিরন! আমার ছোট খোকা, তোর সঙ্গে এই তবে আবার দেখা হল! ক্রুশ-প্রণাম করে ওর ঠান্ডা কাদামাখা কপালের ওপরে চুমু খায়—মিরন রে!...আমারও আর দেরি হবে না। একটা ককানিভরা আর্তনাদে পরিণত হল বুড়োর গলার আওয়াজটা। শক্ত জোয়ানের মতো সমর্থ হাতে মরা মানুষটাকে তুলে নিল সে নিজের ঠোঁটের কাছে, তারপরেই টেবিলের পাশে ধপ্‌ করে পড়ে গেল।

পিয়োত্রার গলার কাছে জেগে উঠল একটা ক্রুদ্ধ খিঁচুনি। ধীরে ধীরে সে উঠোন দিয়ে এগিয়ে গেল মুরগি-ঘরের পাশে বাঁধা ঘোড়াটার কাছে।

সতেরো

মার্চের গোড়ার দিকে তাতারস্কে একটা গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ডাকল ইভান আলেক্সিয়েভিচ। অস্বাভাবিক রকম ভিড় হয়েছে; স্তকমান প্রস্তাব করেছিল, একটা সভা ডেকে যারা শ্বেত-রক্ষীদের কাছে পালিয়ে গেছে তাদের সম্পত্তি গরিব কসাকদের মধ্যে বিলিয়ে দিক বিপ্লবী কমিটি, হয়তো বা সেইজন্যই এত ভিড়।। সভার আগে তুমুল একপালা ঝগড়া হয়ে গেল

স্তকমান আর ভিয়েশেন্‌স্কার এক জেলা-কর্মচারীর মধ্যে। বাজেয়াপ্ত কাপড়চোপড় কিছু নিয়ে যাবার হুকুম নিয়ে এসেছিল জেলা-কর্মচারীটি। স্তকমান তাকে বুঝিয়ে বললে, বিপ্লবী কমিটির পক্ষে এখনি কাপড়গুলো দেওয়া সম্ভব নয় কারণ গতকালই সেগুলো লালফৌজের জখম সেপাইদের সরবরাহ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তরুণ কর্মচারী স্তকমানের ওপর তম্বি করে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বললে :

—এসব কাপড়চোপড় দিয়ে দেবার অনুমতি কার কাছ থেকে পেলেন?

—কারও অনুমতি তো আমরা চাইনি।

—কিন্তু জাতীয় সম্পত্তি এভাবে নষ্ট করার কী অধিকার ছিল আপনার?

—চেঁচাবেন না কমরেড আর বাজে বকবেনও না। কেউ কিছু নষ্ট করেনি। ড্রাইভারদের হাতে ভেড়ার-চামড়ার জামাগুলো দিয়ে আমরা মুচলেকা নিয়েছি এই বলে যে বিশেষ একটা জায়গায় আহতদের পেঁছে দেবার পর তারা পোশাকগুলো ফিরিয়ে আনবে। সেপাইরা সব আধা-ন্যাংটা, ওদের যদি ওইভাবে ছেড়ে দিতাম তাহলে যমের দুয়োরে ঠেলে দেবারই সামিল হতো ব্যাপারটা। এছাড়া আর কী করতে পারতাম বলুন? বিশেষ করে কাপড়গুলো যখন বেফায়দা গুদোমেই পড়ে ছিল।

বিরক্তি চেপে রেখে আস্তে আস্তে কথাগুলো বললে স্তকমান। বাক্যবিনিময়টা হয়তো শান্তিতেই শেষ হত। কিন্তু ছোকরাটি বাজখাঁই গলায় সজোরে জানিয়ে দিলে :

—আপনি কে? বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যান? আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম! আপনার কাজ সহকারীকে বুঝিয়ে দিন। এখুনি আপনাকে ভিয়েশেন্‌স্কায় পাঠাব। বোধহয় এখানকার আর্ধেক সম্পত্তিই চুরি করেছেন, আন্দাজ করছি, কিন্তু আমি

—আপনি কমিউনিস্ট?—মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে স্তকমান প্রশ্ন করলে।

—সে আপনার দেখার কথা নয়! মিলিশিয়ার সেপাই! এখ্‌খুনি এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করে ভিয়েশেন্‌স্কায় চালান করে দাও। জেলা মিলিশিয়ার হাতে তুলে দিয়ে এর কাছ থেকে একটা রশিদ নিয়ে নিও।—স্তকমানের আপাদমস্তক আড়চোখে দেখে নিয়ে আবার বললে :

—সেখানেই আপনার সঙ্গে কথা হবে! আমি আপনাকে নাচিয়ে ছাড়ব, বুঝলেন খুদে ডিক্টেটর মশাই?

—কমরেড, আপনার কি মাথা খারাপ হল? আপনি জানেন না...

—কোনো কথা নয়! চোপ্‌!

একটা ধীর ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে স্তকমান এগিয়ে গেল দেয়ালে ঝোলানো মসার পিস্তলটার দিকে। ছোকরার চোখে তখন শঙ্কার আভাস। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রগতিতে সে পিঠ দিয়ে দরজাটা খুলেই সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে পড়ল প্রত্যেকটা ধাপে শিরদাঁড়ায় গুঁতো খেতে-খেতে। স্লেজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্লেজ-চালকের পিঠে খোঁচা মেরে কেবলি ওস্‌কাতে লাগল যতোক্ষণ না চত্বর ধরে গোটা রাস্তাটা পার হয়ে যাওয়া যায়, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল পেছন থেকে কেউ তাড়া করছে কিনা।

বিপ্লবী কমিটির দপ্তরের জানলা কেঁপে উঠল হাসির হর্‌রায়। দাভিদ তো টেবিলের ওপর হাসতে হাসতে গড়িয়েই পড়ে। কিন্তু স্তকমানের চোখের পাতা কুঁচকে ওঠে স্নায়বিক উত্তেজনায়, ও বিড়বিড় করে বলে :

—ইতর! হতভাগা ছোটলোক!

মিশ্‌কা আর ইভানের সঙ্গে ও সভায় যায়। চত্বর লোকে লোকারণ্য। একটি

কথা ভেবে ইভানের বুকটা অসোয়াস্তিতে ধড়াস্ ধড়াস্ করে : কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। গোটা গ্রামখানাই হাজির। কিন্তু টুপিটা খুলে যখন ঘেরার মাঝখানটিতে গিয়ে দাঁড়ায় তখন ওর সব উদ্বেগ কেটে গেছে। কসাকরা স্বেচ্ছায় ওকে রাস্তা ছেড়ে দেয়। ওদের মুখে শ্রদ্ধার ভাব; কারুর বা চোখে হাসিও ফুটে উঠছে। চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে-থাকা কসাকদের দিকে তাকায় স্তকমান। থমথমে আবহাওয়াটাকে ও কাটাতে চেষ্টা করে, ওদেরকেও টেনে আনতে চায় আলোচনার মধ্যে। ইভানের মতো স্তকমান মাথার ফারের টুপিটা খুলে চেঁচিয়ে বলে :

—কসাক বন্ধুগণ! আজ ছ' সপ্তাহ হল আপনাদের এখানে সোভিয়েতের হুকুমত কায়েম হয়েছে। কিন্তু আমরা, বিপ্লবী কমিটির লোকেরা লক্ষ্য করছি আমাদের সম্পর্কে আপনাদের অবিশ্বাস এখনো কাটেনি। শুধু তাই নয়, আপনারা এখনো আমাদের শত্রু হিসাবেই দেখছেন। আপনারা সভা-সমিতিতে আসেন না, আপনাদের মধ্যে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, পাইকিরি গুলি চালিয়ে খুন করার আষাঢ়ে সব গল্প, সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের নানা অত্যাচারের কাহিনী আপনারা শুনছেন। এখন আমাদের আরো খোলাখুলি, আরো ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলার সময় হয়েছে। আপনারা নিজেরাই আপনাদের বিপ্লবী কমিটি নির্বাচন করেছেন, ইভান কৎলিয়ারভ আর কশেভয় আপনাদেরই মতো কসাক, আপনাদের মধ্যে রাখারাখি ঢাকাঢাকির কিছু নেই। প্রথমেই এখানে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে আমি ঘোষণা করছি যে এইসব পাইকিরি হত্যার গুজব যা আমাদের দুশমনরা ছড়াচ্ছে তা নিছক অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে বদনাম করার উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার : ওরা কসাক আর সোবিয়েত সরকারের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়, চায় আপনাদের আবার ঠেলে দিতে শ্বেতরক্ষীদের খপ্পরে।

—আপনি কি বলতে চান গুলি চালানো হয়নি? তাহলে আমাদের সাতজন লোক কোথায় গেল? ভিড়ের পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে ওঠে।

—কমরেড, কোনোরকম গুলিচালনাই হয়নি সে-কথা আমি বলিনি। সোভিয়েত সরকারের দুশমনদের আমরা গুলি করে মেরেছি, ভবিষ্যতেও মারব, আমাদের ওপর যারা জমিদারী রাজত্বের ফাঁস আবার পরাতে যাবে তাদেরই মারব। জারকে আমরা তাড়িয়েছি, জার্মানির সঙ্গে লড়াই বন্ধ করেছি, জনগণকে মুক্তি দিয়েছি—জমিদারী আমল ফিরিয়ে আনবার জন্য নিশ্চয়ই নয়। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ আপনাদের কী উপকার করেছে? হাজার হাজার কসাক প্রাণ দিয়েছে, অনাথ হয়েছে, বিধবা হয়েছে, উৎখাত হয়েছে

—সে কথা ঠিক!

স্তকমান বলেই চলে—আমরা চাই সব যুদ্ধ শেষ করতে। জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ব আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু জারের আমলে আপনাদের ব্যবহার করা হত জমিদার আর পুঁজি-পতিদের হয়ে দেশ জয় করার কাজে, তাদেরই পকেট ভারি করার কাজে। এই কাছেই থাকত লিস্তনিৎস্কি। তার ঠাকুরদা ১৮১২ সালের যুদ্ধে ভালো কাজ দেখিয়ে দশ হাজার একর জমি পেয়েছিল। কিন্তু আপনাদের পিতামহরা কী পেয়েছিলেন? তাঁদের মাথা কাটা পড়েছিল জার্মানির মাটিতে। সে মাটি রাঙা হয়েছিল ওঁদের রক্তে।

সভাস্থল থেকে সরব সমর্থন আসে। স্তকমান চক্‌চকে কপাল থেকে ঘামটা মুছে নিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে :

মজুর আর কিসানের এই সরকারের বিরুদ্ধে যারা হাত তুলবে তাদের সকলকে আমরা চূর্ণ করে দেব। আপনাদের যেসব কসাককে বিপ্লবী আদালতের হুকুমে গুলি

করে মারা হয়েছে তারা আমাদের শত্রু। আপনারা সবাই তা জানেন। কিন্তু আপনারা যাঁরা মেহনতী মানুষ, যাঁরা আমাদের দরদী, তাঁদের সঙ্গে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে চলব, লাঙল-ঠেলা বলদের মতো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলব। একসঙ্গে মাটিতে লাঙল দেব নতুন জীবনের আশায়, পুরনো আগাছার মতো আমাদের দুশমনদের উপড়ে ফেলার জন্য জমিতে মই দেব। তাহলে আর নতুন করে শেকড় চালাতে পারবে না ওরা, পারবে না নতুন জীবনের ফসলকে চেপে মারতে।

চাপা গলার আওয়াজ আর উদ্দীপ্ত মুখগুলো দেখে স্তকমান বোঝে ওর বক্তৃতা কসাকদের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছে। ভুল করেনি ও। কসাকরা এবার মনের কথা খুলে বলতে শুরু করে:

—অসিপ দাভিদোভিচ! আমরা তোমাকে ভালো করেই জানি, এককালে আমাদের মধ্যেই তুমি বাস করেছ, আমাদেরই একজনের মতো। আমাদের তুমি বুঝিয়ে বল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমার এই যে গভর্নমেণ্ট, আমাদের কাছ থেকে কী চায় তারা? আমরা অবিশ্যি এ গভর্নমেণ্টের পক্ষেই আছি, আমাদের ছেলেরা তো লড়াই থেকে পালিয়েই এল। কিন্তু আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, সবকিছু ভালো করে বুঝে উঠতে পারি না।—বুড়ো গ্রিয়াজ্‌নভ্‌ অনেকক্ষণ ধরে এগিয়ে পেছিয়ে পায়চারি করে যা বললে তার অর্ধেকই বোঝা গেল না, দেখলেই মনে হয় পাছে বেশি বলে ফেলে তাই ভয় পাচ্ছে। কিন্তু হাতকাটা আলেক্সি শামিলের ভয়-ডর নেই।

সে চেঁচিয়ে ওঠে—আমি কিছু বলতে পারি?

—এগিয়ে এসো তাহলে।—জবাব দেয় ইভান।

—কমরেড স্তকমান, আগে আমাদের বলুন: যা খুশি ইচ্ছেমতো বলতে পারি?

—হ্যাঁ?

—গ্রেপ্তার করবেন না তো?

স্তকমান হেসে নীরবে হাতটা নাড়ে। আলেক্সির ভাই মার্তিন পেছন থেকে আলেক্সির জামার হাতাটা ধরে টানে, ভয়ে ভয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে:

—এই গর্দভ, থাম্‌! চুপ কর্‌, নয়তো সাবাড় করে দেবে! আলেক্সি, তোর নাম ওরা টুকে নেবে!

আলেক্সি কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শ্রোতাদের দিকে মুখ ফেরায়। গালের পেশী কাঁপতে থাকে ওর।

—কসাক ভাইসব! আমি বলব, আর আপনারাই বিচার করবেন আমি ঠিক বলছি কি বেঠিক।—মিলিটারি কায়দায় গোড়ালি ঘুরিয়ে স্তকমানের দিকে তাকিয়ে বলে—আমি যা বুঝি তা হল এই। যদি আমি ঠিক বলে থাকি তো ভালো কথা! যদি ভুল বলি, সোজা সেটা জানিয়ে দেবেন, ব্যস্‌। আমাদের কসাকরা প্রত্যেকে যা ভাবছে তাই আমি বলব, বলব কমিউনিস্টরা আমাদের ক্ষতি করেছে বলে কেন আমাদের ধারণা হল। আপনি বললেন খেটে-খাওয়া কসাকদের সঙ্গে আপনাদের নাকি শত্রুতা নেই। আপনারা ধনীদের দুশমন, গরিবদের ভাই। বেশ, তাহলে সত্যি কথাটা বলুন: ওরা আমাদের গাঁয়ের কসাকদের মেরেছে কি মারেনি? করশুনভের কথা কিছু আমি বলছি না; সে ছিল আতামান, সারা জীবন অন্য কসাকদের ঘাড়ে চড়ে কাটিয়েছে। কিন্তু চালিয়াৎ আভ্‌দেয়িচ্‌কে গুলি করে মারা হল কেন? তারপর মাৎভেই কাশুলিন? বোগাতিরিয়েভ, মাইদানিকভ, করোলিয়ভ? ওরা তো একেবারে আমাদের মতোই ছিল, জ্ঞানগম্যি কিছু

নেই, সব খিঁচুড়ি পাকানো। লাঙলের হাতল ধরতেই শিখেছিল শুধু, কেতাব পড়া নয়। ওরা যদি বাজে কথা কিছু বলেই থাকে, তার জন্য কি উচিত হয়েছিল ওদের অমনিভাবে শাস্তি দেওয়া? — নিশ্বাস টেনে একটু এগিয়ে আসে আলেক্সি—যারা বোকার মতো কথা বলত তাদের আপনারা গ্রেপ্তার করলেন, সাজা দিলেন, কিন্তু ব্যবসাদারদের গায়ে তো হাতও তোলেননি। পয়সা দিয়ে কারবারীরা আমাদের জানসুদ্ধ কিনে নিয়েছে। আমরা যে পাল্টা দামে তা ফেরত নেব সে উপায় আমাদের নেই, মাটি কুপিয়েই জীবন কেটে গেল, সৌভাগ্যের মুখও দেখলাম না। ওদের ক'জনকে হয়তো আপনারা মেরেছেন, কিন্তু নিজেদের গা বাঁচাবার জন্য ওরা খামার থেকে শেষ বলদটাকে পর্যন্ত সরিয়ে দিতে পারে। শুধু তো ওদের কাছ থেকে কখনো কিছু আদায় করেননি আপনারা। আর ভিয়েশেন্‌স্কাতে যা ঘটছে সে তো আমাদের অজানা নয়। ব্যবসাদার আর পুরুতরা সেখানে দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে। কারগিনেও তাই। আমাদের চারপাশে যা ঘটছে সবই শুনতে পাই। ভালো খবর তো রটে না, মন্দ খবর ছড়িয়ে পড়ে তামাম দুনিয়ায়।

একটা হট্টগোল ওঠে "ঠিক কথা, ঠিক কথা" বলে, সে আওয়াজে আলেক্সির কথা ডুবে যায়। যতোক্ষণ না গোলমালটা কমে ততোক্ষণ সবুর করে ও। স্তকমান হাত উঁচু করে আছে, সেদিকে নজরই দেয় না। আবার চেঁচাতে শুরু করে :

—সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট হয়তো খুব ভালো, আমরা সেটুকু বুঝি। কিন্তু যে-সব কমিউনিস্ট চাকরি পেয়েছে তারা তো ধরাকে সরা জ্ঞান করে আমাদের একহাত নিচ্ছে। উনিশ-শো পাঁচ সালের শোধ তুলছে আমাদের ওপর, লাল সেপাইদের মুখেই শুনেছি সে কথা। আর আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি—কমিউনিস্টরা আমাদের খতম করতে চায়, আমাদের বন্দী করতে চায়। তারা চায় ডন থেকে কসাকদের আত্মাটাই শুকিয়ে মরে যাক! আমিও এই কথাই বলি। আমি হলাম মদখোর মাতালের মতো ঃ যা মুখে আসে তাই বলে ফেলি। এমনি এক সুখের জীবনের স্বাদ পেয়ে আমরা সবাই মাতাল কিনা, মাতাল হয়েছি আমাদের নিজেদের আর কমিউনিস্টদের কলঙ্কের লজ্জায়।

কসাকদের ভিড় ঠেলে ঢুকে যায় আলেক্সি। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। স্তকমান বলতে শুরু করে, কিন্তু পেছন থেকে চিৎকার এসে বাধা দেয় :

—ঠিকই বলেছে ও! কসাকদের তারা অপমান করছে। জানেন গাঁয়ের লোক এখন কোন্ সুরে গাইছে? সবাই তো মনের কথা খুলে বলবে না, তবে গানের সুরটা ওরা ঠিকই ভাঁজবে! এলোপাথাড়ি কথা চলতে থাকে জনতার মধ্যে।

স্তকমান সজোরে হাতের মধ্যে টুপিটাকে দোমড়ায়। তারপর পকেট থেকে কশেভয়ের তৈরি তালিকাটা বের করে চেঁচিয়ে বলে :

—না, একথা সত্যি নয়! যারা বিপ্লবের পক্ষে তাদের অসন্তুষ্ট হবার কোনো কারণ নেই। আপনাদের পাড়া-পড়শীদের, সোভিয়েত সরকারের শত্রুদের কেন গুলি করে মারা হয়েছিল তা এবারে জানিয়ে দিচ্ছি। শুনুন! — ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে সে পড়তে থাকে :

—বিপ্লবী আদালতের তদন্তকারী কমিশনে সোপর্দ ও ধৃত সোভিয়েত সরকারের শত্রুদের তালিকা।

—মিরন গ্রিগরিয়েভিচ করশুনভ, প্রাক্তন আতামান, অপরের শ্রম শোষণ করিয়া ধনী। ইভান আভ্‌দেয়িচ সেনিলিন, সোভিয়েত সরকারের উচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য প্রচার চালাইয়াছে। মাৎভেই ইভানোভিচ কাশুলিন, একই অপরাধে অপরাধী। সেমিওন

গাব্রিলভ মাইদান্নিকভ, তকমা-পদক আঁটিয়া রাস্তায় রাস্তায় সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে ধ্বনি তুলিয়াছে। পান্তালিমন প্রখোফিয়েভিচ মেলেখভ, সামরিক পরিষদের সদস্য ছিল। গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ মেলেখভ, সোভিয়েত সরকারের বিরোধী লেফ্‌টেন্যান্ট ও বিপজ্জনক ব্যক্তি। আন্দ্রেই কাশুলিন, মাৎভেইয়ের পুত্র, পদ্‌তিয়েকভের লাল কসাকদের হত্যায় যোগ দিয়াছে। ফিওদৎ নিকিফোরভ বদভ্‌স্কভ্‌, একই অপরাধ। আরখিপ্‌ মাৎভিয়েভ ধগার্তিরিয়েভ, গির্জার প্রাক্তন রক্ষক, সরকার-বিরোধী, বিপ্লবের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্‌কাইয়াছে। জাখার লিয়নতিয়েভ করোলিয়ভ, অস্ত্র সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না।

মেলেখভ পরিবারের দু'জন আর বদভ্‌স্কভের নামের পাশে লেখা মন্তব্যটাও স্তকমান পড়ে শোনায় ঃ সোভিয়েত সরকারের এই দুশমনগুলিকে গ্রেপ্তার করা যায় নাই, কারণ তাহাদের দুইজনকে বাহিরে রসদ সরবরাহের কাজে লাগানো হইয়াছে, আর পান্তালিমন মেলেখভ টাইফাস্‌ রোগে অসুস্থ। বাহিরের দুইজনকে ফিরিয়া আসামাত্রই গ্রেপ্তার করিয়া ভিয়েশেন্‌স্কায় চালান দেওয়া হইবে, তৃতীয় ব্যক্তি সুস্থ হইয়া উঠিলেই ধৃত হইবে।

মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ সভা। তারপর একটা চিৎকার ওঠে ঃ

—'এ মিথ্যে কথা।' 'সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তারা কখনো বলেনি, মিথ্যে।' •'এই সব কারণে তোমরা মানুষকে গ্রেপ্তার করো তাহলে?' 'তোমাদের আসল চেহারাটা চিনে নিয়েছি বলে?'

আবার বলতে থাকে স্তকমান। মনে হয় এবার ওরা বেশ মন দিয়েই শুনছে, এমন কি মাঝে মাঝে তারিফও জানাচ্ছে সচিৎকারে। কিন্তু শেষ দিকে যখন সে শ্বেত-রক্ষীদের দলে পালিয়ে-যাওয়া লোকদের সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেবার কথা বলে তখন সব নিস্তব্ধ।

বিরক্ত হয়ে ইভান আলেক্সিয়েভিচ জিজ্ঞেস করে—তোমাদের সকলের হল কি?

গুলির ঝাঁকের মতো এলোপাথাড়ি লোকজন সভা ভেঙে সরে পড়তে থাকে। গাঁয়ের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে গরীব একজন অনিশ্চিতভাবে সামনে এগিয়ে আসছিল, তারপরেই আবার ইতস্তত করে সে পেছু হটে গেল।

—মালিকরা যখন ফিরে আসবে তখন কি হবে?...

স্তকমান ওদের বোঝাবার চেষ্টা করে যাতে কেউ চলে না যায়; কিন্তু কশেভয় খড়িমাটির মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে ইভান আলেক্সিয়েভিচের কানে কানে বলে :

—বলেছিলাম ওরা কেউ ছোঁবেও না। এখন ওদের এগুলো না দিয়ে সব পুড়িয়ে ফেলাই ভাল।

চিন্তিতভাবে পাৎলুনের ওপর চাবুকটা বাজাতে বাজাতে কশেভয় মাথা নিচু করে মখভের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল আস্তে আস্তে। গলি-বারান্দার মেঝেয় কতগুলো ঘোড়ার জিন পড়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেই কেউ এসেছে নিশ্চয়। একটা রেকাবের গায়ে এখনো বুটের দাগ—হলদে গোবরের মতো একদলা বরফ লেগে রয়েছে, নিচে জমে উঠেছে ছোট একটু জলের দাগ। কশেভয় জিনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয় বারান্দার মেঝেয়, সেখান থেকে রেলিঙের নক্‌সায়, তারপর তাকায় ধোঁয়ার ভাপ-ওঠা জানালাগুলোর

দিকে। কিন্তু যা দ্যাখে তার কোনোটাই ওর মনের ওপর ছাপ ফেলতে পারে না। মিশ্‌কার সরল প্রাণ গ্রিগর মেলেখভের প্রতি অনুকম্পা আর বিতৃষ্ণায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

বিপ্লবী কমিটির পাশের ঘরটা তামাক আর ঘোড়ার সাজের বোঁটকা গন্ধে ভরা। মখোভ্‌রা বাড়ির যে সব ঝি-কে ফেলে রেখে দনিয়েৎসের ওপারে পালিয়ে গিয়েছিল তাদেরই একজন উনোনে আগুন দিচ্ছে। আরো দূরের একটা কামরায় মিলিশিয়ার সেপাইদের উচ্চকণ্ঠ হাসি। পাশ কাটিয়ে কমিটির ঘরে ঢোকবার সময় মিশকা বিরক্ত হয়ে ভাবে—মজার লোক সব! হাসির খোরাক কী পেল কে জানে!

লিখবার টেবিলটার ওপাশে বসে আছে ইভান আলেক্সিয়েভিচ। মাথার ওপর কালো ফারের টুপিখানা ঠেলে দিয়েছে। ঘাম-ভেজা মুখে ক্লান্তির রেখা। পাশেই জানলার চৌকাঠে বসে স্তকমান। একটু হেসে মিশ্‌কাকে ডাকে। পাশে বসতে বলে ওকে। কশেভয় বসে পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়ে।

বলে—কাল একটা বিশ্বস্ত সূত্র থেকে খবর পেয়েছি মেলেখভ নাকি বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত একবারও যাইনি ওর কাছে।

—এ সম্পর্কে কী করতে চাও তুমি?—স্তকমান একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে উৎসুকভাবে তাকায় ইভান আলেক্সিয়েভিচের দিকে।

ইভান অনিশ্চিত সুরে জবাব দেয়— কয়েদে পুরব, নাকি আর কিছু?

তুমি বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যান। নিজেই ঠাওরাও!—স্তকমান হেসে এড়াবার মতো করে ঘাড়টা ঝাঁকায়। এমন বিদ্রূপভরে ও হাসতে পারে যার জ্বালা চাবুকের ঘায়ের চেয়েও বেশি। দাঁতে দাঁত চেপে ইভান তীক্ষ্ণভাবে জবাব দেয় ঃ

—চেয়ারম্যান হিসাবে আমি গ্রিগর আর ওর ভাই, দুজনকেই গ্রেপ্তার করে ভিয়েশেন্‌স্কায় চালান দিতে পারতাম।

—ওর ভাইকে গ্রেপ্তার করার কোনো মানে হয় না। ফোমিন তার পক্ষে, তুমি তো জানোই পিয়োত্রার কতো তারিফ করে সে। কিন্তু গ্রিগরকে আজই গ্রেপ্তার করা চাই, এই মুহূর্তে! কাল তাকে ভিয়েশেন্‌স্কায় পাঠাবো, আজই ঘোড়সওয়ার মিলিশিয়া-সেপাই মারফত বিপ্লবী আদালতের চেয়ারম্যানের কাছে ওর সম্পর্কে কাগজপত্র পাঠাতে হবে।

—তার চেয়ে সন্ধ্যের সময় গ্রিগরকে গ্রেপ্তার করলে ভালো হত না অসিপ দাভিদোভিচ? তখন হৈ-চৈ একটু কম হত।

স্তকমান জবাব দেয়—এ আপত্তির কোনো মানে হয় না।

ইভান ঘুরল কশেভয়ের দিকে—মিখাইল, দুজন লোককে নিয়ে এখুনি গিয়ে ওকে গ্রেপ্তার করে আনো। আলাদা রেখো। বুঝলে?

জানালার চৌকাঠ থেকে নেমে কশেভয় মিলিশিয়া-সেপাইদের কাছে যায়। স্তকমান ঘরের ভেতর পায়চারি করছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ও টেবিলের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে ঃ

—শেষ যে হাতিয়ারগুলো জোগাড় হয়েছিল সবই পাঠিয়ে দিয়েছ নাকি?

—না। আজ যাবে সেগুলো।

স্তকমান কপাল কোঁচকায়। ভুরু তুলে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে ঃ

—মেলেখভরা কী জিনিস ফেরত দিল?

ভুরু কুঁচকে মনে করবার চেষ্টা করে ইভান আলেক্সিয়েভিচ, অবশেষে হাসিমুখে বলে ঃ

দুটো রাইফেল আর দুটো রিভলবার। আপনার কি মনে হয় ও-ই ওদের সব?

—তোমার কী মনে হয়?

—ও-হো! আমার চেয়েও বোকা দুনিয়ায় আছে দেখছি!

—আমরাও তাই ধারণা!—ঠোঁট কামড়ায় স্তকমান—আমি তোমার জায়গায় হলে গ্রেপ্তারের পরেও সযত্নে খানতল্লাসী করতাম ওদের বাড়ি। কম্যান্ডাণ্টকে তাই করতে হুকুম দাও। ভাবা এক জিনিস, করা আরেক।

আধঘণ্টা বাদে ফিরল কশেভয়। বারান্দা দিয়ে সবেগে দৌড়ে এসে দুম্ করে দরজাটা খুললে! দম নেবার জন্য চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে বললে ঃ

—নিকুচি করেছে শয়তানের!

কী ব্যাপার?—তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেলে ছুটে এল স্তকমান, চোখদুটো ওর ভয়ানক গোল-গোল হয়ে উঠেছে। স্তকমানের নরম গলার আওয়াজেই হোক্, কি অন্য কোনো কারণেই হোক্ কশেভয় খেপে আগুন হয়ে খেঁকিয়ে উঠল ঃ

—ওসব চোখ পাকানো রাখুন! শুনলুম গ্রিগর ঘোড়ায় চেপে সিনর্গিনে তার পিসির বাড়ি চলে গেছে। তার আমি কী করব? আপনারাই বা কী করেছিলেন? ওর যাবার রাস্তা করে দিয়েছে কে ? আপনারাই তো হাতের তলা দিয়ে গলে যাবার সুযোগ দিয়েছেন ওকে। আমার ওপর তম্বি করে কোনো লাভ নেই। আমি তো একটা ভেড়া। গিয়ে শুধু গ্রেপ্তার করাই আমার কাজ। কিন্তু আপনারা কী ভাবছিলেন তখন?-সোজা ওর দিকে এগিয়ে এল স্তকমান। চুল্লীর গায়ে হেলান দিয়ে কশেভয় বিদ্রূপ করে ওকে বললে ঃ আর এগোবেন না দাভিদ আসিপোভিচ! এগোলে ভগবানের দিব্যি, আপনাকে আমি মারব!

স্তকমান সোজা এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাতের আঙুল ফোটাতে থকে। মিশকার হাসি-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁত চেপে বলে ঃ

—সিনর্গিনের রাস্তা তুমি চেন?

—চিনি।

—তা হলে এখানে ফিরে এলে কেন? আবার বলে বেড়াও তুমি জার্মানদের সঙ্গে লড়েছ!—ইচ্ছাকৃত বিদ্রূপে ভ্রূকুটি করে স্তকমান।

নীল, ধোয়াঁটে কুয়াশার নিচে স্তেপ প্রান্তর। ডন পারের পাহাড়ের ওপাশ থেকে নীলচে পাঁশুটে চাঁদ উঠেছে, নিষ্প্রভ তার কিরণ, তারার দীপালি তাতে ম্লান হয়নি।

সিনর্গিনের রাস্তা ধরে ছুটেছে ছ'জন ঘোড়সওয়ার। মিশকার পাশাপাশি চলেছে স্তকমান। যেন কোনো ঝঞ্চাটই নেই এমনি মুখের ভাব করে মিশকাকে শোনাচ্ছে কোনো কৌতুকাবহ ঘটনার কথা। মিশকা জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছোট ছেলের মতো হাসছে, হাঁপাচ্ছে, আর চেষ্টা করছে স্তকমানের কঠিন মুখটা টুপির তলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে।

সিনর্গিনে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কোনো ফল হল না।

কসাক বিদ্রোহ

এক

রসদগাড়ির সঙ্গে বকোভ্‌স্কায়া অবধি এসেও গ্রিগরকে আরো খানিকটা এগিয়ে যেতে হল। দশদিন বাদে সম্ভব হল ফেরা। তাতারস্কে আসার আগেই ওর বাপ গ্রেপ্তার হয়েছিল। বুড়ো পান্তালিমন সবে রোগশয্যা ছেড়ে উঠেছে তখন আরো রোগা হয়ে; চুল-গুলো আরো পাকিয়ে। কপালের ওপর এসে পড়েছে পোকায়-খাওয়ার মতো চুল। দাড়িটা পাতলা, কিনারায় পাক ধরা।

গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার আগে মিলিশিয়ার সেপাইরা তাকে দশ মিনিট সময় দিয়েছিল জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। ভিয়েশেনস্কায় পাঠাবার আগে তাকে মখোভের কুঠির ঘরে আটকে রাখা হল। ওর সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিল আরো ন'জন বুড়ো আর একজন অবৈতনিক হাকিম।

গ্রিগর ঘোড়ায় চেপে আঙিনার ভেতর ঢুকতেই পিয়োত্রা খবরটা দিলে ওর ভাইকে। বুদ্ধি দিলে ঃ

—এখুনি ফিরে চলে যা, বুঝলি! ওরা কেবলই খোঁজ করছে কখন তুই বাড়ি ফিরবি। যা, একটু হাত-পা গরম করে নে. ছেলেপুলেদের সঙ্গে দেখা করে রিব্‌নি গাঁয়ে চলে যা। সেখানে লুকিয়ে বরং সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে পারিস্। ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলে দেব তুই সিনগিনে পিসির বাড়িতে আছিস। আমাদের সাতজনকে গুলি করে মেরেছে শুনেছিস তো? বাবাকেও এখন অবধি যেতে হয়নি অবিশ্যি ও রাস্তায়! কিন্তু তোর সম্পর্কে...

রান্নাঘরে আধঘণ্টা বসে গ্রিগর, তারপর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে সে-রাতেই চলে যায় রিব্‌নিতে। ওদের একজন দূর সম্পর্কের বিশ্বাসী কসাক আত্মীয় ওকে লুকিয়ে রাখে চালাঘরে পাঁজা-করা গোবর ঘুঁটের আড়ালে।

দুটো দিন সেখানেই শুয়ে থাকে ও, বেরিয়ে আসে শুধু রাত হলে।

॥ দুই ॥

*

সিনগিন থেকে ফেরার দুদিন বাদে, ১০ই মার্চ তারিখে মিশ্‌কা কশেভয় ভিয়েশেনস্কায় গেল কমিউনিস্ট গ্রুপের মিটিঙের খবর নিতে। সে, ইভান আলেক্সিয়েভিচ, দাভিদ ইয়েমেলিয়ান আর ফিল্‌কা সবাই ঠিক করেছে পার্টিতে যোগ দেবে। কশেভয়ের সঙ্গে কসাকদের সঁপে-দেওয়া অস্ত্রশস্ত্রের শেষ চালানটা আছে—ইস্কুল বাড়ির উঠোনে আবিষ্কার করা একটা মেশিনগান, আর আছে জেলা বিপ্লবী কমিটির সভাপতির কাছে লেখা স্তকমানের একখানা চিঠি।

ভিয়েশেনস্কার অবস্থা ও দেখল একেবারে ছন্নছাড়া। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে লোকজন ছুটোছুটি করছে, ঘোড়ায় চেপে সংবাদবাহকরা আসছে যাচ্ছে, রাস্তায় লোকজন বেশ নজরে পড়ার মতেই কম।— এসব হন্তদন্ত ভাবের কোনো কারণই খুঁজে না পেয়ে মিশ্‌কা তো তাজ্জব। কমিটির সহ-সভাপতি উদাসীনভাবে স্তকমানের চিঠিখানা পকেটে পুরলেন, কশেভয় যখন জিজ্ঞেস করলে কোনো জবাব দেবার আছে কিনা তখন উনি তিরিক্ষি হয়ে ফুঁসিয়ে উঠলেন ঃ

—চুলোও যাও! আমার এখন তোমাদের ওসব দেখার সময় নেই।

বিপ্লবী কমিটির দপ্তরে ঢুকল মিশ্‌কা চেনা-জানা কারুর সঙ্গে বসে একটু ধূমপান করবে বলে।

—এতসব হৈ-চৈ কেন বলুন তো?

অনিচ্ছা ভরে জবাব দিলে একজন ঃ

কাজান্‌স্কায় গোলমাল বেধেছে। শ্বেতরক্ষীরা ঢুকে পড়েছে, নাকি কসাকরা বিদ্রোহ করেছে কিংবা ওইরকম কিছু। মোট কথা কাল ওখানে লড়াই চলছিল। টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে।

—আপনাদের তো তাহলে ঘোড়সওয়ার দূত কাউকে পাঠানো দরকার ওখানে।

—তা পাঠিয়েছি। কিন্তু সে তো এখনো ফিরল না। আজ ইয়েলান্‌স্কেও একটা ফৌজীদল পাঠানো হয়েছিল। সেখানেও গোলমাল।

জানলার কাছে বসে সিগারেট ফুঁকছে ওরা। বিপ্লবী কমিটির আস্তানা সওদাগর-বাড়ির জানলা ঘেঁষে ঝিরঝিরে বরফ উড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ গাঁয়ের বাইরে পাইনগাছগুলোর কাছাকাছি কোত্থেকে বন্দুকের আওয়াজ হল। ফ্যাকাশে হয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল মিশ্‌কা। সবাই ছুটল উঠোনে। গুলির আওয়াজটা এখন জোরালো আর ভারি হয়ে উঠেছে। চালা আর ফটকের ওপর ফট্‌ফট্‌

করে বুলেট এসে পড়তে শুরু করেছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকেই জখম হল লালফৌজের একজন সেপাই। ফৌজী কোম্পানীর অবশিষ্ট যারা ছিল তাদের তাড়াতাড়ি সামিল করা হল বিপ্লবী কমিটির সামনে। কমান্ডার তাদের দৌড় করিয়ে নিয়ে চলল ডনের ঢালু পাড়ের দিকে। সর্বত্র আতঙ্ক। চত্বর ধরে লোক এদিক-উদিক ছুটছে। একটা সওয়ারহীন ঘোড়া সবেগে পাশ কাটিয়ে গেল।

বিহ্বলতার মধ্যে মিশকা নিজেই খেয়াল করতে পারেনি কীভাবে ও চত্বরের মাঝখানে চলে এল। দেখল ফোমিন গির্জার পেছন থেকে ঘূর্ণি-হাওয়ার মতো ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে, ওর ঘোড়ার সঙ্গে একটা মেশিন গান বাঁধা। চাকাগুলো কিছুতেই বাগ মানছে না, মেশিনগানটা তাই উল্টে গিয়ে ছেঁচড়তে ছেঁচড়তে চলেছে এপাশে ওপাশে দুলতে দুলতে। জলের ওপর নিচু হয়ে ঝুঁকে পাহাড়ের তলায় ফোমিন অদৃশ্য হয়ে গেল, শুধু পেছনে রেখে গেল গুঁড়ো-বরফের একটা রুপালি রেখা।

মিশ্‌কার প্রথম চিন্তা কী করে ঘোড়াগুলোর কাছে যাওয়া যায়। রাস্তার ধার দিয়ে ও ছুটতে লাগল মাথা নিচু করে, দম নেবার জন্যও থামল না একবার। দেখল ইয়েমেলিয়ান ঘোড়াগুলোর সাজ পরাচ্ছে, গাছের সঙ্গে রাশ বাঁধতে গিয়ে হাত কাঁপছে ওর।

তোৎলাতে তোৎলাতে বললে—কী ব্যাপার মিখাইল? কী হয়েছে?—দাঁত ঠক্‌ঠক্‌ করছে ওর।

হুড়মুড় করতে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম খুঁজে পায় না ওরা। যখন পেল তখন চামড়ার গলাবন্ধটার ফাঁস খুলে গেছে। যে আঙিনাটার মধ্যে ওরা এসে থামে সেটার সামনে স্তেপের মাঠ।

মিশকা পাইনগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু সেদিক থেকে পদাতিক সৈন্যের কোনো সারিই ওর নজরে আসে না, ঢল নেমে আসার মতো ঘোড়সওয়ার ফৌজের কোনো দলও এগিয়ে আসে না।

দূরে কোথাও গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে, রাস্তা জনশূন্য, গোটা জায়গাটায় যেমনকার তেমনি বিমর্ষভাব। তবু সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে: সত্যি-সত্যিই বিদ্রোহটা মাথা চাড়া দিল তাহলে।

ইয়েমেলিয়ান যতোক্ষণ ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল, মিশকা একবারও চোখ সরায়নি স্তেপের দিক থেকে। গির্জার ওপাশ দিয়ে একটি লোককে ছুটে যেতে দেখল ও, পুলের ধার দিয়ে দৌড়োচ্ছে—গত ডিসেম্বর মাসে যে পুলটার কাছে বেতার স্টেশন পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল সেইখানে। লোকটা দৌড়চ্ছে প্রাণপণে, মাথা নিচু করে বুকের ওপর হাত চেপে। কোট দেখে মিশকা চিনতে পারে—সামরিক আদালতের তদন্তকারী গ্রমভ। এবার একটা বেড়ার পেছন থেকে ঘোড়ায় চেপে এল এক সওয়ার। মিশকা তাকেও চিনল: ভিয়েশেন্‌স্কার কসাক, নাম চেরনিচ্‌কিন,—তরুণ জঙ্গী শ্বেতরক্ষী। দৌড়তে দৌড়তে গ্রমভ পেছন ফিরে তাকাল একবার, দু'বার। তারপর পকেট থেকে রিভলবার বের করল সে। একবার গুলির আওয়াজ তারপর আবার। বালিভরা টিলাটার মাথায় ছুটে গেল গ্রমভ। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল চেরনিচ্‌কিন। ঘাড় থেকে রাইফেলটা নামিয়ে নিয়ে একটা তুষার-ঢিবির পেছনে শুয়ে পড়ল। ওর প্রথম গুলিটা লাগবার পর গ্রমভ একপাশে কাত হয়ে চলতে থাকে, বাঁ হাতে চেপে ধরে আগাছার ঝাড়। টিলাটার ওপর একবার পাক খেয়েই সে বরফে মুখ থুবড়ে পড়ে। মরে গেল!—ঠান্ডা হয়ে যায় মিশকার শরীর। স্লেজে উঠে ফটক পার হয়ে যেতে যেতে ওর নজরে পড়ে, চেরনিচ্‌কিন ছুটে

গেল দেহটার কাছে, বরফে হ্মড়ি খেয়ে পড়া কালো কোটের ওপর বসিয়ে দিল তলোয়ারের কোপ।

নিয়মিত পারাপারের জায়গাটা থেকে ডন পার হতে গেলে সেটা বেআক্কেলের কাজ হত, কারণ নদীর সাদা বুকের ওপর ঘোড়া আর মানুষ লক্ষ্য করে গুলি চালাবার চমৎকার সুযোগ মিলত তাহলে। ইয়েমেলিয়ান তাই ঝিলের ওপর দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলল। ঝিল পেরোতে গিয়ে আধা-গলা বরফের ওপর ঘোড়ার খুরের চাপে ছোট ছোট জলের গর্ত জেগে ওঠে, শ্লেজের দাঁড়ের গভীর দাগ বসে যায়। ওরা পাগলের মতো ছুটে চলেছে তাতারস্ক্-মুখো। কিন্তু গাঁয়ের কাছে রাস্তার মোড়ে এসে ইয়েমেলিয়ান লাগাম কষে মিশকার দিকে লাল হয়ে ওঠা মুখখানা ফিরিয়ে বলে ঃ

—কী করলে ভালো হয় বলো তো? ধরো যদি আমাদের নিজেদের গাঁয়েও একই ব্যাপার ঘটে থাকে?

মিশকার চোখে নৈরাশ্যের ছাপ। গাঁয়ের দিকে তাকায় ও। নদীর সবচেয়ে কাছের রাস্তাটা ধরে দুজন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে। ওদের মিলিশিয়া সেপাই বলে চিনতে পারে মিশ্কা।

শক্ত গলায় ও বলে—গাঁয়ের ভেতরেই চলো! আর কোথাও যাবার মতো জায়গা নেই।

অত্যন্ত অনিচ্ছাভরে ইয়েমেলিয়ান ঘোড়া হাঁকায়। নদী পার হয়ে ও-পাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে থাকে ওরা। ওদের দিকে দৌড়ে ছুটে এল চালিয়াৎ আভ্দেয়িচের ছেলে আন্তিপ্ আর গাঁয়ের উত্তর দিককার দু'জন বয়স্ক লোক।

আন্তিপের হাতে রাইফেল দেখতে পেয়ে ইয়েমেলিয়ান রাশ টেনে চট্ করে ঘোড়াগুলোকে ঘুরিয়ে নিলে—এই মিশ্কা!

হুকুম এল—থামো!

একটা গুলির আওয়াজ। ইয়েমেলিয়ান লাগামটা হাতে চেপে ধরেই পড়ে যায়। ঘোড়াগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বেড়ার ওপর। শ্লেজ থেকে লাফ দেয় মিশ্কা। আন্তিপ দৌড়ে আসে ওর দিকে, পা হড়কে যেতে যেতে টাল সামলে দাঁড়িয়ে রাইফেলটা ওর কাঁধের ওপর ছুঁড়ে দেয়। বেড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে মিশ্কা দ্যাখে ওদের মধ্যে একজনের হাতে তে-কাঁটাওয়ালা একটা উকোন-ঠেঙা—সাদা-সাদা দাঁত উঁচিয়ে রয়েছে।

কাঁধে একটা জ্বলুনি আর যন্ত্রণা অনুভব করে মিশ্কা, একটুও আওয়াজ না করে দু'হাতে মুখটা ঢেকে লুটিয়ে পড়ে। সজোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে একটি লোক ওর ওপর ঝুঁকে উকোন-কাঁটাটা বিঁধিয়ে দেয় শরীরে।

—ওঠ, এই হতভাগা!

বাকিটুকু মিশ্কার মনে পড়ে স্বপ্নের মতো। আন্তিপ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ওর বুকটা খিম্চে ধরে কাঁদতে লাগল ঃ এরই বেইমানিতে বাবা খুন হয়েছে। আমার হাতে তোমরা ছেড়ে দাও একে। গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেব এবার!—আন্তিপকে টেনে সরানো হল। ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। কে যেন শান্ত গলায় বোঝাবার চেষ্টা করলে ঃ

—ছেড়ে দাও ছোকরাকে! তোমরা খৃষ্টানের ছেলে না? এই আন্তিপ, ছেড়ে দে! তোর বাপকে তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবিনে, মাঝখান থেকে একটা লোকের খুনের জন্য দায়ী হয়ে থাকবি। ঘরে যাও ভাইসব! ওরা গুদোমবাড়িতে চিনি বিলি করছে, গিয়ে নিজেদের ভাগ বুঝে নাও গে'।

* *

সন্ধ্যায় যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখনো মিশ্‌কা সেই বেড়াটার নিচেই পড়ে আছে।' কাঁটা বেঁধা কোমরটা দপ্‌দপ্‌ করছে, টাটাচ্ছে। কিন্তু কাঁটাগুলো ওর ভেড়ার-চামড়ার কোট আর সোয়েটার ফুঁড়ে মাত্র দু'ইঞ্চি মাংসের মধ্যে বিঁধেছিল। কোনোরকমে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ও কান পেতে শোনে। বিদ্রোহীদের পক্ষের টহলদার সেপাইরা নিশ্চয় গ্রামে পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে এক একটা গুলির আওয়াজ শুনে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ডনের ধারে গরু ভেড়াদের হাঁটা-রাস্তা ধরে ও টিলার ওপর ওঠে। বেড়া ধরে ধরে গুঁড়ি মেরে এগোয়। বরফের মধ্যে হাতড়াতে থাকে, একটু এগিয়েই আবার পড়ে যায়। কোথায় এসেছে ও জানে না, আন্দাজে হামাগুড়ি দিয়ে চলে। ঠাণ্ডায় শরীর কাঁপছে, হাত দুটো জমে গেছে। ঠাণ্ডার চোটেই ও এক বাড়ির পাল্লা ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। লতায়-ছাওয়া ফটকটা খুলে খিড়কির উঠোনে চলে আসে। বাঁ দিকে একটা চালা দেখতে পেয়ে সেদিকেই এগোয়। কিন্তু তখুনি শুনতে পায় কারুর পায়ের শব্দ আর গলা খাঁকারি। ফেল্ট্‌-জুতো মস্‌মস্‌ করতে করতে কে যেন চালাঘরে ঢুকল। এখ্‌খুনি মেরে ফেলবে আমাকে—মিশ্‌কা আন্‌মনা হয়ে ভাবে যেন তৃতীয় ব্যক্তি কারুর কথা ভাবছে। দরজার গোড়ায় আলো-আঁধারির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

—কে ওখানে?—গলার স্বরটা ক্ষীণ, ভয়-পাওয়ার মতো। ঘরের মাঝখানের দেয়াল ধরে এগোয় মিশ্‌কা।

আরো জোরালো, আরো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে লোকটা জিজ্ঞেস করে—কে ও? স্তেপান আস্তাখভের গলা চিনতে পারে মিশ্‌কা।

—স্তেপান, আমি! আমি কশেভয়! ভগবানের দোহাই, বাঁচাও! কাউকে বলবে না তো? কেন বলতে যাবে বলো? আমাকে সাহায্য করো!

—ও, তুমি বুঝি!—টাইফাসের পর সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছে স্তেপান, গলার স্বরটা তাই খ্যানখেনে, সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লেও একটু যেন দ্বিধার ভাব তাতে।—আচ্ছা, রাতটা এখানেই কাটাও, তবে কালই সরে পড়তে হবে। কিন্তু ওখানে তুমি ঢুকলে কি করে?

স্তেপানের হাতটা ধরার জন্য হাতড়ায় মিশ্‌কা। হাতে হাত মিলিয়ে ফের গিয়ে ঢোকে পালা করে রাখা তুষের মধ্যে, পরদিন সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করে মরীয়া হয়ে এবার যাহোক কিছু করবে। সাবধানে নিজের বাড়ির দিকে এগোয় ও। টোকা দেয় জানলায়। ওর মা দরজা খুলে ওকে দেখেই কেঁদে ফেলে। সজোরে আঁকড়ে ধরে মিশ্‌কার গলা। মিশ্‌কার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে তার মাথাটা।

—ওরে মিশ্‌কা, তুই পালা, খৃষ্টের দোহাই ,পালা! আজ সকালে কসাকরা এসেছিল। তোর খোঁজে ওরা সারা বাড়িটা তচনচ করেছে। আন্তিপ আভ্‌দেয়িচ আমায় চাবুক মেরে বললে : তোর ছেলে তুই লুকিয়ে রেখেছিস। বললে : তখুনি যে কেন মেরে ফেললাম না একবারে, আপশোস হচ্ছে।

বন্ধুদের কোথায় হদিশ মিলবে মিশ্‌কা ভেবেই পেল না। মার মুখ থেকে ও অল্প দু এক কথা শুনে বুঝল যে ডনের পারের গোটা গ্রাম-এলাকাটাই বিদ্রোহ করেছে। স্তকমান, ইভান আলেক্সিয়েভিচ, দাভিদ আর মিলিশিয়ার সেপাইরা পলাতক, আগের-দিন দুপুরে ফিল্‌কা আর ত্রিমোফেই খুন হয়েছে।

—এখন চলে যা। নয়তো তোকে ওরা খুঁজে পাবে এখানে।—কাঁদল বটে মিশ্‌কার মা, কিন্তু তার গলার আওয়াজে কাঁপুনি নেই। বহুকাল পরে এই প্রথম মিশ্‌কাও কাঁদল

ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে। তারপর বুড়ী ঘুড়ীটাকে বের করে উঠোনে নিয়ে এল। পেছন পেছন আসছে বাচ্চাটা। মিশ্‌কার মা মিশ্‌কাকে জিনে তুলে দিয়ে ক্রুশ-প্রণাম করে। ঘুড়ীটা অনিচ্ছাভরে চলতে থাকে চিঁহি চিঁহি করে বাচ্চাকে ডাকতে ডাকতে। যতোবার ডাকে, মিশ্‌কার বুকটা ততোবারই টন্‌টন করে ওঠে।

কিন্তু গাঁ ছেড়ে নিরাপদে বেরিয়ে এল ও। কসাক-মোড়লের পুবের দিকের সদর রাস্তাটা ধরে চলল উত্তরমুখো। রাতটা অন্ধকার, আশ্রয় সন্ধানীর কাছে এ এক সুযোগ। মাঝে মাঝেই ঘুড়ীটা চিঁহি চিঁহি ডাকছে, বাচ্চাটাকে হারাবার ভয়ে। মিশ্‌কা দাঁতে দাঁত চেপে মাঝে মাঝে থামে আর কান পেতে শোনে সামনে কিংবা পেছনে ঘোড়ার খুরের ভারী আওয়াজ শোনা যায় কিনা। কিন্তু চারদিকেই একটা মায়াবী নিস্তব্ধতা যেন। শুধু টের পাওয়া যায় এককেবার থামার সুযোগ নিয়ে বাচ্চাটা তার মার ওলানে মুখ দিচ্ছে, পেছনের ছোট ছোট পা-দুটো তার বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে অনেকটা করে।

ভোরবেলায় ক্লান্ত অবস্থায় মিশ্‌কা এসে ঢুকল উস্ত-খপেরস্ক জেলার এক গাঁয়ে। লালফৌজী রেজিমেন্টের এক ফাঁড়িতে এসে দাঁড়াতে হল। দু'জন লালরক্ষী ওকে ওপরওয়ালাদের সদর দপ্তরে নিয়ে গেল। একজন পদস্থ অফিসার বিশ্বাস করতে না পেরে অনেকক্ষণ ধরে জেরা করল ওকে। এমনভাবে প্রশ্ন করতে লাগল যাতে ও নিজের প্যাঁচে নিজেই জড়িয়ে পড়ে—তোমাদের বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল? তোমার কাছে দলিলপত্র নেই কেন?—ইত্যাদি ধরনের বোকা-বোকা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল মিশ্‌কা।

বলল—আমাকে প্যাঁচে ফেলবার চেষ্টা করবে না, কমরেড। কসাকরা আমাকে এভাবে প্যাঁচে ফেলেনি। —শার্টটা তুলে ও কাঁটায় জখম কোমর আর পেটটা দেখাল। অফিসারটিকে বোঝাবার জন্য একটা উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল মিশ্‌কা, ঠিক সেই সময় ঢুকল স্তকমান।

স্তকমান চেঁচিয়ে উঠে মিশকার পিঠটা জড়িয়ে ধরে বললে—এই বাউণ্ডুলে হতভাগা! খুদে শয়তানটা!—অফিসারের দিকে ফিরে বললে—আরে, একে জেরা করছ কেন কমরেড? এ আমাদের নিজেদের লোক যে! কেন আমাকে কিংবা কর্তালিয়ারভকে ডেকে পাঠালে না, তাহলে এত জেরার দরকারই হত না। এসো হে মিখাইল। কিন্তু কি করে ছাড়া পেলে বলো তো? পালিয়ে এলে কি করে? আমরা তো জ্যান্ত লোকদের তালিকা থেকে তোমার নামই বাদ দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি শহীদ হয়েছ বীরের মতো।

মিশ্‌কার মনে পড়ল কেমন করে ও বন্দী হয়েছিল, নিজেকে বাঁচাতে পারেনি, শ্লেজেই পড়ে ছিল ওর রাইফেলখানা—মনে পড়তেই বেদনায় আরক্তিম হয়ে উঠল ওর মুখখানা।

তিন ॥

চালাঘরে পচাখড়, শুকনো গোবর আর ঘাসের আঁটির ভাপ্‌সা ঝাঁঝালো গন্ধ। দিনের বেলায় ছাদের ফাঁক দিয়ে একটা ধূসর আলো এসে পড়ে। রাতে ইঁদুরের কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ আর নিস্তব্ধতা।

বাড়ির গিন্নি দিনে একবার করে চুপিচুপি খাবার আনে গ্রিগরের জন্য—সন্ধ্যের সময়। ঘুঁটের পাঁজার মধ্যে একটা জলের কুঁজো লুকোনো আছে। এভাবে অবিশ্যি খুব মন্দ কাটত না, তবে সবটুকু তামাকই শেষ করে বসে আছে গ্রিগর। প্রথম দিন এ অবস্থায় কষ্ট পায় ও। একটু কিছু দিয়ে ধূমপান না করে আর থাকতে পারছে না। সকালে মাটির মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে কিছু শুকনো ঘোড়ার নাদ জড়ো করে। হাতের তেলোয় সেটাকে ডলে সিগারেট পাকিয়ে ফেলে কয়েকটা। সন্ধ্যের সময় বাড়ির কর্তা পুরনো বাইবেলের কয়েকটা ছেঁড়া পাতা, এক বাক্স দেশলাই, একমুঠো শুকনো তেপাতা আর শেকড়-বাকড় পাঠিয়ে দিল। দারুণ খুশি হয়ে উঠল গ্রিগর, যতোক্ষণ না একেবারে কাহিল হয় পড়ে ততোক্ষণ সমানে ধোঁয়া টানল সে। ঘুঁটের গাদার ওপর এই প্রথম বেশ নিটোল একটা ঘুম দিল।

পরদিন সকালে ওর কসাক বন্ধুটি চালাঘরে ছুটে এসে ঘুম ভাঙাল ওর, তারস্বরে চেচাঁতে লাগল ঃ

—এখনো ঘুম? ওঠো, ওঠো! ডনের বরফ গলতে শুরু করেছে!—প্রাণ খুলে হাসছে লোকটা।

গ্রিগর তড়াক করে নেমে আসে মাটিতে। পেছনে ঘুঁটের গাদাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে।

ও জিজ্ঞেস করে—কী ব্যাপার?

—ইদিককার ইয়েলান্‌স্কা আর ভিয়েশেন্‌স্কার কসাকরা তো মাথা চাড়া দিয়েছে। ফোমিন সমেত ভিয়েশেনস্কার গোটা গভর্নমেণ্ট পালিয়েছে তোকিনে। শুনলাম কাজান্‌স্কা, শুমিলিন্‌স্ক্‌, মিগুইলন্‌স্ক জেলাগুলোতেও নাকি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

গ্রিগরের রগ আর গলার শিরা-উপশিরাগুলো ফুলে ওঠে, ছোট ছোট সবুজ শিখা ঝিকিয়ে ওঠে ওর চোখে। আনন্দটা আর চেপে রাখতে পারছে না ও, গলার স্বর কাঁপছে। জোব্বাকোটের বাঁধনের কাছে কালো আঙুলগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে ওর, জিজ্ঞেস করে ঃ

—আর তোমাদের এ গাঁয়ে? এখানে কিছু ঘটেছে?

—কোনো কিছু শুনিনি। এইমাত্র চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে এলাম, সে হেসে বললে : যতোক্ষণ ভগবান আছেন ততোক্ষণ কোন্‌ ভগবানের আরাধনা করলাম তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আমার। কিন্তু তুমি তো এখন তোমার গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারো।

বাড়ির ভেতর চলল ওরা দু'জন। লম্বা লম্বা পা ফেলে গ্রিগর এগোচ্ছে আর ওর পাশে-পাশে তড়বড় করে ছুটছে কসাকটি। খবরগুলো জানিয়ে দিচ্ছে সে ঃ

—ইয়েলানস্কা জেলায় প্রথম মাথা তুলেছিল ক্রাস্‌নয়ারস্ক। দু'দিন আগে ইয়েলানস্কার জনাকুড়ি কমিউনিস্ট গিয়েছিল কয়েকজন কসাককে গ্রেপ্তার করতে। ক্রাস্‌নয়ারস্কের লোকেরা সে কথা শুনে একজোট হয়ে ঠিক করল ঃ 'আর কতোদিন এসব সহ্য করব? এখন আমাদের বাপ-দাদাদের ধরছে, কাল ধরবে আমাদের। ঘোড়ায় জিন চাপাও, চলো গিয়ে কয়েদীদের ছাড়িয়ে আনি।' বাছা বাছা জনা-পনের ছেলে জোগাড় হল। ওদের সম্বল মাত্র দু'খানা রাইফেল, কিছু তলোয়ার আর বর্শা। মেল্‌নিকভে গিয়ে ওরা দেখল কমিউনিস্টরা বিশ্রাম নিচ্ছে এক বাড়ির আঙিনায়, ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা সেখানে। কিন্তু জায়গাটা পাথরের দেয়ালে ঘেরা, তাই মার খেয়ে ফিরে এল। কমিউনিস্টরা ওদের একজনকে মেরেছে, তার আত্মার শান্তি হোক্‌। কিন্তু সোভিয়েত রাজত্বের আয়ুও শেষ হয়ে এল ঠিক সেই সময় থেকেই—নিকুচি করেছে!

প্রাতরাশের অবশিষ্টটুকু গোগ্রাসে গিলে ফেলল গ্রিগর, তারপর বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে এল রাস্তায়। কসাকরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মোড়ে মোড়ে জটলা করছে ছুটির দিনের মতো। একটা দলের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। সম্ভাষণ জানিয়ে কসাকরা টুপিতে হাত ছোঁয়াল, সংযত হয়ে সম্ভাষণের জবাব দিল। গ্রিগরের অপরিচিত মূর্তিটার দিকে ওরা তাকিয়ে রইল সপ্রশ্ন উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে।

গ্রিগরের কসাক গৃহকর্তা বুক ফুলিয়ে বললে—এ আমাদেরই লোক। ঘাবড়াবার কিছু নেই। তাতারস্কের মেলেখভদের নাম তো শুনেছ? এ হল পান্তালিমনের ছেলে গ্রিগর। গুলির হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমার কাছে এসেছিল।

আলাপ শুরু হল ওদের। একজন কসাক ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে লালরক্ষীদের হটিয়ে দেবার খবরটা সবে বলতে আরম্ভ করেছে এমন সময় দুজন ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল রাস্তার শেষ মাথায়। ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতে একেক দল কসাকের পাশে একটু থামছে আর ঘোড়া ঘুরিয়ে চিৎকার করে হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছে। গ্রিগর সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ওদের এগিয়ে আসার জন্য।

ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একজন কসাক বলল—ওরা আমাদের গাঁয়ের কেউ নয়। কোত্থেকে যেন খবর নিয়ে এসেছে।

গ্রিগরদের দলটার দিকে ঘোড়া চালিয়ে এল লোক দুটো। একজন বুড়ো, গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোটখানা অনেকখানি খোলা, মুখখানা লাল হয়ে ঘেমে উঠেছে, কপালের ওপর এসে পড়েছে পাকা চুলগুলো। জোয়ান মানুষের মতো ঘোড়ার রাশটা টেনে ধরে সে ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরলে। চেঁচিয়ে বলে—কসাকরা তোমরা সবাই মেয়েমানুষের মতো রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?—কান্নায় বুজে এল তার গলা, উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল কালশিটে পড়া গাল দুটো—ডনের সন্তান তোমরা, কেন দাঁড়িয়ে আছ? তোমাদের বাপ ঠাকুরদাদের ওরা গুলি করে মারছে। তোমাদের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে। ইহুদি কমিসারগুলো আমাদের রীতি-ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছে আর তোমরা এদিকে সূর্যমুখীর বীচি চিবোচ্ছ আর তাস পিটছো। তবু তোমরা সবুর করেই থাকবে যতোক্ষণ না রাশিয়ার ফাঁসির দড়িটা আমাদের গলায় এঁটে বসে! ইয়েলান্‌স্কা জেলার ছোট বড়ো প্রত্যেকটা গ্রাম জেগেছে। ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে লালরক্ষীদের হটিয়েছে ওরা, আর তোমরা ...তোমাদের শিরায় কি কসাকের রক্ত, না চাষীদের তাড়ি? ওঠো সবাই! অস্ত্র হাতে

নাও! আমরা ক্রিভস্কি গ্রাম থেকে এসেছি তোমাদের ঘুম ভাঙাতে। কসাক ভাইসব, নষ্ট এখনি ঘোড়ায় চাপো!—বুড়ো মতো একটি চেনা লোকের মুখের দিকে পাগলের মতো ঠায় তাকিয়ে থেকে দারুণ বিদ্রূপ করে সে চেঁচিয়ে উঠল—সিমিওন ক্রিস্তোফোরিভিচ, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? লালরক্ষীরা তোমার ছেলেকে ফিলোনোভোতে কচুকাটা করল আর তুমি চুল্লীর আড়ালে গিয়ে নিজেকে বাঁচাচ্ছ!

গ্রিগর আর শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে পারল না। উঠোনের দিকে ছুটল ও। ঘুঁটের পাঁজার তলা থেকে ঘোড়ার জিনটা টেনে বের করতে গিয়ে নখ ছড়ে রক্ত বেরিয়ে এল. তবু জিন চাপিয়ে ভূষির ঘর থেকে ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে বের করে আনল গ্রিগর। ভূতে পাওয়ার মতো উর্ধশ্বাসে বেরিয়ে এল ফটক দিয়ে।

বন্ধুর উদ্দেশে কোনোরকমে শুধু চেঁচিয়ে বললে—চললাম আমি! ঈশ্বর তোমার সহায় হোন্!—ঘোড়ার ঘাড়-বরাবর জিনের ডগার ওপর ঝুঁকে পড়ে চাবুক কষিয়ে তাকে জোর কদমে ছুটিয়েছে গ্রিগর। পেছনে বরফের গুঁড়ো ফের থিতিয়ে বসল। পা দুটো জিনে ঘষা খাচ্ছে, বুটের ওপর আলগা হয়ে ঝনাৎ ঝনাৎ করছে রেকাবজোড়া। এমন প্রচণ্ড আর ভয়ংকর একটা আনন্দ অনুভব করে ও, শক্তি আর সংকল্পের এমন একটা আবেশ যে নিজের অজ্ঞাতসারেই গলা দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরিয়ে আসে। এখন যেন মনে হয় রাস্তাটা ওর সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে, চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে-ওঠা একটা রাস্তার মতো।

জানোয়ারের মতো ঘুঁটের পাঁজার মধ্যে লুকিয়ে থাকা আর বাইরে একটু আওয়াজ কি কথা হলেই চমকে ওঠার সেই ক্লান্তিকর দিনগুলোয় ও সব কিছু যাচাই করে নিয়েছে, সবকিছু স্থির করে ফেলেছে। যেন আগের সেই দিনগুলোর অস্তিত্বই ছিল না কোনোকালে যখন ও সত্যকে খুঁজে বেড়িয়েছিল। সেই দ্বিধাচিত্ততা, মনের সেই পরিবর্তন আর বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব কোনোকালেও বুঝি-বা ছিল না। মেঘের ছায়ার মতো কেটে গেছে সে-সব। এখন সত্যকে খুঁজতে গেলে তা হবে উদ্দেশ্যহীন, অন্তঃসারশূন্য। ভাববারই বা ছিল কি এত? কেন ফাঁদে-পড়া নেকড়ের মতো ওর মন পালাবার রাস্তা খুঁজে পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করল, খুঁজে পেতে চাইল পরস্পর বিরোধিতার অবসান? জীবনটাকে মনে হয়েছিল অবাস্তব-রকমের, অতি-সমীচীন রকমের সরল। এখন ও বুঝেছে যে এমন কোনো পরম সত্য নেই যার পক্ষপুটে সমস্ত কিছু আশ্রয় পেতে পারে; এখন সে ভাবে, প্রত্যেকের কাছে তার নিজস্ব সত্য, নিজস্ব পথ। যতোক্ষণ মাথার ওপর সূর্য আছে, দেহের শিরায় যতোক্ষণ রক্ত উষ্ণ রয়েছে, ততোক্ষণ মানুষ এক টুকরো রুটির জন্য, একখণ্ড জমি কিংবা একটু বাঁচার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে ও করবে। যারা তাকে জীবন থেকে, জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায় তাদের সঙ্গে তার লড়াই। লড়তে হবে দৃঢ়পণ হয়ে, কোনো দ্বিধা না করে—ঘৃণায় ইস্পাত-কঠিন হয়ে, তার অনুভূতিকে বেঁধে রাখা চলবে না, একেবারে রাশ ছেড়ে দিতে হবে।

কসাকদের পথ আলাদা—রাশিয়ার জমিহীন চাষীদের পথ, কারখানা-মজুরের পথ আলাদা। লড়ো ওদের সঙ্গে! কেড়ে নাও ওদের হাত থেকে কসাকের রক্ত-রাঙা ডনের ভারি মাটি। তাতারদের একবার যেমন খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল সীমান্তের ওপারে, তেমনি তাড়িয়ে দাও এদেরও। আঘাত হানো মস্কোর ওপর, বাধ্য করো ওদের ঘৃণ্য শান্তির শর্ত মেনে নিতে! সরু আলের রাস্তায় পথ ছেড়ে দেবার জায়গা নেই—একজনকে ঠেলে

সরিয়ে দিতেই হবে আরেকজনের। ওরাই শুরু করেছে প্রথম? কসাকদের দেশে লেলিয়ে দিয়েছে লালফৌজীদল? তাহলে ধরো তলোয়ার!

একটা অন্ধ ঘৃণায় উন্মত্ত হয়ে গ্রিগর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যতোক্ষণ-না ডনের সাদা-কেশর-ফুলোনো আস্তরণটা ডিঙিয়ে চলে আসে। মুহূর্তের জন্য একটা সন্দেহ উঁকি দেয় ওর মনে ঃ লড়াইটা তো রাশিয়ার বিরুদ্ধে কসাকদের নয়, ধনীর বিরুদ্ধে গরিবের।... মিশ্‌কা কশেভয় আর ইভান আলেক্সিয়েভিচও কসাক, অথচ তারা মজ্জায় মজ্জায় কমিউনিস্ট।—কিন্তু তক্ষুনি গ্রিগর রাগ করে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলে মন থেকে।

দূরে দেখা যাচ্ছে তাতারস্ক। ঘোড়ার রাশ টানে ও। ঘোড়াটা সাবানের ফেনার মতো ঘেমে উঠে এখন দুলকি চালে চলতে শুরু করেছে। নিজের বাড়ির ফটকের কাছে এসে গ্রিগর আবার নতুন করে দাবড়ায় তাকে; বুকের ধাক্কায় দরজার পাল্লা খুলে উঠোনের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘোড়াটা।

॥ চার

গ্রিগর যেদিন তাতারস্কে এসে পেঁছিলো তার আগেই কসাকদের দুটো পল্টনী দল সেখানে জড়ো হয়েছিল। গ্রামের এক পঞ্চায়েতে ঠিক হয়েছে ষোল থেকে ষাট বছর বয়েস অবধি ছেলেবুড়ো যারাই হাতিয়ার নিতে পারবে তাদেরই সামিল করা হবে ফৌজে। অবস্থা যে সুবিধার নয় তা বুঝতে পেরেছিল অনেকেই—উত্তর দিকে বলশেভিকদের দখলে ভরোনেঝ প্রদেশ, তারপর খপেরস্ক জেলা কমিউনিস্টদের দরদী; দক্ষিণে লড়াইয়ের ফ্রন্ট, যে কোনো মুহূর্তে তা ঘুরে এসে প্রবল চাপে গুঁড়িয়ে দিতে পারে বিদ্রোহীদের। যেসব কসাক একটু বেশি সাবধানী তারা অস্ত্র হাতে নিতে না চাইলেও নিতে বাধ্য হল। স্তেপান আস্তাখভ সরাসরি অস্বীকার করল লড়তে যেতে।

গ্রিগর, ক্রিস্তোনিয়া আর আনিকুশ্‌কা সকালে গিয়ে স্তেপানের সঙ্গে দেখা করতে ও বললে—আমি যাচ্ছি না। আমার ঘোড়া নাও তোমরা, যা খুশি করো আমাকে নিয়ে, কিন্তু রাইফেল আমি তুলতে রাজি নই।

—রাজি নও মানে? কি বলতে চাও? প্রশ্ন করে গ্রিগর। নাকের ফুটো কাঁপছে ওর।

—আমার ইচ্ছে নেই, ব্যস্।

—আর যদি বলশেভিকরা গ্রাম দখল করে তাহলে কি করবে? বেরিয়ে যাবে, না, পেছনেই পড়ে থাকবে?

স্তেপান গ্রিগরের ওপর থেকে নজর সরিয়ে নেয় আকসিনিয়ার দিকে। খানিক চুপ করে থেকে জবাব দেয় :

—সে আমরা দেখব।

—তাই যদি হয় তো বেরিয়ে এসো! ক্রিস্তোনিয়া ওকে ধরো তো! এখুনি তোমায় দেয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে সাবাড় করে দেব!—গ্রিগর চেষ্টা করে যাতে চুল্লীর পাশে

জড়োসড়ো আক্সিনিয়ার দিকে চোখ না পড়ে। স্তেপানের জামার আস্তিন ধরে টানে—চলে এসো!

ফ্যাকাশে হয়ে যায় স্তেপান, দুর্বলভাবে ওদের ঠেকাতে চেষ্টা করে—গ্রিগর, বোকার মতো কোরো না! ছেড়ে দাও!—পেছন থেকে ওর কোমর চেপে ধরেছে ক্রিস্তোনিয়া। বিড়বিড় করে বলছে :

—এই যদি তোমার মনের ভাব, তাহলে চলে এসো!

—ভাইসব!

—আমরা তোমার ভাই-টাই নই। বলছি চলে এসো!

—ছেড়ে দাও আমাকে; আমি ফৌজে যাব। টাইফাসে ভুগে কাহিল হয়ে পড়েছি।

শুকনো হাসি হেসে গ্রিগর ছেড়ে দিল স্তেপানের আস্তিন। বললে—যাও, রাইফেল নিয়ে এসো। অনেক আগেই তোমার আসা উচিত ছিল ফৌজে।

কোনোরকম বিদায় না জানিয়েই ও চলে এল বাইরে। ক্রিস্তোনিয়া কিন্তু এত সব ঘটে যাবার পরও নির্বিকারচিত্তে স্তেপানের কাছ থেকে তামাক চেয়ে নিয়ে বসে বসে গল্পগাছা করতে লাগল, যেন ওদের ভেতর কোনো ব্যাপারই ঘটে যায়নি এর মধ্যে।

সন্ধ্যের দিকে ভিয়েশেনস্কা থেকে এল দু' স্লেজগাড়ি বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র। চুরাশিটা রাইফেল আর একশোটারও বেশি তলোয়ার আছে। কসাকরা অনেকে এবার লুকিয়ে-রাখা হাতিয়ারগুলো বের করল। দুশো এগারজন কসাককে জড়ো করা গিয়েছে গ্রাম থেকে, তার মধ্যে দেড়শো জনের ঘোড়া আছে, বাদবাকি চলল পায়ে হেঁটে।

বিদ্রোহীদের কোনো এক-কাঠ্ঠা সংগঠন এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। গ্রামগুলো কাজ করছে যে যার নিজের মতো, আলাদা আলাদা স্কোয়াড্রন তৈরি করে। কসাকদের ভেতর যারা সবচেয়ে জঙ্গী তাদের বেছে বেছে কমাণ্ডার বানাচ্ছে পদের বিচার না করে, তাদের কাজের যোগ্যতা বুঝে। কোনোরকম আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে না নেমে কেবল আশে-পাশের গ্রামগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগল আর টহলদারী ঘোড়সওয়ার পাঠাতে লাগল।

গ্রিগরের আসার আগে ওর ভাই পিয়োত্রাকে তাতারস্কের ঘোড়সওয়ারী স্কোয়াড্রনের নায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। লাতিশেভ নিয়েছিল পদাতিক ফৌজের নেতৃত্ব। গোলন্দাজ সেপাইদের সর্দার হয়ে ইভান তমিলিন কাছেই একটা গাঁয়ে গেছে। লাল-ফৌজের ফেলে-যাওয়া একখানা বিকল ফিল্ড-কামান মেরামত করবার চেষ্টা করছে সে। ভিয়েশেনস্কা থেকে আমদানি হাতিয়ারগুলো কসাকদের ভেতর বিলি করা হল। মখোভের কুঠরি-ঘর থেকে আর সবার সঙ্গে পান্তালিমনও ছাড়া পেয়েছিল। মেশিন-গানটাকে সে আবার মাটি খুঁড়ে বের করল। কিন্তু ওতে বেল্ট তো লাগানো নেই, ঘোড়সওয়ার ফৌজের কেউ তাই তল্পীতল্পার মধ্যে ওটাকে আর ঢোকাতে চাইল না।

পরদিন সন্ধ্যায় খবর এল, লাল সেপাইদের একটা পিটুনী ফৌজী দল, প্রায় শ'তিনেকের মতো লোক, সাতটা ফিল্ড-কামান আর বারোটা মেশিনগান নিয়ে কারগিন থেকে আসছে বিদ্রোহ দমন করতে। পিয়োত্রা ঠিক করল একটা বড়োসড়ো টহলদারী দল পাঠাবে, ভিয়েশেনস্কাতে খবরও পাঠাল। গ্রিগরের অধীনে বত্রিশজন টহলদারী সেপাই বেরিয়ে গেল সন্ধ্যে লাগার মুখেই। গ্রাম থেকে সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তোকিন পর্যন্ত এল প্রায় সমান গতি বজায় রেখে। গাঁয়ের দু' মাইল এদিকে একটা অগভীর খানার কাছে এনে গ্রিগর ওর দলবলকে নামালো ঘোড়া থেকে, খানাটার মধ্যে সবাইকে

এদিক ওদিক ছড়িয়ে রাখল। ঘোড়াগুলোকে একটা ফোকলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে তখন পুরু হয়ে বরফ পড়েছে। তিনজন কসাক—আনিকুশ্‌কা, মার্তিন শামিল আর প্রোখর জাইখভ্‌কে পাঠানো হল গ্রামের দিকে, ঘোড়ায় চেপে আস্তে আস্তে রওনা হল ওরা। রাত হয়েছে। স্তেপের ওপর দিয়ে নিচু হয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে মেঘ। খানাটার মধ্যে চুপচাপ বসে আছে কসাকরা। তিন ঘোড়সওয়ারের কালো মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল গ্রিগর, যতোক্ষণ না পাহাড়ের ওপাশে নেমে গিয়ে রাস্তার কালো রেখাকৃতির সঙ্গে ওরা মিশে যায়। এখন আর ঘোড়াগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে শুধু ওদের মাথা। তারপর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। দু'এক লহমা বাদেই পাহাড়ের ওপাশ থেকে একটা মেশিনগান কট্‌কট্‌ করে ওঠে। তারপরেই আরেকটা, এবার নিশ্চয় হাত-মেশিনগান। আরো জোরে আওয়াজ উঠল এবার। হাত-গানটা থেমে যায়, তারপর অল্পখানিক বিরতি দিয়েই প্রথম মেশিনগানটা তড়বড় করে শেষ করে আরেকখানা টোটার পেটি। একঝাঁক বুলেট ছুটে যায় আলো-আঁধার ভেদ করে খানাটার অনেক ওপর দিয়ে। তিনজন কসাক পূর্ণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসতে থাকে আবার।

বেশ একটু দূরে থেকেই প্রোখর জাইকভ চেঁচিয়ে বলে—একটা সেপাই-ফাঁড়ির মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম!

ঘোড়াগুলোকে তৈরি রাখতে হুকুম দিয়ে গ্রিগর খানাটার ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে। বুলেটের ঝাঁক শিস্‌ কেটে এসে বরফের মধ্যে বিঁধছে—সেদিকে নজর না দিয়েই ও কসাকদের দিকে এগিয়ে যায়।

জিজ্ঞেস করে—কিছু দেখতে পেয়েছিলে?

—ঘোরাফেরা করছিল, আওয়াজ পেলাম। দলে অনেকজন আছে নিশ্চয়, গলা শুনে যা বোঝা গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে আনিকুশ্‌কা।

গ্রিগর যখন ওদের প্রশ্ন করছে সেই সময় আটজন কসাক খানা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল যেখানে ঘোড়াগুলো ছিল সেইখানে। ঘোড়ার পিঠে চেপে বাড়ির দিকে রওনা হল ওরা।

দূরে সরে যাওয়া খুরের আওয়াজ শুনতে শুনতে গ্রিগর আস্তে আস্তে বললে: কাল আমরা ওদের গুলি করে মারব!

যেসব কসাক গ্রিগরের দলে রয়ে গেছে তারা আরো এক ঘণ্টা বসে থাকে। টুঁ শব্দ করে না, শুধু কান খাড়া করে রাখে। অবশেষে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পায় একজন।

বলে—তোকিনের দিক থেকে আসছে ওরা।

—টহলদার?

—হতেই পারে না।

নিজেদের ভেতর কানাকানি করে ওরা। খানার ওপর মাথা উঁচু করে সূচীভেদ্য অন্ধকারে মিছেই কিছু ঠাহর করতে চেষ্টা করে। ফিওদত বদভ্‌স্কভের 'কাল্‌মিক' চোখই প্রথম চিনতে পারে এগিয়ে-আসা ঘোড়সওয়ারদের। রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে স্থির-নিশ্চয় হয়ে বলে—এই ওরা এসে পড়ল। প্রায় দশজন ঘোড়সওয়ার রাস্তা ধরে আসছে নীরবে, সারি ভাঙা অবস্থায়। ওদের দল থেকে খানিকটা আগে-আগে মাথা উঁচু করে একটা মূর্তি, গরম কাপড় গায়ে। আকাশের কালো পটে গ্রিগর পরিষ্কার দেখতে পায় ঘোড়াগুলোর দেহের রেখা, ঘোড়সওয়ারদের চেহারার আদল, এমনকি ওদের নায়কের চ্যাপ্‌টা ফারের টুপিখানা পর্যন্ত। মাত্র তিরিশ গজ দূরে ওরা। মনে হচ্ছিল যেন ওরা

কসাকদের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস আর বুকের ভারি ধুক্‌ধুক্‌ আওয়াজটা অবধি নির্ঘাৎ শুনতে পেয়েছে।

গ্রিগর আগেই হুকুম দিয়ে রেখেছিল যতোক্ষণ না বলা হয় ততোক্ষণ যেন কেউ গুলি না ছোঁড়ে। সঠিক মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছিল ও সুনিশ্চিত হয়ে, ভেবেচিন্তে হিসেব করে। মতলবটা এর মধ্যেই ওর মাথায় এসে গেছে : ঘোড়সওয়ারদের ও সরাসরি চ্যালেঞ্জ করবে, সবাই যখন হতভম্ব হয়ে একসঙ্গে রাশ টেনে ধরবে তখন গুলি করবে।

আস্তে আস্তে রাস্তার বরফ মুড়মুড় করে। খালি পাথরের ওপর ঘোড়ার খুর পিছলে গিয়ে মাঝে মাঝে আগুনের হলদে ফুল্‌কি ওঠে।

খানার কিনারায় আস্তে করে লাফিয়ে পড়েই গ্রিগর সোজা হয়ে দাঁড়াল—কে যায়? দলের অন্য কসাকরা ওর পেছনে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরে যা হল তার জন্য গ্রিগর তৈরি ছিল না।

—কাকে চাই? ঘ্যাঁসঘেসে গলায় প্রধান ঘোড়সওয়ারটি পাল্‌টা জিজ্ঞেস করলে, গলার আওয়াজে এতটুকু ভয় বা বিস্ময়ের চিহ্ন নেই। গ্রিগরের দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলে লোকটি।

জায়গা থেকে না নড়ে, রিভলবারটা একটু উঁচু করে গ্রিগর কড়া গলায় বললে—কে তুমি?

লোকটা চটে গিয়ে চেঁচিয়ে জবাব দিলে :

—কার অতো গলাবাজি করার সাহস? আমি পিটুনি ফৌজের কমাণ্ডার, আট নম্বর লালফৌজের স্টাফ বিদ্রোহ দমন করার হুকুম দিয়েছে আমাকে। তোমাদের কমাণ্ডার কে? তাকে এখানে আসতে বল।

—আমিই কমাণ্ডার।

—তুমি? ও...

ঘোড়সওয়ারের শূন্যে-উঁচোনো হাতটার মধ্যে একটা কালো জিনিস দেখতে পেল গ্রিগর। মাটিতে শুয়ে পড়েই ও চেঁচিয়ে উঠল : চালাও গুলি!—লোকটার ব্রাউনিং পিস্তল থেকে একটা চ্যাপ্‌টা-মাথা বুলেট ছুটে গেল গ্রিগরের মাথার ওপর দিয়ে। কান-ফাটানো চিৎকার উঠল দু'পক্ষ থেকেই। বদভ্‌স্কভ্‌ ছুটে গিয়ে লাল কমাণ্ডারের ঘোড়ার রাশটা চেপে ধরল। ওর ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে গ্রিগর তার তলোয়ারের চ্যাপ্‌টা দিকটা দিয়ে ঘা মারল লোকটার মাথায়, জিনের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল সে। দু' মিনিটের মধ্যে ঘটে গেল সমস্ত ব্যাপারটা। তিনজন লালফৌজী সেপাই ঘোড়া দাবড়িয়ে পালিয়ে গেল। দু'জন মারা পড়েছে। বাদবাকি সকলের হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হল।

লালফৌজের কমাণ্ডারের মুখের মধ্যে রিভলবারের নলটা পুরে গ্রিগর খুব সংক্ষেপে জেরা করতে লাগল :

—নাম কি তোমার, এই কেউটে?

—লিখাচেভ।

—মাত্র ন'জন সঙ্গী নিয়ে কিসের আশায় বেরিয়েছিলে? ভেবেছিলে কসাকরা তোমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইবে?

—আমাকে মেরে ফেল!

—সে যথাসময়ে হবে!—সান্ত্বনা দেয় গ্রিগর—তোমার দলিলপত্র কই?

—পুলিন্দার মধ্যে। নিয়ে নাও, বেটা ডাকাত...শুয়োর!

লিখাচেভের গালাগালিতে কান না দিয়ে গ্রিগর নিজেই ওকে খানাতল্লাসী করে। ভেড়ার-চামড়ার কোর্তার পকেট থেকে দ্বিতীয় ব্রাউনিং পিস্তলখানা টেনে বের করে। মসার আর পুলিন্দাটা খুলে নেয়। ভেতরের পাশ-পকেটে একটা সিগারেটকেস আর একটা ছোট নোটবই খুঁজে পায়।

লিখাচেভ সমানে গালাগাল ঝাড়ছে আর গোঙাচ্ছে। গ্রিগরের ঘুষিখানা ওর মাথার ওপর পড়ে পিছলে গিয়ে ডান কাঁধে লাগে।

গ্রিগর হুকুম দেয়ঃ কোর্তাটা খোলো তো হে কমিসার! চেহারাটা তো তেল-চুক-চুকে, কসাকদের রুটি খেয়ে ফুলেছ, ঠাণ্ডায় জমে যাবে বলে মনে হয় না।

বন্দীদের হাতগুলো পেছন মোড়া করে ঘোড়ার রাশ আর পেটি দিয়ে বাঁধা। ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওদের। ভিয়েশেনস্কার কাছেই বাজ্‌কিতে রাত কাটায় গোটা দলটা। লিখাচেভ উনোনের কাছে মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল আর দাঁতে দাঁত চেপে গোঙাচ্ছিল। গ্রিগর ওর কাঁধটা ধুয়ে বেঁধে দেয়। কিন্তু লোকটার কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না ও। টেবিলে বসে দখল-করা দলিলপত্রগুলো পড়তে থাকে, ভিয়েশেনস্কার যেসব প্রতি-বিপ্লবীর নাম বিপ্লবী-আদালত দাখিল করেছে সেই তালিকা, নোটবইটা, চিঠিপত্র আর মানচিত্রের নিশানা খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। মাঝে মাঝে লিখাচেভের দিকে তাকায় আর তলোয়ারে-তলোয়ারে মতো দৃষ্টি বিনিময় হয় ওদের। সারা রাত জেগে থাকে কসাকরা। মাঝে মাঝে শুধু ঘোড়াগুলোকে দেখবার জন্য বেরোয়, নয়তো সিঁড়ি-বারান্দায় শুয়ে গল্পগাছা করে, সিগারেট ফোঁকে।

ভোর হবার ঠিক আগেই গ্রিগরের ঝিমুনি এসেছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি জেগে উঠে টেবিল থেকে মাথা তোলে ও। দ্যাখে খড়ের গাদার ওপর বসে লিখাচেভ দাঁত দিয়ে ব্যাণ্ডেজ কেটে পুলটিশ্‌টা ছিঁড়ে ফেলছে। উগ্র রক্তলাল চোখে সে তাকাল গ্রিগরের দিকে। তীব্র ব্যথায় দাঁত বের করে আছে লিখাচেভ, চোখ দুটো তার মৃত্যু-যন্ত্রণায় এমনভাবে ঠিকরে পড়ছে যে গ্রিগরের চোখের তন্দ্রা কে যেন কেড়ে নিল অদৃশ্য হাতে।

ও জিজ্ঞেস করে—কী করছ তুমি?

লিখাচেভ গর্জে ওঠে—তা দিয়ে তোমার কি দরকার? আমি মরতে চাই।—ফ্যাকাশে হয়ে যায় ও, মাথাটা ঢলে পড়ে খড়ের মধ্যে। সারারাত ধরে আধ বালতি জল খেয়েছে, একবারও চোখ বোজেনি। সকালে গ্রিগর ওকে স্লেজে করে ভিয়েশেনস্কায় পাঠিয়ে দিলে, সঙ্গে পাঠাল দখল-করা দলিলপত্রগুলো আর একটা ছোট রিপোর্ট।

* *

দু'জন ঘোড়াসওয়ার কসাকের পাহারায় স্লেজটা ঘড়ঘড় করে এগিয়ে এল ভিয়েশেন্‌-স্কার কর্মপরিষদের লাল ইটের বাড়িটার সামনে। লিখাচেভ আধ-শোয়া অবস্থায় ছিল। এক হাতে রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজটা চেপে ধরে ও উঠে দাঁড়াল। কসাকরা ঘোড়া থেকে নেমে ওকে টেনে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে।

বিদ্রোহীদের একজোট-হওয়া ফৌজের অস্থায়ী সেনাপতি যে কামরাটা দখল করে আছে সেখানে প্রায় জনা-পঞ্চাশেক কসাক ভিড় জমিয়েছে। কমাণ্ডার সুইয়ারভ যে টেবিলটার কাছে বসেছিল লিখাচেভ হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেখানে। সুইয়ারভ ছোটখাটো কসাক, চেহারায় কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই—এক তার ওই হলদে চোখ জোড়ার স-বিদ্রূপ চাউনি ছাড়া। লিখাচেভের দিকে তাকিয়ে সে বললে ঃ

—বাছা, তুমিই বুঝি লিখাচেভ?

হ্যাঁ। এই আমার দলিলপত্র।—লালফৌজের কমাণ্ডার টেবিলে নোটবইটা ছুঁড়ে দিয়ে একগুঁয়ের মতো কঠিন চোখে চেয়ে রইল সুইয়ারভের দিকে।—আমার দুঃখ যে তোমাদের সাপের মতো পিষে মারবার যে হুকুম আমার ওপর ছিল তা তামিল করতে পারলাম না। কিন্তু তোমাদের উপযুক্ত সাজা দেবে সোভিয়েত রুশ! এখুনি আমায় গুলি করে মেরে ফেল!

—না, কমরেড লিখাচেভ। বন্দুক চালানোর বিরুদ্ধেই তো বিদ্রোহ করেছি আমরা। আমরা তোমাদের মতো নই, মানুষকে গুলি করে মারি না। আমরা তোমার জখম সারিয়ে দেব, এর পরেও হয়তো তুমি আমাদের কাজে লাগবে।—জবাব দেয় সুইয়ারভ আর ওর চোখদুটো সামান্য জ্বল্‌জ্বল করে ওঠে। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলে—তোমরা সবাই বাইরে যাও! শিগগির!

কামরার ভেতর রইল শুধু পাঁচটা ফৌজী কোম্পানির কমাণ্ডাররা। টেবিলের ধারে বসল সবাই। একজন একটা টুল পা দিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিল লিখাচেভের দিকে। কিন্তু বসতে রাজি হল না লিখাচেভ। দেয়ালে হেলান দিয়ে তাকিয়ে রইল ওদের মাথার ওপর দিয়ে জানলার বাইরের দিকে।

কোম্পানি কমাণ্ডারদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে সুইয়ারভ বলতে শুরু করলে—আচ্ছা এবারে বলো তো লিখাচেভ, তোমার ফৌজী দলটায় কতোজন সৈন্য আছে?

—আমি বলব না।

—বলবে না? বেশ, কুছ পরোয়া নেই। তোমার কাগজপত্র থেকেই সেটা উদ্ধার করব। তা যদি না হয় তো তোমার লালরক্ষীকে জেরা করব। আরেকটা কথা তোমায় বলার আছে ঃ ভিয়েশেন্‌স্কায় আসবার জন্য তোমার ফৌজীদলকে লিখে জানাও। তোমাদের সঙ্গে লড়বার কোনো কারণ নেই আমাদের। আমরা সোভিয়েত সরকারের বিরোধী নই, তবে কমিউনিস্ট আর ইহুদিদের দুশমন। তোমার সেপাইদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। তোমাকেও আমরা খালাস করে দেব। এক কথায় —ওদের লিখে দাও যে আমরাও মেহনতী মানুষ, আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই, আমরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নই।...

সুইয়ারভের ছোট পাকা দাড়ির ওপর সিধে থুতু ছোঁড়ে লিখাচেভ। আস্তিন দিয়ে দাড়িটা মোছে সুইয়ারভ, চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। একজন কমাণ্ডার হাসে, কিন্তু নেতার সম্মান রক্ষা করতে কেউই এগিয়ে আসে না।

—আমাদের তাহলে অপমান করলে কমরেড লিখাচেভ?—সুইয়ারভের কথায় কৃত্রিমতার আভাস পরিষ্কার—আতামান আর অফিসাররা আগে আমাদের অপমান করত, থুতু ছুঁড়ত। আর তুমি একজন কমিউনিস্ট হয়েও থুতু ছুঁড়লে! তবু তোমরা বলো তোমরা নাকি জনসাধারণের পক্ষে। বেশ, কাল তোমাকে কাজান্‌স্কা পাঠিয়ে দেব।

একজন কোম্পানি কমাণ্ডার কঠিন স্বরে বললে—এখনো তোমার শেষ হয়নি নাকি?

লিখাচেভ কাঁধের ওপর কোটটা গুছিয়ে নিয়ে দরজার প্রহরীর দিকে এগিয়ে গেল।

* * *

তবু ওরা গুলি করে মারেনি লিখাচেভকে। বিদ্রোহীরা "গুলি চালানো আর লুঠতরাজ" ঠেকানোর জন্য খুবই চেষ্টা করছিল। পরদিন লিখাচেভকে পাঠানো হল

কাজান্‌স্কায়। ঘোড়সওয়ার পাহারাদারের আগে আগে বরফের ওপর দিয়ে আলগা পায়ে হেঁটে চলল লিখাচেভ। ভুরুদুটো কুঁচকে আছে ওর। কিন্তু বনের ভেতর একটা বিষাক্ত সাদা-বার্চ গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। থেমে পড়ে ভালো হাতখানা বাড়িয়ে একটা কচি ডাল পেড়ে নিল সে। মার্চ মাসের মিষ্টি রসে এরই মধ্যে ভরপুর হয়ে উঠেছে মুকুলগুলো, তাজা প্রাণের বাসন্তী সুবাস জেগে উঠেছে। লিখাচেভ কয়েকটা কুঁড়ি মুখের ভেতর পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল। নতুন বসন্তে উৎফুল্ল গাছটার দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে আছে ও। ঠোঁটের কিনারায় ফুটে উঠেছে হাসি।

কুঁড়ির কালো পাপড়িগুলো ঠোঁটে নিয়েই মারা যায় লিখাচেভ। ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে পাঁচ মাইল দূরে বালিয়াড়ির মধ্যে পাহারাদার সেপাইরা তাকে পশুর মতো কচুকাটা করে। জ্যান্ত থাকতে থাকতেই লিখাচেভের চোখের মধ্যে ওরা তলোয়ারের ডগা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, হাত কান নাক কেটে মুখের ওপর একটা ঢেরা চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। ওর পাৎলুন খুলে বিশাল সুন্দর পৌরুষব্যঞ্জক দেহটাকে অত্যাচার করে কলুষিত করেছিল ওরা। রক্তাক্ত দেহকাণ্ডটাকে ধর্ষণ করে শেষে একজন ওর কম্পিত বুকের ওপর দাঁড়িয়ে এক কোপে মাথাটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

॥ পাঁচ ॥

*

ডনের ওপার থেকে খবর আসছে বিদ্রোহের ব্যাপক বিস্তৃতির, খবর আসছে উজানী এলাকা থেকে, সমস্ত জেলা থেকে। বিদ্রোহ করেছে সাতটি জেলা, তাড়াতাড়ি করে নও গড়েছে তারা। আরো তিনটে জেলা সরাসরিই এ পক্ষে চলে আসতে প্রস্তুত। কেন্দ্র ভিয়েশেন্‌স্কা। দীর্ঘ বিতর্ক আর আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে আগেকার সরকারী কাঠামোই বজায় রাখা হবে। কসাকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন, বিশেষ করে যারা একটু তরুণ বয়েসী, তারাই নির্বাচিত হয়েছে আঞ্চলিক কর্মপরিষদে। প্রাক্তন গোলন্দাজ অফিসার দানিলভ হল চেয়ারম্যান, জেলায় আর গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠল সোভিয়েত সংস্থা, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার একদা-ঘৃণিত "কমরেড" সম্বোধনটাই দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে চালু থেকে গেল। আওয়াজ উঠল : "আমরা সোভিয়েত রাজত্বের পক্ষে, কিন্তু কমিউন, বন্দুকবাজি আর লুটতরাজের বিরুদ্ধে।" টুপির সাদা চুড়ো বা ফিতের বদলে বিদ্রোহীরা ব্যবহার করছে লাল আর সাদা আড়াআড়ি ফিতে।

বিদ্রোহের নেতৃত্ব করবে যে সব অফিসার তারা এসেছে সরাসরি সাধারণ কসাক সেপাইদের ভেতর থেকে। কিন্তু ফৌজীদল আগেই যা করে ফেলেছে তাতে সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া ওদের করনীয় কিছু নেই। সংগঠক আর নেতা হিসাবে তাদের হাত বাঁধা, ফৌজের এইসব লোকদের চালাবে কিংবা ঘটনার দ্রুত গতির সঙ্গে তাল রাখবে এমন শক্তি তাদের নেই।

বিদ্রোহ দমন করতে পাঠানো হয়েছিল একটা ঘোড়াসওয়ারী লাল রেজিমেণ্টকে।

মার্চ করে যাবার সময় উস্ত-খপেরস্ক্, ইয়েলানস্ক্ আর ভিয়েশেন্স্কার কিছু জেলা থেকে বলশেভিকদের জড়ো করে ওরা এককেটা গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল লড়তে লড়তে। ডন নদী বরাবর স্তেপের ওপর দিয়ে চলল পশ্চিমমুখো। ১৮ই মার্চ তারিখে ইয়েলান্স্কার বিদ্রোহীদের সাহায্য পাঠাবার জরুরি আবেদন নিয়ে একজন ঘোড়সওয়ার কসাক এলো তাতারস্কে। কোনো বাধা না দিয়েই ওরা পিছু হটে গিয়েছে কারণ ওদের রাইফেল বা গোলাবারুদ কিছুই নেই। মেশিনগানের বুলেট দিয়ে ওদের ঝেঁটিয়ে দিয়েছে লালফৌজ, দু'দুটো কামান চলেছে ওদের ওপর। এ অবস্থায় জেলা কেন্দ্র থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকলে ভরসা নেই। পিয়োত্রা মেলেখভ তাই তার দুটো স্কোয়াড্রন নিয়েই লালফৌজের মোকাবেলা করবে ঠিক করল।

কাছেপিঠের গ্রামগুলোতে চারটে স্কোয়াড্রন মোতায়েন রয়েছে, পিয়োত্রা তাদের নেতৃত্বের ভার নিল। সকালবেলায় টহলদারদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে কসাকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তাতারস্ক ছেড়ে। গ্রাম থেকে প্রায় ছ'মাইল দূরে যে-জায়গাটায় গ্রিগর আর ওর স্ত্রী নাতালিয়া চাষবাস শুরু করেছিল, তারপর শীতের প্রথম তুষারের প্রকোপে বেকায়দায় পড়েছিল, যে-জায়গাটায় গ্রিগর প্রথম নাতালিয়াকে খুলে বলেছিল যে সে ওকে ভালোবাসে না, সেই জায়গায় ঘোড়া থেকে নামল ঘোড়সওয়ার ফৌজ। ঘোড়াগুলোকে অন্য জায়গায় সরিয়ে লুকিয়ে রেখে ওরা সার বেঁধে ছড়িয়ে পড়ল। ওপর থেকে ওরা দেখতে পাচ্ছিল নিচে প্রশস্ত পাহাড়ী খাতটার ভেতর থেকে লালফৌজের সেপাইরা বেরিয়ে আসছে তিনটে সারিতে। শত্রুরা এখনো প্রায় দু'মাইল দূরে। কসাকরা তাড়াহুড়ো না করে ধীরে সুস্থে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে লাগল।

পেয়োত্রার দানাপানি-খাওয়া ঘোড়াটার গা থেকে ভাপ বেরুচ্ছিল। ঘোড়ায় চেপে সে এগিয়ে এল যেখানে গ্রিগর তার অর্ধেক স্কোয়াড্রনের ভার নিয়ে হাজির আছে। বেশ খোশমেজাজ সতেজ ভাব ওর।

—ভাইসব! বেফালতু বুলেট খরচা কোরো না। যখন হুকুম দেব তখনি গুলি ছুঁড়বে। গ্রিগর, তোমার আধ স্কোয়াড্রন সেপাই আরো বাঁ-দিকে গজ-পঞ্চাশেক সরিয়ে নিয়ে যাও। জলদি!—শেষবারের মতো কয়েকটা হুকুম-হাকাম দিয়ে দূরবিনটা তুলে ধরল চোখের সামনে—আরে, ওরা দেখছি মাৎভিয়েভ টিলাটার ওপর এক সার কামান বসাচ্ছে। —বলে উঠল ও সবিস্ময়ে।

গ্রিগর বললে—ও একটু আগেই আমি দেখেছি। দেখবার জন্য দূরবিনের দরকার হয় না।—ভাইয়ের হাত থেকে দূরবিনটা নিজের হাতে নিয়ে দেখতে লাগল গ্রিগর।

দলবল ছেড়ে একটু সরে গিয়ে পিয়োত্রাকে ডাকল—এদিকে এসো তো। পেছন পেছন এল পিয়োত্রা। ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করে গ্রিগর বললে ঃ

—এখানে ঘাঁটি করাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। এই খানাখন্দগুলো ছেড়ে সরে যাওয়া উচিত। পাশ থেকে যদি ওরা হামলা করে বসে, তাহলে আমরা কোথায় থাকব? কি মনে হয় তোমার?

চটে গিয়ে হাত নেড়ে পিয়োত্রা বললে—তোমার ব্যাপারখানা কি? পাশ থেকে ওরা কিভাবে আক্রমণ করতে পারে? আমি এক কোম্পানি সেপাই মজুত রেখেছি। যদি অবস্থা খুব খারাপ হয়, এই খানাখন্দই কাজে লাগবে। বিপদ ওগুলোতে নয়।

গ্রিগর ওকে সাবধান করে দিলে—তুমি দেখেই নিও আমার কথাটা!—ঘাঁটিটার চারদিকে আরেকবার চট্ করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ও কসাকদের দলে ফিরে গেল।

কড়া নিষেধ থাকা সত্বেও তাতারস্কের পদাতিক ফৌজ (ঠাট্টা করে ঘোড়সওয়াররা ওদের নাম দিয়েছে 'নাচওয়ালা') ছোট ছোট দল পাকিয়ে বসেছে। নিজেদের মধ্যে বুলেট ভাগাভাগি করছে, ধূমপান আর হাসাহাসি করছে ওরা। বাদবাকি সকলের চেয়ে ক্রিস্তোনিয়ার লোমের টুপিখানা একমাথা উ'চুতে। পান্তালিমন মেলেখভের লাল তে-কোণা টুপিটাও বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দলের বেশির ভাগই বুড়ো কিংবা একেবারে ছোকরা। আধ মাইলটাক দূরে বসেছিল ইয়েলান্স্ক-এর লোকেরা। ওদের চার কোম্পানিতে ছ'শো সেপাই, কিন্তু প্রায় দু'শো জনকেই হুকুম দেয়া হয়েছে ঘোড়াগুলোকে দেখবার জন্য।

টিলার আড়াল থেকে ফিল্ড-কামানের তোপ দাগা শুরু হতেই কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। স্তেপের ওপর ভারি গুম্-গুম্ আওয়াজটা শোনা যেতে লাগল অনেকক্ষণ অবধি। প্রথম গোলাটার টিপ্ ঠিক হয়নি। কসাকদের সারি থেকে প্রায় আধমাইল দূরে পড়েছে সেটা। বিস্ফোরণের কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে রইল ঝোপঝাড়ের মধ্যে। লাল-সেপাইদের সারি থেকে শুরু হয়েছে মেশিনগানের খক্‌খকানি। পুরো আওয়াজের খানিকটা চাপা পড়ে যাচ্ছে তুষারে, শোনাচ্ছে ঠিক রাতের চৌকিদারের হাতুড়ি ঠোকার মতো। কসাকরা ঝোপের আড়ালে বরফের মধ্যে আর সূর্যমুখীর ফুল-ঝরা ঘস্‌ঘসে ডাঁটিগুলের ভেতর শুয়ে পড়ল।

—ধোঁয়াটা তো রীতিমতো কালো। মনে হচ্ছে ওরা জার্মান গোলা ছুঁড়ছে।—প্রোখর জাইকভ চিৎকর করে জানাল গ্রিগরকে।

রুবিয়েঝিন গ্রামের একজন লাল দাড়িওয়ালা কোম্পানি-অধিনায়ক ছুটতে ছুটতে এল পিয়োত্রার কাছে। বললে—আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, কমরেড মেলেখভ। একটা স্কোয়াড্রনকে ডনের দিকে পাঠিয়ে দিন, নদীর ধার দিয়ে ওরা গাঁয়ে চলে যাক্, তারপর পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ুক লালফৌজের ওপর। ওদের রসদবোঝাই শ্লেজগুলো নিশ্চয় বিনা পাহারায় ফেলে রেখে এসেছে। একেবারে ঘাবড়ে যাবে সবাই।

"বুদ্ধি"টা বেশ মনে ধরল পিয়োত্রার। গ্রিগরের দিকে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল ও। প্রস্তাবটা ওকে বুঝিয়ে দিয়ে সংক্ষেপে হুকুম জানাল ঃ

—তোমার আধ স্কোয়াড্রন সরিয়ে নিয়ে পেছন দিক থেকে ওদের ওপর হামলা করো।

গ্রিগর ওর দলের কসাকদের সরিয়ে একটা নিচু জায়গায় নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সবাইকে চড়িয়ে জোর কদমে ছুটল গাঁয়ের দিকে।

ঘাঁটিতে বসে-থাকা কসাকরা দু রাউণ্ড গুলি চালিয়ে আবার চুপচাপ। লালফৌজের সবাই মাটিতে শুয়ে পড়েছে। ওদের মেশিনগানের একটা বুলেট এসে লাগে মার্তিন শামিলের ঘোড়ার গায়ে। যে কসাকটি ঘোড়া সামলে রেখেছিল তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ঘোড়াটা পাগলের মতো ছুটে চলে রুবিয়েঝিন্ কসাকদের সারির ভেতর দিয়ে। টিলা বেয়ে সে সবেগে নামতে থাকে লালফৌজের দিকে। এক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি এসে লাগে, শূন্যে অনেকখানি উ'চুতে পাছা তুলে বরফে মুখ থুবড়ে পড়ে জানোয়ারটা।

মেশিনগান চালকদের দিকে গুলি চালাতে হুকুম দেয় পিয়োত্রা। ছোটখাটো এক কসাক, নাম ডাক আছে হাতের অব্যর্থ টিপের জন্য—তিনজন গোলন্দাজকে সে-ই ঘায়েল করে। ওদের ম্যাকসিম-গানখানা বিকল হয়ে যায়। কিন্তু মজুত গোলন্দাজরা ফের চট্ করে দখল করে নেয় ওদের জায়গা, আবার শুরু হয় মৃত্যুবীজের বর্ষণ। কসাকরা বরফের

মধ্যে ক্রমেই বেশি করে ডুবে যাচ্ছে, শেষ অবধি শুধু মাটিতে পা ঠেকে ওদের। লালফৌজের গোলাবারুদ ফুরিয়ে এসেছে বোঝা যায়, কারণ, প্রায় তিরিশ রাউণ্ডের পর ওদের গুলি ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল। অধীরভাবে পিয়োত্রা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে থাকে টিলার চুড়োটার দিকে। দু'জন সংবাদবাহককে দিয়ে গাঁয়ে হুকুম পাঠায় যতো প্রাপ্তবয়স্ক লোক আছে সবাই যেন উকোন-ঠেঙা কাস্তে কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে আসে! পাহাড়ের ওপর ওদের দেখলে কসাকদের শক্তি সম্পর্কে লালফৌজের একটা অতিরঞ্জিত ধারণা হবে এই ওর আশা।

এ হুকুমে সাড়া দিয়ে দেখতে-দেখতে অসংখ্য লোক এসে দাঁড়ায় পাহাড়ের মাথায়, ঢাল বেয়ে নামতে থাকে তারা। কসাকরা ওদের তামাশা করে তারিফ জানায় :

—কতগুলো কালো পাথর যেন গড়িয়ে আসছে, দ্যাখো!

—সারা গ্রামটাই বেরিয়ে পড়েছে, মেয়ে পুরুষ সবাই।

হাত-কাটা আলেক্সি বলে—আহা, লালফৌজের বন্দুকগুলো ঠাণ্ডা মেরে গেল! একখানা গোলা যদি ছুঁড়ত ওদের মাঝখানে, তাহলে সব ঘাগরা ভিজিয়ে ছুটত ফের গাঁয়ের দিকে। —মনে হল ও যেন সত্যিসত্যিই দুঃখ করছে লালফৌজ মেয়েদের ওপর একখানাও গোলা ছুঁড়ল না বলে।

দুটো লম্বা এলোমেলো সারিতে এগিয়ে এসে ভিড়টা থেমে যায়। পিয়োত্রা হুকুম দেয় কসাকদের লাইন থেকে ওরা যেন বেশ কিছুটা পেছনে থাকে। কিন্তু ওদের এই আবির্ভাবেই লালফৌজ যেন চিন্তায় পড়েছে। পেছু হটতে হটতে তারা একেবারে নেমে যায় উপত্যকার নিচে। কোম্পানি-অধিনায়কদের সঙ্গে সংক্ষেপে একটু আলোচনা সেরে পিয়োত্রা ইয়েলান্‌স্কের লোকদের সরিয়ে ওর ফৌজের ডান পাশটা খালি করে দেয়। ওদের হুকুম দেয় উত্তরের দিকে গিয়ে গ্রিগরের সঙ্গে আক্রমণে যোগ দেবার জন্য। লালফৌজের একেবারে চোখের ওপরেই স্কোয়াড্রনগুলো তৈরি হয়ে ছুটে যায় ডনের দিকে।

পেছু হটতে-থাকা শত্রুদের ওপর কসাকরা নতুন করে গুলি চালাতে শুরু করল। এর মধ্যে বেশ ক'জন বেপরোয়া মেয়ে আর এক পাল ছেলে লড়িয়ে ফৌজের সারির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওদের মধ্যে একজন দারিয়া। পিয়োত্রার কাছে গিয়ে ও বললে :

—ওগো একবারটি আমায় গুলি ছুঁড়তে দাও ওই লালগুলোর ওপর। আমি রাইফেল চালাতে জানি।—পিয়োত্রার কার্বাইনটা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পরম আস্থাভরে কাঁধে কুঁদো ঠেকিয়ে দুবার গুলি চালাল দারিয়া।

এদিকে পাহাড়ের ধারে 'মজুত' সেপাইরা পা দাপাতে শুরু করেছে, শরীর গরম রাখবার জন্য লাফালাফি করছে ওরা। সৈন্যদের দুটো সারি যেন হাওয়ায় দুলছে। নীল হয়ে উঠেছে মেয়েদের গাল আর ঠোঁট; ওদের ঘাগরার চওড়া বেড়ের তলায় বরফ ঢুকছে হু-হু করে। বুড়ো গ্রিশ্‌কা সমেত ওদের অনেককেই হাত ধরে পাহাড়ের ওপর তুলে দিতে হল। কিন্তু তবু এক উত্তেজনাময় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। বলছে আগেকার দিনের বড়ো বড়ো যুদ্ধ আর লড়াইয়ের কীর্তিকাহিনীর কথা, সে তুলনায় এখনকার যুদ্ধের অবস্থা শোচনীয়—ভাই ভাইকে খুন করছে, বাপ লড়ছে ছেলের বিরুদ্ধে, কামান দাগা হচ্ছে এমন দূর থেকে যে খালি চোখে তা দেখবারই জো নেই...!

* *

আধ স্কোয়াড্রন সৈন্য নিয়ে গ্রিগর রসদবোঝাই স্লেজগাড়িগুলোর ওপর হামলা করে, আটজন লালরক্ষীকে মেরে গোলাবারুদ ঠাসা চারখানা স্লেজ আর দুটো জিন-আঁটা

ঘোড়া দখল করে ওরা। গ্রিগরের খোয়া যায় একটা ঘোড়া, একজন কসাকের সামান্য একটু আঁচড় লাগে।

কিন্তু গ্রিগর যখন দখল-করা শ্লেজগুলো নিয়ে ডনের পাড় ধরে পেছু হটছে সাফল্যের আনন্দে মশগুল হয়ে, সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়, তাতারস্কের পাহাড়ে তখন লড়াই শেষ। যুদ্ধ শুরু হবার আগে লাল ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একটা স্কোয়াড্রন বেরিয়েছিল সাত মাইল রাস্তা ঘুরে পাশ থেকে কসাকদের ঘিরে ফেলবার উদ্দেশ্যে। পাহাড়টা চক্কোর দিয়ে আচম্‌কা এসে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত কসাকদের ওপর। একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, খানাখন্দের ভেতর থেকে ঘোড়া নিয়ে ছুটে পালাল কসাকরা। কেউ কেউ অতিকষ্টে ঘোড়া লাইনে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল বটে, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই হয় লাল ঘোড়সওয়ার বাহিনীর হাতে কাটা পড়ল নয়তো পালাবার জন্য দিশাহারা হয়ে ছুটতে লাগল। পদাতিক সৈন্যরাও গুলি চালাতে পারে না পাছে নিজের দলের লোকরা ঘায়েল হয়। বস্তা থেকে বেরিয়ে-আসা মটরদানার মতো এলোমেলো হুড়মুড় করে ওরা ঢুকে পড়ে খানাখন্দগুলোর মধ্যে। কসাক ঘোড়সওয়ার ফৌজের যারা কোনো রকমে ঘোড়াগুলোকে ধরতে পেরেছিল (সংখ্যায় তারাই বেশি) এবার ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে তারা যে যতো জোরে পারে সিধে ছুটল গাঁয়ের দিকে।

চেঁচামেচি কানে যেতে পিয়োত্রা বুঝল কী হয়েছে। হুকুম দিল : ঘোড়ায় চাপো! লাতিশেভ, পায়দল সেপাইদের খানার ধার দিয়ে নিয়ে যা!

কিন্তু নিজের ঘোড়ার কাছে যেতে পারে না পিয়োত্রা। যে ছোকরা-সেপাইয়ের হাতে ওটার ভার ছিল সে নিজেই ঘোড়ায় চেপে ছুটে আসতে থাকে পিয়োত্রা আর ফিওদর বদভ্‌স্কভের ঘোড়া দুটো সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু পেছন থেকে এক লালফৌজী সেপাই ওর কাঁধের ওপর তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দেয়। সৌভাগ্যক্রমে ছেলেটির পিঠের ওপর ঝুলছিল একটা রাইফেল, তাই তলোয়ারের ঘা না লেগে সেটা পিছলে গিয়ে রাইফেলের নলে ঠেকে লোকটার হাত থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ছোকরার ঘোড়া তখন পাশ ফিরে ছুটতে শুরু করেছে, সেই সঙ্গে পিয়োত্রা আর ফিওদতের ঘোড়া দুটোও। পিয়োত্রা আর্তনাদ করে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, গাল বেয়ে ঝরছে ঘাম। পেছন ফিরে তাকায়। প্রায় ডজনখানেক কসাক ওর দিকে ছুটে আসছে।

ভয়ে মুখ বিকৃত করে বদভ্‌স্কভ্‌ চেঁচিয়ে ওঠে : আমরা মরেছি!

—কসাক ভাইসব, খানাটার মধ্যে নেমে পড়ো! নেমে পড়ো!—পিয়োত্রা নিজেকে সামলে নিয়ে ওদের আগে আগে ছুটে যায় খানার ধারে, স্তেপের খাড়াই ঢাল বেয়ে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে। একেবারে তলায় এসে পিয়োত্রা লাফিয়ে উঠে কুকুরের মতো গা ঝাড়া দেয় একসঙ্গে গোটা শরীরটা ঝাঁকিয়ে। ওর পেছন পেছন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে দশজন কসাক।

মাথার ওপর এখনো গুলির আওয়াজ হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে চিৎকার আর খুরের দাপাদাপি। খানাটার তলায় কসাকরা গা থেকে বরফ আর টুপি থেকে বালি ঝেড়ে ফেলছে, আর নয়তো জখম জায়গাগুলো ঘষছে। মার্তিন শামিল রাইফেলের নল থেকে বরফ বের করতে লেগে যায়। শুধু প্রাক্তন আতামানের অল্প বয়েসী ছেলে মানিৎস্কভই ভয়ে কাঁপে, ওর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

হাউ-হাউ করে ওঠে ও—কী করব আমরা বলো তো? ও পিয়োত্রা, বলো না! মরণ যে শিয়রে! কোথায় যাব? ওরা আমাদের মেরে ফেলবে!

ফিওদত ˎ ˎ বোঁ করে ঘুরেই খানার তলা দিয়ে দৌড়তে থাকে ডনের দিকে। আর সবাই ভেড়ার মতো ওর পেছু নেয়। পিয়োত্র ওদের থামতে হুকুম দেয়

—সবুর! পালিও না! গুলি করব!

কিনারা বেরিয়ে-আসা খাড়া পাহাড়টার তলায় ওদের টেনে আনে পিয়োত্র। তোৎলাতে থাকে, তবু কোনোরকমে একটা শান্তভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে ও। বলে :

—খাদের তলা থেকে তোমরা বেরুবার রাস্তা পাবে না। ওরা নিশ্চয় আমাদের লোকদের তাড়া করবে। খাদের মধ্যেই আমাদের লুকোতে হবে। কেউ কেউ থাকবে ও পাশটাতে।...এ জায়গা আমাদের হাতে রাখা চাই। এখানে আটক পড়লেও সামলাতে পারব!

—আমরা এবার গেছি! বাবা রে! দাদা রে, তোমরা আমায় এখান থেকে যেতে দাও। আমি চাই না!...চাই না আমি মরতে!—ছোকরা মানিৎস্কভ একেবারে হাঁউমাউ করে মরাকান্না কেঁদে ওঠে। বদভ্স্কভের 'কালমিক' চোখজোড়া জ্বলে ওঠে, ছেলেটার গালের ওপর এক ঘুষি বসিয়ে দেয় ও। নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, পাহাড়ের গায়ে সজোরে ছিটকে পড়ে ওর দেহ। কিন্তু ফোঁপানি থেমে যায় ছেলেটার।

পিয়োত্রর হাত চেপে ধরে মার্তিন শামিল জিজ্ঞেস করে—কী করে বন্দুক ছুঁড়ি? একটাও বুলেট নেই সঙ্গে। ওরা তো হাত বোমা ছুঁড়েই আমাদের উড়িয়ে দেবে।

হঠাৎ পিয়োত্র যেন নীল হয়ে গেল, ফেনা জমে উঠল ওর ঠোঁটে—আর কীই বা করার আছে এখন? শুয়ে পড়ো! আমি তো তোমাদের কমাণ্ডার? গুলি করে মারব তোমাদের!—ওদের মাথার ওপর রিভলবার নাচাতে লাগল পিয়োত্র।

সরু শিসের মতো ওর চাপা গলার আওয়াজে যেন নতুন প্রাণ পেল ওরা। বদভ্স্কভ, মার্তিন শামিল আর অন্য দুজন কসাক খাতের অপর দিকটায় ছুটে গিয়ে খাড়া পাহাড়ের তলায় শুয়ে পড়ে। বাদবাকি সবাই পিয়োত্রর সঙ্গে। বসন্তের সময় পাহাড়ী জলের ঢল নামে, তার সঙ্গে গড়িয়ে নেমে আসে পাথরের চাঁই। বন্যায় ধুয়ে ভেসে যায় খাতের তলদেশ, আর লাল কাদার স্তরে স্তরে তার দংশনের চিহ্ন থাকে, পাহাড়ী দেয়ালের গা কেটে গর্ত আর নালি হয়ে যায়। এমনি সব গর্তের ভেতর লুকিয়ে থাকে কসাকরা।

মাথার ওপর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে দৌড়োনো পায়ের আওয়াজ। বরফ আর বালি ঝুরঝুর করে পড়ে খাতের ভেতর।

বিড়বিড় করে পিয়োত্র বলে—ওই তো ওরা!

পাহাড়ের কিনারায় কেউ আসে না, কিন্তু গলার আওয়াজ শুনতে পায় কসাকরা। কে যেন একটা ঘোড়াকে চেঁচিয়ে গাল পাড়ে।

পিয়োত্র ভাবে—কী করে আমাদের ধরবে তাই নিয়ে আলোচনা করছে। ওর পিঠ বেয়ে আবার দরদর করে নেমে আসে ঘাম, পিঠ বুক আর মুখ বেয়ে।

ওদের মাথার ওপর কে যেন চিৎকার করে বলে—এইও! বেরিয়ে আয়! তোদের এমনিতেও গুলি করে সাবাড় করব!

খাতের ভেতর ঘন হয়ে বরফ পড়ছে দুধ-সাদা জলের ধারার মতো। কেউ যেন এগিয়ে এল খাতের কিনারাটার খুব কাছাকাছি। আরেকজন স্থির-নিশ্চিত হয়ে মন্তব্য করল :

—ওরা এখানেই লাফিয়ে পড়েছে; এই তো সব পায়ের দাগ। তাছাড়া আমি নিজের চোখে দেখলাম ওদের।

—পিয়োত্র মেলেখভ, বেরিয়ে এসো ওখান থেকে!

নিমেষের জন্য একটা অন্ধ আনন্দ অনুভব করে পিয়োত্রা। ও ভাবে—লালদের মধ্যে কে আমাকে চেনে? নিশ্চয় আমাদেরই দলের কসাক। ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তে সেই একই গলার আওয়াজে কেঁপে ওঠে ওর শরীর।

—আমি মিখাইল কশেভয়। তোমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছি আমরা। এমনিতেও তোমরা বের হতে পারবে না।

ভিজে কপাল মোছে পিয়োত্রা, হাতের তেলোয় রক্তমাখা ঘামের দাগ। একটা অদ্ভুত প্রশান্তির অনুভূতি, প্রায় বিস্মৃতির মতো, জেগে ওঠে ওর মনে। বহু দূর থেকে যেন ভেসে আসে আস্তিপের গলা :

—যদি আমাদের ছেড়ে দাও তাহলে বেরিয়ে আসব। নয়তো গুলি করব!

এক মুহূর্ত নীরব থেকে ওপরের জবাব এল—তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

প্রবল চেষ্টায় পিয়োত্রা আল্‌সেমি ঝেড়ে ফেলে। 'ছেড়ে দেওয়া হবে' কথাটার মধ্যে যেন একটা বিদ্রুপের আভাস পায় ও। ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলে—পেছু হটো! কিন্তু কেউ ওর দিকে কান দেয় না।

পিয়োত্রাই বেরিয়ে এল সবার শেষে। নারী গর্ভের শিশুর মতো একটা প্রবল প্রাণের স্পন্দন ওর বুকের ভেতর। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির তাগিদে রাইফেলের ঘরা থেকে বুলেটগুলো ও সরিয়ে রাখল খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠার আগে। চোখে ওর কাদা জমেছে, সারা বুকটায় হাতুড়ি পিটছে। যেন গভীর ঘুমের মধ্যে শিশুর মতো দম আটকে আসছে ওর। গলাবন্ধটা ছিঁড়ে ফেলল পিয়োত্রা। ঘাম জমেছে চোখে, হাত পিছলে যাচ্ছে পাহাড়ের ঠাণ্ডা ঢালু গায়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল যেখানে ওরা দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গাটিতে। পায়ের কাছে রাইফেলটা ছুঁড়ে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলল। ওর আগে যেসব কসাক বেরিয়ে এসেছিল তারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে। লাল ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক সৈন্যদের দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে মিশকা কশেভয় লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল ওদের দিকে। পিয়োত্রার কাছে এসে সোজা ওর সামনে দাঁড়িয়ে মাটিতে চোখ রেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল : খুব লড়াই হল তো?—জবাবের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ফের পিয়োত্রার পায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে একই সুরে বললে—তুমিই তো ওদের কমাণ্ডার হয়েছিলে, তাই না?

ঠোঁট কেঁপে ওঠে পিয়োত্রার। একটা নিদারুণ ক্লান্তির ভঙ্গিতে ভিজে কপালের ওপর হাত ঠেকায় বহু কষ্টে। তির্‌তির্‌ করে কাঁপে মিশ্‌কার দীঘল চোখের পাতা, ওপরের ফুলো ঠোঁটটা কুঁচকে যায়। সমস্ত দেহটা ওর এমন ভয়ানকভাবে কেঁপে ওঠে যে মনে হয় বুঝি আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। কিন্তু পরক্ষণেই পিয়োত্রার দিকে তাকায় ও, সোজা চেয়ে থাকে তার চোখের তারার দিকে, একটা অদ্ভুত অন্য দৃষ্টি দিয়ে বিঁধতে থাকে ওর চোখদুটো। চাপা গলায় তাড়াতাড়ি বলে :

—কাপড় খোলো!

পিয়োত্রা চট্‌পট্‌ খুলে ফেলে ভেড়ার-চামড়ার কোর্তাটা, সাবধানে সেটাকে দলা করে বরফের ওপর রাখে। টুপি খোলে, বেল্ট, খাকি শার্ট খোলে, কোর্তাটারই এক পাশে বসে বুট খুলতে শুরু করে, মুহূর্তের জন্য একটু ফ্যাকাশে হয়ে যায় ও।

ফিস্‌ফিস্‌ করে মিশ্‌কা বলে—জামা খোলার দরকার নেই। তারপর একটু কেঁপে উঠে আচম্‌কা চেঁচিয়ে বলে—

—জলদি, এই!...

ঘোড়া থেকে নেমে ইভান আলেক্সিয়েভিচ এগিয়ে এল ওদের দিকে। দাঁত ঠক্‌ঠক্‌ করছে ওর, ভয় পাচ্ছে পাছে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

পিয়োত্রা ওকে ডাকে—ভাই! ঠোঁট প্রায় নড়েই না ওর। ইভান নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, পিয়োত্রার খালি-পায়ের তলায় বরফ গলে যাচ্ছে।—ভাই ইভান, আমার ছেলের তুমি ধর্ম-বাপ..., ভাই, আমাকে গুলি করে মেরো না।—পিয়োত্রা মিনতি জানায়। এর মধ্যে ওর বুকের সামনাসামনি মিশ্‌কা রিভলবার তুলে ধরেছে দেখে চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—যেন চোখ দিয়ে একটা আলোর ঝল্‌কানি ঠেকাবার চেষ্টা করছে ও। ক্রুশ প্রণাম করাবর জন্য তাড়াতাড়ি আঙুল উঁচিয়ে ধরে, তারপর মাথা গোঁজে বুকের মধ্যে।

গুলির আওয়াজটা কানে যায়নি ওর: সোজা মুখ থুবড়ে পড়ে, যেন পেছন থেকে কেউ সজোরে ধাক্কা মেরেছে।

কশেভয়ের সামনে-বাড়ানো হাতখানা ওর হৃৎপিণ্ডের ওপরে বুক চেপে ধরে, টেনে বের করে রক্ত। জীবনের শেষ প্রয়াসটুকু দিয়ে পিয়োত্রা শার্টের গলাবন্ধ টেনে খুলে ফেলে, বাঁ স্তনের বোঁটার নিচে বুলেটের ছেঁদা আলগা করে দেয়। প্রথম দিকে জখম থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল, তারপর খোলা মুখ পেয়ে তা সবেগে ছিটকে উঠতে লাগল ঘন কালচে ধারায়।

* * *

বিকেলের দিকে তাতারস্ক থেকে পাঠানো একটা পর্যবেক্ষক দল ফিরে এল খবর নিয়ে—লালরক্ষীদের কোনো পাত্তা পায়নি ওরা, তবে পিয়োত্রা মেলেখভ আর দশজন কসাক স্তেপের মাঠে মরে পড়ে আছে।

লাশগুলো আনবার জন্য শ্লেজের বন্দোবস্ত করে গ্রিগর। তারপর মরা পিয়োত্রাকে নিয়ে বাড়ির মেয়েদের কান্নাকাটির রোল আর দারিয়ার একঘেয়ে কাতরানিতে অস্থির হয়ে ও ক্রিস্তোনিয়ার বাড়িতে রাত কাটাতে আসে। ক্রিস্তোনিয়ার কুঁড়েঘরে উনোনের ধারে বসে থাকে ভোর অবধি, একটার পর একটা সিগারেট খায় আর ঘুমে ঢুলতে-থাকা ক্রিস্তোনিয়ার সঙ্গে উদ্দেশ্যহীনভাবে বক্‌বক্‌ করে চলে—নিজের মনের ভাবনার সঙ্গে, ভাইয়ের জন্য ওর নিজের আকুতির সঙ্গে কিছুতেই যেন একা মোকাবিলা করার সাহস নেই ওর।

দিনের আলো ফোটে। ভোর সকালেই গলতে শুরু করেছে বরফ। গোবর-ছড়ানো রাস্তার এখানে-ওখানে বেলা দশটা নাগাদ জল জমে যায়। বসন্তের দিনের মতো মোরগও ডেকে উঠল একটা। মুরগি ডাকে কক্‌-কক্‌ করে গুমোট দুপুরবেলার মতো।

উঠোনের যেদিকটায় রোদ সেদিকে গরু-ভেড়াগুলো গাদাগাদি করে বেড়া ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। গলন্ত বরফের ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ। ছোট্ট একটা হলদে-বুক টমটিট্‌ পাখি ক্রিস্তোনিয়ার ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা আপেলগাছের ন্যাড়া ডালে বসে দোল খাচ্ছে আর কিচির মিচির করছে। শ্লেজের অপেক্ষায় ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে গ্রিগর নিজের অজ্ঞাতেই কখন পাখিটার ভাষার সঙ্গে ছেলেবেলাকার সেই বুলি মিলিয়ে ফেলছিল: 'লাঙল চালাও, লাঙল চালাও!'—মনের আনন্দে পাখি বরফ-গলা ভোরকে স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু গ্রিগর জানে আজ যদি তুষার-পড়া ঠাণ্ডা দিন হত তাহলে বুলিটা বদলে যেত, পাখি তখন তড়বড় করে বলত: 'জুতো-মোজা পর্‌! জুতো-মোজা পর্‌!'

রাস্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে দোল-খাওয়া পাখিটার দিকে তাকায় গ্রিগর। আনন্দে

মশগুল হয়ে সে কিচ্মিচ্ করছে : 'লাঙল চালাও! লাঙল চালাও!—শুনতে শুনতে গ্রিগরের মনে পড়ে ছেলেবেলায় ও আর পিয়োত্রা টার্কি-মুরগিগুলোকে স্তেপের মাঠে নিয়ে যেত তাদের খাওয়াবার জন্য, আর পিয়োত্রা কেমন মজা করে টার্কিগুলোর বক্বকানি নকল করত, ছেলেমানুষি ভাষায় একেকটা অদ্ভুত বুলি খাড়া করত। খুশি হয়ে হাসত গ্রিগর আর বারবার পিয়োত্রাকে সাধত টার্কির মতো করে কথা বলতে।

রাস্তার শেষ মাথায় একটা স্লেজ এসে হাজির হয়, পাশে পাশে হাঁটছে একজন কসাক। তারপর নজরে আসে দ্বিতীয়টা, তারপর তৃতীয়। চেখের জল মোছে গ্রিগর, মুছে ফেলে অনাহূত স্মৃতির আবেশে ফুটে-ওঠা ক্ষীণ হাসিটুকু। নিজেদের বাড়ির দরজার দিকে হন্হন্ করে এগিয়ে যায় ও। শোকে প্রায় অর্ধোম্মাদ হয়ে গেছে ওর মা, তাই গ্রিগর ভেবেছিল প্রথম সাংঘাতিক মুহূর্তটায় তাকে সরিয়ে রাখবে পিয়োত্রার দেহ বয়ে-আনা স্লেজটার কাছ থেকে। প্রথম স্লেজটার পাশে-পাশে লম্বা পা ফেলে হেঁটে আসছিল আলেক্সি শামিল, খালি মাথায়। বাঁ হাতের কব্জি দিয়ে সে টুপিটাকে বুকের ওপর চেপে ধরেছে, ডান হাতে স্লেজের বল্গা। স্লেজের ভেতরে তাকিয়ে দ্যাখে গ্রিগর : খড়ের গাদার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মার্তিন শামিল, মুখে, উর্দিতে জমাট রক্তের দাগ। দ্বিতীয় স্লেজে মানিৎস্কভ, জখম মুখখানা খড়ের মধ্যে গোঁজা, কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথা, খুলিটা চোপানো হয়েছে পরিষ্কার কুশলী হাতে। তৃতীয় স্লেজটার দিকে তাকায় গ্রিগর, কিন্তু মৃতদেহটা কার চিনতে পারে না। চতুর্থ ঘোড়াটার লাগাম চেপে ধরে আঙিনার ভেতর টেনে আনে। পেছন পেছন দৌড়ে আসছে পড়শিরা, মেয়ে বাচ্চা সবাই। সিঁড়ির আশেপাশে তারা ভিড় করে দাঁড়ায়।

কে যেন চাপা গলায় বলে—ওই শুয়ে আছে আমাদের আদরের পিয়োত্রা পান্তালিয়েভ! ছেড়ে চলে গেল!

ফটক দিয়ে খালি-মাথায় ঢুকল স্তেপান আস্তাখভ। গ্রিশকা এবং আরো তিনজন বড়ো যেন কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে। উদাসীনভাবে চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখে গ্রিগর। বলে : আমায় একটু সাহায্য করুন ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে যাই।

স্লেজ-চালক পিয়োত্রার পা ধরে প্রায় তুলে ফেলেছিল এমন সময় লোকজন নীরবে সসম্ভ্রমে পথ করে দিল ইলিনিচনাকে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে সে। স্লেজের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। কপালটা মড়ার মতো ফ্যাকাশে, ক্রমে গাল নাক থুতনি অবধি পাণ্ডুর হয়ে উঠল। পান্তালিমন কাঁপতে কাঁপতে নিঃশব্দে তার হাতটা চেপে ধরে কনুইয়ের নিচে। দুনিয়ার গলাতেই আওয়াজ ফোটে প্রথম। তারপর দারিয়া সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে আসে আলুথালু অবস্থায়। স্লেজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে :

—পিয়োত্রা, ওগো পিয়োত্রা আমার! ওঠো, ওগো, উঠে দাঁড়াও!

বিষণ্ণ গম্ভীর গ্রিগরের চোখদুটো। নিজেকে সামলাতে না পেরে ও পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে—দারিয়া! সরে যাও!—সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় দারিয়াকে। তুষারের একটা ঢিবির ওপর আছড়ে পড়ল দারিয়া। গ্রিগর তাড়াতাড়ি পিয়োত্রার বগলের নিচে হাত দিয়ে তাকে তোলে, স্লেজ-চালক ধরেছে দুটো আ-ঢাকা পা। দারিয়া কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি অবধি আসে ওদের পিছু পিছু, স্বামীর কটকটে শক্ত ঠাণ্ডা হাত চেয়ে ধরে চুমু খায়। আরেক মুহূর্ত হলেই নিজেকে আর একেবারে সামলাতে পারবে না বুঝতে পেরে গ্রিগর পা দিয়ে ঠেলে ওকে সরিয়ে দিল। জোর করেই দুনিয়া দারিয়ার হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে ওর বুকের মধ্যে চেপে ধরল নিজের চেতনাহীন মাথাটা।

রান্নাঘরটা এমন নিঃঝুম যে জনপ্রাণী আছে মনে হয় না। পিয়োত্রার দেহ মেঝেতে পড়ে আছে দারুণ ছোট হয়ে, যেন চুপ্‌সে গেছে একেবারে। নাক জখম, শণের নুড়োর মতো জুলফি কালচে হয়ে উঠেছে, কিন্তু গোটা মুখটা নিভাঁজ টান-টান, আগের চেয়েও সুশ্রী দেখাচ্ছে। নগ্ন লোমশ পা দুটো বেরিয়ে আছে পাৎলুনের তলার পটির ভেতর থেকে। ধীরে ধীরে দেহের বরফ গলছে, নিচে লাল্‌চে জল জমেছে এক চিলতে। হিম-জমাট দেহটা যতোই গলে ততোই নোন্‌তা রক্ত আর পচ্‌-ধরার সোঁদা মিষ্টি গন্ধ উগ্র হয়ে ওঠে।

চালাঘরে পান্তালিমন কফিন তৈরি করছিল। মেয়েরা দারিয়াকে নিয়েই ব্যস্ত। ওর জ্ঞান ফিরে আসেনি এখনো। ওর ঘর থেকে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ পাগলপারা চিৎকার আসছে, আর তারপরেই শোনা যাচ্ছে ভাসিলিসা মাসির নরম গলার আওয়াজ; মেলেখভদের শোকের "ভাগ নিতে" এসেছিল সে-ও। গ্রিগর বেঞ্চিতে বসে তাকিয়ে আছে ভাইয়ের হলদে হয়ে-আসা মুখটার দিকে, দেখছে ওর গোল-গোল নীল নখ-ওয়ালা হাতটা। একটা হিম-শীতল বিচ্ছেদ এর মধ্যেই পিয়োত্রার কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছে ওকে। পিয়োত্রা আর এখন গ্রিগরের ভাই নয়, সে বিদায়োন্মুখ এক ক্ষণিকের অতিথি। মাটির মেঝের ওপর নির্বিকারভাবে গাল ঠেকিয়ে শুয়ে আছে পিয়োত্রা, গোঁফের নিচে জমাট বাঁধা একটা প্রশান্ত রহস্যময় হাসি। কাল ওর বউ আর মা ওকে যুদ্ধে যাত্রার জন্য তৈরি করে দেবে।

—এখানে মায়ের চোখের সামনে না মরে যদি প্রাশিয়ার মতো বিদেশ বিভুঁয়ে মরতিস তাহলে বরং ভালো ছিল—গ্রিগর ধীরে ধীরে তিরস্কার করে বলে। দেহটার দিকে নজর পড়তেই হঠাৎ ও একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পিয়োত্রার গাল বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। গ্রিগর লাফিয়ে এল সামনে, কিন্তু ভালো করে নজর করে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মৃতের চোখের জল এ নয়, পিয়োত্রার কপালের ওপর ঝুলে-পড়া চুল থেকে এক ফোঁটা জল গলে ওর গাল বেয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে।

সন্ধ্যের সময় পিয়োত্রার মা তিন কুঁজো জল গরম করল ওর জন্য। পরিষ্কার কাপড়, পিয়োত্রার সবচেয়ে ভালো পাৎলুন আর উর্দির কোর্তাটা জোগাড় রাখল পিয়োত্রার বউ। গ্রিগর আর পান্তালিমন স্নান করালো দেহটাকে। সে দেহ আর পিয়োত্রার আপনার নয়, নগ্নতার জন্য তার এতটুকু লজ্জা নেই এখন। রোববারের সেরা পোশাকে ওকে সাজিয়ে টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হল। দারিয়া এল। চওড়া হিমঠাণ্ডা হাতদুটো গতকালও ওকে জড়িয়ে ধরেছিল, আর আজ সেই হাতে দারিয়া রাখল সেই মোমবাতিটা—ওদের বিয়ের দিন পুরুত মশায়ের পেছন পেছন গির্জার বেদী প্রদক্ষিণ করার সময় এই মোমবাতির আলোতেই উজ্জল হয়ে উঠেছিল ওদের মুখ। কসাক পিয়োত্রা মেলেখভ এখন সেই জায়গায় যাবার জন্য প্রস্তুত যেখান থেকে কেউ কোনোদিন সংসারে ফিরে আসে না।

ছয়

মিলিত বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক কুদীনভের হুকুমে ভিয়েশেনস্কা রেজিমেন্টের কমান্ডার হল গ্রিগর মেলেখভ। দশ স্কোয়াড্রন কসাক নিয়ে রেজিমেণ্টটা। ভিয়েশেনস্কার সামরিক কর্তারা ওকে নির্দেশ দিয়েছে কারগিন জেলার দিকে অভিযান চালাবার জন্য, যেমন করে হোক লিখাচেভের ফৌজীদলটাকে গুঁড়ো করে ফেলতে হবে, ওদের ঠেলে নিয়ে যেতে হবে এলাকার সীমানার বাইরে।

রেজিমেন্টের ভার হাতে নেবার দিন দলের কসাকদের গ্রিগর তদারক করলে ভিয়েশেনস্কা থেকে ওদের ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে আসার সময়। রাস্তার পাশে নিজের ঘোড়ার লাগাম সজোরে টেনে রেখে জিনের ওপর ঝুঁকে বসে রইল, আর ওর সামনে দিয়ে সার বেঁধে চলল স্কোয়াড্রনগুলো। ওরা এসেছে ডন-পারের গ্রামগুলো থেকে : বাজকা, বিয়লোগরকা, অলসানস্কা, মেরকুলভ, গ্রম্কভ, সিয়েমেন্ভস্কি, রিবনস্কি, ভদ্চিন্স্ক, লিয়েবাঝি, ইয়েরিক থেকে। প্রত্যেকটা স্কোয়াড্রনকে তীক্ষ্ম সতর্ক নজরে দেখে নিচ্ছে গ্রিগর আর দস্তানাপরা একখানা হাত জুলফির ওপর ঘষছে। তামাকের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেসে যাচ্ছে সেপাইদের মাথার ওপর, ভাপ বেরুচ্ছে ঘোড়াগুলোর গা থেকে।

রেজিমেণ্টটা ভিয়েশেন্স্কা ছেড়ে প্রায় তিন মাইল চলে এসেছে এমন সময় একজন টহলদার এসে খবর দিল—চুকারিনের দিকে পেছু হটছে লালফৌজ। শত্রুর ফৌজীদলের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য তিনটে স্কোয়াড্রন পাঠিয়ে দিল গ্রিগর, আর বাদবাকিদের নিয়ে এমন কুকুর-তাড়া করল লাল সেপাইদের পেছু-পেছু যে তারা লটবহর গোলাবারুদ ফেলে পালাতে শুরু করল। চুকারিন থেকে সরে পড়ার মুখে লিখাচেভ গোলন্দাজ বাহিনী একটা ছোট সোঁতার মধ্যে খোয়ালো তাদের গোটাকতক কামান। চালকরা কামানের দড়ি কেটে দিয়ে ঘোড়া ছোটালো। চুকারিন থেকে কারগিনের দিকে বারো মাইল পর্যন্ত এগোলো কসাকরা পথে একটুও বাধা না পেয়ে। নভোচেরকাসে পৌঁছানো নিয়ে জল্পনা শুরু হল ওদের।

কামানগুলো হাতে আসায় বড়ো খুশি হয়েছে গ্রিগর। মনে মনে হেসে বলে—কামানগুলোর মুখ আঁটিতে অবধি সময় পায়নি হতচ্ছাড়ারা।—বলদ লাগিয়ে কসাকরা নদী থেকে তোলে কামানগুলো। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্কোয়াড্রন থেকে এগিয়ে আসে গোলন্দাজরা, সেই সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ঘোড়া—একেকটা কামানের জন্য ছ' জোড়া করে ঘোড়া জুতে দেওয়া হয় কামানগাড়ির সঙ্গে, আর পাহারাদার বানানো হয় আধ স্কোয়াড্রন সেপাইকে।

বেলা ডোবার মুখে কারগিন দখল করে কসাকরা। লিখাচেভ-ফৌজীদলের একটা অংশকে ওরা বন্দী করে, ওদের সঙ্গে ছিল বাকি তিনটে ফিল্ড্-কামান আর ন'টা মেশিনগান। অন্যরা কোনোক্রমে উত্তরমুখো পালিয়েছে।

সারারাত ধরে বৃষ্টি পড়ছে। সকালে নালা আর পাহাড়ী খাতগুলো জলে ভরে থাকে, রাস্তা দিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। গলা বরফে আর কাদার মধ্যে হাবুডুবু খায় ঘোড়াগুলো, হয়রান হয়ে বসে পড়ে সেপাইরা। পিছু-হটা শত্রু সৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে দুটো স্কোয়াড্রন পাঠানো হয়েছিল তারা সকাল বেলায় প্রায় তিরিশজন লালরক্ষীকে বন্দী করে কারগিনে ফিরে এল।

গ্রিগরের সদর-দপ্তর বসেছে স্থানীয় এক ব্যবসাদারের প্রকাণ্ড বাড়িতে। বন্দীদের আনা হল উঠোনে। স্কোয়াড্রন দুটোর কমাণ্ডার রিপোর্ট করল গ্রিগরকে :

—বন্দী হয়েছে সাতাশজন লালসেপাই। ওদের নিয়ে কী করা যাবে?

লোকটার জোব্বাকোটের ওপরের বোতামটা চেপে ধরে গ্রিগর ওর কানের কাছে মুখ আনে। চোখে ঝিলিক দিচ্ছে আগুনের ফুল্‌কি, কিন্তু ওর জুলফির নিচে ঠোঁটের কোণে একটা হিংস্র হাসি।

—সঙ্গে পাহারা দিয়ে ওদের ভিয়েশেন্‌স্কায় পাঠাও। বুঝতে পেরেছ? কিন্তু ওই পাহাড়টার ওপারে যেন ওদের আর যেতে না হয়—কারগিনের পাশেই যে ঢালু বালি-পাহাড় উঠে গেছে সেদিকে চাবুক দেখায় গ্রিগর।

ও ভাবে—পিয়োত্রাকে হারানোর শোধ তোলার এই প্রথম ধাপ।

কারগিন থেকে গ্রিগর সাড়ে তিন হাজার তলোয়ার বের করে এনেছে। ভিয়েশেন্‌স্কার সেনাপতিমণ্ডলী আর কর্মপরিষদ ওকে জরুরী হুকুম আর নির্দেশ পাঠাচ্ছে যেন ও এগিয়ে চলে কিন্তু বন্দীদের না খুন করে। পরিষদের একজন সদস্য ওকে ব্যক্তিগতভাবে লিখে পাঠায় অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় এক পত্র :

"পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

কমরেড মেলেখভ,

আমরা এইরূপ জনরব শুনিতেছি যে আপনি নাকি নিষ্ঠুরভাবে লালফৌজের বন্দীগণকে মৃত্যুদণ্ড দিতেছেন। শুনিলাম যে আপনার বন্দীদের মধ্যে একজন নারী কমিউনিস্ট ছিল যাহার নিকট হইতে আমরা শত্রুর শক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান সংবাদ অবগত হইতে পারিতাম। প্রিয় কমরেড, আপনি আপনার হুকুম ফিরাইয়া লউন, ইহাতে আমাদের বিপদই ঘটিতে পারে। এইরূপ নিষ্ঠুরতার ফলে কসাকদের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠিয়াছে, তাহারা ভয় পাইতেছে পাছে লালফৌজও এইভাবে তাহাদের নিজেদের বন্দীদের হত্যা করে ও আমাদের গ্রামগুলি পুড়াইয়া দেয়। লেখক পুশকিনের ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক তারাস বুলবার ন্যায় আপনিও আপনার বাহিনীসহ আগাইয়া চলিয়াছেন আর আগুন ও তলোয়ারের মুখে সবকিছু সঁপিয়া দিয়া কসাকদের বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। দয়া করিয়া বন্দীদের হত্যা করিবেন না, আমাদের নিকট তাহাদের পাঠাইয়া দিন। ইহাতেই আমাদের শক্তি বজায় থাকিবে। আপনার শারীরিক মঙ্গল কামনা করি। আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ও আপনার উত্তরোত্তর সাফল্য প্রত্যাশা করি।"

পর পর তিন দিন গ্রিগরের সাফল্যলাভ ঘটে। ঝড়ের বেগে বুকভ্‌স্কি দখল করে সে ফৌজ নিয়ে ছোটে ক্রাস্‌নোকুৎস্ক্‌-এর দিকে। রাস্তায় বাধা দিয়েছিল একটা ছোট ফৌজীদল। তাদের বন্দী করা হল কিন্তু বন্দীদের মারবার হুকুম দিল না। গ্রিগর, পাঠিয়ে দিল ভিয়েশেন্‌স্কায়। রণাঙ্গণের পেছন দিকে আচম্‌কা এই বিপদ দেখা দিতেই দনিয়েৎস্‌ নদীর লাল বাহিনীর নেতারা অনেকগুলো রেজিমেণ্ট আর কামান পাঠালো

বিদ্রোহ দমাবার জন্য। ক্লিস্তিয়াকভের কাছে গ্রিগরের রেজিমেণ্টের সঙ্গে লড়াইয়ে নামল নতুন লাল ` নী। তিন ঘণ্টা ধরে চলল যুদ্ধ, তারপর ঘেরাও হয়ে যাবার ভয়ে গ্রিগর ওর ফৌজ সরিয়ে নিল ক্রাস্‌নোকুৎস্কের দিকে। কিন্তু পরদিন সকালে খপেরস্ক্‌ থেকে লাল কসাকদের একটা ফৌজ গ্রিগরের রেজিমেণ্টগুলোর ওপর হামলা করল। ডনের কসাকরা আবার জোর কায়দায় শুরু করল তলোয়ারের লড়াই। লড়াইয়ে গ্রিগরের ঘোড়া মারা পড়ে, ও নিজেও জখম হয়। রেজিমেণ্ট সরিয়ে নিয়ে গ্রিগর বুকভ্‌স্কির দিকে পেছু হটে।

সেদিনই সন্ধ্যায় শত্রু পক্ষ সম্পর্কে আরো খোঁজ-খবর নেবার আশায় গ্রিগর খপেরস্ক্‌ জেলার এক কসাক বন্দীকে জেরা করতে শুরু করে। লোকটা জবাব দিতে মোটেই কসুর করে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাসে জোর করে একটু বাঁকা হাসি।

গ্রিগর জিজ্ঞেস করে—তোমাদের ফৌজের হাতে গোলাবারুদ কতটা আছে?

—শয়তান জানে কতোটা!

—কামান?

—কমপক্ষে আটটা।

—তোমাদের রেজিমেণ্টে কোন্‌ এলাকার লোক আছে?

—কামেন্‌স্কি গ্রামের।

—সেপাইতে ভর্তি করার সময় কসাকরা কী বলত?

—ওরা যেতেই চাইত না।

—আমরা বিদ্রোহ করলাম কেন তা তোমরা জানতে?

—কী করে জানব?

—তাহলে তোমরা যেতে চাইতে না কেন?

—তোমরাও তো আমাদেরই মতো কসাক? এর মধ্যেই তো কতো লড়াই করলাম! আর কতো?

—আমাদের দলে কাজ করতে রাজি আছ?

—যা তোমাদের মর্জি। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই...

লোকটাকে বের করে নিয়ে যাবার সময় গ্রিগর ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে, তারপর ওর আরদালি প্রোখর জাইকভ্‌কে ডাকে। জানলার কাছে এসে প্রোখরের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হুকুম দেয়ঃ

—যে লোকটাকে এইমাত্র জেরা করলাম তাকে নিয়ে চুপচাপ বাগানের দিকে এগোতে বলো সেপাইদের। লাল কসাক বন্দীদের আমি সঙ্গে রাখতে চাই না!—মাথা ঘুরিয়ে জানলার বাইরের দিক তাকায় গ্রিগর।

বেরিয়ে যায় প্রোখর। দু-এক মিনিট অলসভাবে দাঁড়িয়ে গ্রিগর জানলার ধারে একটা জিরেনিয়ামের কচি ডাল ছিঁড়তে থাকে। তারপর পেছন ফিরে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে আসে সিঁড়িতে। দ্যাখে প্রোখর জাইকভ্‌ গোলাবাড়ির দেয়ালের ধারে রোদে বসে একদল কসাকের সঙ্গে নিচু গলায় আলাপ করছে।

কসাকদের দিকে না তাকিয়ে ও প্রোখরকে ডেকে বলে—কয়েদীকে ছেড়ে দাও! একটা ছাড়পত্র লিখে দাও তাকে!

ঘরে ফিরে এসে একটা পুরনো আয়নার সামনে দাঁড়ায় ও। অবাক হয়ে হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দেয়, কেন যে বেরিয়ে গিয়ে বন্দীকে ছেড়ে দেবার হুকুমটা দিয়ে

এল তা ভেবে পায় না। নিজের ওপর ও খানিকটা চটে যায় হৃদয়ের এই আকস্মিক দয়ার্দ্রতায়, কিন্তু তবু খুশি হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা আরো অদ্ভুত এই জন্যে যে আগের দিনটাতেও ও কসাকদের বলেছিল—চাষীরা আমাদের দুশমন, কিন্তু যে-কসাক লালরক্ষীদের সাহায্য করে সে দুনো দুশমন। গোয়েন্দা চরের মতো কসাকদেরও দ্বিরুক্তি না করে সাবাড় করা চাই ঃ দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে সিধে স্বর্গের দরজা দেখিয়ে দাও!

ঘর থেকে বেরিয়ে আঙিনায় আসে গ্রিগর। সূর্যের প্রখর তেজ। মধ্য-গ্রীষ্মদিনের মতো দুরান্ত আকাশ, তেমনি হাল্কা নীল রঙ দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে আসছে ছোট ছোট সাদা মেঘ। সমস্ত স্কোয়াড্রন কমান্ডারদের গ্রিগর এক কোণে নিয়ে জড়ো করল যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। প্রায় তিরিশজন লোক, একটা ধসে-পড়া বেড়ার ওপর বসেছে। একজনের তামাকের থলে ঘুরছে সকলের হাতে হাতে। সভার কাজ শুরু করলে গ্রিগর—এবার কী মতলব ঠাওরানো যায়? যে সব রেজিমেন্ট আমাদের হটিয়ে দিল তাদের শায়েস্তা করব কেমন করে? কোন্ রাস্তায় যাব?

একটু নীরবতার পর স্কোয়াড্রন কমান্ডারদের একজন জিজ্ঞেস করল—শত্রুদের তরফে লোকজন কেমন? বন্দীর কাছ থেকে কিছু শুনলেন?

এক এক করে রেজিমেন্ট ধরে-ধরে গ্রিগর চট্পট্ তাদের সৈন্য সংখ্যার হিসেব দিতে লাগল। কমান্ডাররা চুপ করে বসে আছে, সতর্কভাবে বিবেচনা না করে কেউ মুখ খুলতে রাজি নয়। একজন গ্রিগরকে সে-কথা খোলাখুলিই জানিয়ে দিলে।

—একটু সবুর মেলেখভ! আমাদের ভাবতে দাও! এ ব্যাপারে একটুও ভুল হলে চলবে না।

একটু বাদেই সবাই যার যার মত দিতে শুরু করে। বেশির ভাগই জানায় সাফল্য যতোই হোক তবু বেশি দূর এগোনো ঠিক হবে না। তারা স্রেফ আত্মরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী। কিন্তু একজন খুব জোর গলায় ভিয়েশেন্স্কার সামরিক বড়কর্তাদের হুকুমমাফিক সামনে এগিয়ে যাবার কথা বলে।

তার বক্তব্য হল—এখানে বসে দিন গোনার কোনো মানে হয় না। মেলেখভ আমাদের দনিয়েৎসে নিয়ে যাক। আমরা তো মাত্র ক'জন, আর ওদের পেছনে গোটা রাশিয়া। কি করে আমরা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারি? আমাদের ওরা পেছু তাড়া করবেই, ব্যস্ তাহলে তো আমাদের হয়ে গেল। ওদের প্রাচীর ভেঙে আমাদের এগোতে হবেই। হাতে বেশি গোলাবারুদ নেই, কিন্তু আরো দখল করব। হামলা আমাদের করতেই হবে।

—আর আমাদের দেশের লোকদের কী হবে? মেয়েমানুষ, বুড়ো, বাচ্চাকাচ্ছা?

—তারা পেছনেই থেকে যাক্ না।

—ভেবেছ তুমি খুব চালাক! আসলে তুমি একটি গাধা!

এতক্ষণ পর্যন্ত কমান্ডাররা খালি শীতের শেষে জমিতে লাঙল দেওয়ার কি হবে তাই নিয়ে কানাকানি করছিল, এগিয়ে যেতে হলে খামারগুলোর কী ঘটবে সেই তো এক ভয়ের কথা। এখন কিন্তু চিরিক্-এর লোকরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে সভার অবস্থা দাঁড়াল গ্রামের পঞ্চায়েতের মতো। বাদবাকি সকলের ওপর গলা চড়িয়ে একজন বয়স্ক কসাক বলে ঃ

—খামার ছেড়ে আমরা বেরুব না! আমিই প্রথম আমার কোম্পানিকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। যদি লড়তেই হয় তো ভিটে-বসতের আশেপাশে লড়ব, অন্যদের জান বাঁচাবার জন্য লড়ব না।

যতোক্ষণ না সবাই চুপ হয়ে যায় ততোক্ষণ গ্রিগর সবুর করে থাকে। তারপর চূড়ান্ত ভোটটা দেয় সে ঃ

—এখানেই আমাদের ঘাঁটি করে থাকতে হবে। ক্রাস্নাকুৎস্ক্-এর কসাকরা যদি আমাদের দলে যোগ দেয় তাহলে ওদের আমরা রক্ষা করব। যাবার মতো জায়গাই নেই আর। সভা শেষ হল। এবার যার যার স্কোয়াড্রনে চলে যাও! এখুনি আমাদের ঘাঁটিতে গিয়ে বসতে হবে।

আধঘণ্টা বাদে ঘোড়সওয়াররা যখন ঘন হয়ে সার বেঁধে অন্তহীন রাস্তায় এঁকে-বেঁকে চলে যেতে থাকে, তাই দেখে গ্রিগর একটা তীব্র গর্বভরা আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু ওর এই আত্ম-তৃপ্ত আনন্দের সঙ্গে মনে একটা উদ্বেগ আর কটু তিক্ততাও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যেন ঃ ওরা যেভাবে নেতৃত্ব পেতে চায় তেমন নেতৃত্ব কি ও দিতে পারবে? হাজার হাজার কসাকের কর্মতৎপরতাকে কি ও বুদ্ধিমানের মতো চালিত করতে পারবে? একটা স্কোয়াড্রন শুধু নয়, এখন একটা গোটা ডিভিশন ওর হাতে। ওর মতো একজন অর্ধশিক্ষিত কসাকের পক্ষে হাজারটা জীবনের ভার নিয়ে তাদের প্রতি ধর্মসংগত দায়িত্ব পালন করা কি সম্ভব! ও ভাবে—কিন্তু এর চেয়েও বড়ো কথা কাদের বিরুদ্ধে আমি আজ এদের চালাচ্ছি? সাধারণ মানুষেরই বিরুদ্ধে! কাদের পথ ঠিক? হা ভগবান এ যে কী এক জীবন!

দাঁতে দাঁত চেপে ও ঘন হয়ে-চলা ফৌজের সারির পাশে পাশে ঘোড়া চালায়। ওর চোখ থেকে বলদর্পীর নেশার ঘোর কেটে গেছে, রয়ে গেছে শুধু উদ্বেগ আর তিক্ততাটুকু, তারই অসহ্য ভারে কাঁধ দুটো ওর ধনুকের মতো বেঁকে যায়।

॥ সাত ॥

নদী-প্রণালীগুলোর মুখ খুলে যায় বসন্তের আবির্ভাবে। দিনগুলো হয়ে ওঠে আর্দ্রতর, আগের চেয়েও অশান্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সবুজ পাহাড়ী স্রোতের প্লাবন। সূর্যও এখন বেশ লাল হয়ে উঠেছে বোঝা যায়, আগের সেই স্তিমিত হলদে ভাবটা মিলিয়ে গেছে। সূর্যরশ্মির রেখা মখমলের মতো উষ্ণ। বেলা-দুপুরে চষা খেত-জমি থেকে ভাপ ওঠে, আর এবড়োখেবড়ো আঁশ-ওঠা তুষারের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ভিজে বাতাস ভারি আর স্যাঁতসেঁতে গন্ধভরা।

রোদে তেতে উঠল গ্রিগরের পিঠ। রেজিমেণ্টের অন্য সেপাইরাও গরমের আমেজ পাচ্ছিল। জিনের গদিতে আরামদায়ক উষ্ণতা। দমকা ছুঁচ-ফোটানো হাওয়ায় কসাকদের বাদামি গাল ভিজে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এ-হাওয়া বরফ-ঢাকা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে একেক দমক ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস বয়ে আনে। কিন্তু শীতকে ছাপিয়ে উঠছে গরম। বসন্তের মাতনে ঘোড়াগুলো নাচে, লাফ-ঝাঁপ করে, গা থেকে ওদের আলগা চুল ঝরে পড়ে, নাকের

ফুটোয় আরো ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে ওদের ঘাম। লেজের ঝাঁকড়া চুল কসাকরা আগেই বেঁধে দিয়েছে। সওয়ারদের পিঠের ওপর ঝোলে উটের-লোমের ঘোমটা টুপিওগুলো, এখন আর ভালো লাগে না। ফারের টুপির লতায় কপাল ভিজে ওঠে ঘামে. ভেড়ার চামড়ার কোর্তা আর আস্তর-দেওয়া কোটে বড়ো গরম বোধ হয়।

শুকনো রাস্তা ধরে গ্রিগর রেজিমেন্ট নিয়ে এগোয়। দূরে হাওয়া-কলের ওপাশে দেখা যাচ্ছে লাল বাহিনীর স্কোয়াড্রনগুলো। লড়াই শুরু হল স্ভিরিদভ গাঁয়ের কোল ঘেঁষে।

ডিভিশনের কমান্ডার হিসাবে যা করা উচিত. লড়িয়েদের সারির বাইরে থেকে যুদ্ধ চালানো—এ জিনিস গ্রিগরের এখনো রপ্ত হয়নি। ও নিজেই ভিয়েশেন্‌স্কা কসাকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লড়াইয়ে সবচেয়ে মারাত্মক জায়গাগুলোয় ঠেলে দিল ওদের। সুসংবদ্ধ পরিচালনা ছাড়াই লড়াই এগিয়ে চলে। প্রত্যেক রেজিমেন্টই আগের বন্দোবস্ত করা সব শর্ত ভুলে গিয়ে, সাধারণ পরিস্থিতি কোন্ দিকে যাচ্ছে তার ধার না ধেরেই লড়াই চালিয়ে যায়।

ফ্রন্ট বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই ব্যাপক আকারে মহড়া দেবার মওকা মিলে যায়। গ্রিগরের ডিভিশনের প্রধান যেটা শক্তি—অশ্বারোহী ফৌজের প্রাচুর্য—সেটাই একটা মস্ত বড়ো সম্পদ ওর পক্ষে। গ্রিগর এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে স্থির করেছে, যুদ্ধ চালাবে ও "কসাক" কায়দায় : পাশ থেকে আক্রমণ করবে, আচম্‌কা অবরোধ ভেঙে শত্রুর পেছনদিকে হামলা চালাবে, রসদগাড়িগুলোকে বিপদে ফেলাবে। নৈশ আক্রমণ চলিয়ে লালফৌজকে ঘাবড়ে দিয়ে ওদের মনের জোর ভেঙে দেবে।

কিন্তু স্ভিরিদভের কাছাকাছি এসে একটা নতুন মতলব ঠাওরায় ও। নিজেই স্কোয়াড্রনগুলোকে জোর কদমে চালিয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর, এদিকে একটা স্কোয়াড্রন তখন ঘোড়া থেকে নেমে গাঁয়ের আশেপাশের ফলবাগিচাগুলোর ভেতর গুঁড়ি মেরে পড়ে থাকে। গ্রিগরের উল্টো তরফে রয়েছে লাল ঘোড়সওয়ার ফৌজের দুটো স্কোয়াড্রন। ওরা নিশ্চয়ই খপেরস্কের কসাক নয়, কারণ দূরবিন দিয়ে গ্রিগর দেখতে পাচ্ছে ওদের ঘোড়াগুলোর বেঁড়ে লেজ, ডনের কসাকরা কস্মিনকালেও লেজ ছেঁটে ঘোড়ার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করবে না।

একটা টিলার মাথায় উঠে গোটা অঞ্চলটা ও দূরবিন দিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে। জিনের ওপর বসলে মাটিকে সব সময়ই অনেকখানি খোলামেলা মনে হয়, তাই রেকাবের ভেতর যখন বুটের ডগা রেখে ও উঁচু হয়ে ওঠে তখন নিজের সম্পর্কে আস্থা আরো বেড়ে যায় ওর। লালফৌজের সারি যেখানে আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে গ্রিগর প্রায় এক মাইল দূরে। সাবেকী মিলিটারি কায়দায় ও তাড়াতাড়ি রেজিমেন্টগুলো সাজিয়ে ফেলে, যাদের হাতে বর্শা তাদের রাখে একেবারে সামনের সারিতে। লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে ঘোড়াটাকে কসাকদের দিকে পাশ ফিরিয়ে দাঁড় করায় গ্রিগর। তলোয়ার বের করে বলে : হাল্‌কা কদমে সামনে এগিয়ে চলো!

এগোবার পর এক মিনিট না যেতেই গ্রিগরের ঘোড়ার খুর বসে গেল বরফে-ঢাকা একটা ইঁদুরের গর্তের মধ্যে, হোঁচট খেয়ে পড়ল ঘোড়াটা। রাগে পাংশু হয়ে গ্রিগর তলোয়ারের চ্যাপ্‌টা দিক দিয়ে সজোরে ঘা কষাল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া খুব ভালো জাতের, ভিয়েশেন্‌স্কার এক কসাকের কাছ থেকে ধার করা তেজী জঙ্গী ঘোড়া। কিন্তু

গ্রিগরের বিশ্বাস নেই ওকে। ও জানে দু'দিনের মধ্যে এ ঘোড়ার পক্ষে ওর বশ মানা সম্ভব নয়। আর ওর চরিত্র বা কায়দাদস্তুর বোঝার মতো সময়ও গ্রিগরের নেই। ভয় ছিল নতুন ঘোড়াটা হয়তো ওর লাগাম ধরার কায়দা বুঝবে না, কিংবা মুখ থেকে কথা খসতে না খসতেই হুকুম মেনে চলা ওর দ্বারা হবে না—যেমনটি বুঝতো আর মেনে চলত ওর নিজের ঘোড়া যেটা ক্রিস্তিয়াকভে মারা গিয়েছিল। তলোয়ারের গুঁতো খেয়ে খেপে গেল জানোয়ারটা, লাগামের ধার না ধেরে জোর কদমে ছুটতে শুরু করল সে। শরীর হিম হয়ে এল গ্রিগরের, এমনকি নিজের ওপর খানিকটা দখলও যেন চলে গেল। কিন্তু ঠিক-রাস্তায় চালাবার জন্য গ্রিগরের হাতের প্রায়-দুর্বোধ্য ইঙ্গিত ঘোড়াটা ক্রমে ক্রমে মেনে নিতে থাকে আর লম্বা লম্বা পা ফেলে দুল্‌কি চালে চলতে গিয়ে ক্রমেই সপ্রতিভ আর ধীরস্থির হয়ে আসে। মুহূর্তের জন্য গ্রিগর এগিয়ে-আসা শত্রুসৈন্যের সারি থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে ঘোড়ার কাঁধের দিকে তাকায়। লাল-লাল কানদুটো শয়তানের মতো সেঁটে রেখেছে মাথার সঙ্গে, তালে তালে কাঁপছে সামনে বাড়ানো গলাটা। গ্রিগর জিনের ওপর সোজা হয়ে বসে লোভীর মতো ঢোঁক গেলে আর বুটদুটো অনেকখানি চালিয়ে দেয় রেকাবের ভেতর। পেছন ফিরে তাকায়। এর আগেও কতোবার দেখেছে পেছন থেকে ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ারের গর্জমান বন্যাস্রোত! আর প্রত্যেক বারই আসন্ন সংঘাতের আশংকায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে বুক, বন্য উত্তেজনার একটা দুর্বোধ্য অনুভূতি জেগেছে ওর মনে। ঘোড়া ছুটিয়ে দেবার প্রথম লহমা থেকে দুশমনের মুখোমুখি এসে পড়ার নিমেষটুকু পর্যন্ত মুহূর্তেকের মধ্যে অজ্ঞাতসারেই কী যেন একটা পরিবর্তন ঘটে যায় মনের ভেতরে। সেই ভয়ংকর মুহূর্তটিতে যুক্তি, স্থৈর্য, বিবেচনা সবই ওর লাগামের বাইরে চলে যাবে, অপ্রতিহত অখণ্ডভাবে মনের শাসনদণ্ড দখল করবে শুধু একটিমাত্র পাশব প্রবৃত্তি। কিন্তু তবু আক্রমণের সেই বিশেষ মুহূর্তটায় বাইরে থেকে ওকে দেখলে যে-কেউ মনে করবে বুঝি একটা সুস্থির ভাবাবেগহীন যুক্তি ওকে চালনা করছে : এমনই আশ্বস্ত, সংযত আর সুবিবেচিত ওর বাইরের আচরণ।

দুই বাহিনীর ভেতর দূরত্ব কমে যাচ্ছে যতোটা সম্ভব দ্রুতগতিতে। গ্রিগর দেখল ওর স্কোয়াড্রন থেকে খানিকটা আগে আগে যাচ্ছে একজন ঘোড়সওয়ার। তার প্রকাণ্ড কালো ঘোড়াটা ছুটছে নেকড়ের মতো ছোট ছোট পা ফেলে। একটা অফিসারী ঢঙের তলোয়ার শূন্যে ঘোরাচ্ছিল লোকটা; রুপোলি তলোয়ারের খাপ দুলে দুলে রেকাবে ঘা খাচ্ছে, সূর্যের আলোয় ঝক্‌মক্‌ করে উঠছে। এক নিমেষের মধ্যে গ্রিগর লোকটাকে চিনে ফেলল—কারগিনের এক কমিউনিস্ট, সাতাশ বছরের জোয়ান ছোকরা। ১৯১৭ সালের জার্মান-যুদ্ধ থেকে যারা প্রথম ফিরে আসে তাদের দলে ছিল সে। ফেরার সময় বলশেভিক আদর্শ আর জঙ্গী জীবনযাত্রার ফলে যেমন হয় তেমনি সুকঠিন তেজ নিয়ে ফিরেছিল। বলশেভিকই রয়ে গেল আগাগোড়া, লালফৌজে কাজও করল, তারপর বিদ্রোহের আগে রেজিমেণ্ট থেকে ফিরে এল নিজের জেলায়   চয়েত সরকার সংগঠন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এখন সে বেশ আত্মস্থ ভাব নিয়ে সিধে ঘোড়া চালিয়ে আসছে গ্রিগরের দিকে। তলোয়ার ঘোরাচ্ছে ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গিতে—অবিশ্যি একমাত্র কুচকাওয়াজের ময়দান ছাড়া আর কোথাও তলোয়ারটার কদর হবে না।

গ্রিগর দাঁত বের করে লাগামজোড়া উঁচিয়ে ধরে। ঘোড়াটাও একান্ত বাধ্যের মতো চলার বেগ বাড়িয়ে দেয়।

গ্রিগরের নিজস্ব একটা কৌশল ছিল যা ও আক্রমণের সময় প্রায়ই কাজে লাগাত।

ছোটবেলায় ও ছিল ন্যাটা। ডান হাতে চামচ তুলেও শেষ অবধি চট্ করে বাঁ হাতে বদলি করে নিত। ওর এই অভ্যেস ছাড়াবার জন্য ওর বাপ ওকে কতোবার প্রচণ্ড মারধোর করেছে, এমনকি অন্য সব ছেলেরাও ওকে "বাঁওয়া গ্রিগর" বলে খেপাত। এসব মারধোর আর গালাগালের নিশ্চয়ই একটা ফল হয়েছিল বলতে হবে, কারণ ওর বয়স যখন বছর দশেক তখন বাঁ হাত ব্যবহার করার বিশেষ কায়দাটা ও ভুলে গেল। কিন্তু বাঁ হাতের নিপুণতা ওর ঠিকই রয়ে গিয়েছিল, ডান হাতের মতোই সমান তালে ও-হাতখানা দিয়ে যে-কোনো কাজ করতে পারত সে। আক্রমণ করার সময় হলেই ও বাঁ হাতের কৌশল খাটাতো আর সফলও হতো প্রত্যেক ক্ষেত্রেই। শত্রুপক্ষের ঘোড়সওয়ারটিকে বেছে নিয়ে ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যেত তার মুখোমুখি, ডান হাতে তলোয়ার চালাবে এমনি ভঙ্গি করে স্বাভাবিক গতিতেই বাঁ দিকে সরে আসত। প্রতিদ্বন্দ্বীও তাই করত। তারপর যখন দুজনের মাঝে প্রায় গজ কুড়িকের তফাত, অন্য লোকটা এক পাশে খানিকটা ঝুঁকেছে তলোয়ার চালাবার জন্য তৈরি হয়ে। ঠিক সেই সময় গ্রিগর সাঁ করে ঘোড়াটাকে ডানদিকে ঘুরিয়ে নেবে আর একই রকম ক্ষিপ্র বেগে তলোয়ারটা তুলে নেবে ডান হাত থেকে বাঁ হাতে। শত্রুকে তখন নিজের ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আঘাত না করলে চলে না, তাই ভয়ানক অসুবিধায় পড়ে সে হতভম্ব আর দিশাহারা হয়ে যায়। গ্রিগরের তলোয়ার তখন অসহায় লোকটির ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে নেমে আসে।

ঝোপঝাড়ের ওপর থেকে কুশলী হাতে তেরছা করে ছাঁটা ডালপাতার ডগা যেমন একটুও না কেঁপে খসে পড়ে, ঠিক যে জায়গায় কসাকের তলোয়ারে কাটা পড়ল সেখানেই ঝোপের ধারে বালুর ওপর মাথা গুঁজে তা ঝরে পড়ে, তেমনিভাবে সুপুরুষ সিয়েমি-গ্লাজভ্ও পড়ে গেল পেছু হটতে-থাকা ঘোড়াটার পিঠ থেকে, তলোয়ারের আঘাতে জখম বুকটা হাতের তেলো দিয়ে চেপে ধরে নিঃশব্দে খসে পড়ল জিন থেকে। গ্রিগরও তক্ষুনি জিনের ওপর সোজা হয়ে রেকাবে পা দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াল। আরেকটি লোক অন্ধের মতো ছুটে আসছে ওর দিকে, ঘোড়াকে বাগে রাখতে পারছে না। জানোয়ারটার ফেনা-ওঠা মুখের ওপাশে সওয়ারের মুখখানা দেখতে পাচ্ছে না গ্রিগর, কিন্তু লোকটার তলোয়ারের বাঁকা ফলাটা ওর নজরে পড়ে, প্রাণপণশক্তিতে ঘোড়ার রাশ টেনে গ্রিগর আঘাতটা সয়ে যায় আর পাল্টা জবাবও দেয়—ডান হাতে রাশ গুটিয়ে রেখে পরিষ্কার করে ছাঁটা লাল কাঁধটার ওপর তলোয়ার চালায়।

গ্রিগরই প্রথম লড়তে লড়তে রাস্তা করে নিল, ছুটে গেল কসাক আর লাল সেপাইদের একাকার ভিড়ের ভেতর দিয়ে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দ্যাখে ঘোড়সওয়ারী ফৌজের সে এক উত্তাল জনসমুদ্র। খাপে তলোয়ার গুঁজে গ্রিগর পিস্তল বার করে, পুরোদমে ছুটিয়ে দেয় ঘোড়া। কসাকরা ওর পেছন পেছন এলোমেলো সার বেঁধে স্রোতের মতো এগিয়ে আসছে। ওর পাশে ঘোড়া ছুটিয়েছে একজন সার্জেন্ট, শেয়ালের লোমের টুপি আর ভেড়ার চামড়ার কোর্তা পরা। লোকটার কান আর গলা একেবারে থুতনি অবধি কেটে গেছে, বুক দেখলে মনে হয় যেন একঝুড়ি পাকা চেরীফল থেঁতলানো হয়েছে বুকের ওপর। দাঁতের পাটি খোলা, রক্তমাখা।

লালফৌজের লোকরা বে-তাল হয়ে পড়েছিল, অর্ধেকই এর মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছিল। এবার তারা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল পলায়মান কসাকদের পেছু নেবার নতুন উৎসাহে। পিছিয়ে-পড়া একজন কসাক ঘোড়া থেকে যেন ঝোড়ো হাওয়ার টানে ছিটকে পড়ে গেল। বরফের ভেতর ঘোড়ার খুরের নিচে চাপা পড়ল সে। এবার গ্রাম, ফলবাগিচার কালো

কালো ঝোপঝাড়, পাহাড়ের ধারের মন্দির আর চওড়া রাস্তা এসে পড়েছে নাগালের মধ্যে। প্রায় দুশো গজের মধ্যেই সেই ঘেরার বেড়াটা, যেখানে কসাকদের ফৌজী কোম্পানি ওৎ পেতে ছিল। সবেগে ছুটতে ছুটতে গ্রিগর পেছনের কসাক ঘোড়সওয়ারদের উদ্দেশ করে হেঁকে বললে : দু'দলে ভাগ হয়ে যাও!

কসাক স্কোয়াড্রনদের জমাট স্রোতটা এবার পাথরের মুখে নদীর ধারার মতো দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। লাল ঘোড়সওয়ার ফৌজের বন্যাপ্রবাহের সামনে আর কোনো আড়াল রইল না। বেড়ার ওপাশে লুকোনো কসাক বাহিনীর ভেতর থেকে একসঙ্গে গুলির আওয়াজ উঠল; তারপর আরেকবার; তারপর আবার। লালফৌজী-সওয়ারকে পিঠে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা ঘোড়া, আরেকটা হাঁটু মুড়ে বরফে মাথা গুঁজল। জিন থেকে আরো তিন চারজন লাল সেপাই ছিটকে পড়ল। লাল অশ্বারোহী ফৌজ রাশ টেনে ফের ঘুরে যাবার আগেই কসাকরা তাদের সমস্ত রাইফেলের ঘরা খালি করে দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। 'স্কোয়াড্রন!' বলে গ্রিগর কোনো ক্রমে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই হাজারটা ঘোড়ার খুর বরফের ওপর সবেগে পাক খেয়ে গেল, কসাকরা তাড়া করে চলল এবার।

কিন্তু ওরা লালদের পেছু নিয়েছে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত। এক মাইল যাবার পর কসাকরা ফিরল। লালফৌজের মরা সৈনিকদের কাপড় খুলে নিল ওরা, ঘোড়ার জিন খুলল। হাত-কাটা আলেক্সি শামিল নিজেই খুন করল তিনজন আহত লাল-সেপাইকে, বেড়ার দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে একে একে তলোয়ার কুপিয়ে। ওর কাজ শেষ হবার পর কসাকরা সিগারেট মুখে ভিড় করে দাঁড়াল লাশগুলো ঘিরে। তিনজনেরই শরীরে এক রকম চিহ্ন ঃ কণ্ঠা থেকে কোমর অবধি ধড়টুকু দুভাগ করে চেরা।

চোখ আর গালদুটো নাচাতে নাচাতে আলেক্সি জাঁক করে বলে ঃ তিনটেকে আমি ছ'টা বানিয়ে ছেড়েছি। অন্য কসাকরা তোয়াজ করে তামাক খাওয়াল ওকে, ওর হাতের ছোট মুঠিটা আর খোলা জ্যাকেটের ভেতর দিয়ে উঁকি দেওয়া বুকের সুপুষ্ট পেশীগুলোর দিকে সরাসরি তারিফের চোখে তাকিয়ে রইল ওরা।

ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলো বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। ওদের পিঠের ওপর জোব্বা-কোট ঢাকা দেওয়া। কসাকরা জিনের পেটি আঁট করে একে একে এসে কুয়োর কাছে দাঁড়াতে লাগল জলের জন্য। অনেককে ক্লান্ত ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে আনতেও হল।

গ্রিগর ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে গেছে প্রোখর ও আরো পাঁচজন কসাককে সঙ্গে নিয়ে। চোখ থেকে বাঁধন খসে গেলে যেমন হয় তেমনি মনে হচ্ছে ওর। আক্রমণের আগে যেমন মাটির ওপর সূর্যকে দেখেছিল কিরণ দিতে, আর খড়ের গাদার নিচে গলতে দেখেছিল বরফ, এবারও তেমনিই দেখছে। গাঁয়ের দিক থেকে চড়ুইপাখির কিচিরমিচির কানে আসছে। উন্মুখ বসন্তের মধুগন্ধ ওর নাকে। জীবন এবার ওর কাছে ম্রিয়মান হয়ে ফিরে আসেনি তো, এক্ষুনি যে রক্তপাত ঘটে গেল তার ফলে বয়েসের ভারও বেড়ে যায়নি, বরং যেন আরো লোভনীয় হয়ে উঠেছে তা বিরল আর স্বল্পস্থায়ী আনন্দে। গলন্ত মাটির কালো বুকে বরফের শেষচিহ্নগুলোকে অনেক সাদা আর অনেক উজ্জ্বল বলে কেবলি ভ্রম হয়।

॥ আট ॥

বন্যার জলের মতো বিদ্রোহ উত্তাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, ডন অববাহিকার সমস্ত জেলা আর ডনের পূর্বদিকে তিনশো মাইল জায়গা জুড়ে স্তেপের এলাকা সে বন্যায় প্লাবিত। পঁচিশ হাজার কসাক হয়েছে ঘোড়সওয়ার, আর উজানী ডন এলাকার গ্রামগুলো থেকে এসেছে দশ হাজার পদাতিক।

অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্যে শুরু হয়েছে যুদ্ধ। দোনিয়েৎসের পাড়-বরাবর ফ্রন্ট দখল করে রেখেছে ডন শ্বেতরক্ষী ফৌজ, নভোচেরকাস্ক কব্জা করে তারা একটা চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়। আর শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে সংগ্রামরত আট নম্বর ও নয় নম্বর লালবাহিনীর পেছন দিকে ঝড়ের মতো জেগে উঠছে আরেকটা বিদ্রোহ—ডন এলাকাকে শাসনে রাখার সুকঠিন কাজটা এইভাবে ক্রমেই আরো জটিল হয়ে ওঠে।

বিদ্রোহী কসাকদের সামরিক রসদপত্রে ঘাটতি পড়ল। প্রথমে ছিল রাইফেলের অভাব, এবার বুলেটের অকুলোন। বুলেট পেতে হলে রক্তব্যয় করতে হয় হামলা কিংবা নৈশ অভিযান চালিয়ে। বুলেট অবশ্য পাওয়া যায় ঠিকই। ১৯১৯ সালের এপ্রিলে বিদ্রোহীরা পুরোদস্তুর সজ্জিত হল রাইফেলে। আটটা কামান আর দেড়শো মেশিনগান এসেছে ওদের হাতে।

বিদ্রোহের গোড়ার দিকে ভিয়েশেন্স্কার গুদোমঘরে ছিল পঞ্চাশলক্ষ কার্তুজ। আঞ্চলিক সোভিয়েত সবচাইতে সেরা লোহামিস্ত্রি, তালা-কারিগর আর বন্দুক-মিস্ত্রিদের জোগাড় করেছে, বুলেট ঢালাই করবার একটা কারখানাও গড়ে তুলেছে তারা। কিন্তু সীসে নেই, এমন কিছুও নেই যা দিয়ে বুলেট তৈরি করা যাবে। আঞ্চলিক সোভিয়েতের ডাকে গ্রামে গ্রামে তখন জমানো সীসে আর তামা জোগাড় করার হিড়িক পড়ল। স্টীম-কলের সীসের অংশগুলো সব জবরদখল করা হল। ঘোড়সওয়ার দূতেরা গ্রামগুলোতে গিয়ে আবেদন জানাতে লাগল অল্পকথায় :

—তোমাদের স্বামী, সন্তান ভাইদের হাতে এমন কিছু নেই যা দিয়ে রাইফেল চালাবে। হতভাগা দুশমনদের কাছ থেকে যেটুকু কেড়ে নেয়া যায় শুধু সেটুকুই সম্বল। বুলেট তৈরি করার উপযুক্ত যা কিছু সবই তোমরা দিয়ে দাও। ঝাড়াই-কলের তামার চালুনিগুলোও খুলে দাও।

এক হপ্তার মধ্যে সারা জেলায় এমন একটি ঝাড়াই-কলও রইল না যার চালুনি আস্ত আছে। যতোকিছু কাজের অকাজের টুকিটাকি জিনিস মেয়েরা নিয়ে এল গ্রাম সোভিয়েতের দপ্তরে। যে-সব গ্রামে এর আগে লড়াই হয়ে গেছে সেখানকার ছেলেপিলেরা দেয়ালে-বেঁধা বুলেট খুঁড়ে-খুঁড়ে বের করতে লাগল, আঁতিপাঁতি করে মাটির মধ্যে খুঁজতে লগল কামানের গোলার টুকরো। কিন্তু একাজেও ওদের পুরোপুরি মিল-মিশের অভাব। খুব গরিবঘরের বৌ-ঝিরা যারা তাদের শেষ সম্বল বাসন-কোশন হাতছাড়া

করতে চায়নি তাদের গ্রেপ্তার করে ভিয়েশেন্‌স্কায় চালান করা হল "লালরক্ষীদের দরদী" বলে। তাতারস্কে বয়স্ক ধনী কসাকরা মিলে রেজিমেণ্ট ফেরত একটি জোয়ান কসাককে মারধোর করে খুন বইয়ে দিল, কারণ ছোকরা অসাবধানে একটা মন্তব্য করে ফেলেছিল। সে বলেছিল : ঝাড়াই-কল নষ্ট করতে চায় বড়োলোকরা করুক। হয়তো এই লোকসান-টুকুর চেয়ে লালদেরই ওদের ভয় বেশি।

ভিয়েশেন্‌স্কা কারখানার সমস্ত মজুত সীসে গালিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তৈরি বুলেটগুলোয় নিকেলের খোল নেই, সেগুলোও তাই গলে গেল। রাইফেল ছোঁড়ার সময় সীসের বুলেট আধা-গলা অবস্থায় নল থেকে বেরোয়, কিন্তু তার যা কিছু জারিজুরি তিনশো গজের মধ্যে। তবে তাতে ঘায়েল করে বড়ো সাংঘাতিক রকম।

পঁয়ত্রিশ হাজার বিদ্রোহীকে পাঁচটি ডিভিশনে, আর একটা বিশেষ ষষ্ঠ ব্রিগেডে ভাগ করা হয়েছে। গ্রিগর মেলেখভ প্রথম ডিভিশনের অধিনায়ক। চিরা নদীর ধার বরাবর রয়েছে ডিভিশনটা। দনিয়েৎস্‌-এর প্রধান যুদ্ধরেখা থেকে ফিরিয়ে-আনা লালফৌজী দলের আক্রমণের আসল ধাক্কাটা এসে পড়েছে ফ্রণ্টের যে-দিকটায় গ্রিগর রয়েছে সেদিকটাতেই। কিন্তু শত্রুপক্ষের চাপ তো ও ফিরিয়ে দিতে পারলোই, উপরন্তু ঘোড়-সওয়ার ও পদাতিক সৈন্যবল দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য দ্বিতীয় ডিভিশনটাকেও সাহায্য করল।

উত্তর দিকে খপেরস্ক্‌ ও উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিয়েৎস্‌ জেলা পর্যন্ত গড়াতে পারেনি বিদ্রোহ, যদিও সে-সব জায়গায় বিক্ষোভ ধূমায়িত। দূতরা এসে সৈন্য পাঠাতে বলছে বুজুলুক আর খপারের উজানী এলাকার দিকে, যাতে কসাকদের সেখানে বিদ্রোহ করতে ওস্‌কানো যায়। কসাকদের নায়করা ডন উজানী এলাকার ওপারে আর এগিয়ে যাবার ভরসা পাচ্ছে না, কারণ ওরা জানে খপেরস্ক্‌ কসাকদের একটা বড়ো অংশ সোভিয়েত সরকারের সমর্থক, তাদের বিরুদ্ধে তারা হাতিয়ার তুলবে না। আর এসব দূতদের খবরের ওপর ভরসাও করা যায় না, কারণ ওরা নিজেরাই স্বীকার করেছে লালরক্ষীদের সম্পর্কে অসন্তোষ আছে এমন কসাকের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। তাছাড়া জেলার নির্ঝঞ্ঝাট একেকটা কোণে যে-সব অফিসার পড়ে ছিল তারা নাকি সবাই লুকিয়ে আছে। লড়াইয়ের সারি থেকে সেপাইরা হয় বাড়ি ফিরে গেছে নয়তো এরি মধ্যে যোগ দিয়েছে লালবাহিনীতে, আর বুড়োদেরও সেই শক্তি নেই, গ্রামাঞ্চলে তাদের আগেকার সেই প্রতিপত্তি নেই।

দক্ষিণের উক্রেইনীয় জেলাগুলোয় লালফৌজ তরুণ যুবকদের জমায়েত করেছিল। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তারা নিজেদের ইচ্ছাতেই বেশ উৎসাহ নিয়ে লড়ছে।

বিদ্রোহ তাই ডন উজানী এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। নায়ক থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি বিদ্রোহীর কাছেই দিনের পর দিন এটা পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল যে তারা বেশিদিন আর বাড়িঘর সামলে রাখতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক লালফৌজ দনিয়েৎস-রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসে ওদের ধ্বংস করবেই।

* *

৩১শে মার্চ গ্রিগর মেলেখভকে ভিয়েশেন্‌স্কায় ডেকে পাঠানো হল সর্বোচ্চ অধিনায়কদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য। সহকারী রীয়াব্‌চিকভের হাতে ডিভিশনের ভার বুঝিয়ে দিয়ে গ্রিগর ভোরবেলায় রওনা হল আরদালি সঙ্গে নিয়ে। ঠিক যে সময়টায় ও সদর দপ্তরে এল, কমাণ্ডার কুদীনভ তখন খপেরস্ক জেলার এক খবরবাহককে জেরা

করছে। টেবিলের পাশে চেয়ারে গন্টিশন্টি হয়ে বসে কুদীনভ বেল্টের ডগায় মোচড় দিচ্ছিল।

ও জিজ্ঞেস করে—তোমার নিজের এ সম্পর্কে কী মনে হয়?

কসাকটি ইতস্তত করে—মানে, অবিশ্যি...আমি কী বলব বলুন? অন্যরা যা ভাবে আমিও তাই ভাবি। জানেন তো মানুষগুলো কেমন। ওরা ভয় পায়। মাথা চাড়া দিতে চায় বটে তবে ভয় পায়।...

—চায় বটে, তবে ভয় পায়!—খেপে চিৎকার করে ওঠে কুদীনভ। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সে। চেয়ারটা যেন আগুনে তেতে উঠেছে এমনিভাবে উশ্খুশ্ করতে থাকে: —তোমরা হলে মেয়েমানুষের ঝাড়! ইচ্ছে আছে, ইচ্ছে নেই, মা বারণ করে দিয়েছে! যাও, যাও, নিজের জেলায় ফিরে যাও, বুড়োদের গিয়ে বলো তোমরা নিজেরা যতোক্ষণ না শুরু করছ ততোক্ষণ একজন সেপাইও আমরা পাঠাব না। এক এক করে তোমাদের 'লাল'গুলোকে ফাঁসি দিলেই পারো!

দরজায় টোকা না দিয়েই ভেতরে ঢুকল ভেড়ার-চামড়ার কোর্তা-পরা গাঁট্টাগোট্টা কালো-গালপাট্টাওয়ালা একটি লোক। মাথা ঝুঁকিয়ে কুদীনভকে নমস্কার করে টেবিলে গিয়ে বসল হাতের তেলোয় গাল রেখে। গ্রিগর বড়োকর্তাদের সবারই মুখ চিনত, কিন্তু এ লোকটিকে চিনতে পারল না। ও হাঁ করে চেয়ে রইল লোকটির মুখের সুডোল রেখার দিকে, মুখের রঙটা কাল্চে তবে রোদপোড়া নয়, নরম ফর্সা হাতদুটো।

চোখের ইশারায় আগন্তুককে দেখিয়ে কুদীনভ বললে গ্রিগরকে:

—মেলেখভ, ইনি হলেন কমরেড গিয়রগিদ্জে। ভদ্রলোক...।—একটু থেমে কুদীনভ ককেসীয় রুপোর তৈরি বেল্ট-বগলেশটায় মোচড় দিয়ে খবরবাহককে বললে—হ্যাঁ, তুমি এবার যেতে পারো। আমাদের হাতে এখন কাজ আছে। বাড়ি ফিরে যাও, যে তোমায় পাঠিয়েছে তাকে গিয়ে যা বললাম তাই বলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠল কসাকটি। জ্বলজ্বলে লালচে-বাদামি শেয়ালের লোমের টুপিটা প্রায় ছাদ ছোঁয় আর কি! টুপি খুলে লোকটা বলে—এই যদি ঘটনা হয় তাহলে আমি অবশ্য দুঃখিত, কিন্তু মাননীয় হুজুর, আপনি আমার ওপর চোটপাট না করলেও পারতেন। আমি আমাদের মোড়ল মাতব্বরদের খবর এনে দিয়েছি, আপনার জবাবটাও তাদের জানিয়ে দেব। কিন্তু আপনার ধমকা-ধমকি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আগে শ্বেতরক্ষীরা আমাদের ওপর চোটপাট করত, তারপর এল লালরক্ষীরা। এবার আরম্ভ করলেন আপনারা। উঃ, কী কঠিন দিনকালই পড়েছে আমাদের।—মাথার ওপর খপ্ করে ফের টুপিটা বসিয়ে লোকটা গট্মট্ করে বেরিয়ে গেল গলি-বারান্দায়, পেছন থেকে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। কিন্তু একবার বেরিয়ে এসেই বুঝি আবার তার মাথায় রাগ চড়ে, বাইরের দরজাটা এমন জোরে বন্ধ করে যে ছাদ থেকে চুণবালির আস্তর খসে পড়ে।

লোকটা চলে যাবার পর কুদীনভ হাসিমুখে টিপ্পনি কাটে—লোকজনও আজকাল হয়েছে খুব মজার! উনিশ-শো সতের সালের বসন্তকালে আমি জেলা দপ্তরে যাচ্ছিলাম। চাষবাসের সময়, ইস্টার পরবের মুখোমুখি। মুক্ত স্বাধীন কসাকরা জমিতে লাঙল দিচ্ছে। স্বাধীনতা পেয়ে সব পাগলা হয়ে গেছে। এমনভাবে রাস্তায় সুদ্ধু লাঙল চালাচ্ছে যেন এর মধ্যেই যা জমি পেয়েছে তাতেও ওদের কুলোচ্ছে না। একজন কসাক রাস্তার ওপর লাঙল দিচ্ছিল, তাকে ডাকতেই সে আমার কাছে এল। জিজ্ঞেস করলাম—এই! রাস্তায়

লাঙল চড়িয়েছিস্ কেন রে? সে ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দিলে—আর একাজ করব না, এখুনি সমান করে দিচ্ছি গো। আরো দু'তিন জনকে ঠিক এই কায়দায় ভয় দেখালাম। কিন্তু আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখি রাস্তায় ফের লাঙল দিয়ে রেখেছে। যে লোকটা লাঙল দিয়েছে তাকেও দেখলাম। তাকে ডাকলাম : এই, এদিক শোন্! সে এল, আমি ধমক দিয়ে বললাম : রাস্তায় লাঙল দিতে তোকে হুকুম দিয়েছে কোন্ হতভাগা? আমার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে রইল লোকটা (বেশ গাঁট্টাগোট্টা বেঁটে গোছের চেহারাটাও বটে)। একটা কথাও না বলে সে বলদগুলোর দিকে ছুটে গেল। একটা লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়ে ফের দৌড়ে এল, আমার 'তারান্তাস্'-গাড়ির একপাশ চেপে ধরে পা-দানির ওপর পা রেখে চড়া গলায় বললে : তুমি কে? আর কতোকাল তোমরা রক্ত চুষবে আমাদের? বেশি চোট দেখাবে তো মাথা ফুটো করে দেব হ্যাঁ।—ডাণ্ডাটা তুলে ধরল। আমি তখন বলি : আরে, না না, ইভান, আমি তামাশা করছিলাম শুধু। কিন্তু ও জবাব দেয় : আমি আর ইভান নই এখন, ইভান অসিপোভিচ। আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে না পারো তো মেরে বদন বিগড়ে দেব! আর এই কসাকটিকেও দ্যাখো : এই ফোঁসাচ্ছে, মাথা নোয়াচ্ছে, নাকে কাঁদছে, তারপরই যাবার সময় দেখিয়ে গেল আসল মেজাজখানা। লোকগুলো সব অহঙ্কারে ফুলে উঠছে।

—ফুলে উঠেছে ওদের ভেতরের বদমায়েশী, অহঙ্কার নয়। বদমায়েশী তো আজকাল আইনের মর্যাদা পেয়েছে কিনা।—ককেসীয় অফিসারটি কথাগুলো বলে প্রতিবাদের অপেক্ষা না করেই বিষয়টার ওপর চূড়ান্ত ছেদ টেনে দেয় : এবার আসুন আলোচনা শুরু করা যাক। আমি আবার আজই নিজের রেজিমেণ্টে ফিরে যেতে চাই।

গ্রিগরের দিকে ফিরে কুদীনভ বলে : তুমি এখানেই থাকো। সবাই মিলে আলোচনা করব। জানো তো সেই প্রবাদটা : 'একা মাথার চেয়ে দুটো মাথায় বেশি বুদ্ধি খোলে।' আমাদের ভাগ্যি বলতে হবে কমরেড গিয়রগিদ্জেকে ভিয়েশেন্স্কা জেলাতেই থেকে যেতে হল. উনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্নেল, তার ওপর সামরিক কর্মচারী-শিক্ষণ কলেজ থেকে পাশ করেছেন।

গিয়রগিদ্জেকে গ্রিগর জিজ্ঞেস করে—আপনি কেমন করে ভিয়েশেন্স্কায় থেকে যাবার ব্যবস্থাটা করলেন?—কোনো এক অজ্ঞাত কারণে গ্রিগর মনে-মনে একটু কঠিন আর সতর্ক হয়ে উঠেছে।

—টাইফাসে শয্যা নিয়েছিলাম। যখন উত্তরের রণাঙ্গনে পেছু-হটা শুরু হল, আমি রয়ে গেলাম দুদরভ্স্কিতে।

—কোন্ রেজিমেণ্টে ছিলেন আপনি?

—লড়াইয়ের সারিতে তো ছিলাম না। আমি তখন সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত।

গ্রিগর আরো প্রশ্ন করতে চেয়েছিল কিন্তু ককেসীয় লোকটির মুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন দেখে ও মনে মনে বুঝল আর বেশি জেরা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, তাই কথার মাঝখানেই থেমে গেল ও।

মিনিট দুয়েক বাদে ঘরে ঢুকল সেনাপতিমণ্ডলীর প্রধান সাফোনভ, চতুর্থ কসাক ডিভিশন আর ষষ্ঠ বিশেষ ব্রিগেডের কমাণ্ডাররা। তারপর শুরু হল আলোচনা। কুদীনভ সংক্ষেপে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরাখবর দিল। প্রথমেই বলতে উঠল ককেসীয় লোকটি। ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর একটা মানচিত্র মেলে ধরল সে। তারপর বেশ অনর্গল বলে চলল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে :

—গোড়াতেই বলে রাখছি, আমার ধারণা তিন নম্বর আর চার নম্বর ডিভিশনের কিছু কিছু রিজার্ভকে মেলেখভের ডিভিশন আর বিশেষ ব্রিগেড যে দিকটায় আছে সেদিকে পাঠানো খুবই জরুরি। আমাদের হাতে যা খবর আছে আর বন্দীদের জেরা করে যা জানতে পেরেছি তাতে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, লালফৌজের কর্তারা এই বিশেষ অংশটার ওপর একটা বড়োরকমের হামলার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমরা জানতে পেরেছি তারা দুটো ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্ট, পাঁচটা বিশেষ ফৌজীদল, তিনটে কামানের সার আর সেই সঙ্গে দরকার মতো মেশিনগান পাঠাচ্ছে। মোটামুটি হিসেব করলে ওদের ফৌজের সঙ্গে আরো সাড়ে পাঁচ হাজার সেপাই যোগ করা হচ্ছে। সে অবস্থায় সংখ্যার দিক থেকে ওরাই বড়ো হবে তাতে সন্দেহ নেই, রসদের ব্যাপারে ওদের প্রাধান্যের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল।

দক্ষিণ দিক থেকে হল্‌দে রোদ এসে ঢুকছে কামরার ভেতর। কড়িকাঠের নিচে নিশ্চল হয়ে জমে যাচ্ছে তামাকের ধোঁয়ার একটা নীল কুণ্ডলী, আর তারই মধ্যে একটা মাছি ধোঁয়ার জ্বালায় পাগলের মতো ভন্‌ভনাচ্ছে। দু'রাত জেগে এখন ঘুম পাচ্ছিল গ্রিগরের, তন্দ্রাভরা চোখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল ও। চোখের পাতা-জোড়া সীসের মতো ভারী, অতিরিক্ত গরম ঘরটার গুমোট আর ক্লান্তি ওর মনের জোর আর চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। জানলার বাইরে বসন্তের হাল্‌কা হাওয়া নাচছে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে শেষ তুষারের টকটকে লাল মানিকজ্বালা। ডনের ওপারে পপ্‌লারগুলো এমন পাগলের মতো হাওয়ায় দুলছে যে, সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় যেন ওদের চাপা গলার একটানা ফিস্‌ফিসানিও শুনতে পাচ্ছে ও।

ককেসীয় লোকটির পরিষ্কার জোর দিয়ে বলা গলার আওয়াজ ওকে সজাগ করে তোলে। জোর করেই কান পেতে শোনে ও, আর অজান্‌তে ঝিমুনিভাবটা কেটে যায়।

—এক নম্বর ডিভিশন যেখানে রয়েছে সেখানে শত্রুর তৎপরতা কম, এদিকে মিগুইলিন্‌স্ক্‌ মিয়েশ্‌কভ লাইনের দিকে তারা এগিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে—এ ব্যাপারটাই তো বুঝিয়ে দিচ্ছে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। আমি বলি কি...। 'কমরেড' কথাটা বলতে গিয়ে তোৎলামি এসে যাচ্ছিল, ভীষণ একটা ভঙ্গি করে সে গলার স্বর চড়াল—আমি বলি কি, কুদীনভ আর সফোনভ লাল-সেপাইদের এই মহড়াগুলোকে ওপর ওপর বুঝে নিয়ে ভয়ানক ভুল করছেন, তাই মেলেখভের অংশটাকে খানিকটা কম-জোর করে দিতে চাইছেন তাঁরা। শত্রুপক্ষের শক্তি বে-চাল করে দিয়ে তাদের দুর্বল অংশের ওপর নিজেদের ফৌজকে ঠেলে দিতে হবে—এ তো রণনীতির একেবারে গোড়ার কথা।...

কথার মাঝখানে কুদীনভ বলে উঠল—কিন্তু মেলেখভের তো মজুত রেজিমেণ্টের প্রয়োজন নেই।...

—ঠিক তার উল্‌টো! হাতের কাছে আমাদের মজুত ফৌজ রাখতেই হবে যাতে সারি ভেঙে ওরা বেরিয়ে গেলে আমরা শূন্য জায়গাটা পূরণ করতে পারি।

—মনে হচ্ছে আমার মজুত সেপাইদের আমি হাতছাড়া করব কি না সে সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছেও কুদীনভের নেই।—বলতে বলতে রাগ চড়ে যায় গ্রিগরের—কিন্তু আমি ওদের ছেড়ে দেব না; একটি স্কোয়াড্রনও ছাড়ব না!

সাফোনভ হাসতে হাসতে গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে বললে—কিন্তু, ভাই এ তো...

—এর মধ্যে ভাই-টাই কিছু নেই। আমি ওদের হাতছাড়া করব না, ব্যস্‌, এই

আমার শেষ কথা। আমার এলাকা আর আমার সেপাইদের জন্য আমিই দায়ী। —পাল্টা জবাব দিলে গ্রিগর।

এইভাবে আচম্কা গজিয়ে-ওঠা তর্কটার ওপর ছেদ টানল গিয়রগিদ্জে। লাল পেন্সিল দিয়ে ম্যাপের ওপর রণাঙ্গনের সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাগুলো দেখাতে লাগল সে। তারপর যখন সব মাথাগুলো একজায়গায় নিচু হয়ে ঝুঁকল তখন এটা ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, লালফৌজের কর্তৃপক্ষ যে-কোনো আক্রমণের জন্যই তৈরি হোক না কেন, তা একমাত্র সম্ভব দক্ষিণের রণাঙ্গনেই, কারণ সেটাই ডনের সবচেয়ে কাছাকাছি, আর যাতায়াতের দিক থেকেও সবচেয়ে সুবিধাজনক।

এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল বৈঠক। চার নম্বর ডিভিশনের কমাণ্ডার কন্দ্রাত মেদ্ভেদিয়েভ মেজাজী মানুষ। আলোচনার সময় সে বরাবর চুপচাপ রয়ে গিয়েছিল। একেবারে শেষটায় সে অবিশ্বাসভরে চারদিক চেয়ে বললে :

—মেলেখভকে সাহায্য করার জন্য আমরা ফৌজ পাঠাতে পারি। বাড়তি সেপাইও আছে আমাদের। কিন্তু একটা জিনিস আমায় ভাবিয়ে তুলছে। ধরুন যদি ওরা একসঙ্গে সবদিক থেকে আক্রমণ চালায় তাহলে আমরা কী করব? ঠেলে নিয়ে এক কোণে জড়ো করবে আমাদের, তখন আমরা পড়ব সাংঘাতিক অবস্থায়, ছোট দ্বীপের ভেতর কোণঠাসা সাপের মতো।

—সাপ তো সাঁতার কাটতে পারে, কিন্তু আমাদের যে সাঁতার কেটে যাবার মতো জায়গাও নেই।—ওদের মধ্যে একজন হেসে বললে।

কুদীনভ চিন্তিতভাবে বলে—সে কথা আমরা ভেবেছি। কিন্তু সে অবস্থা যদি সত্যিই হয় তাহলে যারা হাতিয়ার বইতে পারে না তাদের ছেড়ে, পরিবার পরিজন পেছনে ফেলে আমাদের লড়তে লড়তে পথ করে এগিয়ে যেতে হবে দনিয়েৎসে। আমাদের ফৌজ তো নেহাৎ ছোট নয়, তিরিশ হাজার লোক আছি।

—তারপর যে আবার ক্যাডেটদের হাতে পড়তে হবে! উজানী ডনের কসাকদের ওপর তাদের আগেকার গায়ের ঝাল মেটাবার আছে!

—মুরগি বসে রইল, তার ডিম কবে ফুটবে? এসব কথা বলার কোনো মানে হয়!—গ্রিগর মাথায় টুপি দিয়ে বেরিয়ে এল। আসবার সময় শুনতে পেল গিয়রগিদ্জের জবাবটা :

—ভিয়েশেন্স্কার কসাক আর বিদ্রোহী ফৌজ যদি বলশেভিকদের সঙ্গে মরদের মতো লড়তে পারে তাহলে ডন আর রাশিয়ার কাছে তারা যা পাপ করছে সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।...

গ্রিগর ভাবল—শয়তানটা মুখে এই কথা বলছে বটে কিন্তু মনে মনে হাসছে! প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটার মতো এই অফিসারটি সম্পর্কে আবার ভেতরে ভেতরে একটা উদ্বেগ আর অহেতুক রাগ অনুভব করে গ্রিগর।

ফটকের কাছে ওকে কুদীনভ এসে ধরে। দু'এক মিনিট কোনো কথা না বলে দুজন একসঙ্গে হাঁটে। গোবর-ছড়ানো চত্বরের এখানে-ওখানে জমা জল হাওয়া লেগে কেঁপে উঠছে। সন্ধ্যে হয়ে আসে। দক্ষিণ দিক থেকে রাজহাঁসের মতো ধীরে ধীরে ভেসে আসছে গোল গোল ভারী সাদা মেঘ। বরফ-গলা মাটির ভিজে সোঁদা গন্ধ সজীব আর সুবাস। বেড়ার নিচে ঘাসগুলোকে সবুজ দেখাচ্ছে। এবার গ্রিগর সত্যিসত্যিই শুনতে পায় ডন-পারের পপ্লার গাছগুলোর সকাতর নিঃশ্বাস।

কুদীনভ মন্তব্য করে—শিগ্‌গীর বরফ ভাঙতে শুরু করবে।

—হ্যাঁ।

—নিকুচি করেছে...মরার আগে একটু তামাক খাবার বিলাসিতাও করে যেতে পারব না! এক ভাঁড় ঘরে-তৈরি তামাক, তারও দাম এখন চল্লিশ 'কেরেন্‌স্কি' রুব্‌ল্‌।

হাঁটতে হাঁটতেই পাশ ফিরে গ্রিগর চট্‌ করে প্রশ্ন করে—আচ্ছা বলো তো, সিক্যাশিয়ানদের ওই অফিসারটার এখানে কী কাজ?

—গিয়র্গিদ্‌জের কথা বলছ? ওই তো অভিযান বিভাগের কর্তা। ভয়ানক মাথা শয়তানটার! যতো পরিকল্পনা সবই তো ও করে। লড়াইয়ের কায়দা-কৌশলে ও আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।

—ও কি সব সময় ভিয়েশেন্‌স্কাতেই থাকে?

—না। চেরনভ্‌স্কি রেজিমেণ্টর রসদগাড়ির ভার দিয়েছি আমরা ওর হাতে।

—তাহলে প্রত্যেকটা ঘটনার সঙ্গে ও যোগ রাখে কী করে?

—সব সময়ই তো ঘোড়ায় চেপে ভিয়েশেন্‌স্কায় আসে। প্রায় রোজই।

ব্যাপারটা আরো তলিয়ে বুঝবার জন্য গ্রিগর প্রশ্ন করে—ওকে তোমরা এখানেই রাখো না কেন?

কুদীনভ কেশে মুখে হাত চাপা দেয়। তারপর অনিচ্ছাভরে আস্তে আস্তে জবাব দেয়—

—কসাকদের চোখের সামনে সেটা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। জানোই তো ওরা কী চিজ্‌। বলবে 'অফিসার আবার জিনে চেপেছে আর আমাদের ঠেলে দিচ্ছে লড়াইয়ের সারিতে।'

—আমাদের ফৌজে ওর মতো লোক আরো আছে নাকি?

কাজান্‌স্কায় আছে দু'তিনজন। কিন্তু তুমি উশ্‌খুশ্‌ করছ কেন! জানি কী ভাবছ। কিন্তু ভাই ক্যাডেটদের কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের যে কোনো গতিই নেই। তাই না? নাকি তুমি ভেবেছ দশখানা জেলা নিয়ে তুমি তোমার নিজের 'প্রজাতন্ত্র' খাড়া করবে? না, ক্রাস্‌নভের কাছে আমাদের যেতেই হবে হেঁট মাথা নিয়ে। আমাদের বলতে হবে—পিয়োত্র মিখোলায়েভিচ ক্রাস্‌নভ, দয়া করে আমাদের প্রাণে মারবেন না। লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে কাজটা আমরা একটু অন্যায় করেছি...।

অন্যায় করেছি?—গ্রিগর কথার মাঝখানে বলে।

—কেন, করিনি?—সত্যিসত্যিই অবাক হয়ে বলে কুদীনভ!

গ্রিগর মুখ লাল করে জোর করে হাসতে হাসতে বলে—আমার ধারণা...আমার মনে হয় বিদ্রোহ যখন শুরু করলাম তখন থেকেই আমরা ভুল করেছি।

কুদীনভ নীরবে সকৌতূহলে চেয়ে থাকে গ্রিগরের দিকে।

চত্বর পেরিয়ে একটা রাস্তার মোড়ে এসে দু'জন দুদিকে চলে যায়। কুদীনভ যায় তার আস্তানায়, আর গ্রিগর ফিরে আসে দপ্তরে, আরদালীকে বলে ঘোড়া আনতে। আস্তে আস্তে বল্‌গা খুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে. কিন্তু তখনো ককেসিয়ানটার ওপর ওর রাগের আসল কারণটা বুঝতে চেষ্টা করে ও। তারপর হঠাৎ যেন একটা কথা মনে হতেই পরিষ্কার হয়ে যায় ব্যাপারটা: আচ্ছা এও তো হতে পারে যে, ক্যাডেটরা ইচ্ছে করেই এইসব চালাক-চতুর অফিসারগুলোকে রেখে গেছে যাতে লালরক্ষীদের পেছন দিকে বিদ্রোহ ওস্‌কানো যায় আর ওদের খুশিমতো চালানো যায় আমাদের?—আগেকার একটা

কথা মনে পড়তে যেন আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে ওর ধারণা—কোন্ রেজিমেণ্ট থেকে এসেছে সে কথা তো লোকটা বলল না। খালি বলল স্টাফের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এভাবে তো তারা চলাফেরা করবে না। দুদরভঙ্গিকতেই বা এলো কোন্ মতলবে—এই অজ পাড়াগাঁয়ে? হ্যাঁ এবার বেশ বুঝতে পারছি কী গ্যাঁড়াকলে পড়েছি! লেখাপড়া-জানা লোকগুলো এবার কব্জা করেছে আমাদের! জমিদারদের ফাঁদে পা দিয়েছি। আমাদের পায়ে দড়ি দিয়ে ওদের নিজেদের কাজ উদ্ধার করে নিচ্ছে। সামান্য ব্যাপারেও কাউকে আর বিশ্বাস নেই...।

ডন একবার পার হয়ে এসেই ও জোর কদমে ছোটায় ঘোড়া। পেছনে আরদালি। পাকা লড়িয়ে আর বেপরোয়া কসাক সে। জিনে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে আসছে। এমনি ধরনের মানুষদেরই গ্রিগর বেছে নিয়েছিল ঝড়-ঝাপটার ভেতর দিয়ে ওকে অনুসরণ করবে বলে। জার্মান যুদ্ধে হাত-পাকানো এই সব মানুষ ওর পার্শ্বচর। আরদালিটা আগে স্কাউট ছিল। সারাটা পথ সে চুপচাপ রয়েছে, কদমচালে ছুটতে ছুটতে বাতাসের মধ্যেও সিগারেট ফুঁকেছে। একটা গ্রামের মধ্যে এসে পেঁৗছোবার পর গ্রিগরকে সে উপদেশ দিলে :

—যদি তেমন কিছু তাড়া না থাকে তাহলে পথেই রাত কাটানো যাক্ না কেন। ঘোড়াদুটো হয়রান হয়ে পড়েছে, ওদেরও বিশ্রাম হবে।

* * *

রাতটা কাটায় ওরা এক গাঁয়ে। স্তেপের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হওয়ার পর ছিটেবেড়ার এই নড়বড়ে কুঁড়েঘরটাকে মনে হয় আরামদায়ক, উষ্ণ, বেশ ঘরোয়া। মাটির মেঝেতে বাছুর আর ছাগলের পেচ্ছাবের নোন্‌তা ঝাঁঝ। উনোনে কপি-পাতার ওপর সেঁকা ভিজে পোড়ারুটির গন্ধ। কসাক বুড়িটার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে গ্রিগর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। বুড়ির তিন ছেলে আর বুড়ো বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। গলার আওয়াজটা তার গম্ভীর, পুরুষালি। কথা বলতে গিয়ে গোড়াতেই কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয় গ্রিগরকে :

—তুমি হয়তো অফিসার, কসাক গাধাগুলোর কমাণ্ডার, কিন্তু আমার ওপর জোর খাটবে না তোমার—আমি হলুম বুড়ি, তোমার মা হবার মতো বয়েস। কথা বলবে তো আমার সঙ্গে, নাকি বলবে না? বসে বসে তো খালি হাই তুলছ—মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাও না বুঝি! তোমার লড়াইয়ে আমার তিন ছেলেকে পাঠিয়েছি, বুড়োটাও গেছে পাপের প্রাচিত্তির করতে। তুমি আমার ছেলেদের ওপর হুকুম-হাকাম কর, কিন্তু ওদের জন্ম দিয়েছি আমি, বুকের দুধ দিয়ে বড়ো করেছি, কোলে পিঠে মানুষ করেছি। সে বড়ো চাট্টিখানি কথা তো নয়। অমন নাক ঘুরিয়ে থেকো না, বলো তো আমার : শিগ্‌গিরই লড়াই শান্তি হবে তো?

—শিগ্‌গিরই।...কিন্তু বুড়ি মা, তোমার এখন শুয়ে পড়া উচিত।

—শিগ্‌গিরই! কিন্তু কতো শিগ্‌গির? আমাকে তুমি ঘুমোতে পাঠাবার চেষ্টা কোরো না গো। এবাড়ির মালিক হলুম আমি, তুমি নও। আমাকে এখন বেরোতে হবে ছাগল-ভেড়াগুলোকে দেখতে। রাত হলে সব উঠোন থেকে ভেতরে নিয়ে আসি তো; এখনো ওগুলো কচি বাচ্চা। যাক্, ইস্টার পরবের আগেই লড়াই থামবে তো?

—লালগুলোকে হটিয়ে বের করে দিয়ে তবে ওদের সঙ্গে শান্তি।

—অমন কথা বোলো না বাছা!—হাতদুটো ঝুলে পড়ে বুড়ির। খাটুনিতে আর

বাতে ফুলো-ফুলো কব্জি আঙুল বেঁকে গেছে, হাভিসার হাঁটুর ওপর হাত রেখে শুকনো বাদামি ঠোঁট তিক্তভাবে চোষে।—তাহলে কি ওরা হার মানল? কেন লড়ছ ওদের সঙ্গে? মানুষজন তো এদিকে হন্যে, পুরোদস্তুর পাগল হয়ে গেছে। বন্দুকবাজি করা আর ঘোড়ায় চেপে কাত্তিক ঠাকুর সেজে ঘুরে বেড়ানো তোমাদের কাছে খেলা মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের মায়েদের কী হবে? মরতে মরছে তো আমাদের ছেলেপেলেরাই, তাই না?

গ্রিগরের আরদালি বুড়ির কথাবার্তায় মেজাজ আর ঠিক রাখতে না পেরে চটে আগুন হয়ে বলে—আমরাও কি মায়ের পেটের ছেলে নই রে কুত্তী? মেরে সাবাড় করছে আমাদের আর বলে কিনা 'ঘোড়ায় চেপে কাত্তিক সেজেছি'। চুল তো পেকে সাদা হল, তবু বাজে বক্‌বক্‌ করতে ছাড়বি না। কাউকে ঘুমোতেও দিবি না।

—ঘুমো ঘুমো, মড়কের গরু! তুই নাক গলাচ্ছিস্‌ কেন রে? এই তো কুয়োর জলের মতো ঠাণ্ডা মেরে বসেছিলি, ফের আবার বলা-নেই কওয়া-নেই একেবারে ফেটে পড়লি!—বুড়ি পাল্‌টা ধমক লাগায়।

—এ বুড়ির জিভের জন্য আমাদের ঘুম আসবে না, বুঝলে গ্রিগর পান্তালিভিচ। —হতাশ হয়ে কঁকিয়ে ওঠে আরদালি। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে চক্‌মকিটা সে এমন জোরে ঠোকে যে আগুনের ফুল্‌কি ছোটে তুবড়িবাজির মতো।—শুলোনো দাঁতের মতো তুই কট্‌কট্‌ করছিস বুড়ি। তোর বুড়ো নিশ্চয় গুলি খেয়ে মরলে খুশিই হবে। বলবে 'ভগবানের মহিমা, বুড়িটার হাত থেকে বাঁচলুম!'

গ্রিগর জোর করে ওদের ঝগড়া মিটিয়ে দিল। তারপর ঘুমোবার জন্য মেঝের ওপর শুয়ে পড়তে ওর কানে এল দরজা ভেজাবার আওয়াজ। ওর পা দুটোয় একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগল। তারপর ঠিক কানের কাছেই ও শুনতে পেল একটা ভেড়ার বাচ্চার ভ্যা-ভ্যা ডাক। মেঝের ওপর কতগুলো ছাগলের ছোট ছোট খুরের চলাফেরার শব্দ। ভেড়ার দুধ আর বাইরের তুষারের টাট্‌কা তাজা খোশবাই আসে নাকে, সেই সঙ্গে গরুর খোঁয়াড়ের গন্ধ।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ও প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রইল। উনোনে সাদাটে লাল ছাইয়ের নিচে কয়লার পোড়া-লাল আঁচ। উনোন ঘিরে গাদাগাদি হয়ে বসেছে ভেড়ার বাচ্চাগুলো। দুপুর রাতের স্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে ও শুনতে পায় ভেড়াগুলো ঘুমের ঘোরে দাঁত কিড়মিড় করছে আর মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করছে। একটা সুদূর পূর্ণিমার চাঁদ জানলা দিয়ে উঁকি দেয়। মেঝের ওপর চারকোণা হলদে জ্যোৎস্নাটুকুর মধ্যে লাফ ঝাঁপ করছে একটা ছোট্ট কালো ছট্‌ফটে ছাগল-ছানা। মুক্তোকণার মতো ধুলো ওড়াচ্ছে। গোটা ঘরটায় একটা হলদে-নীল আলোর আভা, বলতে গেলে দিনের আলোর মতোই ঝল্‌মলে। উনোনের তাকের ওপর চক্‌চক করছে একটা আয়নার টুকরো, এক কোণে একটা দেবীপটের রুপোলি ফ্রেম, অস্পষ্ট, কাল্‌চে। গ্রিগর আবার ভাবতে লাগল ভিয়েশেন্‌স্কার সেই আলোচনা সভার কথা, খপেরস্ক্‌ জেলার সেই সংবাদবাহক আর ককেসীয় লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেলটির কথা। লোকটার কথা মনে হতেই ওর আগের সেই অস্বস্তিকর চাপা উদ্বেগটা ফিরে আসে। ছাগলছানাটা ওর চামড়ার কোটের ওপর দিয়ে হেঁটে এল, ওর পেটের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল বোকার মতো। তারপর সাহস পেয়ে পা দুটো ফাঁক করল। গ্রিগরের পাশে শোয়া আরদালিটির চিতোনো হাতের তেলোয় একটা সূক্ষ্ম ধারা এসে পড়তে থাকে। লোকটা গোঁ গোঁ করে জেগে ওঠে পাৎলুনে হাত মোছে, তারপর বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ে।

ছাগলছানাটার মাথায় সে চাপড় মেরে বলে—বেটা ভিজিয়ে দিয়েছে, হতভাগা! দূরোঃ! কান-ফাটানো ভ্যা ভ্যা চিৎকার করে ছাগলছানাটা চামড়ার কোট থেকে লাফিয়ে পড়ে, তারপর গ্রিগরের কাছে গিয়ে ছোট খস্‌খসে জিবটা দিয়ে ওর হাত চাটতে থাকে।

॥ নয় ॥

তাতারস্ক থেকে পালিয়ে আসার পর স্তকমান, কশেভয়, ইভান আলেক্সিয়েভিচ ও আরো কয়েকজন কসাক মিলিশিয়া সেপাই চার নম্বর লালফৌজী জামুরস্কি রেজিমেণ্টে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু মার্চ মাসের শেষাশেষি যখন ওরা শুনল বিদ্রোহের সময়ে পালিয়ে যাওয়া কমিউনিস্ট আর সোভিয়েত কর্মীদের নিয়ে উস্ত্‌-খপেরস্কে একটা ফৌজী কোম্পানি গড়া হয়েছে তখন স্তকমান, ইভান আর মিশ্‌কা তাতেই ভর্তি হতে চলল। একটা স্লেজ ভাড়া করেছে ওরা। স্লেজ চালাচ্ছে 'সনাতনপন্থী' সমাজের এক কসাক। প্রকান্ড দাড়ির ভেতর থেকে তার কচি-কচি লালচে মোলায়েম মুখখানা এমনভাবে উঁকি দিচ্ছে যে তাই দেখে স্তকমানের অবধি ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।

সারা রাস্তা মিশ্‌কা নিজের মনে গুনগুন করে। ইভান আলেক্সিয়েভিচ হাঁটুতে রাইফেল রেখে স্লেজের পিঠে হেলান দিয়েছে। স্তকমান আলাপ জুড়ে দেয় স্লেজ-চালকের সঙ্গে।

বলে—কমরেড তোমার স্বাস্থ্যটি তো খাসা!—বুড়ো লোকটার স্বাস্থ্য আর শক্তি যেন উপচে পড়ছে। সে খুশি হয়ে হাসে :

—তা খাসাই বটে, ঈশ্বরের মহিমা! আর গন্ডগোল থাকবেই বা কেন? কখনো সিগরেট ফুঁকিনি, ভদ্‌কার বদলে খাই জল, ভালো আটার রুটির খাই। তাই অসুখ আমার করবে কেন বলো?

—ফৌজে ছিলে তুমি কখনো?

—অল্প কিছুদিন। ক্যাডেটরা ভর্তি করেছিল।

—ওদের সঙ্গে দনিয়েৎস্‌ অবধি গেলে না কেন?

—কমরেড তুমি অদ্ভুত লোকের মতো প্রশ্ন করছ। বিনুনি-করা ঘোড়ার চুলের চাবুকটা ছেড়ে দিয়ে হাতের দস্তানা খুলে মুখ মুছল লোকটা। এমনভাবে ভুরু কুঁচকে আছে যেন চটে গেছে—সেখানে আমি যাব কেন? ওরা আমাকে জোর করে না খাটালে ওদের হয়ে কখনোই খাটতাম না। তোমাদের গভর্নমেণ্টটা সাচ্চা গভর্নমেণ্ট। যদিও তোমরা একটু ভুল করছ।

—কেমন? সিগারেট পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে নেবার পরও স্তকমানকে জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে হল।

অবশেষে কসাকটা বলল—ওই আগাছা কেন পোড়াচ্ছ বলো তো? চারদিকে কেমন

বসন্তকাল এসে পড়ল, অথচ তোমার ওই দুর্গন্ধ ধোঁয়া দিয়ে সব বিষিয়ে তুলছ। তোমরা কীভাবে ভুল করছ তা বলছি। কসাকদের তোমরা নিংড়ে শুষে নিয়েছ, অত্যাচার করেছ ওদের ওপর। তোমাদের মধ্যে একপাল মুর্খ আছে, তা নইলে এত কষ্ট পোয়াতে হত না তোমাদের।

—অত্যাচার করেছি কীভাবে?

—আমি যেমন জানি তুমিও তেমনিই জানো।...লোককে গুলি করে মেরেছ। আজ একজনের পালা। কাল হয়তো আরেকজনের। আবার কার পালা আসবে তার জন্য কে সবুর করে থাকবে? গলা কাটতে গেলে বলদেও মাথা নাড়ে। ধরো ওই যে বুকানভস্কি গ্রাম দেখা যাচ্ছে ওইটের কথাই। দেখতে পাচ্ছ গির্জাটা—যেদিকে চাবুক দেখাচ্ছি? হ্যাঁ, ওইখানে এক কমিসার ছিল। লোকজনের ওপর সে সুবিচার করত কেমন সে কথাই বলছি তোমায়। বুড়োদের গ্রেপ্তার করে গাঁয়ের বাইরে কাঁটাঝোপের ভেতর নিয়ে তাদের জান বের করে দিল, আত্মীয়স্বজনরা কবর দেবার হুকুম অবধি পেল না। ওদের কসুর বলতে এই যে কোন্ সময় না কবে নাকি ওরা অবৈতনিক হাকিম হয়েছিল। কেমন হাকিম সে কথা শুনবে? একজন তো কোনোরকমে শুধু নামটা দস্তখত করত, আরেকজন দোয়াতের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে ঢ্যাড়া কাটত। দোষের মধ্যে খালি লম্বা দাড়ি রাখত ওরা আর বুড়ো বলে পাৎলুনের বোতাম আঁটতে ভুলে যেত। একেবারে কচি শিশুর মতো সব। আর এই কমিসারটি এমনভাবে সব লোকের জানপ্রাণের খবরদারি করতেন যেন উনিই সাক্ষাৎ ভগবান। একদিন এক বুড়ো একটা লাগাম হাতে নিয়ে চৌরাস্তা ডিঙিয়ে যাচ্ছে তার ঘুড়ীটাকে ধরবার জন্য, এমন সময় একপাল ছোকরা তামাশা করে ডাকতে লাগল—এই যে! কমিসার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে! বুড়ো তো তার 'কাফেরী' ক্রুশ প্রণাম করতে করতে (ওখানে সবাই 'নব্যপন্থী' সমাজের লোক কিনা) টুপি খুলে ঢুকল বাড়ির মধ্যে। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বলল: হুজুর, আমায় ডেকেছেন? কমিসার বললে: না, কেউ তোমায় ডাকেনি, তবে এসেই পড়েছ যখন তখন বাকি সকলের যা হয়েছে তোমারও তাই হবে। কমরেডরা, একে বাইরে নিয়ে যাও তো! ওরা তো যেমন নেবার ওকে নিয়ে দেয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে দিলে। এদিকে বুড়োর বুড়ি বসে বসে অপেক্ষাই করে, বুড়ো আর ফিরল না। চলে গেছে সে। এই কমিসারটাই আরেক গাঁয়ের এক বুড়োকে একবার রাস্তায় দেখে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল: তুমি কোত্থেকে এলে হে? নাম কি? তারপর ঘোঁত ঘোঁত করে বললে: তোমার দাড়িটা ঠিক শেয়ালের ন্যাজের মতো। বদনখানা তো হুবহু মরা নিকোলাই জার। তোমাকে আমরা পিষে ছাতু করে দেব। নিয়ে যাও তো হে!—হুকুম দিলে সেপাইদের। লম্বা দাড়ি রেখেছিল আর অতি কুক্ষণে কমিসারের নজরে পড়েছিল কিনা তাই গুলি খেয়ে মরল লোকটা। এসব কাজ মানুষের পক্ষে লজ্জার কি না বলো?

লোকটা গল্প শুরু করার সময়ই মিশ্‌কার গুন্‌গুন্ গান থেমে গিয়েছিল। গল্প শেষ হতে সে রাগ করে বললে:

—তুমি যে মিথ্যে কথাগুলো বললে সে তো ভালো নয় বাপ্!

—আরো ভালো কি আছে তুমিই বলো! 'মিথ্যে' বলার আগে সত্যিটাকে যাচাই করে নিও। তারপর কথা বলতে এসো!

—এসব ব্যাপার নির্ঘাত ঘটেছে বলে তুমি জানো?

—লোকেই এসব কথা বলাবলি করেছে।

—লোকে...! লোকে তো মুরগির দুধ দোয়াবার কথাও বলে, মুরগির কি আর দুধ হয়? তুমি যা শুনেছ সব মিছে কথা, আর তোমার জিভটাও নড়ে ঠিক মেয়েমানুষের মতো।

—বুড়োরা তো শান্তিপ্রিয় মানুষ...

—শান্তিপ্রিয়!—বিদ্রূপ করে মিশ্‌কা—তোমার ওই শান্তিপ্রিয় বুড়োরাই বোধহয় গোলমালে ওস্‌কানি দিয়েছে, তোমার সেই হাকিমদের বাড়ির উঠোনে মেশিনগান পোঁতা থাকলেও বিচিত্র নয়, আর তুমি বলছ কিনা দাড়ির জন্য আর তামাশা করার জন্য ওদের গুলি করে মারা হয়েছে। তোমাকে মারল না কেন? তোমারও তো বুড়ো ছাগলের মতো লম্বা দাড়ি।

—আমি যে দামে জিনিস কিনি সেই দামেই বেচি। কে জানে! লোকে হয়তো বা মিছে কথাই বলে; হয়তো ওরা নতুন গভর্নমেন্টের কিছু ক্ষতি করেই থাকবে।—উদাসীন-ভাবে বিড়বিড় করে বুড়ো। শ্লেজ থেকে লাফ দিয়ে নেমে রাস্তার ধারের গলা-বরফের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে। স্তেপের ওপর সূর্যের অকৃপণ কিরণধারা। উজ্জ্বল মেঘমুক্ত আকাশের বিশাল আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে পাহাড় আর উপত্যকার দুরান্ত মেশামিশি। ঝিরঝিরে বাতাসে আসন্ন মধুঋতুর ঈষৎ সৌগন্ধ্যময় আমেজ। পূর্বদিকে ডন পাড়ের আঁকাবাঁকা সাদা পাহাড়ের ওপাশে একটা লালচে-নীল কুয়াশা ঠেলে উঠেছে উস্ত্‌-খপেরস্কের পাহাড়চুড়ো। দিগন্তরেখা ঘেঁষে প্রকাণ্ড ফুলে-ওঠা চাঁদোয়ার মতো মাটি ছেয়ে আছে সাদা আঁশ-আঁশ মেঘ।

বুড়ো আবার বলতে শুরু করে—আমার ঠাকুরদা এখনো বেঁচে আছেন, একশো-আট বছর নাকি বয়েস। তাঁর ঠাকুরদাদা নাকি বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনকালে, মানে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে, জার পিটার একজন প্রিন্সকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের উজানী ডনে (তাঁর নাম ছিল দলিম্নরুকভ না দলগরুকভ্, না কী যেন)। প্রিন্স্‌টি এলেন ভরোনেঝ্ থেকে সেপাইশান্ত্রী নিয়ে। কসাকরা পাদ্রী নিখনের ধর্মের কথা মানেনি আর জারের সেবা করতে চায়নি বলে তিনি কসাকদের বসতবাড়ি ধুলোয় লুটিয়ে দিলেন। কসাকদের ধরে ধরে নাক কাটা হল, কাউকে কাউকে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে ডন নদীতে নৌকোয় ভাসিয়ে দেওয়া হল।

মিশ্‌কা কড়া গলায় বললে—এসব কথা আমাদের বলছ কেন?

—মানে, যদি উনি প্রিন্স দলিম্নরুকভও হন তবু তো জার তাকে এসব করার অধিকার নিশ্চয়ই দেননি। বুকানভ্‌স্কির কমিসারটিও ঠিক সেই রকম। বুকানভ্‌স্কির পঞ্চায়েতে সে গলা ফাটিয়ে বললে: এমন শিক্ষা তোমায় দেব যে জন্মে তা ভুলবে না। কিন্তু সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট কি তাকে এমন ক্ষমতা দিয়েছিল? সেইটেই হচ্ছে কথা। এসব কথার হুকুমই তো তার ছিল না।

স্তকমানের রগের চামড়া কুঁচকে ওঠে। বলে—তোমার কথা তো শুনলাম। এবার শোনো আমার কথা।

লোকটা বিড়বিড়িয়ে ওঠে—হয়তো না বুঝে কোনো কথা বলে থাকব যা সত্যি নয়। তা যদি হয় তাহলে আমাকে মাপ কোরো তোমরা।

—সবুর, সবুর! কমিসারের কথা তুমি যা বললে তা নিশ্চয়ই সত্যি বলে মনে হয় না। তবু আমি খোঁজ করে দেখব। আর যদি সত্যি হয়, যদি কসাকদের ওপর সে এমনি ব্যবহার করেই থাকে, তাহলে আর দ্বিতীয়বার কৈফিয়তও চাইব না তার কাছে।

কিন্তু লড়াই যখন তোমাদের গ্রামে এসে ঠেকল তখন লাল সেপাইরা তাদের রেজিমেণ্টের একজন কমরেডকে গুলি করে মেরেছিল এক কসাক স্ত্রীলোকের জিনিস চুরি করেছিল বলে—এ কথা কি সত্যি? তোমাদের গাঁয়েই শুনেছি এ খবর।

—তা সত্যি। একজন মেয়েমানুষের বাক্স চুরি করেছিল সে। ঠিক কথা, এটা অবিশ্যি ঘটেছিল। লোকটাকে গুলি করে মারা হয়েছিল সেটাও সত্যি। কোথায় তার কবর হবে সেই নিয়ে আমাদের ভেতর তর্কাতর্কিও হয়েছিল। কেউ বলল গোরস্থানে হোক, কেউ বলল না, ওতে জায়গা অপবিত্র হবে। শেষ অবধি ফসল ঝাড়াইয়ের যে উঠোনটায় ওকে গুলি করে মারা হয়েছিল সেখানেই কবর দেওয়া হল।

—তাহলে এমনি ব্যাপারও ঘটেছে?—স্তকমান চটপট্ একটা সিগারেট পাকিয়ে ফেলে।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয়—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা অস্বীকার করছি না।

—তাহলে বলো সেই কমিসারের কথা তুমি যা বললে তাতে তাঁকে শাস্তি দেওয়া উচিত কিনা?

—কিন্তু কমরেড! ওর হয়তো ওপরওয়ালা কেউ নেই। সে লোকটা তো ছিল সামান্য সেপাই। কিন্তু এ একজন কমিসার...।

—সেজন্যই তো আরো কড়া তদন্ত হবে! বুঝেছ? সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট দুশমনদের টিট্ করে বটে, কিন্তু আমাদেরই কোনো সরকারী প্রতিনিধি খেটে-খাওয়া মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার করলে তাকে নির্মম শাস্তি দেওয়া হয়।

মার্চ মাসের দুপুরে নিঃঝুম স্তেপের প্রান্তর, মাঝে মাঝে শুধু স্লেজের দাঁড়ের সরসরানি আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। হঠাৎ কামানের গর্জনে খান্‌খান্ হয়ে যায় এ নীরবতা। ক্রুতভ্‌স্কি গ্রামের কামানগুলো ডনের বাঁ দিকে আবার নতুন করে গোলা ছুঁড়তে শুরু করেছে।

স্লেজের ওপর কথাবার্তা থেমে যায়। হেৎমানের সদর রাস্তার মোড় ঘোরে ওরা। চোখে পড়ে ডনের ওপারে হলদে বালির মধ্যে গলন্ত বরফের চিল্‌তে-ধরা চওড়া চওড়া জমি, বেতস আর পাইনবনের টোপর ছাওয়া নীলচে-ধূসর বিস্তার। উস্ত্-খপেরস্কে এসে বিপ্লবী কমিটির দপ্তরের সামনে ঘোড়া রুখল স্লেজ-চালক। স্তকমান পকেট হাতড়ে একটা চল্লিশ রুবলের কেরেন্‌স্কি নোট বের করে চালকের হাতে দিল। ভিজে দাড়ির ফাঁকে হল্‌দে দু'পাটি দাঁত বের করে হেসে ফেলল লোকটা। অপ্রস্তুত হয়ে উশ্‌খুশ্ করতে লাগল :

—এ আবার কেন কমরেড, খ্রীস্টের দোহাই! এত দাম দেবার মতো কিছু তো করিনি!

—তোমার ঘোড়ার মেহনতের জন্যই নাও না হয়। আর গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে কোনো রকম সন্দেহ রেখো না। মনে রেখো, আমরা মজুর আর চাষীদের সরকারের পক্ষে। তোমাদের দুশমন জোতদার, আতামান সর্দার আর অফিসাররাই তোমাদের বিদ্রোহে ঠেলে দিয়েছে। বিদ্রোহের মূলে আছে ওরাই। আমাদের দরদী কোনো মেহনতী কসাক আমাদেরই বিপ্লবের সাহায্য করছে অথচ যদি আমাদের কোনো লোক অন্যায়ভাবে তার ক্ষতি করে থাকে তাহলে তাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা আমরা করব।

—জানোই তো কমরেড 'ভগবান থাকেন সেই আশমানের ওপর, জারের নাগাল পাওয়াও তেমনি ভার।' তোমাদের জারও থাকেন অনেক দূরে। 'বলবানের সঙ্গে লড়তে

নেই আর ধনীর সঙ্গে লাগতে নেই।' তোমরা হলে বলবান আর ধনী। চল্লিশটা রুবল্ জলে ফেলে দিচ্ছ : পাঁচটা হলেই খাঁটি দাম হত। যাক্ তবু ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিশ্কা কশেভয় হেসে পাজামার হাঁটু চাপড়ে বললে—তোমার বক্বকানির জন্য ওটা তোমাকে বখশিস দেওয়া হল। হ্যাঁ, আর তোমার ওই চমৎকার দাড়িটার জন্য। কাকে শ্লেজে চড়িয়ে নিয়ে এলে জানো, মাথামোটা বুড়ো? লালফৌজের একজন জেনারেলকে!

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ 'অ্যাঁ-অ্যাঁ'ই করো! তোমরা সবাই এক গোয়ালের গরু, হতভাগা! যদি কম দেওয়া হল তো সারা তল্লাটে কাঁদুনি গেয়ে বেড়ালে : 'কমরেডদের গাড়িতে চড়ালাম আর ওরা দিলে মাত্তর পাঁচ রুবল!' সে ব্যথা তোমাদের বারোমাসেও ঘুচবে না। এদিকে যখন আমরা বেশি দিচ্ছি তখন গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে : 'কতো পয়সাকড়ি এদের! চল্লিশটা রুবল জলে ফেলে দিল! এতটাকা যে গুনে শেষ করতে পারে না!' আচ্ছা, লম্বা-দাড়ি, আসি তাহলে!

মস্কো রেজিমেণ্টের সেনানায়করা যেখানে আস্তানা করেছে সে বাড়ির উঠোন থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে এল একজন লালরক্ষী। ঘোড়ার রাশ টেনে সে চেঁচিয়ে উঠল: শ্লেজ কোত্থেকে এল?

—কেন জানতে চাইছ সে কথা? প্রশ্ন করল স্তকমান।

—আমরা ক্রুতভ্স্কিতে গোলাবারুদ পাঠাতে চাই।

—কিন্তু এ শ্লেজ তো তুমি পাবে না কমরেড!

—তোমরা কে? সুন্দর চেহারার ছোকরামতো লালরক্ষীটি এগিয়ে এল স্তকমানের দিকে।

—আমরা জামুরস্কি রেজিমেণ্টের লোক। এ শ্লেজ তোমরা দখল কোরো না।

—ঠিক আছে, যেতে পারে ও। চলে যাও হে বুড়ো!

* *

খোঁজ নিয়ে স্তকমান জানতে পারল একটা বলশেভিক ফৌজী কোম্পানি গড়া হয়েছে, কিন্তু সে উস্ত্-খপেরস্কে নয়, বুকানভ্স্কিতে। 'সনাতনী'-সমাজের সেই শ্লেজওয়ালা রাস্তায় যে কমিসারের কথা বলেছিল সেই কমিসারই রংরুটের ব্যবস্থা করেছে। ইয়েলান্স্ক্, বুকানভ্স্কি ও অন্যান্য জেলা থেকে কমিউনিস্ট ও সোভিয়েত কর্মী আর সেই সঙ্গে লালফৌজের সেপাইরা মিলে বেশ চমৎকার একটা লড়িয়ে ইউনিট গড়েছে দুশো বেয়নেট, কয়েক ডজন তলোয়ার আর ঘোড়সওয়ার টহলদার নিয়ে। সাময়িকভাবে বুকানভ্স্কিতেই ছিল কোম্পানিটা। মস্কো রেজিমেণ্টের একটা দলের সঙ্গে মিলে ওরা বিদ্রোহীদের বাধা দিচ্ছিল—ইয়েলান্স্ক্ আর জিমভ্না নদীর উজানী এলাকা থেকে বিদ্রোহীরা চেষ্টা করছিল এগিয়ে আসতে।

মস্কো রেজিমেণ্টের প্রধান সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে স্তকমান ঠিক করল উস্ত্-খপেরস্কেই থেকে যাবে, রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যোগ দেবে সে। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করল রাজনৈতিক কমিসারের সঙ্গে।

হল্দে-মুখ কমিসার ধীরে-সুস্থে বললে—বুঝতে পারছেন কমরেড, অবস্থাটা এখানে বেশ ঘোরালো। আমার দলের সেপাইরা বেশির ভাগই মস্কো আর রিয়াজানের

লোক, কয়েকজন আছে নিজ্‌নি-নভ্‌গরদের। শক্ত-সমর্থ মানুষ সব, বেশির ভাগ মজুর। আপনি আমাদের সঙ্গে থেকে যান, কাজ করার সুযোগ অনেক পাবেন। দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে আমাদের কাজ করতেই হবে, তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে। জানেনই তো কসাকরা কী জাতের মানুষ। কান সজাগ রাখতে হয় সব সময়।

লোকটার পিঠ-চাপড়ানি ঢঙের কথাবার্তায় হাসে স্তকমান, জবাব দেয়—ও সব আমাকে বলার দরকার নেই! আপনি শুধু বলুন বুকানভ্‌স্কির এই কমিসারটি কে?

পাক-ধরা খাটো গোঁফের ওপর আঙুল বুলিয়ে লোকটা অলসভাবে জবাব দেয় নীল স্বচ্ছ চোখের পাতাদুটো তুলে :

—লোকটা ভালো মানুষ, তবে রাজনৈতিক অবস্থাটা ভালো করে বোঝে না। এখন সে জেলার সমস্ত পুরুষদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ার মাঝামাঝি কোনো জায়গায়।

* * *

পরদিন সকালে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নকে হাতিয়ার ধরতে হুকুম দেওয়া হল। এক-ঘণ্টার মধ্যে সবাই সার বেঁধে মার্চ করে চলল ক্রুতভ্‌স্কি গাঁয়ের দিকে। ক্রুতভ্‌স্কি থেকে ডনের ওপর দিয়ে একটা ঘোড়সওয়ার টহলদার দলকে পাঠানো হয়েছিল, তাদেরই পেছন পেছন চলল ফৌজ। নদীর বরফের ওপর নীল নীল নরম গর্তের ছিটে। পেছনে পাহাড়ের ওপরকার কামানগুলো গোলা ছুঁড়ছে ইয়েলান্‌স্ক্‌ গাঁয়ের ওপাশে যে পপ্‌লার গাছের গুঁড়িগুলো দেখা যাচ্ছে সেই দিকে। ব্যাটালিয়নের ওপর হুকুম যাচ্ছে ইয়েলান্‌স্ক গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কসাকরা গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। জেলার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বুকান্‌ভস্কির দিক থেকে আসা এক নম্বর ব্যাটালিয়নের সঙ্গে মিলতে হবে ওদের। সৈন্যদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে গোলা, সামনে একটু দূরেই বিস্ফোরণে মাটি কেঁপে উঠছে। ওদের পেছনে ডনের বরফ চিড় ধরে ভেঙে-ভেঙে যায়। স্তকমান আর মিশ্‌কার পাশাপাশি চলতে চলতে পেছন ফিরে তাকায় ইভান আলেকসিয়েভিচ্‌।

বলে—জলটা যেন নেমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

—এ সময় ডন পেরুতে যাওয়া বোকামির কাজ। ওই দ্যাখো বরফ ভাঙতে শুরু করেছে।—চষা জমির ওপর দিয়ে মার্চ করে যেতে-যেতে হোঁচট খেয়ে মিশ্‌কা ঘোঁত ঘোঁত করে ওঠে।

স্তকমান তাকিয়ে থাকে সামনে কদম মিলিয়ে এগিয়ে-চলা সেপাইদের পিঠের দিকে, ধোঁয়াটে-নীল সঙ্গীন বসানো রাইফেলের নলগুলো তালে তালে দুলছে। চারপাশে তাকিয়ে দ্যাখে সৈনিকদের শান্ত গম্ভীর মুখ, পাঁচ-কোণা তারাওয়ালা ধূসর টুপির দুলুনি। পুরনো হবার সঙ্গে সঙ্গে ধূসর জোব্বাকোটগুলোও হলদে হতে শুরু করছে। অনেকগুলো পায়ের ভারী শব্দ আসে কানে। ভিজে বুটজুতো, তামাক আর চামড়ার ফিতের গন্ধ। চোখ-দুটো আধবোজা করে স্তকমান মনে মনে এই লোকগুলোর প্রতি একটা বিপুল প্রীতির আবেগ অনুভব করে, অথচ গতকালও এদের কাউকে সে চিনত না। ও অবাক হয়ে যায় : 'ভাবতেও কতো আনন্দ, কিন্তু হঠাৎ ওরা কেমন করে এত আপন জন হয়ে উঠল আমার? অবিশ্যি আমাদের সকলেই এক উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছি : কিন্তু তার চেয়েও বেশি কিছু আছে নিশ্চয়। একই কর্তব্য আমাদের, তাছাড়া বিপদ আর মরণও এত কাছাকাছি।' —চোখে হাসি জাগে ওর—'মরণ এত কাছাকাছি বলে এত মিল নয় নিশ্চয়ই?'

সামনে যে লোকটা চলেছে তার পিঠের দিকে পিতৃসুলভ স্নেহের দৃষ্টিতে তাকায়

ও। কলার আর টুপির মাঝখানে পরিষ্কার লাল ঘাড়ের অংশটা দ্যাখে, তারপর চোখ ঘুরিয়ে নেয় পাশের লোকটির দিকে। পরিষ্কার করে কামানো দাড়ি, কাল্‌চে রক্ত-লাল গাল। ঠোঁট দুটো চমৎকার, চাপা। লোকটা ঢ্যাঙা কিন্তু দেহের গড়ন ভালো. হাত প্রায় না দুলিয়েই মার্চ করে যাচ্ছে। কপালের ভ্রূকুটি রেখায় ব্যথার ছাপ ফুটে উঠেছে। স্তকমান তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়।

—ফৌজে কি অনেকদিন আছেন কমরেড?

স্তকমানের মুখের ওপর লোকটার হাল্‌কা-বাদামি চোখের শীতল জিজ্ঞাসু দৃষ্টি এসে পড়ে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে,—পনের সাল থেকে।

এত সংক্ষিপ্ত জবাবেও স্তকমান দমে না। ও ফের জিজ্ঞেস করে—আপনার দেশ কোথায়?

—মস্কো।

—কারখানায় কাজ করেন?

—হ্যাঁ!

লোকটার হাতের দিকে তাকায় স্তকমান। লোহা-কারিগরের চিহ্ন রয়ে গেছে হাতে, দেখতে পায় ও।

—লোহা-তামার কারিগর?

স্তকমানের মুখের ওপর আবার বাদামি চোখের দৃষ্টি এসে পড়ে।—আমি লোহা কোঁদাই করি। আপনিও করতেন নাকি?—উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কঠিন চোখজোড়া।

—আমি ছিলাম তালা-মিস্ত্রি। কিন্তু চোখদুটো অমন পাকিয়ে রেখেছেন কেন বলুন তো?

—জুতোয় পায়ে ফোস্কা পড়েছে। ভিজে কটকটে হয়ে উঠেছে।

স্তকমানের মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে ওঠে।

—ভয় পাননি বলে না তো?

—কিসের ভয়?

—এই, লড়াইয়ে চলেছি বলে...

—আমি কমিউনিস্ট।

—কমিউনিস্টরা কি মরার ভয় করে না?—এবার মিশ্‌কা যোগ দেয় কথাবার্তায়।

এক মুহূর্ত কী ভেবে লোকটা জবাব দেয়ঃ

—এসব ব্যাপারে আপনি ভাই বেশ কাঁচা তা বোঝা যাচ্ছে। ভয় তো আমার পাওয়াই উচিত নয়। আমি তো নিজেই নিজেকে হুকুম দিয়েছি। বুঝতে পেরেছেন? আমি জানি কাদের সঙ্গে লড়ছি, কেন লড়ছি, আর এও জানি যে আমরা জিতব। সেটাই তো আসল কথা।—কী একটা কথা মনে হতে লোকটা হাসে, তারপর স্তকমানের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে: —গেল বছর আমি উক্রেইনের এক ফৌজী দলে ছিলাম। একটানা চাপ আসছিল আমাদের ওপর। আহতদেরও পেছনে ফেলে চলে যেতে হল। হুকুম পেলাম আমাদের একজনকে রাতে শ্বেতরক্ষীদের লাইন ভেঙে পেছনে গিয়ে একটা নদীর পুল উড়িয়ে দিতে হবে যাতে একটা সাঁজোয়া ট্রেনের আসা বন্ধ করা যায়। স্বেচ্ছাসৈনিক ডাকা হল। কিন্তু এলো না কেউ। আমাদের ভেতর যারা কমিউনিস্ট ছিল—সংখ্যায় অবশ্য অল্পই—তারা বললে কড়ির দান ফেলে ঠিক করা যাক কে যাবে। কিন্তু আমি খানিক চিন্তা করে নিজেই এগিয়ে গেলাম। একটা 'স্লো ফিউজ' আর দেশলাই সঙ্গে নিয়ে

কমরেডদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাত অন্ধকার, কুয়াশাভরা। দু'শো গজ যাবার পর আ-কাটা রাইয়ের খেতের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চললাম, তারপর এগোলাম একটা খানার ধার দিয়ে। খানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় মনে আছে নাকের ঠিক তলা দিয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল একটা পাখি। শ্বেতরক্ষীদের প্রায় কুড়িগজ দূরে দিয়ে গুঁড়ি মেরে পুলটার কাছে এলাম। পুল পাহারা দিচ্ছিল মেশিনগানধারী একটা ফৌজীদল। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক শুয়ে রইলাম সেখানে, অপেক্ষা করতে লাগলাম সঠিক মুহূর্তটার জন্য। তারপর লাইন পেতে দিয়ে দেশলাইয়ে কাঠি ঘষতে শুরু করলাম। কিন্তু দেশলাই শিশির লেগে ভিজে গিয়েছিল। জ্বলতেই চায় না, হামাগুড়ি দেবার সময় আমার বুক-পকেটের মধ্যে ছিল তো। তার ওপর শুরু হল উজানী হাওয়া। একটু বাদেই ভোর হয়ে যাবে। হাত কাঁপতে লাগল, চোখে ঘাম জমতে লাগল আমার। ভাবলুম সব গেল! বোমা ফাটানো তো নয়, এ একেবারে বন্দুকবাজি হচ্ছে। চেষ্টা করতে করতে শেষ অবধি একটা কাঠি জ্বলল। ফিউজ আগুন লাগিয়ে দিলাম। রেলের বাঁধের ধারে পাঁজা-করা স্লিপারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে রইলাম। যখন বিস্ফোরণ হল সে এক মজার ব্যাপার—দুটো মেশিনগান গর্জাচ্ছে আর আমার সামনে দিয়েই ছুটেছে ঘোড়সওয়াররা। কিন্তু ওই রাতে আমাকে খুঁজে বের করা তো সোজা কথা নয়। স্লিপারগুলোর ভেতর থেকে ঢুকলাম খেতের মধ্যে। ঠিক সেই সময়টাতেই বুঝলেন আমার সমস্ত শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে মনে হল, আর যেন চলতে চায় না হাত পা। শুয়ে পড়লাম। পুলের দিকে গিয়েছিলাম খুব বুক ফুলিয়ে, সহজেই, কিন্তু ফিরতে গিয়ে অন্য ব্যাপার! অবস্থা আমার তখন ছেঁড়া নেকড়ার মতো। শেষ অবধি অবিশ্যি ফিরেছিলাম ঠিক। পরদিন সকালে বন্ধুদের বললাম দেশলাই কাঠি নিয়ে দুর্ভোগের কথা। একজন বললে—কিন্তু তোমার সিগারেট লাইটারটা? সেটা কি হারিয়ে ফেলেছিলে? পকেটে হাত দিয়ে দেখি বরাবর সেখানেই রয়ে গেছে সেটা। হাতড়ে বের করলাম, বেশ জ্বললও!

ইভান আলেক্সিয়েভিচ চুপচাপ হাঁটছিল সারির বাইরের দিকটায়। এমন সময় মেশিনগান নিয়ে দুটো শ্লেজ গাড়ি চলে গেল ওর ওপর বরফ ছিটিয়ে। দ্বিতীয় শ্লেজ থেকে গড়িয়ে পড়ল একজন মেশিনগান-চালক। ড্রাইভার গালাগালি করতে করতে সজোরে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল যাতে সে আবার লাফিয়ে উঠতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে হো- হো করে হেসে উঠল লালফৌজের সেপাইরা।

॥ দশ ॥

কারগিনকে প্রতিরোধের কেন্দ্র করে বিদ্রোহী বাহিনীর এক-নম্বর ডিভিশন লাল-ফৌজের মোকাবিলা করছে। কারগিনের চারধারে ঘাঁটি করে থাকার সামরিক গুরুত্ব গ্রিগর মেলেখভ ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল। কোনো অবস্থাতেই ঘাঁটি ছেড়ে দেবে না স্থির করেছে ও। চিরা নদীর বাঁ পাড় দিয়ে পাহাড় চলে গেছে, পাহাড়ের মাথা থেকে সব দিকে নজর রাখা চলে। কসাকরা সেখানে বসে ভালোভাবেই ব্যূহ রক্ষা করতে পারবে। নিচে,

চিরা নদীর ওপারে কারগিন, তারপরেই দক্ষিণে মাইলের পর মাইল জুড়ে স্তেপ, মাঝে মাঝে শুধু এখানে ওখানে খাদ আর নিচু জমি। গ্রিগর নিজেই তিনটে কামান বসাবার জায়গা বেছে নিয়েছে, ওক গাছে ঢাকা একটা টিলার কাছাকাছি। সেটাই এ এলাকার সবচেয়ে উঁচু জায়গা, চারদিকে লক্ষ্য রাখার পক্ষে এমন চমৎকার জায়গা আর হয় না।

রোজই কারগিনের আশেপাশে যুদ্ধ লেগে আছে। লালফৌজ সাধারণত দু'দিক থেকে হামলা চালায় ঃ দক্ষিণের স্তেপভূমি আর পুবে চিরা নদীর পাড় ধরে। ছোট শহরের ওপাশে প্রায় দুশো গজ জায়গা নিয়ে কসাকদের যুদ্ধ-রেখা। লালফৌজের গুলিগোলার দরুন প্রায়ই ওদের পেছু হটে আসতে হচ্ছে শহরের ভেতর দিয়ে সরু সরু খাতের খাড়া পাড় ধরে পাহাড়ের মধ্যে। কিন্তু ওদের আরো পেছনে ঠেলে দেবে এতটা শক্তি লালফৌজের নেই। লালফৌজের এগিয়ে আসার পক্ষে প্রধান অসুবিধা ঘোড়সওয়ারের অভাব। ঘোড়সওয়ার থাকলে পাশ থেকে হামলা চালিয়ে কসাকদের আরো পেছনে তাড়িয়ে দিতে পারত, শহরের বাইরে পদাতিক সৈন্যরা কি করবে ঠিক না করতে পেরে কেবল সময় নষ্ট করছে, অথচ আরো অন্য কাজের জন্য তারা ছাড়া পেতে পারত। এ সব কুচকাওয়াজে পদাতিকদের লাগানো যায় না, কারণ যে-কোনো মুহূর্তে কসাক ঘোড়সওয়াররা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে।

বিদ্রোহীদের আরেকটা সুবিধা হল তারা সমস্ত এলাকার খুঁটিনাটি খবর রাখে। পাশ থেকে ও পেছন থেকে শত্রুদের আঘাত করার জন্য পাহাড়ী খাত ধরে গোপনে ঘোড়সওয়ার পাঠাবার সুযোগ তারা হাতছাড়া করেনি, লালফৌজকে ক্রমাগত তটস্থ করে রেখেছে, আরো বেশি এগোবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে তারা।

শত্রুকে বিধ্বস্ত করার এক পরিকল্পনা খাড়া করল গ্রিগর। কসাকরা পেছু হটে যাবার ছল করবে। এইভাবে লালফৌজকে টেনে আনবে কারগিনে। এদিকে পেছন থেকে ওদের ওপর আক্রমণ করবার জন্য উপত্যকার ভেতর দিয়ে পাশ কাটিয়ে আসবে একটা ঘোড়সওয়ারী রেজিমেণ্ট। একেবারে শেষ খুঁটিনাটিটুকু পর্যন্ত তৈরি থাকল পরিকল্পনার। আগের দিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন ফৌজীদলের কমাণ্ডারদের এক বৈঠকে প্রত্যেককে হুবহু কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হল। সবকিছু এখন জলের মতো সোজা। প্রত্যেকটা সম্ভাবনা খতিয়ে বিচার করে, আচমকা কিছু ঘটে গিয়ে পরিকল্পনার ক্ষতি করতে পারে কিনা সে-হিসাব করে গ্রিগর দু'গ্লাশ ঘর-চোলাই ভদ্‌কা খেল। তারপর জামাকাপড় না ছেড়ে সটান ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। জোব্বাকোটে মাথা ঢেকে মড়ার মতো ঘুমোলো সে।

পরদিন সকালে কারগিন দখল করল লালফৌজ। ওদের আরো দূরে টেনে নেবার জন্য কসাক পদাতিকের একটা অংশ রাস্তাঘাটের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল পাহাড়ের দিকে। ছোট শহরটার ভেতর লালফৌজ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল।

একটা কামানের পাশে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে গ্রিগর লাল পদাতিক বাহিনীর কারগিন দখল করা দেখছিল। ওরা তখন চিরা নদীর পাড়ে এসে জমা হচ্ছে। ঠিক করা হয়েছিল কামানের প্রথম তোপ দাগার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের নিচে ফলবাগানে ওৎ-পেতে থাকা দু'কোম্পানি কসাক হামলা করতে যাবে সেই ফাঁকে পেছন থেকে আক্রমণ করবে পাশ-কাটিয়ে আসা সেই রেজিমেণ্ট। গোলন্দাজ কমাণ্ডারের ইচ্ছা ছিল কামানের প্রথম গোলাটা গিয়ে পড়ুক কারগিনের দিকে সবেগে ছুটে-আসা একটা মেশিনগান-শ্লেজের ওপর, কিন্তু ঠিক তখুনি পর্যবেক্ষক খবর দিল পুব দিক থেকে লালরক্ষীদের একটা বাহিনী মাইল তিনেক দূরে একটা পুল পার হচ্ছে।

চোখ থেকে ফিল্‌ড্‌গ্লাস না সরিয়েই গ্রিগর হুকুম দিলে ঃ মর্টার-কামান চালাও ওদের ওপর।

গোলন্দাজ চটপট্‌ কামানের নিশানা ঠিক করে নিল। একটা ভারি গর্জন উঠল মর্টারের, কামানটা পেছনে হটে আসতেই মাটি খোঁড়ার দাগ পড়ে গেল। লাল গোলন্দাজদের দ্বিতীয় কামানটা সবে পুলের দিকে এগোচ্ছে এমন সময় প্রথম গোলাটা এসে পড়ল পুলের এক প্রান্তে। এক গোলার ঘায়েই উড়ে গেল ঘোড়াগুলো। পরে ওরা জেনেছিল ছ'জনের দলের ভেতর মাত্র একজন নাকি রক্ষা পায়। গ্রিগর ফিল্‌ড্‌গ্লাস দিয়ে দেখল কামানটার সামনে একটা হলদে-ধূসর ধোঁয়ার স্তম্ভ; ঘোড়াগুলো ধোঁয়ার মধ্যে পেছু হটে আসছে, লোকগুলো পড়ে যাচ্ছে আর ছুটে পালাচ্ছে। দু'চাকার গাড়ির কাছে একজন ঘোড়সওয়ার সেপাই ঘোড়াসমেত উঁচু পুল থেকে ছিট্‌কে পড়ে গেল বরফের ওপর।

প্রথম গোলাতেই এতটা সফল হওয়া যাবে গোলন্দাজরা তা আশা করেনি। এক মুহূর্তের জন্য কসাক কামানের আশেপাশে সবাই নিশ্চুপ। পর্যবেক্ষক লোকটি শুধু একটু দূরে ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কি বলল আর হাত নাড়ল।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিচের ঘন চেরী-বাগিচা আর বাগানের ঝোপঝাড় থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ এল "হুর্‌রা" বলে। রাইফেল ছোঁড়ার ফট্‌ফট্‌ শব্দ। সাবধানতার ধার না ধেরে গ্রিগর ছুটে ঢিবির ওপর উঠতে থাকে। শহরের রাস্তা দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে লাল সেপাইরা। একটা এলোমেলো কোলাহল, সচিৎকার হুকুম আর ফটাফট্‌ গুলির আওয়াজ কানে আসে।

দিগন্তের দিকে কসাক ঘোড়সওয়ারদের চিহ্ন খুঁজে পাবার বৃথাই চেষ্টা করে গ্রিগর। ওদের এখনো কোনো পাত্তা নেই। বাঁ-পাশের লাল সেপাইরা ছুটে যাচ্ছে কারগিন আর তারই লাগোয়া আরখিপভ্‌ গাঁয়ের মাঝামাঝি যে পুলটা রয়েছে সেইদিকে। এদিকে তাদের ডান বাহু এখনো কারগিনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে। চিরা নদীর কাছের রাস্তা দুটো দখল করে ছিল যে-কসাকরা তাদের গুলিগোলার সামনে তিষ্ঠোতে পারছে না ওরা।

অবশেষে ঘোড়সওয়ার ফৌজের এক নম্বর স্কোয়াড্রনকে পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে ঘুরে আসতে দেখা গেল। তারপর দু'নম্বর, তিন নম্বর, চার নম্বর। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ওরা সবেগে বাঁ-দিকে ছুটে গেল পলায়নপর লাল সেপাইদের বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য। হাতের মুঠোয় সজোরে দস্তানা-জোড়া চেপে ধরে গ্রিগর লড়াইয়ের গতি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। কসাক সওয়াররা ধাঁ করে সদর রাস্তার দিকে এগিয়ে গেছে, লাল সেপাইরা একজন দুজন করে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আরখিপভ্‌ গাঁয়ের দিকে পালাচ্ছে। সেখানে কসাক পদাতিক-দলের গুলিগোলার সামনে পড়ে ওরা আবার ঘুরে দৌড়ে আসতে থাকে রাস্তার দিকেই কসাক ঘোড়সওয়াররা তখন পাক খেয়ে কারগিনের মুখোমুখি ছুটছে আর ঝড়ের মুখে গাছের পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাল সেপাইদের।

পুলের কাছাকাছি তিরিশজন শত্রু-সৈন্য এমনভাবে আলাদা হয়ে পড়ল যে বাঁচবার কোনো আশাই তাদের নেই। আত্মরক্ষা করতে লাগল ওরা। সঙ্গে একটা মেশিনগান আর প্রচুর কার্তুজ-বেল্‌ট্‌ ছিল। ফলবাগিচাগুলো থেকে কসাক পদাতিকরা সবে বেরিয়েছে এমন সময় মেশিনগানটা চালু হল হুড়মুড় করে। কসাকরা চালা আর পাথর-পাঁচিলের আড়ালে গুঁড়ি মেরে শুয়ে পড়ল। গ্রিগর তার পর্যবেক্ষণের ঘাঁটি থেকে দ্যাখে ওর দলের কসাকরা কারগিনের রাস্তা দিয়ে একটা মেশিনগান টেনে আনছে। শহরতলির একটা বাড়ির হাতার কাছে এসে ওরা আগু-পিছু করছে, তারপর দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

কয়েক মিনিট বাদে গোলাঘরের ছাদ থেকে মেশিনগানের কট্‌কট্‌ আওয়াজ আসতে শুরু করে। দূরবিন দিয়ে গ্রিগর দ্যাখে বেড়ার পেছনে গোলন্দাজরা পা ছড়িয়ে জোট বেঁধে বসেছে; একজন ছাদের ওপর শুয়ে, আরেকজন কার্তুজের বেল্‌ট্‌ কোমরে জড়িয়ে মই বেয়ে ওপরে উঠছে।

পদাতিকদের সাহায্য দেবার জন্য কসাক কামানগুলো গোলা ছুঁড়তে থাকে লাল সেপাইয়ের দলগুলোকে নিশানা করে। পনের মিনিট না যেতেই পুলের কাছে লালফৌজের মেশিনগান হঠাৎ চুপ মেরে যায়। একটা ক্ষীণ আওয়াজ ওঠে 'হুর্‌রা' বলে। উইলো গাছের ন্যাড়া গুড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ঘোড়ায়-চড়া কসাকদের মূর্তি একেকবার দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

সব শেষ হয়ে গেছে।

গ্রিগরের হুকুমে কারগিন আর আর্খিপভের বাসিন্দারা লালফৌজের একশো-সাতচল্লিশজন মরা সেপাইকে টেনে এনে একটা অগভীর গর্তের মধ্যে ফেলে। গাঁয়ের ঠিক বাইরেই খোঁড়া হয়েছিল গর্তটা। কসাকরা ঘোড়াসমেত ছ'টা দু'-চাকাওয়ালা গোলাবারুদের-গাড়ি, একটা জখম মেশিনগান আর রসদশুদ্ধ বেয়াল্লিশটা মালগাড়ি দখল করেছে। কসাকদের মারা গেছে চারজন, জখম হয়েছে পনের জন।

* *

লড়াইয়ের পর কারগিন রণাঙ্গনে এক হপ্তা ক্ষান্তি আছে। লালফৌজের কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের দু'নম্বর ডিভিশনের বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠিয়ে তাদের পেছনে ঠেলে দিল। মিগুইলিন্‌স্ক্‌ জেলার অনেকগুলো গ্রাম তারা চট্‌পট দখল করে নিল। কারগিনে রোজই সকালে বহুদূর থেকে কামানের আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু লড়াইয়ের কোথায় কী হচ্ছে সে খবর আসে বড়ো দেরিতে, অবস্থাটা কী তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না সে-সব খবর থেকে।

এ ক'দিন গ্রিগর মনের দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অতিরিক্ত মদ খেতে আরম্ভ করেছিল। দারুণ ময়দার অভাবে মুশকিলে পড়েছে বিদ্রোহীরা। প্রায়ই কসাকদের সেদ্ধ গম খেতে হচ্ছে, কারণ আটাকলগুলো ফৌজের চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু ওদের হাতে মজুত শস্য অঢেল, তাই ঘর-চোলাই ভদ্‌কার অভাব হয়নি কখনো। এক নাগাড়ে ভদ্‌কার স্রোত বইয়ে দেওয়া হয়েছে। সেপাইরা মাতাল অবস্থায় লড়াইয়ে সামিল হয়েছে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। একবার তো একটা গোটা কসাক স্কোয়াড্রনই আধা মাতাল হয়ে ঘোড়ায় চেপে হামলা চালাতে গিয়েছিল, সিধে মেশিনগানের মুখোমুখি জোরকদমে ছুটে শেষে প্রায় গোটা দলই নিকেশ হয়ে গেল। গ্রিগরের ভদ্‌কার যোগান আছে অফুরন্ত, কারণ ওর আরদালি প্রোখর জাইকভের বিশেষ কৃতিত্ব আছে সুরা দখল করার ব্যাপারে! কারগিনের লড়াইয়ের পর গ্রিগরের অনুরোধে ও তিন কলসী ভদ্‌কা এনেছিল আর কয়েকজন গাইয়েকেও ডেকেছিল। গ্রিগর একটা বাঁধন থেকে ছাড়া পাওয়ার আনন্দে আর দুশ্চিন্তা ভোলবার তাগিদে রাত ভোর অবধি মদ চালাল কসাকদের সঙ্গে। পরদিন সন্ধ্যেয় সে আবার গাইয়েদের ডাকল, আবার হৈ-হল্লা মোচ্ছবে মশগুল হল—এসবই অবিশ্যি সত্যিকারের আনন্দের একটা মোহ সৃষ্টি করে অরুচিকর বাস্তবকে-চাপা দেওয়ার চেষ্টা।

মদের ওপর ঝোঁকটা চট্‌ করে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় গ্রিগরের। সকালে টেবিলের

ধারে বসতেই ভদ্‌কার জন্য একটা অদম্য তৃষ্ণা জাগছে। প্রচুর পান করেও কিন্তু ও মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি। দুপায়ে খাড়া হয়েই ছিল সব সময়। আর সবাই যখন মাতাল হয়ে টেবিলের তলায় আর মেঝের ওপর পড়ে ঘুমচ্ছে জোব্বাকোট মুড়ি দিয়ে, তখনও ওকে বেশ তাজা দেখাচ্ছিল। এমনিতে ওর মুখখানা অবিশ্যি তখন ফ্যাকাশে, চোখ স্থির। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরছিল।

চারদিন একটানা মদ চালাবার পর এবার তার ফল ফলতে শুরু করল। চোখের নিচে টস্‌টসে নীল হয়ে উঠেছে, চাউনিতে একটা নির্বোধ কাঠিন্য। পাঁচদিনের দিন প্রোখর জাইকভ আশ্বাসের হাসি হেসে প্রস্তাব করলে :

—লিখোভিদভে আমার জানাশোনা এক চমৎকার ছুঁড়ি আছে, আজ সন্ধ্যায় চলো তার কাছে। ভারি খাপসুরত। কিন্তু আগেই যেন মেজাজ খিঁচড়ে বোসো না। আমি কোনোদিন চেষ্টা করে দেখিনি বটে, তবে এটুকু জানি ও তরমুজের মতো মিষ্টি! কিন্তু এমনিতে ফোঁস করে উঠবে, ডাইনি একটা, তেমনি বুনো। ওর কাছে যা চাইবে তা একবারমাত্র চাইলেই পাবে না। কিন্তু ও ভদ্‌কা যা বানায় তার তুলনা নেই। চিরার গ্রামগুলোর মধ্যে সেরা ভদ্‌কা ওর। ওর স্বামী দনিয়েৎসের ওপারে পালিয়েছে, ওর ধারণা এতদিনে সে মরেই গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ওরা লিখোভিদভে আসে ঘোড়ায় চেপে। গ্রিগরের সঙ্গে ওর দুজন কমান্ডার রীবাচিকভ আর ইয়েরমাকভ, হাত-কাটা আলেক্সি শামিলও আছে, আর আছে তিন নম্বর ডিভিশনের কমান্ডার মেদ্‌ভেদিয়েভ। সে এসেছিল এক নম্বর ডিভিশনটাকে দেখতে। সামনে চলেছে প্রোখর জাইকভ। গাঁয়ে এসে পৌঁছোবার পর সে একটা ছোট গলিতে ঢোকে। একটা ছোট ফটক খোলে। রাস্তাটা গিয়ে উঠেছে ফসল-মাড়াইয়ের উঠোনে। খড় আর বিচালির গাদার পাশ দিয়ে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে ওরা প্রোখরের পিছু-পিছু চলে, তারপর থামে একটা খোলা চেরী বাগিচার মধ্যে। গাঢ় নীল আকাশে সোনার পেয়ালার মতো বাঁকা চাঁদ, তারাগুলো মিট্‌মিট্ করছে। চারদিকে একটা জাদু-মাখা নিঃঝুম ভাব। শুধু শোনা যায় দূর থেকে কুকুরের ডাক আর ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ। গাঢ় আকাশের পটে জ্বল্‌জ্বল্ করছে একটা হলদে আলোর বিন্দু। তারপর দেখা গেল নীল-খাগড়ার খড়-ছাওয়া প্রচণ্ড একটা ঘরের ছায়ারেখা। জিনের ওপর ঝুঁকে প্রোখর একটা ফটকের পাল্লা খুলল ক্যাঁচক্যাঁচ্ করে। সিঁড়ির কাছে এসে গ্রিগর লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। রেলিঙের থামে ঘোড়ার রাশ বেঁধে সিঁড়ি-দরজা দিয়ে ঢুকল। ভেতরের দরজার আগলটা হাতড়ে খুঁজে দরজা খুলে একটা বড়োসড়ো রান্নাঘরে এসে পড়ল। জোয়ান বয়েসী বেঁটেখাটো অথচ ভালো গড়নপেটনের একটি কসাক স্ত্রীলোক উনোনের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে মোজা বুনছিল। মুখখানা শামলা, সুছাঁদ ভুরু দুটো কালো। চুল্লীর ধারে গোটা ন' বছরের একটি মেয়ে একহাত বাইরে ঝুলিয়ে ঘুমোচ্ছিল।

বাইরের জামা-কাপড় না খুলেই গ্রিগর টেবিলের ধারে বসল। বলল—ঘরে ভদ্‌কা আছে তোমাদের?

গ্রিগরের দিকে না তাকিয়ে, মোজা বোনার কাজ একবারও না থামিয়ে স্ত্রীলোকটি জবাব দিলে— প্রথমে নমস্কার জানানো উচিত ছিল বলে মনে হয়নি?

—তা যদি ভেবে থাকো তাহলে নমস্কার। কী, ভদ্‌কা আছে নাকি?

ভুরু উঁচিয়ে ওর দিকে তাকায় মেয়েটি—কালো চোখে হাসি। বাইরের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনে কান খাড়া করে।

—ভদ্‌কা খানিক আছে ঘরে। কিন্তু তোমরা তো বিরাট দলবল নিয়ে রাতকাটাতে এসেছ?
—হ্যাঁ। একটা গোটা ডিভিশন।

দরজায় ভিড় করে ঢুকল অন্য কসাকরা। একজন আবার একজোড়া কাঠের চাম্‌চে দিয়ে তড়বড় তড়বড় করে একটা দ্রুত নাচের সুর বাজিয়ে দিল। বিছানার ওপর জোব্বা-কোটগুলো গাদা করে ওরা হাতিয়ার বন্দুক সব রেখেছে বেঞ্চের ওপর। প্রোখর তাড়াতাড়ি ছুটে এল মেয়েটিকে টেবিল সাজাতে সাহায্য করবার জন্য। হাত-কাটা আলেক্সি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল বাঁধাকপির আচারের খোঁজে। সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে ভাঙা প্লেটের টুকরোগুলো আর একগাদা ভিজে বাঁধাকপি জোব্বাকোটে জড়িয়ে নিয়ে ফিরে এল।

মাঝরাত গড়াবার আগেই ওদের দুভাণ্ড ভদ্‌কা সাবাড় হয়ে যায়, বাঁধাকপিও খেয়েছে দেঁড়েমুশে প্রচুর পরিমাণে। তারপর ওরা ঠিক করে একটা ভেড়া মারবে। ভেড়ার খোঁয়াড় হাতিয়ে একটাকে ধরল প্রোখর, ইয়েরমাকভ তলোয়ারের এক কোপে উড়িয়ে দিল মাথাটা। মেয়েটি উনোন ধরিয়ে মাটনের পাত্রটা চাপায়। আবার শোনা যাচ্ছে কাঠের চাম্‌চে দিয়ে বাজানো নাচের তালের গৎটা। রীবাচিকভ পা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে হাত দিয়ে হাঁটু চাপড়াচ্ছে আর চড়া অথচ বেশ মিষ্টি মোটা গলায় গান গাইছে।

ইয়েরমাকভ জানলার চৌকাঠের ওপর তলোয়ারের ফলার ধারটা পরখ করে হঠাৎ গাঁক্‌ গাঁক্‌ করে ওঠে—রক্তের গন্ধ পাচ্ছি! গ্রিগর ইয়েরমাকভ্‌কে পছন্দ করত ওর অসাধারণ সাহস আর কসাকসুলভ পাগলামির জন্য। টেবিলের ওপর তামার মগটা ঠক্‌ করে রেখে গ্রিগর ওকে সামলায়। চেঁচিয়ে বলে—খারলাম্‌পি, গাধামি কোরো না!

ইয়েরমাকভ বাধ্য ছেলের মতো তলোয়ারটা খাপে পুরে সতৃষ্ণভাবে এক গেলাস ভদ্‌কা তুলে নেয়।

গ্রিগরের পাশে বসে হাত-কাটা আলেক্সি বলে—এসব সাথী থাকতে মরণকে কেউ ডরায় না! গ্রিগর পান্তেলিয়েভিচ, তুমি আমাদের গর্বের ধন! সারা দুনিয়ায় একমাত্র তুমিই আছো যার নামে আমরা শপথ নিতে পারি। আরেকবার সবাই মিলে পান করা চলবে?

রাত ভোর হওয়ার মুখে গ্রিগর টের পেতে শুরু করে যে সে এবার মাতাল হয়ে উঠছে। আর সবাই যখন কথা বলছে ওর মনে হচ্ছে যেন বহু দূরে রয়েছে ওরা। লাল টক্‌টকে চোখদুটো অতি কষ্টে খুলে রাখে ও, প্রবল চেষ্টায় সজাগ রাখে চেতনা।

গ্রিগরকে জড়িয়ে ধরে ইয়েরমাকভ গজ্‌গজ্‌ করে— সোনার তক্‌মা-ওয়ালারা আবার আমাদের ওপর মোড়লী করছে। হুকুমত তো ওদেরই হাতে চলে গেছে এখন।

ওর হাত সরিয়ে দিয়ে গ্রিগর বলে—কোন্‌ তক্‌মাওয়ালা?

—ভিয়েশেন্‌স্কায়। তুমি শোননি বলছ? একজন ককেসীয়ান প্রিন্স তো সেখানে রাজত্ব করছে! একজন কর্ণেল। আমি খুন করব তাকে! মেলেখভ তোমার পায়ে আমি জান সঁপে দিচ্ছি, আমাদের দল ছেড়ে তুমি যেও না! কসাকরা গজর গজর করছে। আমাদের ভিয়েশেনস্কায় নিয়ে যাও, ওদের সবগুলোকে মেরে শহরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আসি। কুদীনভ, কর্ণেল সবাইকে মারব! ওদের ঠাণ্ডা কররার মতো যথেষ্ট সেপাই আমাদের আছে। এসো না একসঙ্গে লালফৌজ আর ক্যাডেট দুটোর সঙ্গেই লড়ি। আমি তো তাই চাই!

—কর্ণেলকে আমরা মারব। ইচ্ছে করে বেটা আড়ালে রয়েছে! খারলাম্‌পি, সোভিয়েত গবর্নমেন্টের কাছে আমাদের হার মানাই উচিত। আমরা ভুল পথে চলেছি।

—দু'এক মিনিট বাদে হঠাৎ সম্বিত ফিরে আসে গ্রিগরের, কাষ্ঠহাসি হেসে বলে—আমি তামাশা করছিলাম। মদ খাও হে ইয়েরমাকভ।

মেদ্‌ভেদিয়েভ কড়া গলায় বলে—তামাশা কী মেলেখভ? তামাশা কোরো না, ব্যাপারটা খুব গুরুতর। আমরা আমাদের সরকারকে গদি থেকে নামাতে চাই। ওদের সবাইকে বস্তাবন্দী করে চালান দেব, তার জায়গায় বসাব তোমাকে। কসাকদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, ওরা রাজি। কুদীনভ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলব ঃ কেটে পড়ো! তোমাদের আমরা চাই না! যদি যায় তো ভালোই। আর না যায় তো ভিয়েশেনস্কায় একটা রেজিমেণ্ট পাঠিয়ে হতভাগাদের ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে দেব!

—ও সব কথা আর নয়!—রাগে ধমক লাগায় গ্রিগর।

মেদ্‌ভেদিয়েভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে টেবিল ছেড়ে ওঠে, আর মদ ছোঁয় না। রীয়াব্‌চিকভ গান ধরে। গ্রিগরকে ধরে মেয়েমানুষটি যখন সামনের ঘরে নিয়ে যায় তখন ভোরের ছায়া লালচে-বেগুনি হতে শুরু করেছে।

মেয়েটি ওদের বলে—অনেক মদ খাইয়েছ ওকে! এবার থামো তো, শয়তানের ঝাড়! দেখতে পাচ্ছ না দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না? —গ্রিগরকে এক হাতে ধরে আরেক হাতে সে ইয়েরমাকভকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। এক মগ ভদ্‌কা নিয়ে ওদের পেছু পেছু যাচ্ছিল ইয়েরমাকভ।

টলতে টলতে হাতের মগ থেকে খানিকটা ভদ্‌কা চল্‌কে ফেলে দিয়ে ইয়েরমাকভ চোখ টেপে ঃ এখন আর শুয়ো না ওর সঙ্গে। কিছু মিলবে না ওর কাছে।

—সে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি আমার বাপ নও।—পাল্টা জবাব দেয় মেয়েটি।

গ্রিগরকে সে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। চোখে ঘৃণা আর করুণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে গ্রিগরের মরার মতো ফ্যাকাশে মুখের দিকে—গ্রিগরের চোখের পলক পড়ছে না, শূন্য দৃষ্টি। যতোক্ষণ না ও ঘুমিয়ে পড়ে ততোক্ষণ ওর মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে থাকে। তারপর উনোনের ধারে নিজের বিছানা করে মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ে; কিন্তু শামিলের জন্য ওর ঘুমই আসে না। হাতে মাথা রেখে শামিল নাক ডাকাচ্ছে ভড়কে যাওয়া ঘোড়ার মতো ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করে। তারপরেই হঠাৎ জেগে উঠে ভাঙা হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠছে এক কলি গান। আবার মাথাটা হাতের ওপর এলিয়ে শুয়ে পড়ছে, কয়েক মিনিট ঘুমিয়ে ফের গেয়ে উঠছে গান।

* * *

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে গ্রিগরের মনে পড়ল কভ আর মেদ্‌ভেদিয়েভের কথাগুলো। মদ খেয়ে পুরোপুরি বেহুঁশ হয়নি সে, একটু চেষ্টা করতেই মনে পড়ল ওরা সরকারকে গদী থেকে হটাবার কথা বলাবলি করছিল। লিখোভিদভের এই উৎসবের ব্যবস্থাটা যে ইচ্ছে করেই করা হয়েছিল ওদের পরিকল্পনায় গ্রিগরের সমর্থন নেবার জন্য তা ও চট্‌ করে বুঝে ফেলল। উগ্রপন্থী কসাকরা গোপনে গোপনে স্বপ্ন দেখত ডন প্রদেশের বাদবাকি এলাকা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে তারা নিজস্ব একটা ছোটখাটো সোভিয়েত সরকার খাড়া করবে কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে। কুদীনভের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল ওরাই। কুদীনভ খোলাখুলিই জানিয়ে দিয়েছে দনিয়েৎসের দিকে পেছু হটে গিয়ে শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলানোই তার উদ্দেশ্য। বিদ্রোহীদের নিজেদের শিবিরে দলাদলি থাকলে তার ফল কী হবে তা ওরা বোঝেনি। যে কোনো মুহূর্তে লাল বাহিনী ওদের সব দলাদলি-শুদ্ধুই উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। বিছানা থেকে আলগোছে লাফ

দিয়ে ওঠে গ্রিগর। ভাবে—এ কী ছেলেখেলা হচ্ছে। পোশাক পরতে পরতে ইয়েরমাকভ আর মেদভেদিয়েভকে ডাকে ঘরের ভেতর। চট্ করে ওদের পেছনে দরজাটা ভিজিয়ে দিয়ে বলে—এবার শোনো তো ভাই! কাল যেসব কথাবার্তা হয়েছে সব বিলকুল ভুলে যাও। কোনোরকম ট্যাঁ-ফোঁ নয়। নয়তো তোমাদের খুব খারাপ হয়ে যাবে। কে হুকুমদারি করছে প্রশ্ন সেটা নয়। কুদীনভ বা অন্য কারুর প্রশ্ন নয়। আসল কথা হচ্ছে আমরা একটা ফাঁদে পড়েছি, পিপের মতো বেড়ের চাকার মধ্যে আটক পড়েছি। আজ না হলেও কাল ওই বেড়ের ফাঁস আমাদের পিষে মারবে। আমাদের রেজিমেণ্ট ভিয়েশেনস্কায় পাঠাতে হবে না, পাঠাতে হবে মিগুলিন্স্কে, ক্রাস্নোকুৎস্কে।—মেদভেদিয়েভের ভাবপ্রবণ, আবেগময় মুখটার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বেশ জোর দিয়েই কথাগুলো বলে গ্রিগর—জিনিসটা ভেবে দ্যাখো, বোঝো। আমরা যদি এভাবে কমান্ডারদের তাড়াতে শুরু করি আর ফৌজের ভেতর বিদ্রোহ করতে থাকি তাহলে আমাদের আর দেখতে হবে না। হয় আমাদের শ্বেতরক্ষীদের কাছে যেতে হবে নয়তো লালফৌজের কাছে। মাঝামাঝি কোনো রাস্তা নেই। হয় এরা নয় ওরা আমাদের পিষে মারবে।

ফিরে যেতে যেতে ইয়েরমাকভ বলে—আর কাউকে গিয়ে আমাদের আলোচনার কথা বলবে না তো!

—না আর বেশিদূর গড়াবে না, তবে এক শর্তে—কসাকদের ভেতর তোমাদের ওস্কানি বন্ধ করতে হবে। কুদীনভ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কী আছে? যতোক্ষণ আমার হাতে একটা ডিভিশন রয়েছে ততোক্ষণ আমার অর্ধেক ক্ষমতাও তো ওদের নেই। ওদের যা করুণ অবস্থা সে তো জানি। আমরা সুযোগ দিলেই ওরা ক্যাডেটদের হাতে তুলে দেবে আমাদের কিন্তু কার কাছেই বা যাবো বলো? সামনে তো কোনো রাস্তাই খোলা দেখছি না, সমস্ত পথ বন্ধ।

—সে কথা সত্যি!—মেদ্ভেদিয়েভ মেনে নেয় কথাটা। ঘরে ঢোকার পর এই প্রথম চোখ তুলে তাকায় গ্রিগরের মুখের দিকে।

কারগিনের আশেপাশের গ্রামগুলোয় আরো দু'দিন মদ খেয়ে কাটাল গ্রিগর,—মাতলামির হর্রায় শূন্য ফাঁকা একটা জীবন। ওর ঘোড়ার জিনটা অবধি ভদ্কার গন্ধে ভরে উঠেছে। স্ত্রীলোক ও পল্লীকন্যা যাদের আগেই কুমারীত্ব ঘুচেছিল তারা এবার গ্রিগরের হাত পার হল ওদের ক্ষণিকের প্রণয়লীলায় গ্রিগরের সঙ্গিনী হয়ে। কিন্তু রোজই সকালে গ্রিগর তার শেষতম আনন্দের কামোত্তাপে পরিতৃপ্ত হয়ে ঠান্ডা মাথায় সুস্থিরভাবে চিন্তা করে ঃ জীবনে তো সবরকম জিনিসই পরখ করে দেখা হল। মেয়েমানুষদের সঙ্গে প্রেম করেছি, স্তেপের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়েছি, বাপ হওয়ার আনন্দ পেয়েছি, মানুষ মেরেছি, নিজেও মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, নীল আকাশ দেখে হয়ে উঠেছি উতলা। জীবনের আর নতুন কী দেখবার আছে আমার? কিছুই না! ইচ্ছে করলে এখন মরতেও পারি! তেমন সাংঘাতিক মনে হবে না ব্যাপারটা। বে-পরোয়া হয়ে এখন লড়াইটাকে ধরে নিতে পারি খেলার মতো। ধনী তো নই, লোকসানও বড়ো বেশি হবে না। —গ্রিগর ওর শেষতম মেয়েমানুষটির পাশে শুয়ে আছে আর ওর মনের মধ্যে প্লাবনের ধারার মতো অজস্র স্মৃতি উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। পুরনো বন্ধু, পুরনো মুখ, আগেকার নানা কণ্ঠস্বর, কথাবার্তার টুকরো, হাসি। প্রিয় স্তেপভূমির স্মৃতি কল্পনা করতে থাকে ও আর হঠাৎ যেন প্রান্তরের বিশাল বিস্তার ওর সামনে উন্মুক্ত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়। গরমকালের ফসল ভরা একটা বলদ-টানা গাড়ি, জোয়াল-দান্ডার সামনে বসে আছে ওর

বাবা, চষা খেত জমি আর কাটা ফসলের সোনালি শীষ, রাস্তায় একদল দাঁড়কাকের কালো ছিটে। যে অতীত আর ফিরে আসার নয় তারই স্মৃতি পথে চলতে চলতে ও হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে আক্‌সিনিয়ার সামনে।—আমার ভালোবাসার ধন, তোমায় যে কোনোদিন ভুলতে পারি না!—ভাবে ও আর পাশের ঘুমন্ত মেয়েমানুষটার কাছ থেকে নাক সিঁটকে সরে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর অধীর হয়ে অপেক্ষা করে কখন ভোর হবে। পুবের আকাশে সবে সূর্যের লালচে সোনালি ছোঁয়া লাগতেই ও লাফিয়ে উঠে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে যায় ঘোড়ার কাছে।

॥ এগার ॥

স্তেপ-প্রান্তরের সর্বগ্রাসী-দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহ। কিন্তু অবাধ্য এলাকাগুলোকে ঘিরে ধরেছে রণাঙ্গনের ইস্পাত বেষ্টনী। নিয়তির রাহুগ্রস্ত মানুষ। মৃত্যুকে নিয়ে খেলছে কসাকরা, বড়ো পাশার দান হেঁকেও ওদের অনেকের পাশা কাত হয়েছে উল্টো দানে। ছোকরারা বেপরোয়া দিন কাটাচ্ছে, উদ্দাম প্রেম করছে, বুড়োরা ভদ্‌কা চালিয়ে যাচ্ছে যতোক্ষণ না আসনের নিচে গড়িয়ে পড়ে, টাকা আর বুলেট বাজি রেখে (টাকার চেয়েও বুলেটের দাম বেশি কিনা) তারা তাস খেলছে, ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছে যাতে দুমিনিটের জন্য হলেও অন্তত বন্দুকটা রেখে কুড়ুল হাতে নিতে পারে, খানিকক্ষণ বসতে পারে প্রিয়জনদের মধ্যে, কিংবা একটু বেড়াটা মেরামত করা কি বসন্তকালের চাষ আবাদের জন্য মইটা বা ঘোড়ার-সাজটা জোগাড় করতে পারে। এমনিভাবে যারা শান্তিময় জীবনের কিছুটা আস্বাদ পায় তাদের অনেকেই রেজিমেণ্টে ফেরে মাতাল হয়ে, তারপর মাথা সাফ হবার আগেই আবার ছোটে হামলা চালাতে, মেশিনগানের মুখে সরাসরি এগিয়ে যাবার জন্য। কিংবা উন্মত্ত উত্তেজনায় হাঁটুর নিচে ঘোড়ার অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গিয়ে তারা বন্য আক্রোশে নৈশ আক্রমণে বের হয়, বন্দীদের ধরে আদিম বর্বর নির্মমতায় ওদের ওপর নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করে, তলোয়ারের আঘাতে শেষ করে ওদের।

অতুলনীয় সৌন্দর্যের সম্ভার নিয়ে এসেছিল ১৯১৯ সালের বসন্তকাল। এপ্রিলের দিনগুলো যেন কাঁচের মতো স্বচ্ছ নির্মল। আকাশের উত্তুঙ্গ নীলিম বিস্তারে বুনো হাঁস আর তামাটে-জিভ সারসের দল উড়ে যায়, ওড়ে আর মেঘ পার হয়ে ভেসে যায় উত্তরের দিকে। ঝিলের কাছ ঘেঁষে স্তেপের হাল্‌কা-সবুজ গালিচায় রাজহাঁসগুলো চিক্‌মিক্‌ করে ছড়ানো-মুক্তোর মতো। পাখিরা গান গায়, একটানা ডাকে নদীর পাড় বরাবর জলা-জঙ্গলের ভেতর। টৈ-টম্বুর ডোবার ওপর দিয়ে উড়তে গিয়ে ডেকে ওঠে মাদী হাঁসগুলো। অসিয়ারের বনে অনবরত শোনা যায় পাতিহাঁসের প্রণয়ার্ত শীৎকার। বেতসবনে সবুজ লোমশ শীষ ধরেছে, পপ্‌লারের কুঁড়ি দেখা দিয়েছে—চট্‌চটে সুগন্ধভরা। সবুজে-উপচে-পড়া স্তেপের মাঠ অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে ভরপুর, নেড়া কালো মাটি আর চির-নতুন ঘাসের পুরনো গন্ধে উদ্বেল।

বিদ্রোহীদের এ-লড়াইয়ের একটা বৈশিষ্ট্য, কসাকদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের গাঁয়ের কাছাকাছি রয়েছে। দূরের ঘাঁটিতে গিয়ে ডিউটি দিয়ে আর গোপন হামলা চালিয়ে ওরা ক্লান্ত। হয়রান হয়ে গেছে পাহাড়ী চড়াই-উৎরাইয়ে টহল দিয়ে। কোম্পানি কমাণ্ডার-দের হুকুম নিয়ে ওরা বাড়ি ফেরে আর নিজেদের জায়গায় পাঠায় বয়স্ক রোগা বাপ কিংবা সাবালক ছেলেদের। স্কোয়াড্রনগুলোতে লড়িয়ে সেপাইয়ের সংখ্যায় কমতি নেই, কিন্তু অনবরতই লোক বদল হয়ে চলেছে। তবে কিছু কিছু কসাক আছে, তারা আরো শেয়ানা। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তারা স্কোয়াড্রনের রাতের আস্তানা থেকে চম্পট দিয়ে বিশ-তিরিশ মাইল রাস্তা জোর কদমে পাড়ি দেয়, আর রাত আঁধার হতেই বাড়িতে গিয়ে ঢোকে। বউ কিংবা প্রণয়িনীর সঙ্গে রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা ঘোড়ায় জিন চাপায়, তারপর আকাশের বুকে ছায়াপথ মিলিয়ে যাবার আগেই ফিরে আসে স্কোয়াড্রনে।

ওদের অনেকেই বাড়ির চৌহদ্দিটুকু পেরিয়ে আর বাইরে গিয়ে লড়তে ভালবাসে না। বারবার বউয়ের কাছ-ছাড়া হয়ে শেষে অনেকে বলেছে—'মরার কোনো মানে হয় না'। ফৌজের বড়ো-কর্তাদের বিশেষ করে ভয়—বসন্তের খেতখামারি কাজ শুরু হবার সময় দলে-দলে সব ভেগে না পড়ে। প্রত্যেকটা ডিভিশনকে বিশেষভাবে তদারক করতে আসে কুদীনভ, অনভ্যস্ত রূঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দেয়ঃ

—খালি পতিত জমি খালি পড়ে থাক্ সেও ভালো, ক্ষেতে বরং বীজ বুনবো না তবু ভালো—কিন্তু কোনো কসাককে আমি ছুটির অনুমতি দেব না, ছুটি না নিয়ে বাড়িতে কেউ ধরা পড়লে তাকে কেটে ফেলা হবে, গুলি করে মারা হবে।

* *

ক্লিমভ্স্কির দক্ষিণে একটা লড়াইয়ে গ্রিগর সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল। এপ্রিল-দিনের দুপুর নাগাদ গাঁয়ের শেষ প্রান্তে খামারগুলোর আশে-পাশে শুরু হল বন্দুক ছোঁড়াছুঁড়ি। কয়েক মিনিট বাদে লাল বাহিনী এগিয়ে এল গাঁয়ের দিকে। বাঁদিক থেকে বাল্টিক নৌবাহিনীর কয়েকটা জাহাজের নাবিক ইচ্ছে করেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বেপরোয়া আক্রমণে ওরা কসাক স্কোয়াড্রনগুলোকে গাঁ থেকে বের করে দেয়, একটা উপত্যকা ধরে ওদের ঠেলে নিয়ে আসতে থাকে।

লালফৌজ জিতে যাচ্ছে এমন সময় গ্রিগর টিলার ওপর থেকে লড়াই দেখতে দেখতে দস্তানা নেড়ে প্রোখর জাইকভ্কে হুকুম দেয় ওর ঘোড়া নিয়ে আসবার জন্য। জিনের ওপর লাফিয়ে উঠে গ্রিগর দ্রুত বেগে নেমে যায় একটা গিরিখাতের ভেতর, সেখানে ও একটা ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রন মজুত রেখেছিল। ফলবাগিচা আর বেড়ার ওপর দিয়ে রাস্তা করে স্কোয়াড্রনের কাছে ছুটে আসে গ্রিগর। কসাকরা তখন ঘোড়া থেকে নেমে হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে। খানিকটা দূরে থাকতেই গ্রিগর তলোয়ার উঁচিয়ে চিৎকার করে বলে—ঘোড়ায় চাপো! এক মিনিটের মধ্যে দু'শো কসাক ঘোড়ায় উঠে বসে। স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার গ্রিগরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এগিয়ে এল।

—আমরা হামলা চালাব?— জিজ্ঞেস করল সে।

গ্রিগরের চোখ দুটো ধ্বক্ করে ওঠে—হ্যাঁ, এখুনি ঠিক সময়! স্কোয়াড্রন আমি নিজে চালিয়ে নিয়ে যাব।—সেপাইদের দিকে ফিরে ও বলেঃ

—গাঁয়ের শেষ সীমানা অবধি সার বেঁধে এগিয়ে চলো!

গ্রাম পেরিয়ে এসে স্কোয়াড্রনকে আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়াতে হুকুম দেয়

গ্রিগর, খাপ থেকে সহজে তলোয়ারটা বের করা যাচ্ছে কিনা পরখ করে দ্যাখে, তারপর স্কোয়াড্রনের প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে থেকে কদম চালে এগোতে থাকে ক্লিমভ্‌কার দিকে। ক্লিমভ্‌কার সামনে টিলার মাথায় এসে ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়ায় এক মুহূর্তের জন্য, অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে। নিচেই লাল পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার বাহিনী পেছু হটে যাচ্ছে। গ্রিগর খানিকটা বেঁকে স্কোয়াড্রনের দিকে ঘোরেঃ

—তলোয়ার টেনে নাও! হামলা করো! ভাইসব, এসো আমার পেছনে!— তলোয়ার বের করে ও চেঁচায় 'হুররে' বলে। টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটায় গাঁয়ের দিকে। বাঁ হাতে শক্ত করে টেনে-ধরা রাশটা কাঁপছে. মাথার ওপর উঁচানো তলোয়ার বাতাসে শাঁই শাঁই আওয়াজ তুলেছে।

প্রকাণ্ড একটা সাদা মেঘ দু'এক মিনিটের জন্য ঢেকে দিয়েছিল সূর্যটাকে। গ্রিগরকে ডিঙিয়ে একটা ধূসর ছায়া টিলা বেয়ে উঠে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। নিমেষের জন্য ক্লিমভ্‌কার বাড়িগুলোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ও সামনের দিকে পালিয়ে-যাওয়া ঝল্‌মলে হলদে আলোটার দিকে তাকায়। ছুটে এগিয়ে আলোটাকে ডিঙিয়ে যাবার দুর্বোধ্য অবচেতন একটা ইচ্ছা ওকে পেয়ে বসে যেন। ঘোড়া চাবুকে দ্রুততম গতিতে তাকে ছোটায়। কয়েক লহমা বেপরোয়া চলবার পর টান-করে বাড়িয়ে-দেওয়া ঘোড়ার মাথাটায় রোদ এসে পড়ে জাল্‌তির মতো আলো-ছায়া মেশা, লাল্‌চে ঝুঁটি হঠাৎ যেন উজ্জ্বল সোনালিতে ঝলমলিয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় সামনের একটা রাস্তা থেকে গুলির আওয়াজ শোনা যায়ঃ বিস্ফোরণের শব্দ বাতাসে ভর করে ভেসে আসে ওর কানে। আরেকটা মুহূর্ত, তারপরেই ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্‌ আওয়াজ, বুলেটের শিস্‌ আর কানের পাশে বাতাসের গর্জনের ভেতর পেছনের স্কোয়াড্রনের ঘোড়া-দাবড়ানোর শব্দ ডুবে যায়। অতোগুলো ঘোড়ার পায়ের ভারী গুর্‌গুর্‌ আওয়াজ যেন চট্‌ করে ওর কানের আড়ালে চলে যায়, মনে হয় যেন আওয়াজটাকে দূরে ফেলে ও এগিয়ে যাচ্ছে। শুকনো ডাল আগুনে পড়ার মতো পট্‌পট্‌ আওয়াজ হচ্ছে বন্দুকের; পাশ দিয়ে ছুটেছে বুলেট। হতভম্ভ হয়ে বিপদ বুঝে চারদিকে তাকায় ও, মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে রাগে আর দিশাহারা হয়ে। স্কোয়াড্রনের সেপাইরা তখন ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে গ্রিগরকে ফেলে চলে যাচ্ছিল। ওরই খানিকটা পেছনে রেকাবের ওপর উঁচু হয়ে উঠে কমাণ্ডার বেয়াড়া ভঙ্গিতে তলোয়ার ঘোরাতে থাকে আর ভাঙা কর্কশ গলায় চিৎকার করে কাঁদে। শুধু দু'জন কসাক গ্রিগরের পেছু পেছু আসছে, আর প্রোখর জাইকভ ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের কাছে। আর-সবাই খাপে তলোয়ার পুরে চাবুক গুটিয়ে নিয়ে এলোপাথাড়ি পেছন পানে ছুটেছে।

নিমেষের জন্য গ্রিগর ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে। পেছনে কী ঘটল, একজন লোকও কাত হল না অথচ তবু কেন স্কোয়াড্রন হঠাৎ পালিয়ে যেতে শুরু করল তাই বুঝতে চেষ্টা করে ও। তখুনি ও মনে মনে স্থির করে ফেলেঃ ও ফিরবে না, পালাবে না, ঘোড়া চালিয়ে এগিয়েই যাবে। সামনে প্রায় দু'শো গজ দূরে একটা বেড়ার আড়ালে দেখল সাতজন লালফৌজী নাবিক একটা মেশিনগান ঘিরে জটলা করছে। মেশিনগানটাকে ঘুরিয়ে কসাকদের ওপর তাক করার চেষ্টা করছিল ওরা। কিন্তু সরু গলিটার মধ্যে খুব সুবিধা পাচ্ছিল না। এবার গ্রিগরের কানের পাশে আরো প্রচণ্ড আর্তনাদ করে ছুটেছে রাইফেলের বুলেট। পেছন থেকে একটা ভাঙা বেড়ার পাশ দিয়ে সরু গলিটার মধ্যে ঢুকবে বলে ও ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল। বেড়ার কাছ থেকে মেশিনগানের দিকে ফিরে

তাকাল, এবার নাবিকদের দেখতে পেল খুব কাছেই। ওরা তাড়াতাড়ি ঘোড়ার সাজ খুলে নিচ্ছে। দুজন কাটছে রশারশিগুলো, তৃতীয় জন মেশিনগানের ওপর ঝুঁকে পড়েছে. আর অন্যরা হাঁটু গেড়ে বসে ওকে লক্ষ্য করে রাইফেল চালাচ্ছে। ওদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময় গ্রিগরের নজরে পড়ল বন্দুকের ঘোড়ার ওপর ওদের আঙুলগুলো দ্রুতবেগে সচল হয়ে উঠেছে, একেবারে কানের কাছে গুলির আওয়াজ শুনতে পায় ও। কাঁধের কাছে বন্দুকের বাঁট রেখে ঘরগুলো আবার ভর্তি করে নিচ্ছে ওরা, এত তাড়াতাড়ি গুলি চালাচ্ছে যে ঘামে নেয়ে উঠেও গ্রিগরের পরিষ্কার ধারণা হয়ে যায় ওরা ওকে জখম করতে পারবে না।

গ্রিগরের ঘোড়ার খুরের নিচে বেড়াটা চেপ্‌টে যায়, বেড়া ছেড়ে আরো এগিয়ে গেছে ও। তলোয়ার উঁচু করে ঠিক সামনের জাহাজীটার ওপর নজর স্থির রাখে। আরেকবার যেন বিজলির চমকের মতো শিউরে উঠল শরীরটাঃ

ওরা তো এবার সরাসরি নিশানা করে গুলি চালাবে...সিধে ঘোড়াটার বুকে।... ঘোড়াটাও আমায় ফেলে দেবে...তারপর তো আমি গেছি!— ওকে সোজা লক্ষ্য করে দুটো গুলি ছুটে আসে, সেই সঙ্গে চিৎকার—জ্যান্ত পাকড়াও করো!— সামনেই একজন নাবিকের টুপির-ফিতেটা ওর নজরে পড়ল, জাহাজের নামের সোনালি মার্কা মারা তাতে। পা দিয়ে রেকাব আঁকড়ে ধরে গ্রিগর। টের পায় নাবিকটার নরম দেহে ওর তলোয়ারখানা ঢুকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় নাবিক কোনোরকমে গ্রিগরের বাঁ কাঁধে একটা বুলেট চালিয়ে দেয়, তারপরেই প্রোখরের তলোয়ারে দু'ফাঁক হয়ে যায় তার মাথাটা। রাইফেলের বল্টুর আওয়াজে গ্রিগর ফিরে দাঁড়ায়ঃ মেশিন-গানের পেছন থেকে একটা রাইফেলের নলের ছোট কালো চোখ ওর দিকে চেয়ে আছে। পাশের দিকে এমন জোরে কাত হয়ে ও কানের ধার ঘেঁষে ছুটে-যাওয়া বুলেটটাকে এড়ায় যে ঘোড়ার জিনটা হেলে পড়ে, আর ঘোড়াটাও ভয়ে ফোঁস ফোঁস করে দুলে ওঠে। গাড়ির সামনের জোয়াল-দাণ্ডাটা লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে গ্রিগর লোকটাকে কোতল করে, রাইফেলে দ্বিতীয়বার গুলি ভরতে সময় পর্যন্ত পায় না লোকটা।

এক লহমার মধ্যে চারজন খালাসিকে তলোয়ারের ঘায়ে শেষ করে গ্রিগর। ভাইকভের চেঁচামেচিতে কান না দিয়ে গলির মোড়ের দিকে পালাতে-থাকা পঞ্চম লোকটাকেও ধাওয়া করার জোগাড় করেছিল ও। কিন্তু ঘোড়া চালিয়ে ওর সামনে ছুটে এল স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার, ঘোড়ার মুখের বাঁধনটা চেপে ধরল সেঃ

—কোথায় চললে তুমি? ওরা যে তোমাকে মেরে ফেলবে! ওখানে ওই চালাটার পেছনে ওদের আরেকটা মেশিনগান আছে।

আরো দুজন কসাক আর প্রোখর নিজে ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে এল ওর কাছে, ঘোড়া থেকে ওকে জোর করে টেনে নামাল। ওদের হাত ছাড়াবার জন্য ছটফট্ করতে থাকে গ্রিগর আর চেঁচায়ঃ

—আমায় ছেড়ে দে, এই শয়তানের ঝাড়! আমি ওটাকে সাবাড় করব—সব কটাকে খুন করব!

—গ্রিগর পান্তেলিয়েভিচ! কমরেড মেলেখফ! একটু মাথা ঠাণ্ডা করো!— মিনতি জানায় প্রোখর।

এবার গ্রিগর অন্যরকম একটা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—আমায় ছেড়ে দাও ভাই!— ওরা ছেড়ে দেয়। স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার প্রোখরকে ফিস্‌ফিস করে বলেঃ

—ওকে ওর ঘোড়ার ওপর তুলে দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

নিজেই ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল গ্রিগর, কিন্তু টুপিটা সে মাটিতে ফেলে দিয়ে টলতে থাকে। হঠাৎ দাঁতে দাঁত ঘষে ভয়ানকভাবে মুখ বিকৃত করে গোঙাতে থাকে, জোব্বাকোটের বাঁধন টেনে ছিঁড়ে ফেলতে শুরু করে। স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার ওর দিকে পৌঁছিয়ে আসছে এমন সময় জায়গায় দাঁড়িয়েই সরাসরি মাথা নিচু করে উল্টে পড়ে ও। খোলা বুকটা বরফে ঠেকে। কাঁদতে থাকে, কান্নার দমকে কাঁপতে কাঁপতে কুকুরের মতো বেড়ার নিচের বরফে মুখ ঘষে। তারপর মনের এক ভয়ঙ্কর স্বচ্ছতার মুহূর্তে ও খাড়া হয়ে উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। চারধারে ঘিরে-দাঁড়ানো কসাকদের দিকে চোখের জল-মাখা বিকৃত মুখখানা ফিরিয়ে ও ভাঙা কর্কশ গলায় চিৎকার করে ওঠেঃ

—কাকে খুন করেছি আমি?

জীবনে এই প্রথম ও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গা মোচড়াতে থাকে, চেঁচায় আর মুখ থেকে গাঁজলা বের করেঃ

—ভাইসব, আমার কোনো ক্ষমা নেই...আমায় মেরে ফেল...আমায় কেটে ফেল, ভগবানের দোহাই!... মারো...মরণের মুখে ঠেলে দাও...

কমাণ্ডার আর একজন পল্টন অফিসার ছুটে এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তলোয়ারের পেটি আর পুলিন্দাটা টেনে খুলে ওর মুখ চাপা দিলে, পা চেপে ধরলে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ওদের দেহের ভারের নীচে ছট্‌ফট করতে লাগল গ্রিগর। পাগলের মতো পা ছুঁড়ে বরফ ছিটিয়ে মাথা ঠুকতে লাগল ঘোড়ার খুরের চিহ্ন আঁকা ঘাসহীন মাটিতেঃ এই মাটিতেই ও জন্মেছে, মানুষ হয়েছে, পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করেছে তিক্ততা আর ছোটখাট আনন্দে ভরা জীবনের।

মাটিতে গজায় ঘাস, মাটির জীবন-রস শুষে নিয়ে রোদ আর বর্ষাকে সে মাথা পেতে নেয় নিরাসক্তভাবে, ঝড়ের সর্বনাশা নিঃশ্বাসের কাছে সে বিনয়াবনত হয়ে যায়। তারপর, বাতাসে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে একই রকম ঔদাসীন্যে সে শুকিয়ে মরে যায়, আর তার শুকনো শীষের মর্মরধ্বনিতে জাগে শারদ-সূর্যের অন্তিম অস্তরাগের আবাহন।

* * *

পরদিন গ্রিগর ডিভিশনের কর্তৃত্বভার তুলে দেয় ওরই রেজিমেণ্ট কমাণ্ডারদের মধ্যে একজনের হাতে। প্রোখর জাইকভের সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় ভিয়েশেন্‌স্কায়। কারগিনের ওপারে দ্যাখে গভীর পাহাড়ীখাতের নিচে একটা ঝিলে বিরাট এক ঝাঁক বুনোহাঁস পড়েছে। প্রোখর চাবুক দিয়ে ইশারা করে দেখায়। হেসে বলেঃ

—একটা হাঁসটাঁস মারলে কিন্তু বেশ হতো গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ। তারপর একেক পাত্তর ভদ্‌কা।

গ্রিগর বলে—একটু কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়া যাক্, চেষ্টা করেই দেখি এক হাত।

খাতের ভেতর নেমে পড়ে ওরা। পাহাড়ের কিনারায় ঘোড়া নিয়ে দাঁড়ায় প্রোখর। গ্রিগর জোব্বাকোটখানা খুলে রাইফেলের বল্টু খাড়া করে নেয়, তারপর গেল-বছরের মুড়ো-ঘাসে ভরা সরু একটা নালা ধরে হামা দিয়ে নিচে নামতে থাকে। অনেকক্ষণ হামা দেয়, মাথা প্রায় তোলেই না বলতে গেলে। এমনভাবে গুঁড়ি মেরে চলে যেন শত্রুপক্ষের

ঘাঁটি নজর করে দেখছে; স্তখদ্ নদীতে ও জার্মান শান্ত্রীটাকেও ধরেছিল ঠিক এই কায়দায়। ওর রং-জবলা খাকি কোর্তাটা মাটির সবুজে-বাদামি রঙের সঙ্গে বেশ মিশে গেছে। জলার ধারে এক-পায়ে-খাড়া প্রহরী হাঁসটার তীক্ষ্ণ নজর থেকে ও আড়াল পেয়েছে নালাটার জন্য। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসতে হলে যতোটা হামাগুড়ি দেওয়া দরকার ততোটা এসে একটুখানি উঁচু হয় ও। হাঁসটা ধূসর সর্পিল গলা বেঁকিয়ে ওকে উদ্বেগভরে লক্ষ্য করে। জলে মাদী-হাঁসগুলো সাঁতরাচ্ছে, ডুব দিচ্ছে, পা ঘোরাচ্ছে। গ্রিগরের কানে আসে হাঁসগুলোর কক্-কক্ আওয়াজ আর জলের ছপ্ছপানি। ও ভাবে—এবার বন্দুকের-নিশানা-মাছি দিয়ে তাক্ করা যেতে পারে। রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে ও যখন হাঁসটাকে গুলি করে তখন ওর বুক দুরদুর করছে।

গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই ও লাফিয়ে ওঠে—কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে পাখার ঝাপ্টানি আর হাঁসগুলোর চেঁচানিতে। যে হাঁসটাকে ও নিশানা করেছিল সেটা উড়ে যায় বটে, কিন্তু বৃথাই চেষ্টা করে উঁচুতে উঠতে। অন্য হাঁসগুলো ঘন মেঘের মতো জলার ওপর উড়ছে। ঝাঁকের ওপর আরো দু'বার গুলি চালায় ও, দ্যাখে কোনোটা পড়ে কিনা, তারপর নিরাশ হয়ে ফিরে আসে প্রোখরের কাছে।

প্রোখর তখন জিনের ওপর লাফিয়ে উঠে ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, নীল আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাওয়া হাঁসগুলোর দিকে চাবুক দেখিয়ে গ্রিগরকে চেঁচিয়ে বলছে—ওই দ্যাখো! ওই দ্যাখো!

গ্রিগর ঘুরে দাঁড়ায়, সফলকাম শিকারীর উত্তেজনায় আর আনন্দে ও কাঁপতে থাকে। দল ছেড়ে পেছনে পড়ে গেছে একটা হাঁস, দ্রুতবেগে নেমে আসছে আর ধীরে ধীরে থেকে-থেকে পাখা ঝাপ্টাচ্ছে। পায়ের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে গ্রিগর চোখে হাত আড়াল করে লক্ষ্য করে। হঠাৎ পাখিটা একটুকরো পাথরের মতো নিচে নেমে আসে, ছড়ানো-ডানাদুটো সূর্যের আলোয় সাদা ঝক্মক করে ওঠে।

ঘোড়া নিয়ে প্রোখর গ্রিগরের কাছে এগিয়ে এল। ওর হাতে ঘোড়ার রাশটা ছুঁড়ে দিয়ে খাতের ঢালু কিনারা ধরে চলল দুজনেই। হাঁসটাকে দেখল গলা লম্বা করে পড়ে থাকতে। নির্দয় মাটিকে বুকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় ডানাদুটো ঝাপটাচ্ছে। জিনের ওপর ঝুঁকে গ্রিগর ওর বীরত্বের পুরস্কার লুফে নেয়। প্রোখর সেটাকে বাঁধে জিনের ডগায়। তারপর ঘোড়া হাঁকায় দুজন।

ভিয়েশেনস্কায় এসে গ্রিগর জানাশোনা এক বুড়ো কসাকের বাড়িতে ওঠে। তখন-তখনি হাঁসটাকে রাঁধতে দিয়ে প্রোখরকে পাঠায় ভদ্কার জোগাড়ে। সেনাপতিমণ্ডলীর কাছে রিপোর্ট দেবার কোনো চেষ্টাই দেখায় না ও। বিকেলে অনেকক্ষণ অবধি বসে-বসে মদ খায়। আলাপ করতে করতে বুড়ো কসাক অনেকগুলো নালিশ শুনিয়ে দেয় গ্রিগরকে।

—অফিসাররা তো এখানে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ।— শুরু করে বুড়ো।

—কোন্ অফিসাররা? গ্রিগর জিজ্ঞেস করে।

—আমাদের নিজেদেরই অফিসার। কুদীনভ আর তার সঙ্গীসাথীরা।

—কী করছে তারা?

—ভিন্‌দেশীদের শুষে নিংড়ে নিচ্ছে। যারা লালদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাদের পরিবারসুদ্ধ গ্রেপ্তার করছে : ধরপাকড়ে মেয়ে, বাচ্চা, বুড়ো কারুর রেহাই নেই। আমার এক আত্মীয়কে ধরেছে তার ছেলের জন্য। কিন্তু এর কী মানে হয়? ধরুন আপনি

ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে দনিয়েৎস্ অবধি হটে গেছেন, এদিকে লাল ফৌজ আপনার বাপ্ পান্তালিমনকে গ্রেপ্তার করল, সেটা কি খুব ভাল কাজ হবে, বলুন অ্যাঁ?

—নিশ্চয়ই না।

—কিন্তু আমাদের নিজেদের গভর্নমেণ্টই ওদের ধরপাকড় করছে। লালফৌজ যখন এখানে এসেছিল তারা কারুর ওপর কোনো অন্যায় করেনি, কিন্তু এরা সব হন্যে হয়ে উঠেছে, এদের সামলানো দায়।

একটুখানি টলে গ্রিগর উঠে খাটের কোণে ঝোলানো জোব্বাকোটটার দিকে হাত বাড়াল। সামান্য মাতাল হয়েছে সে।

চেঁচিয়ে উঠল—প্রোখর! আমার তলোয়ার আর পিস্তল!

—কোথায় চললে গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ?

—সে তোমার দেখবার ব্যাপার নয়। তোমাকে যা বলা হল তাই করো।

গ্রিগর তলোয়ার আর রিভলবার বেল্‌টে ঝুলিয়ে নিল, জোব্বাকোটখানা জড়িয়ে কোমরবন্ধ এঁটে সোজা চলল স্কোয়ারের জেলখানায়। ফটকের কাছে পাহারারত শান্ত্রীটা রাস্তা আগলে ছাড়পত্র দেখতে চাইল।

—সরে দাঁড়াও বলছি!

—ছাড়পত্র ছাড়া কাউকে ঢুকতে দিতে পারব না।

গ্রিগর খাপ থেকে তলোয়ারের আদ্ধেকটা বের করতেই শান্ত্রীটা দরজা ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

তলোয়ারের হাতলে হাতটা রেখেই গ্রিগর তার পেছু-পেছু ঢুকল গলি-বারান্দায়।

গ্রিগর চেঁচিয়ে উঠল—জেলখানার কমাণ্ডারকে চাই। মুখটা ওর ফ্যাকাশে, ভুরু কোঁচকানো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে কয়েকটা বাচ্চা কসাক ছেলে ছুটে এল ওর কাছে। অফিস থেকে উঁকি দিলে একজন কেরানি। এক মুহূর্ত বাদে কমাণ্ডার এল ঘুম-জড়ানো চোখে রাগ-রাগ ভাব নিয়ে।

—জানো না ছাড়পত্র ছাড়া.. গর্জাতে থাকে লোকটা, কিন্তু গ্রিগরকে চিনতে পেরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তোৎলাতে শুরু করেঃ

—ও, তা আপনি...কমরেড মেলেখফ? কী চাই আপনার?

—জেলখানার চাবি।

—জেলখানার?

—হ্যাঁ, সে কথা কি একশোবার বলতে হবে? চাবিগুলো দে, কুত্তা কাঁহাকা!—গ্রিগর লোকটার দিকে এগিয়ে যায়, আর লোকটা পিছু হটে। কিন্তু বেশ জোর দিয়েই জবাব দেয়ঃ

—চাবি আমি দেব না। আমার সে এক্তিয়ার নেই।

—এক্তিয়ার!— দাঁতে দাঁত পিষে তলোয়ার বের করে গ্রিগর। গলিবারান্দায় নিচু ছাদের নিচে ওর হাতের তলোয়ার সাঁৎ করে একটা চাকার মতো ঘুরে আসে। কেরানি আর ওয়ার্ডার ভড়কে-যাওয়া চড়ুইয়ের মতো পালায়। কমাণ্ডার দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছে, চুণকাম করার চেয়েও সাদা হয়ে উঠেছে মুখখানা। দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে সে বলেঃ

—ওই যে চাবি...কিন্তু আমি নালিশ জানাব।

—হ্যাঁ, নালিশের সুযোগ তোমায় দিচ্ছি! লড়াইয়ের পেছনে থেকে-থেকে ঘেঁতো

হয়ে উঠেছ। কী বীরপুরুষ বুড়োদের গ্রেপ্তার করছেন! তোমাদের
ফটিকে শিক্ষা দিয়ে শিগ্‌গির লড়াইয়ে া, শয়তান,
নইলে যেখানে আছিস সেখানেই মুণ্ডু খসিয়ে দেব।

খাপে তলোয়ার গুঁজে সন্ত্রস্ত কম্যাণ্ডারকে একটি ঘুষি মেরে হাঁটু দিয়ে হাতের মুঠো দিয়ে গুঁতোতে গুঁতোতে গ্রিগর তাকে বাইরের দরজার দিকে ঠেলে দিল আর চেঁচাতে লাগলঃ

—লড়াইয়ে চলে যা! যা চলে এখুনি! হতচ্ছাড়া...খিড়কি-ঘরের ইঁদুর!

লোকটাকে ঠেলে বের করে দিয়ে কয়েদখানার অন্দরের আঙিনায় একটা গোলমালের আওয়াজ পেয়ে সেইদিকে ছোটে গ্রিগর। রসুইখানার দরজার মুখে তিনজন ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে একটা মরচে-ধরা জাপানী রাইফেল। সে হড়বড় করে চেঁচাচ্ছেঃ

—কয়েদখানার ওপর হামলা হয়েছে। লোকটাকে ভাগাতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের সাবেকী আইন।

গ্রিগর পিস্তল বের করে। ওয়ার্ডার মরি-বাঁচি করে রসুইখানার দিকে ছোটে।

ভিড়ঠাসা কয়েদ-ঘরগুলোর দরজা খুলে দিয়ে গ্রিগর হাঁকে—বেরিয়ে এসো সবাই। বাড়ি চলে যাও! সমস্ত বন্দীদের ছেড়ে দেয় সে। একসঙ্গে প্রায় শ'খানেক লোক। যারা বেরুতে ভয় পাচ্ছিল তাদের জোর করে টেনে বার করে। রাস্তায় ওদের তাড়িয়ে দিয়ে কয়েদখানার খালি ঘরে কুলুপ এঁটে দেয়।

কয়েদখানার ফটকের বাইরে ভিড় জমতে শুরু করেছিল। ছাড়া-পাওয়া বন্দীরা দলে-দলে চত্বরে ঢুকে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। রক্ষী কসাকরা সদর দপ্তরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চত্বর ডিঙিয়ে ছুটে আসে কয়েদখানার দিকে—ওদের সঙ্গে কুদীনভ।

শূন্য বন্দীশালা থেকে সবচেয়ে শেষে বেরিয়ে এল গ্রিগর। ভিড় ঠেলে আসতে আসতে কৌতূহলী মেয়েদের লক্ষ্য করে গালিগালাজ ঝাড়ল, তারপর কাঁধদুটো কুঁজো করে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল কুদীনভের কাছে। যে কসাকরক্ষীটা চত্বর পার হয়ে ছুটে আসছিল সে ওকে চিনতে পেরে নমস্কার জানাল। গ্রিগর চেঁচিয়ে বললে ওদেরঃ

—সেপাইরা, তোমরা নিজেদের কোয়ার্টারে ফিরে যাও! দৌড়োচ্ছো কেন? কুইক মার্চ!

—শুনলুম কয়েদখানায় বিদ্রোহ হয়েছে। কমরেড মেলেখফ!

—মিছিমিছি ভয় দেখানো হয়েছে।— জবাব দেয় গ্রিগর।

কসাকরা হাসতে হাসতে, গল্প করতে করতে ফিরে যায়। কুদীনভ লম্বা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে গ্রিগরের কাছে।

—এই যে মেলেখফ! ব্যাপার কী?— বলে ওঠে কুদীনভ।

—তোমার কুশল কামনা করি, কুদীনভ! এইমাত্র তোঃ কয়েদখানা ভেঙে

—কী কারণটা? এ আবার কী খেলা খেলছ?

—সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি। হাঁ করে চেয়ে আছ যে? তোমরা যে মেয়েমানুষ আর বুড়োদের আটক করছিলে তারই বা কারণটা কী? তোমরা কোন্ খেলা খেলছ?

—নিজের মর্জিমতো চলতে যেয়ো না বুঝলে। খুব জবরদস্তি চালাচ্ছ তুমি।

—তোমার গতরটার ওপরও জবরদস্তি করতে পারি! কারগিন থেকে সিধে আমার রেজিমেণ্টকে নিয়ে আসব, তখন বুঝবে জবরদস্তি কাকে বলে!

হঠাৎ গ্রিগর কুদীন চামড়ার পেটি চেপে ধরে কঠিন রাগে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বললেঃ

—যদি চাও এক্ষুনি ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিই। যদি দেহ থেকে প্রাণপাখি ছেড়ে দিতে চাও তো সে ব্যবস্থা এখানেই করে দিচ্ছি।— দাঁত কিড়মিড় করে হাত আল্‌গা করে দেয় ও। মিটমিটিয়ে হাসছিল কুদীনভ। বেল্‌ট্‌খানা ঠিক করে ও গ্রিগরের হাত ধরল।

—আমার ঘরে এসো। অমন চটে যাচ্ছো কেন বলো তো? তোমার চেহারাটা কেমন হয়েছে একবার যদি দেখতে...ঠিক শয়তানের মতো! আমরা এখানে অনেকদিন ধরে তোমার অপেক্ষা করেছি। কয়েদখানা-টানা ওসব সামান্য ব্যাপার। ছেড়ে দিয়েছ, তাতে আর ক্ষতি কী! সেপাইদের বলে দেব যে-সব মেয়েদের স্বামী লালফৌজের সঙ্গে গেছে তাদের ধরা নিয়ে যেন অতটা হৈ-চৈ না করে। কিন্তু এখানে আমাদের কর্তৃত্ব তুমি খাটো করছ কেন? আরে গ্রিগর, তুমি একটি গোঁয়ার গোবিন্দ। ইচ্ছে করলেই তো আমাদের এসে বলতে পারতেঃ বন্দীদের ছেড়ে দিতে হবে, হ্যানো-ত্যানো। আমরা তালিকা যাচাই করে দেখে কয়েকজনকে ছেড়েও দিতে পারতাম। কিন্তু তুমি পাইকিরি ছেড়ে দিলে। পয়লা নম্বরের আসামীগুলোকে যে আলাদা করে রেখেছিলাম সে দেখছি ভালোই হয়েছে, নয়তো ওদেরও তুমি ছেড়ে দিতে...।— গ্রিগরের কাঁধ চাপড়ে ও হাসল।

কুদীনভের মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় গ্রিগর। সদরদপ্তরের সামনে এসে থামে।

—তোমরা আমাদের পাছ-দোরে বসে বড়ো বাহাদুর বনে গেছ। লোকদের ধরে জেলখানা বোঝাই করছ। লড়াইয়ে ময়দানে গিয়ে কেরদানিটা দেখালেই পারতে।

—আমার আমলে আমি তোমার চেয়ে কম কেরদানি দেখাইনি। এখনও দেখাতে পারি। তুমি এসে আমার জায়গাটি নাও, আমি তোমার ডিভিশনের ভার নিচ্ছি।

—না, ধন্যবাদ।

—হ্যাঁ, সেই কথা বলো।

—কিন্তু আমরা বাজে কথা বলে অনেক সময় নষ্ট করলাম। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নেব। ভালো বোধ হচ্ছে না। কাঁধটা জখম।

—ভালো বোধ হচ্ছে না কেন?

—মনটা বড়ো ব্যাকুল।— গ্রিগর মুখ বেঁকিয়ে হাসে।

—যাক্ গে, তামাশা রাখো। কী ব্যাপার বলো তো তোমার? এখানে আমাদের একজন বন্দী ডাক্তার আছে। শুমিলিন্‌স্কে খালাসীদের সঙ্গে জুটেছিল। ও হয়তো তোমাকে দেখতে পারে।

—চুলোয় যাক্ ডাক্তার!

—বেশ, তাহলে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নাও। কাকে ডিভিশনের ভার বুঝিয়ে দিয়েছ?

—রীয়াব্‌চিকভ।

—দাঁড়াও সবুর। এত তাড়া কিসের? লড়াইয়ের খবর কী বলো তো? কাল শুনলাম তুমি নাকি ক্লিমভ্‌স্কিতে একা লড়ে অনেকগুলো খালাসীকে সাবাড় করেছ? সত্যি নাকি?

—চলি তাহলে!— গ্রিগর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যেতে থাকে, কিন্তু খানিকটা গিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেঃ যদি শুনি তোমরা আবার ধরপাকড় শুরু করেছ...।

বেলা পড়ে আসছে। ডনের দিক থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া গড়িয়ে আসে। গ্রিগরের মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বেলে হাঁস উড়ে যায় ডানা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে। ঘোড়াগুলোকে যে-আঙিনাটার মধ্যে রাখা হয়েছিল সেখানে ঢুকবার সময় গ্রিগরের কানে এল নদীর উজানের দিক থেকে কামানের আওয়াজ।

॥ বারো ॥

*

তাতারস্কে এসে অন্য কসাকদের না পেয়ে গ্রিগরের দিনগুলো বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা একঘেয়ে ঠেকে। ছুটিতে ওদের গাঁয়ে ফেরার সুযোগ প্রায় মেলেই না বলতে গেলে। ইস্টার পরবের সময় একবারই মাত্র তাতারস্ক-পদাতিক-ফৌজের আধেকটা গাঁয়ে ফিরেছিল। একদিন সেখানে থেকে, কাপড়জামা বদলে, রসালো ঝলসানো রুটি আর অন্যসব খাবার সঙ্গে নিয়ে তারা ডন পার হল একদল তীর্থযাত্রীর মতো, তবে লাঠির বদলে ওদের হাতে রাইফেল। ইয়েলান্‌স্কা জেলার দিকে মার্চ করে চলে গেল ওরা। তাতারস্কের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মা বোন বউরা দেখল ওদের চলে যাওয়া। হাউ-হাউ করে মেয়েরা কাঁদছিল, উড়ুনি আর শালের খুঁটে চোখ মুছে নাক ঝাড়ছিল ঘাগরার কোণা দিয়ে। ডনের ওপার দিয়ে বালিয়াড়ির ওপর মার্চ করে চলেছে কসাকরাঃ ক্রিস্তোনিয়া, আনিকুশ্‌কা, পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ্‌, স্তেপান আস্তাখভ এবং আরো অনেকে। সঙীনের ফলায় ঝুলছে খাবার-ভর্তি কাপড়ের পুঁটুলি, বাতাসে ভেসে আসছে করুণ সুরে গাওয়া গান, নিজেদের মধ্যে ওরা কথাবার্তা বলছে অলসভাবে। বেশির ভাগই মন-মরা, তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পেটও ভরা আছে। ছুটিতে আসার আগেই ওদের মা বউরা জল গরম করে রেখেছিল, তাই দিয়ে ওদের নাইয়ে গায়ের যতো ময়লা ধুইয়ে দিয়েছে তারা। চুল আঁচড়ে বেছে দিয়েছে রক্ত-খেয়ে-ফুলে-ওঠা উকুন। ওদের মধ্যে ষোল-সতের বছরের ছোকরাও ছিল ক'জন, সবে তারা বিদ্রোহীদের ফৌজে যোগ দিয়েছে। গরম বালির ওপর বুক ফুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে আর কী এক অজ্ঞাত কারণে খুব খুশি হয়ে গান গাইছে, বক্‌বক্‌ করছে। ওদের কাছে যুদ্ধটা একটা নতুন জিনিস, নতুন খেলার মতো। লড়াইয়ের প্রথম দিকে ওরা এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর মাথা উঁচু করে শিস-কেটে ছুটে যাওয়া বুলেটের আওয়াজ শুনত। লড়াইয়ের সামনের সারির কসাকরা ওদের ঠাট্টা করত "কাঁচা বাছুর" বলে। বয়স্ক কসাকরা ওদের গড়খাই কাটা শেখাত, গুলি ছোঁড়া, রসদ কাঁধে নিয়ে মার্চ্‌ করা এমন-কি উকুন বাছার কায়দা আর ভারী বুট পরে যাতে চট্‌ করে হয়রান হয়ে না পড়ে তার জন্য পায়ে পটি বাঁধার কৌশলটাও শিখিয়ে দিত। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ছেলেগুলো অবাক পাখির মতো বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকত আশপাশের দুনিয়ার দিকে, পরিখা থেকে মাথা তুলে তাকিয়ে থাকত দারুণ কৌতূহল নিয়ে—লাল-রক্ষীদের দেখবার আশায়। এদিকে ওদের গা ঘেঁষে ছুটে যেত লালরক্ষীদের বুলেট।

কপালে মরণ থাকলে ষোলবছর বয়সের "সেপাই" চিৎপাত পড়ে থাকত নিটোল ছেলেমানুষী হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে। তারপর তাকে কাঁধে করে বয়ে আনা হত তার দেশ-গাঁয়ে, তার পূর্বপুরুষরা যেখানে পচেছে সেই মাটিতে কবর দেবার জন্য। হয়তো তার মা এল দেখতে, হাত মোচড়াতে মোচড়াতে মরা ছেলের বুকে আছড়ে পড়ে মাথার পাকা চুল ছিঁড়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। তারপর যখন কবর দেওয়া হয়ে গেল, ঢিবির মাটি শুকনো হতে শুরু করল, তখন বয়েসের ভারে নুয়ে-পড়া বুড়ি মা মনের অদম্য শোক নিয়ে গেল গির্জায়, সেখানে তার মরা ছেলেকে 'স্মরণ' করবে বলে।

কিন্তু বুলেটে মারাত্মক রকম ঘায়েল না হলে তখনি শুধু ওদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় যুদ্ধ কী নির্মম বস্তু। তখন ঠোঁট কাঁপে, কুঁচকে ওঠে। "সেপাই" তখন ছেলেমানুষী গলায় কেঁদে ওঠে 'মা, মাগো' বলে। চোখ দিয়ে ছোট ছোট জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি রাস্তাহীন মাঠের ভেতর দিয়ে ছোটার সময় ঝাঁকুনি দিতে থাকে, কোম্পানির ডাক্তার অফিসার জখমের জায়গা ধুয়ে হাসিমুখে সান্ত্বনা দেয় ছোট-ছেলে ভোলাবার মতোঃ 'ছি ভানিয়া, ছিঁচ্-কাঁদুনের মতো কোরো না!' কিন্তু "সেপাই" ভানিয়া তখন কাঁদবেই, বাড়ি যেতে চাইবে, মাকে ডাকবে। যদি ভালো হয়ে ফৌজে ফিরে আসে তাহলে অবিশ্যি লড়াই সম্পর্কে সে রীতিমতো ওয়াকিবহাল হতে শুরু করবে। আরো দু'এক হপ্তা লড়াই, সঙীন-যুদ্ধ হলেই তারপর দেখা যাবে সে হয়তো একজন বন্দী লাল সেপাইয়ের সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তার মুখে আর-পাঁচজন সার্জেন্ট-মেজরের মতোই থুতু ছুঁড়ছে আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিস্ হিস্ করে বলছেঃ

—ওরে বেটা চাষী, বেজন্মা, তাহলে ধরা পড়েছিস! বড়ো যে জমি চাইছিলি? সমান সমান হতে চেয়েছিলি? তুই নিশ্চয় কমিউনাক। বল্ না রে এই গোখ্রো!— বাহাদুরি আর "কসাক" তেজ দেখাবার জন্য সে রাইফেল তুলে গুঁতো মারবে সেই লোকটিকে যে ডনের মাটিতে এসেছে মৃত্যু বরণ করে নিতে, লড়েছে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের জন্য, কমিউনিজমের জন্য, পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে চিরতরে মুছে দেবার জন্য।

তারপর, মস্কো অথবা ভিয়াৎকা প্রদেশের কোথাও, কিংবা বিরাট সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কোনো এক নিরালা পল্লীতে কোনো মা হয়তো খবর পাবে তার ছেলে "জমিদার আর পুঁজিপতিদের জোয়াল থেকে মেহনতী মানুষদের মুক্তি দিতে গিয়ে শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে।" খবরটা সে বার-বার করে পড়বে, গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নামবে তার। শোকের আগুনে ধিকি-ধিকি জ্বলবে মায়ের হৃদয়, মৃত্যুর শেষ দিনটি অবধি সে স্মরণ করবে তার গর্ভের সন্তানকে, যাকে সে জন্ম দিয়েছিল রক্তস্নানে আর জঠর-যন্ত্রণায়, শত্রুর হাতে যে প্রাণ দিল অজানা ডন অঞ্চলের কোনো এক জায়গায়।

তাতারস্ক্ পদাতিক বাহিনীর সেই আধ কোম্পানি সেপাই নদীর বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে চলেছে লালচে বেতস বনের ভেতর দিয়ে। খোশমেজাজে নিশ্চিন্ত মনে এগোচ্ছে ছেলেছোকরারা। বুড়োরা এগোচ্ছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গোপনে চোখের জল লুকিয়ে। এখন লাঙল ঠেলার সময়, জমিতে মই দেওয়া, ফসল বোনার সময়; মাটি ওদের ডাক দিয়েছে, দিন-রাত শুনেছে ওরা মাটির ডাক, তবু ওদের যেতে হয় লড়তে, অচেনা অজানা গ্রামে গিয়ে মরতে হয় জোর করে-চাপানো এই কর্মহীনতা, ভয়, অভাব আর আকুতির মধ্যে। ছোট সংসারটির কথা ভাবে সৈনিক, ভাবে তার চাষবাসের হাতিয়ার আর গাইগরুর

কথা। সবকিছুতেই চাই বেটাছেলের হাতের ছাপ। কর্তার নজর না থাকলে সংসার অচল। আর কতোটা পারে? জমি শুকিয়ে যায়, ফসল ফ , সামনের বছরে তো অজন্মার ভয়।

বুড়োরা তাই নীরবে হেঁটে চলে বালির ওপর দিয়ে। ওরা একবার শুধু চঞ্চল হয়ে উঠল যখন এক ছোকরা একটা খরগোশ মারতে গিয়ে গুলি ছুঁড়ে বসল। একটা তাজা বুলেট এভাবে নষ্ট হাত দেখে অপরাধীকে শাস্তি দেবার ইচ্ছে হল ওদের। যতো রাগ গিয়ে পড়ল ছেলেটির ওপর।

পান্তালিমন বললে—চল্লিশ ঘা লাগিয়ে দাও।

—বড্ডো বেশি হয়ে যাবে। তারপর আর লড়াইয়েই যেতে পারবে না।

ক্রিস্তোনিয়া গজ্‌গজ্‌ করে ওঠে—ষোলো ঘা।

ষোলোই ঠিক হল। অপরাধীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওরা পাৎলুন টেনে নামায়। ক্রিস্তোনিয়া ওর ভাঁজ-করা ছুরিখানা দিয়ে পুসি-উইলোর হলদে নরম শিষে ঢাকা নরম ডাল কাটে। আনিকুশ্‌কা ঘা কষায়। অন্যরা সবাই গোল হয়ে ঘিরে বসে চুরুট টানে। তারপর আবার চলতে শুরু করে সবাই। ওদের পেছনে পা টেনে-টেনে এগোয় ভুক্তভোগী ছেলেটা, চোখ মোছে আর পাতলুনটাকে গা থেকে আল্‌গা করে রাখে।

বালির চরের শেষ কিনারায় এসে কালো মাটির জমিতে পা দিয়েই কসাকরা চষা খেতের ওপর ঝুঁকে পড়ে, প্রত্যেকে একেক খাবলা শুকনো রোদ-পোড়া মাটি তুলে নিয়ে হাতের মুঠোয় কচলাতে থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেঃ

—মাটি তো এখন তৈরি।

—আর তিন দিন পার হয়ে গেলে ফসল বোনা চলবে না।

—ডনের এপারে যেন একটু তাড়াতাড়িই মরশুম এল!

—হ্যাঁ মরশুম আগে এল ঠিকই। দ্যাখো না, পাহাড়ে এখনো বরফ রয়েছে।

দুপুরবেলায় জিরোবার জন্য থামে ওরা। পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ্‌ শাস্তি-পাওয়া ছেলেটিকে খানিকটা টক দুধ খাইয়ে দেয়। রাইফেলের নলচের সঙ্গে নেকড়ার পুঁটুলিতে বেঁধে এনেছিল আর সারা রাস্তা জল চুঁইয়ে পড়েছে পু্‌টুলি থেকে। দুধটা ওকে দেবার সময় পান্তালিমন বললেঃ

—বোকা ছেলে, বড়োদের ওপর রাগ করিস্‌নি। ওরা তোকে চাবকেছে বটে কিন্তু তার জন্য মুষড়ে পড়ার কি আছে!

—পান্তালিমন দাদু, ওরা যদি তোমায় ধরে চাব্‌কাতো তাহলে অন্য সুরে কথা কইতে।

—ওর চেয়েও খারাপ জিনিস গেছে আমার ওপর দিয়ে, বুঝলে বাছা। একবার আমার বাপ গাড়ির জোয়াল দিয়ে পিটিয়েছিল।

—গাড়ির জোয়াল?

—গাড়ির জোয়ালই তো বল্‌ছি রে, তবে কি? দুধটা খেয়ে নে! অমন হাঁ করে চেয়ে আছিস কেন? সকালে তোর যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি বুঝি?

* *

তাতারস্কে আসার পরের দিন সকালে গ্রিগর নাতালিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেল বুড়ো গ্রিশাকা আর ওর শাশুড়ীকে দেখতে। লুকিনিচ্‌না ওদের দেখে কেঁদেই ফেললে।

—ওরে গ্রিশা, খোকা রে! আমাদের মিরন মরে গেল, কোথায় দাঁড়াব, ওর আত্মার শান্তি হোক। এখন আমাদের জমিজিরেতের কাজ কে করে দেবে বল্? গোলাঘরে বীজ বোঝাই, কিন্তু বোনার কেউ নেই। এখন আমরা অনাথ, কেউ চায় না আমাদের, কেউ যেন চেনেই না, ধারও ধারে না। ...দ্যাখ্ বাছা। খামারটা আমাদের একেবারে নিকেশ হয়ে গেল। মেরামত করতেও কেউ এগিয়ে আসে না।

বাস্তবিকই খামারটা চোখের ওপর দিয়ে যেতে বসেছে। আঙিনায় চারদিককার বেড়া উলটে গেছে, চালাঘরের মাটির দেয়াল বর্ষার জলে গলে গিয়ে ধসে পড়ার জোগাড়। ফসল মাড়াইয়ের উঠোনে বেড়া নেই, আঙিনায় আবর্জনা জমে আছে, জং ধরা ভাঙা খামার কল পড়ে আছে চালার নিচে। চারদিকে ছন্নছাড়া, ক্ষয়ের চিহ্ন।

খামার বাড়ির উঠোন দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আপনা থেকেই যেন গ্রিগরের মনে হয়—ঘরের কর্তা নেই বলে সবই নয়-ছয় অবস্থা।— ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দেখে নাতালিয়া তার মার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে। ও আসতেই নাতালিয়া চুপ করে গিয়ে মন-ভোলানো মিষ্টি হাসি হাসে।

বলে—মা এইমাত্র বলছিলেন গ্রিগর...। তুমি যদি কাল একটু জমি দেখতে যেতে। এক আধ একর জায়গায় হয়তো বীজ বুনেও আসতে পারো।

—কিন্তু বোনার দরকার কি বলো তো তোমাদের? পিপেগুলো তো ময়দায় ঠাসা।

লুকিনিচ্‌না হাতে তালি বাজায়।—কিন্তু গ্রিশা, মাটিটার কী দশা হবে? আমাদের মিরন বেঁচে থাকত তো অনেকখানি করে জায়গা লাঙল দিয়ে রাখত।

—বেশ তো, কী হল তাতে? পড়েই থাকবে না হয়! এবার শীতের আগে যদি বেঁচে থাকি তো ফসল বুনব।

কিন্তু লুকিনিচ্‌না গোঁ ছাড়ে না, চটে যায় গ্রিগরের ওপর, শেষে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটদুটো ফুলিয়ে বলে—বেশ তো, তোমার যদি অবসর না থাকে...। কিন্তু আমাদের একটু মদত দেবার কেউ রইল না।

—তা বেশ তো! কালই যাচ্ছি আমাদের নিজেদেরটা বুনতে, সেই সঙ্গে তোমারও দু'একর করে দেব'খন। তাতেই অনেক হবে। গ্রিশাকা বুড়ো তো বেঁচে বর্তেই আছে, কেমন?

—বাঁচালি তুই বাঁচালি।— লুকিনিচ্‌না সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে ওঠে—আজ আগ্রিপিনাকে বলে দেব বীজটা তোর কাছে দিয়ে আসতে। বুড়ো কর্তা? ঈশ্বর তো এখনো তাকে কাছে ডেকে নিলেন না। বেঁচে তো আছে, তবে মাথাটা যেন কেমন একটু হয়েছে। সারাক্ষণ বসে থাকে ঘরে আর সারারাত ধরে শাস্তর পাঠ করে। মাঝে মাঝে খালি কথাই বলে, কথাই বলে, কিন্তু সব আজে বাজে গির্জাঘরের বক্তিমে। একবার গিয়ে দেখে আসতে পারিস—ঘরেই আছে।

নাতালিয়া বলে—এইমাত্র আমি দেখে এলাম।— গাল দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে ওর। একটু হেসে আবার বলেঃ

—উনি বললেন, 'অকম্মার ঢেঁকি' একবার দেখতেও আসিস্‌না? আর ক'দিনই বা বাঁচব। তোর আর আমার নাতি-নাতনিগুলোর কথা মনে করে ঈশ্বরকে একটু ডাকব। এখন আমি কবরের মাটির আশায় বসে আছি রে নাতালিয়া। মাটি আমায় ডাকছে। আর যাওয়ার সময় হল!

বুড়োকে দেখতে যায় গ্রিগর। ওর নাকে আসে ধুপের বাস, ছাতা-পড়া পচাটে

গন্ধ, বুড়ো জবুথবু মানুষের গন্ধ। এখনো গ্রিশাকার গায়ে সেই পুরনো ছাই-রঙা উর্দিটা। পাতলুনটা ভালোই আছে, উলের মোজায় রিফু। নাতালিয়ার বিয়ের পর বুড়োকে দেখাশোনা করে তার মেজো নাতনি আগ্রিপিনা। নাতালিয়া আগে যতোখানি মমতা আর যত্ন নিয়ে বুড়োকে দেখত আগ্রিপিনাও ততোটাই করে। বুড়োর হাঁটুর ওপর একখানা বাইবেল। চশমার তলা দিয়ে তাকাল গ্রিগরের দিকে, তারপর ঠোঁট ফাঁক করে হাসতেই দেখা গেল দাঁতগুলো।

বুড়ো বললে—এই যে সেপাই, এখনো আস্ত রয়েছ তাহলে? ভগবান্ তোমায় বুলেটের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। জয় হোক তাঁর! বোসো বোসো।

—আপনি এখনো বহাল তবিয়তেই আছেন দাদু?

—অ্যাঁ?

—বলছি ভালো আছেন তো?

—অদ্ভুত ছোকরা হে তুমি। এ বয়সে কী করে ভালো থাকতে পারি? এখন তো প্রায় একশো হল। তবু মনে হয় এই তো মাত্র সেদিন লাল চুল নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, জোয়ান, তাজা। আর আজ যেন ঘুম থেকে উঠে দেখছি সব ঝরে গেল। গ্রীষ্মের দিনের মতো কোথা দিয়ে কেটে গেল জীবনটা। কফিনখানা এত বছর ধরে পড়ে আছে চালাঘরে, অথচ মনে হচ্ছে যেন ঈশ্বর আমায় ভুলেই গেছেন। মাঝে মাঝে প্রার্থনা করিঃ হে প্রভু, একবার করুণাময় দৃষ্টি ফেরাও তোমার গ্রিশাকার দিকে।

—আপনি কিন্তু আরো অনেকদিন বাঁচবেন বুড়ো-দা। বত্রিশ পাটি দাঁত রয়েছে মুখে।

—দাঁত! হা-রে ছোকরা, তুই যে কী!—

গ্রিশাকা বিরক্ত হয়ে ওঠে—প্রাণ যখন দেহ ছেড়ে বেরুবার পথ খোঁজে তখন কি আর দাঁত দিয়ে আটকে রাখা যায়! তাহলে তোরা এখনো লড়াই চালাচ্ছিস্?

—হাঁ এখনো লড়ছি।

—তাই তো বলছি। কিন্তু কী নিয়ে লড়ছিস বল্ তো? তোরা নিজেরাই জানিস্নে। অথচ এ সবই ঈশ্বরের লীলা, তারই হুকুমে সব হচ্ছে। পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে যাবে। ঈশ্বরের উল্টো পথ আমরা ধরেছি, লোকে মাথা তুলেছে মালিক কর্তাদের বিরুদ্ধে। দেশ-শাসনের ব্যাপার তো ঈশ্বরেরই বিধান। যদি খৃষ্টের দুশমনের গভর্নমেন্টও হয় তবু তা ঈশ্বরেরই দেওয়া। মিরনকে তাই বলছিলামঃ 'মিরন, কসাকদের তোরা জাগাস্নি, গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু বলিস্নি, পাপের দিকে আর ঠেলে দিস্নি লোকদের।' কিন্তু ও বললেঃ 'না বাবা, আর বরদাস্ত হচ্ছে না। আমাদের জাগতে হবে, এ গভর্নমেন্টকে ধ্বসাতে হবে; আমাদের পথে বসিয়ে ছাড়ল। আগে মানুষের মতো বুক ফুলিয়ে থাকতাম আর এখন হয়েছি বুড়ো হাবড়া।' কিন্তু ও ভুলে গিয়েছিল 'যারা বাঘের সাথে লড়ে তারা বাঘের হাতেই মরে'। সত্যি কথাই। লোকে বলে তুমি নাকি জেনারেল হয়েছ, একটা ডিভিশনের হর্তাকর্তা। তাই নাকি হে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তোমার তক্মা কই?

—আজকাল আর ওসব নেই আমাদের।

—আজকাল আর নেই! তাহলে তুই কোন্ ছার জেনারেল? আগের দিনে জেনারেলদের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সুখ হতঃ কেমন সব নধরকান্তি, গণেশের মতো

পেট, কেউকেটার মতো চেহারা। আর তুই এখন...তাকিয়ে দ্যাখ্ নিজের দিকে! কাদামাখা জোব্বাকোট, তক্মা নেই পদক নেই, বুকে সাদা দাড়ি নেই। তোরা হচ্ছিস্ উকুন, উকুনে খাওয়া।

গ্রিগর হাসিতে ফেটে পড়ে। কিন্তু গ্রিশাকা তিক্তকণ্ঠে বলে চলেঃ

—হাসিস্নি রে হতভাগা! তোরা মানুষকে মরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছিস, সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিস। ভয়ানক পাপ করেছিস তোরা। যাহোক্ তবু ওরা তোদের নাশ করবে, সেইসঙ্গে আমাদেরও। ঈশ্বরই তোদের জানাবেন তাঁর ইচ্ছা কী। বাইবেলে আমাদের একালের হাঙ্গামার দিনগুলোর কথা পরিষ্কার বলা আছে। শোন্ তোকে গুরু জেরেমিয়ার ভগবদ্বাক্য পড়ে শোনাই।

বুড়ো হলদে আঙুল দিয়ে বাইবেলের হলদে-পাতা উলটিয়ে পড়তে শুরু করে, প্রত্যেকটা অক্ষর উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে :

—"জাতিগুলির সম্মুখে ঘোষণা করো, প্রচার করো, ধ্বজা তুলিয়া ধরো। প্রচার করো, গোপন করিও না; বলো, বাবিলন শত্রুর হস্তগত, বেল-দেব ভুলুণ্ঠিত, মেরোদাখ্-দেবতা খণ্ড-বিখণ্ড; বাবিলনের বিগ্রহ কলুষিত, তাহার প্রতিমূর্তি গুঁড়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে।"

"উত্তরের দিক হইতে একটি জাতি আগাইয়া আসিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে, বাবিলন ভূমিকে তাহারা ছারখার করিয়া দিবে, কেহই সেখানে আর বসবাস করিবে না। মানুষ পশু সকলেই সেখান হইতে সরিয়া যাইবে, বিদায় লইবে।"

—বুঝেছিস তো গ্রিশা? উত্তর দিক থেকে তারা আসছে, আমাদের বাবিলনীয়দের তারা বন্দী করছে, তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই জায়গাটা শোন্ঃ

—"ঈশ্বর বলিলেন, এই দিনগুলিতে, ঠিক এই সময়েই, ইস্রাইলের সন্তানগণ আসিবে, জুডার সন্তানগণের সহিত একযোগে তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিবে। তাহারা আসিয়া তাহাদের প্রভু ঈশ্বরকে সন্ধান করিবে।"

"আমার প্রজাবৃন্দ যূথভ্রষ্ট মেষের মতো; তাহাদের রাখালগণই তাহাদের ভুল পথে লইয়া গিয়াছে, পাহাড়ের দিকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছেঃ তাহারা পাহাড় হইতে পর্বতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, বিশ্রামের স্থান খুঁজিয়া পায় নাই।"

গ্রিগর এই সেকেলে ভাষার খানিকটা বুঝল, খানিকটা বুঝল না। প্রশ্ন করল—কিন্তু তুমি বলতে চাচ্ছ কী? এসবের কী মানে আমরা বুঝব?

—ওরে হতচ্ছাড়া, বুঝবি এই যে তোরা যারা মানুষগুলোকে নাকাল করছিস, তোরা পালাবি পাহাড়ের দিকে। আর তোরা তো কসাকদের রাখাল নোস্, নিজেরাই বোকা ভেড়ার অধম। কী করছিস তা তোরা জানিস না। শোন্ এই কথাটাঃ "যাহারাই উহাদের পাইল খাইয়া ফেলিল।" এই তো দ্যাখ তাহলে! উকুনগুলো আমাদের খেয়ে শেষ করছে কিনা?

গ্রিগর স্বীকার করে—তা অবিশ্যি উকুনের হাত থেকে রেহাই নেই।

—তাহলেই দ্যাখ মিলে যাচ্ছে হুবহু। আবার শোন্ঃ "উহাদের শত্রুরা বলিল—আমাদের তো কোনো অপরাধ নাই, কারণ উহারা ন্যায়ের রক্ষক প্রভুর বিরুদ্ধে পাপকার্য করিয়াছে, তাহাদের পিতৃপুরুষদের ভরসাস্থল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে।"

"বাবিলনের মধ্যস্থল হইতে সরিয়া যাও, চাল্ডীয়দের দেশ হইতে চলিয়া যাও, মেষপালের সম্মুখে পুরুষ-মেষের ন্যায় হও।"

"কারণ আমি উত্তরের দেশ হইতে বাবিলনের বিরুদ্ধে অসংখ্য বৃহৎ জাতিকে সমাবিষ্ট করিব; তাহারা ব্যূহ-রচনা করিয়া দাঁড়াইবে; সেখান হইতেই তাহারা বাবিলন দখল করিবে; কুশলী বীরের ন্যায় তাহারা তীর ছুঁড়িবে; কেহই ব্যর্থ হইয়া ফিরিবে না।"

"আর চাল্ডীয়া হইবে লুণ্ঠিত। যাহারা সে দেশ লুণ্ঠন করিবে তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে (প্রভু তাহাই বলেন); যেহেতু তোমরাও (এক সময়) আনন্দ করিয়াছিলে, তোমরাও তৃপ্ত হইয়াছিলে, আমার ঐতিহ্যনাশকারীগণ..."

গ্রিগর বাধা দিয়ে বললে—গ্রিশাকা দাদু! তুমি বরং একটু সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলো। এসব আমি কিছু বুঝতে পারছি না।— বুড়ো কিন্তু ঠোঁট চিবিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাকাল ওর দিকে, তারপর জবাব দিলেঃ

—এই শেষ হল বলে। শোনো! "...যেহেতু তোমরাও ঘাস খাইয়া মহিষের ন্যায় স্থূল হইয়াছে, বৃষের ন্যায় ডাকিতেছ। তোমাদের জননী তীব্রভাবে নিন্দিত হইবে, তোমাদের গর্ভধারিণী লজ্জায় পড়িবে। যে দেশ সর্বাপেক্ষা পিছনে পড়িয়া আছে তাহা শুষ্ক ভূমি মরুদেশে পরিণত হইবে। ঈশ্বরের ক্রোধের ফলে তাহাতে জনপ্রাণী থাকিবে না, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইবেঃ বাবিলনের পাশ দিয়া যাহারাই যাইবে তাহারাই আশ্চর্য হইবে, বাবিলনের দুঃখযন্ত্রণা দেখিয়া তাহারা আপশোস করিবে।"

গ্রিগর এবার একটু বিরক্ত হতে শুরু করেছে, ও আবার মিনতি করে বলে—আচ্ছা এসবের কী মানে?

বুড়ো কোনো জবাব না দিয়ে বাইবেল বন্ধ করে রেখে চুল্লীর ধারে শুয়ে পড়ে। ঘর থেকে বেরুবার সময় গ্রিগর ভাবে—সবাই এইরকমই হয়। জোয়ান বয়েসে ফূর্তি করে কাটায়, ভদ্‌কা খায়, আর-সকলের মতো নানা বদ কাজ করে। তারপর জোয়ান-বয়েসে যে যতো-বেশি পাগলামো করেছে সে বুড়ো হয়ে ততো ভগবানের মার থেকে বাঁচবার চেষ্টা করে। এই তো গ্রিশাকা বুড়ো, নেকড়ের মতো দাঁতের পাটি। বুড়ো যখন কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ঘরে ফিরত তখন নাকি গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে ওর জন্য পাগল, সবাই এসে ওর পায়ে পড়ত। আর এখন...বুড়ো বয়েস অবধি বেঁচে থাকলেও আমি কিন্তু ওরকমটি হতে পারব না। আমি তো বাইবেল-বিশারদ নই!

শ্বশুরবাড়ি থেকে নাতালিয়া আর গ্রিগর ফিরে আসার সময় গ্রিগর ভাবছিল বুড়োর সঙ্গে ওর আলাপের কথা, বাইবেলের রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় "ভবিষ্যদ্বাণীর" কথা। নাতালিয়াও মুখ বুজে হাঁটছে। এবার ওর স্বামী ফিরে আসার পর ও অস্বাভাবিকরকম নিস্পৃহ, কারগিন জেলার মেয়েদের সঙ্গে গ্রিগরের ফষ্টিনষ্টির খবর নিশ্চয় আগেই ওর কানে পৌঁছেছিল। যে রাতে গ্রিগর ফেরে সে-রাতে ওর বিছানা করে দিয়েছিল বড়ো-ঘরে আর নাতালিয়া নিজে শুয়েছিল সিন্ধুকের ওপর ভেড়ার-চামড়া গায়ে দিয়ে। তিরস্কার করে একটি কথাও বলেনি সে, কোনো প্রশ্নও করেনি। সে রাতে গ্রিগরও কোনো কথা বলেনি, নাতালিয়া অমন অস্বাভাবিক রকম উদাসীন কেন সে প্রশ্ন ওকে আপাতত না জিজ্ঞেস করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল সে।

নির্জন রাস্তা ধরে চুপচাপ হেঁটে চলেছে ওরা, এখন যেন আগের চেয়েও দূর বলে মনে হচ্ছে পরস্পরকে। একটা গরম আরামদায়ক হাওয়া আসছিল দক্ষিণ দিক থেকে। পশ্চিমের আকাশে জমছে সাদা মেঘ। বহু দূরে মেঘের ক্ষীণ গর্জন। সারা গাঁ ম-ম করছে ফুটন্ত ফুলের কুঁড়ি আর ভিজে কালো মাটির স্নিগ্ধ প্রাণোচ্ছল সৌরভে। ডন-নদীর নীল জলে সাদা কেশর দুলিয়ে ঢেউ ছুটেছে। পাহাড়ের ঢাল বরাবর মখমল-কালো

গালিচার মতো চষা জমি, তারই নিচের দিক থেকে বাষ্প ওঠে, ডনপাড়ের পাহাড়ের ওপর দিয়ে কুয়াশার মেঘ ভেসে যায়। ঠিক রাস্তাটার ওপর মাতালের মতো গান গেয়ে চলেছে একটা ভারুই পাখি, শিস্ দিচ্ছে পাহাড়ী ইঁদুর। বিপুল ফল-সম্ভার আর প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে উদ্বেল এই মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশে কিরণ দিচ্ছে গর্বোন্নত এক উত্তুঙ্গ সূর্য।

গাঁয়ের মাঝখানে বানের জলে কল্‌কলিয়ে উঠা একটা নালা। ছোট্ট পুলটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় নাতালিয়া। জুতোর ফিতে বাঁধার ছলে ও নিচু হয় কিন্তু আসলে মুখ লুকোয় গ্রিগরের কাছ থেকে। জিজ্ঞেস করেঃ

—কথা বলছ না কেন?

—কী নিয়ে কথা বলব বলো?

—অনেক কিছু আছে বলার। কারগিনে কেমন মাতলামি করলে, কেমন করে বেশ্যাদের পেছনে ঘুরলে সে-সব তো বলতে পারো আমায়...

—কিন্তু তুমি তো জানোই...। — তামাকের থলিটা বের করে একটা সিগারেট পাকাতে শুরু করে গ্রিগর। একবার কি দু'বার ধোঁয়া ছাড়ে। এবার ওর প্রশ্ন করার পালাঃ

—তাহলে এসব কথা তুমি শুনেছ? কে বললে তোমায়?

—বলছি যখন তখন নিশ্চয়ই জানি ব্যাপারটা। গাঁয়ের সবাই জানে, তাই আমাকেও বলার লোকের অভাব হয়নি।

—বেশ তো, জানোই যখন তখন আর নতুন করে কী বলব?

গট্ গট্ করে হাঁটে গ্রিগর। ওর পায়ের আওয়াজ আর সেই সঙ্গে নাতালিয়ারও আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলার শব্দ বসন্তের স্বচ্ছ নীরবতার মধ্যে পরিষ্কার কানে বাজে। খানিকক্ষণ একটিও কথা না বলে চোখের জল মুছে নাতালিয়া হাঁটে। তারপর গ্রিগরের হাতটা চেপে ধরে কান্নায় বুজে-আসা গলায় জিজ্ঞেস করেঃ

—তাহলে আবার তোমার সেই পুরনো খেলা শুরু করেছ!

—চুপ করো, নাতালিয়া!

—হতচ্ছাড়া কুকুর, কোনোদিন তোমার শখ মিটবে না! আবার আমায় জ্বালাতে শুরু করেছ কেন?

—অন্য লোকের মিছে কথায় কান দেওয়াটা কমাও।

—কিন্তু এইমাত্র তুমি নিজেই স্বীকার করেছ।

—ওরা যতোটা না সত্যি কথা বলেছে তার চেয়ে বানিয়ে বলেছে ঢের বেশি। সে তো বোঝাই যাচ্ছে। আমার বিশেষ দোষ নেই।... দোষ দিতে হয় আমাদের এই জীবনকেই। সারাক্ষণ মরণের মুখোমুখি, মাঝে মাঝে একেকবারে লাঙল-চষা জমিতে গুঁড়ি মেরে আসা...

—তোমার ছেলেপিলেদের কথা ভাবো? ওদের মুখের দিকে তাকালে তোমার লজ্জা হয় না?

—লজ্জা! হুঃ!— দাঁত বের করে হাসে গ্রিগর। তারপর বলে—কীভাবে লজ্জা পেতে হয় তাই ভুলে গিয়েছি। সব কিছু যখন তালগোল পাকিয়ে ছন্নছাড়া তখন লজ্জা পাব কেমন করে? কেবল মানুষ খুন করে যাচ্ছি। এত হুড়োহুড়ি কিসের জন্য তাই বা কে জানে।... কিন্তু কীভাবে তোমাকে বোঝাই? তুমি কখনো বুঝবে না। তোমার

মধ্যে যে কথা কইছে সে এক নিষ্ঠুর মেয়েমানুষ। তুমি কখনো বিশ্বাসই করবে না আমার বুকের মধ্যে কি যন্ত্রণা হয়।... শেষে ভদ্‌কা খেতে শুরু করলাম। সেদিন তো অজ্ঞানই হয়ে পড়েছিলাম।... কিছুক্ষণ হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে শরীর আমার ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল...। —গ্রিগরের মুখটা কালো হয়ে আসে, কথা বলতে কষ্ট হয় ওর। আর পারি না আমি, যন্ত্রণা ভুলবার জন্য যাহোক একটা হলেই হল, ভদ্‌কা কি মেয়েমানুষ। সবুর! শেষ করতে দাও কথাটা। বুকের এইখানটা কে যেন শুষে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে আমাকে, কেবলই নিংড়ে নিচ্ছে। জীবনটা ভুল পথে চলতে শুরু করেছে, হয়তো বা এ ব্যাপারেও আমি ভুলই করে থাকব।... আমাদের উচিত লালফৌজের সঙ্গে সন্ধি করে ক্যাডেটদের আক্রমণ করা। কিন্তু কেমন করে? সোভিয়েতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেবে কে? আমাদের দুপক্ষেরই যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার হিসেবনিকেশ হবে কেমন করে? কসাকদের অর্ধেকই তো দনিয়েৎসের ওপারে, যারা পেছনে রয়ে গেছে তারাও পাগল হয়ে গেছে।... নাতালিয়া, আমার মগজের মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তোমার গ্রিশাকা দাদু বাইবেল পড়ে শোনাচ্ছিল আর বলছিল আমরা ঠিক কাজ করিনি। আমাদের বিদ্রোহ করা উচিত হয়নি। তোমার বাবাকেও গালাগাল করছিল।

—দাদুর মাথার ঠিক নেই। এখন তোমাকেই সামলাতে হবে সব।

—বিচার বিবেচনা করার আর তো কোনো রাস্তা নেই। আর কারুর মতামতও জানার উপায় নেই।

—হ্যাঁ, আমাকে আর বোঝাবার চেষ্টা কোরো না। আমার সঙ্গে অন্যায় করেছ, নিজে তা স্বীকারও করেছ। কিন্তু এখন সব দোষ চাপাচ্ছ লড়াইয়ের ঘাড়ে। তোমরা সবাই সমান। তোমার জন্য তো আমি একটু আধটু নয়, ঢের দুঃখ পেয়েছি। সেবারই কেন মরে গেলাম না ভেবে আপশোস হয়।...

—এ নিয়ে আর বেশি কথা বলার মানে হয় না। যদি তোমার খুব দুঃখ হয়ে থাকে, কাঁদো। কাঁদলে মেয়েদের যন্ত্রণা কমে। কিন্তু এখন আমি তোমায় সান্ত্বনা দিতে পারব না। মানুষের রক্ত নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি করেছি যে কারুর জন্য আমার মনে আর এখন দয়ামায়া নেই। লড়াইয়ে সব শুকিয়ে গেছে! বড়ো কঠিন হয়ে গিয়েছি আমি।... আমার বুকের ভেতরটা তাকিয়ে দ্যাখো, ঠিক খালি কুয়োর মতো কালো অন্ধকার।...

ওরা প্রায় বাড়ি এসে উঠেছে এমন সময় শুরু হল বৃষ্টি—তেরছা হয়ে পড়ছে, ছুঁচ ফোটানোর মতো। রাস্তায় ধুলো মরে গেল। ছাদের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা চড়বড় করে। বেশ তরতাজা ঠাণ্ডার আমেজ একটা। জোব্বাকোটের বোতাম খুলে গ্রিগর নাতালিয়াকে ঢেকে দেয়, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওকে। কাঁদছিল নাতালিয়া। একখানা কোটের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে পরস্পরকে চেপে ধরে সেইভাবেই উঠোনে ঢোকে দুজনে।

সন্ধ্যার সময় লাঙলটা উঠোনে তৈরি রাখে গ্রিগর। সীমিয়ন মিস্ত্রির পনের বছরের ছেলেটা বাপের কাছ থেকে পৈতৃক ব্যবসা শিখে নিয়েছিল, তাতারস্কে ও-ই এখন একমাত্র মিস্ত্রি। পুরনো লাঙলটার সঙ্গে ফলা জুড়ে দেয় সীমিয়নের ছেলে। শীতকালটা বলদগুলো বেশ বহাল তবিয়তেই কাটিয়েছে, পান্তালিমন ওদের জন্য ঘাসবিচালি যা রেখে গিয়েছিল তাতেই ওদের যথেষ্ট পুষিয়ে গেছে।

* * *

পরদিন সকালে গ্রিগর তৈরি হয় স্তেপে যাবার জন্য। ইলিনিচ্‌না আর দুনিয়া

যথাসময়েই ঘুম থেকে উঠেছিল যাতে ভোর হবার আগেই উনোন জেবলে খাবার তৈরি করে রাখতে পারে। পাঁচ দিন কাজ করবে ঠিক করেছে ও। নিজেদের আর শাশুড়ীর জমিতে বীজ বুনে চার একর জমিতে লাঙল দেবে তরমুজ আর সূর্যমুখী ফলাবার জন্য। তারপর পদাতিক বাহিনী থেকে ওর বাপকে ডেকে আনবে বীজ বোনার বাকি কাজটুকু শেষ করে ফেলবে বলে।

চিমনি থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে কালচে বেগুনি ধোঁয়া। জবালানির কাঠ-খড়ির খোঁজে উঠোনে ছুটোছুটি করে দুনিয়া। গ্রিগর ওর সুঠাম কোমর আর ভরন্ত বুকের দিকে চেয়ে থাকে আর ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ মনে ভাবেঃ কী ভাবে যে সময় কেটে যায়! তেজীয়ান ঘোড়ার মতো ছোটে যেন। এই তো সেদিনও দুনিয়াটা ছিল একটা ছোট্ট ছিঁচকাঁদুনে খুকী, দৌড়োতে গেলে বেণীদুটো পিঠের ওপর নাচত, আর আজ সে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। এদিকে আমার চুল পেকে যাচ্ছে। বুড়ো গ্রিশাক ঠিকই বলেছিলঃ 'গ্রীষ্মের দিনের মতো দেখতে দেখতে কেটে গেছে জীবন'।
মানুষের আয়ু তো মাত্র কতোটুকু; অথচ তবু আমরা সেটাকে আরো ছোট না করে ছাড়ি না।

দারিয়া এগিয়ে এল ওর দিকে। পিয়োত্রার মরার পর খুব তাড়াতাড়িই শোক কাটিয়ে উঠেছে। কিছুদিন কান্নাকাটি করেছিল। শোকে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মনে হত যেন বয়েস কতো বেড়ে গেছে। কিন্তু বসন্তের মলয় পবন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন মাটি তেতে উঠল সূর্যের তেজে, তখন ওর শোকও মিলিয়ে গেল গলা-বরফের মতো। আবার ওর গালে লজ্জারুণ আভা দেখা দিতে শুরু করল, চোখে ঝিলিক খেলল, ওর আগের সেই সাবলীল মরালগতি ফিরে এল হাঁটাচলার মধ্যে। পুরনো অভ্যাসও ফিরে এল আবার ঃ ভুরুতে রঙ চড়ল, গাল চক্‌চক্ করে উঠল ক্রিম মেখে, আবার শুরু হল ওর ঠাট্টা তামাসা, নাতালিয়াকে খ্যাপানো। হাসিমাখা ঠোঁট দুটো সব সময় ফাঁক হয়ে আছে। বিজয়ী জীবনধর্ম ফিরে পেল তার পুরনো প্রতিষ্ঠা।

হাসিমুখে দারিয়া এগিয়ে এল গ্রিগরের কাছে। ওর গাল থেকে শশার রসের গন্ধ আসে।

বলল—তোমাকে একটু মদত দেব গ্রিগর?

—কী দিয়ে?

—আঃ গ্রিশ্‌কা, আমি বিধবা মানুষ, আমার ওপর তুমি অতো কড়া হয়ে ওঠো কেন বল তো? একবার হাসো না পর্যন্ত।

—তুমি বরং গিয়ে নাতালিয়াকে একটু মদত দাও। কাদার মধ্যে হাঁটাহাঁটি করে মিশাটা একেবারে নোংরা হয়ে গেছে।

—আমার বুঝি ওই কাজ? তুমি জন্ম দেবে আর আমি তোমার জন্য ওদের মাজা ঘষা করব? না বাবা, কাজ নেই। তোমার নাতালিয়াটিও বিয়োয় খরগোশের মতো। মরার আগে তোমাকে আরো দশটি দিয়ে যাবে। আর ওদের চান করিয়ে দিতে দিতেই আমার জান কাবার হবে।

—হয়েছে, হয়েছে, এবার ভাগো!

—গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ, এখন গাঁয়ের ভেতর একমাত্র কসাক পুরুষ আছ তুমি। আমায় তাড়িয়ে দিও না; অন্তত একটু দূরে থেকে দাঁড়িয়ে তোমার ওই চমৎকার জুলফি জোড়া আমায় দেখতে দাও।

গ্রিগর হেসে কপালের ওপর থেকে চুলটা পেছনে ঠেলে দেয় ঃ

—জানি না পিয়োত্রা কী করে তোমার সঙ্গে ঘর করত...

—তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই।—জবাব দেয় দারিয়া। ক্ষুধাতুর আধ-বোজা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর মিথ্যেই ভয় পাবার ছল করে পেছন ফিরে বাড়ির দিকে তাকায়—ধরো যদি এক্ষুনি নাতালিয়া বেরিয়ে আসে! তোমার জন্য ওর যে কী হিংসে! আজ তোমার দিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখছিলাম সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখটাই একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। কাল গাঁয়ের জোয়ান মেয়েরা আমায় কী বলেছে জানো? বলেছে ঃ 'এ সব আবার কী আইন? গাঁয়ে একটিও পুরুষ নেই অথচ গ্রিগর এদিকে ফিরে এসে একবারও বউয়ের আঁচল ছাড়বে না। আমরা তাহলে বাঁচব কেমন করে? যদি সে জখমও হয়ে থাকে, যদি তার অর্ধেকটাও আস্ত থাকে তো সেই অর্ধেকটা নিয়েই আমরা খুশি থাকব। রাতে ওকে গাঁয়ের ভেতর ঘুরতে মানা করে দিও, নয়তো ওকে আমরা পাকড়াব, ফলটা ও নিজেই ভুগবে।' আমি ওদের বললুম ঃ ' নারে ভাই, আমাদের গ্রিগর অন্য সব গাঁয়ে গিয়ে কাপ্তানি করে কিন্তু যখন বাড়ি ফেরে তখন নাতালিয়ার ঘাগরা ধরে বসে থাকে, তাকে ছেড়ে কোথাও নড়ে না।'

কৌতুকভরে হেসে ওঠে গ্রিগর, ফোঁড়ন কাটে—তুমি একটি কুত্তী!

—আমি না-হয় যা আছি তাই। কিন্তু তোমার মন্তর-পড়া সতীসাধ্বী নাতালিয়া বউটি কাল বুঝি বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, তাই আইন ভাঙার সাহসটি নেই তোমার'

—অন্য লোকের ব্যাপারে মাথা গলিও না দারিয়া

—তা গলাচ্ছি না। শুধু এ কথাই বলছি যে তোমার নাতালিয়াটি একটি গাধা। স্বামী ঘরে এল, আর ও তার কাছে গিয়ে কেঁদে-কেটে সিন্দুকের ওপর শুয়ে রইল এক পয়সার পুলিপিঠের মতো। আমি যদি সুযোগ পেতাম তো কোনো কসাককেই ছাড়তাম না। তোমার মতো বুকের পাটাওয়ালা লোককেও আমি ভিরমি খাইয়ে ছেড়ে দিতাম—। —দাঁতে-দাঁত চেপে জোর গলায় হাসতে হাসতে দারিয়া চলে গেল বাড়ির দিকে, যাবার সময় ফিরে তাকাতে লাগল আর হাসতে লাগল বোকা-বনে যাওয়া গ্রিগরকে দেখে।

গ্রিগর ভাবল—ভাই পিয়োত্রা, তুমি মরে গিয়েই বেঁচেছ। দারিয়া তো মেয়েমানুষ নয়, ডাইনি। আজ হোক কাল হোক একদিন তার হাতে তোমায় মরতেই হত।

॥ তেরো ॥

বাখ্‌মুৎস্কিন গ্রামের শেষ বাতি কটাও নিভে গেছে। বরফের ফিনফিনে গুড়ো। পাতলা একটা আস্তর পড়ে জলা জায়গাগুলোর ওপর। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ জমিগুলোর মধ্যে কোথায় যেন শেষ মরশুমের সারস এসে জুটেছে। কানে আসে ঈশানী হাওয়ার ক্লান্ত ক্ষীণ মর্মর—এপ্রিল রাতের নিথর নীরবতাকে যেন আরো নীরব মনে হয় তাতে। কোথায় এক বাড়ির উঠোনে গোরু ডাকে, তারপর আবার সব চুপচাপ। অন্ধকারে

উড়ে যেতে যেতে করুণভাবে ডেকে ওঠে একদল কাদাখোঁচা। বন্যাপ্লাবিত ডনের অবারিত বিস্তারের দিকে তাড়াতাড়ি উড়ে চলেছে বুনোহাঁসের ঝাঁক। অসংখ্য চঞ্চল ডানার শিস্‌

গ্রামের সীমানায় হঠাৎ একদল মানুষের গলা শোনা যায়, সেইসঙ্গে ঘোড়ার নাক ঝাড়া, পায়ের খুরে খুরে জমাট কাদার ওপর মুচ্‌মুচ্‌ শব্দ। ছ' নম্বর বিশেষ ব্রিগেডের দুটি স্কোয়াড্রন ঘাঁটি করেছিল গাঁয়ে—ওদেরই একদল টহলদার সেপাই সদর রাস্তায় এল ঘোড়া চালিয়ে। কথায় গানে মাতোয়ারা হয়ে সবাই বাড়ি-বাড়ি আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ে। উল্‌টে-পড়ে-থাকা শ্লেজগাড়িতে ঘোড়ার রাশ বেঁধে ওদের ঘাস বিচালি খেতে দেয়।

হাওয়া-কলের ওধারে যে-সব কসাক শান্ত্রী মোতায়েন ছিল তাদের কানে গেল চেঁচামেচির শব্দ। এই রাতে ঠান্ডা জমাট মাটির ওপর পড়ে থাকতে ওদের খুবই খারাপ লাগছিল। শান্ত্রীদের ধূমপান করা, কথা বলা নিষেধ, হাতে তালি বাজিয়ে গা গরম রাখার চেষ্টাও চলবে না। গেল-মরশুমের সূর্যমুখীর ডাঁটিগুলোর মধ্যে শুয়ে ওরা স্তেপের মাঠের অতল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, মাটিতে কান পেতে শোনে। মাত্র হাত দশেক তফাতে কিছুই নজরে আসে না। এপ্রিলের এই রাত বাতাসের শব্দে এত মুখর, এমন সব সন্দেহজনক আওয়াজ কানে আসে যে মনে হয় এই বুঝি কোনো লালফৌজের সেপাই ওদের দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। অনেকক্ষণ অন্ধকারের দিকে চেয়ে থেকে এক ছোকরা কসাকের চোখে জল এসে গিয়েছিল, হাতের দস্তানা দিয়ে চোখ মুছল সে। ওর মনে হল যেন কাছেই কোথাও মট্‌ করে একটা ডাল ভাঙল, কেউ যেন দম চেপে চেপে হাঁপাচ্ছে। ঝোপঝাপের খস্‌খসানি আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পরিষ্কার হয়ে ওঠে. তারপর যেন আচম্‌কা কসাক ছোকরার একেবারে মাথার ওপর থেকে আওয়াজটা আসে। ছেলেটি কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে ঘাসপাতার ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকে. অনেক কষ্টে ঠাহর করতে পারে একটা বড়োসড়ো শজারু—ইঁদুরের খোঁজে মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগোচ্ছে তড়বড় করে। হঠাৎ শজারুটা বুঝতে পারে কাছেই শত্রু। মাথা উঁচিয়ে দ্যাখে লোকটা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কসাক ছোকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—শালা! কী ভয় পাইয়ে দিয়েছিল! শজারুটা মাথা গুঁজে মুহূর্তের মধ্যে একটা কাঁটার বলের মতো হয়ে যায়, তারপর আস্তে মাথা খুলে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় সূর্যমুখীর ডাঁটিগুলোর মধ্যে গুঁতো খেতে খেতে। আবার নেমে আসে স্তব্ধতা।

গাঁয়ের দিকে দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠল। আকাশের মেঘ কেটে গেছে, পাতলা কুয়াশার ভেতর দিয়ে সন্ধ্যার তারাগুলো উঁকি দেয়। তারপর বাতাসের দমকে কুয়াশাও কেটে যায়, আকাশ চেয়ে থাকে পৃথিবীর দিকে অসংখ্য সোনালি চোখ মেলে।

ঠিক এমনি সময় কসাক ছেলেটি স্পষ্ট শুনতে পায় ওর সামনেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, লোহার টুংটুং। একটু বাদে জিনের ক্যাঁচ্‌কোঁচ্‌ শব্দ আসে। অন্য কসাকরাও শুনতে পেয়েছিল। রাইফেলের ঘোড়ায় আল্‌তো হয়ে আঙুল ওঠে। ঘোড়সওয়ারের কালো মূর্তি আকাশের পটে স্পষ্ট রেখায় ফুটে ওঠে। গাঁয়ের দিকে এগোচ্ছিল লোকটা কদম চালে।

—সবুর! কে যায়?

কসাকরা লাফিয়ে ওঠে। গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি ওরা। ঘোড়সওয়ার থমকে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর দু'হাত তোলে।

—গুলি কোর না কমরেড! —চেঁচিয়ে ওঠে সে।

ঘাঁটির জিম্মাদার অফিসার উঁচু গলায় বলে—সংকেত বলো?

—কমরেড...

—সংকেত? সেপাইলোক...

—সবুর! আমি একা। ধরা দিচ্ছি..

—একটু সবুর ভাইসব: গুলি চালিও না! জ্যান্ত পাকড়াও করব।

পল্টন-কমাণ্ডার ঘোড়সওয়ারের দিকে ছুটে যায়। জিনের ওপর দিয়ে পা ঘুরিয়ে মাটিতে নামে লোকটা।

—কে তুমি? লালফৌজের লোক? হ্যাঁ, ভাইসব, টুপিতে তারা দেখতে পাচ্ছি। খতম হয়ে গেলে হে...

ঘোড়সওয়ার শান্তভাবে জবাব দেয়—তোমাদের কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে যাও আমাকে। তাঁকে একটা দারুণ দরকারি খবর দেবার আছে। আমি ভরোনভ্স্কি, সেরদবাস্কি রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার। ওঁর সঙ্গে একটা ফয়সালা করতে এসেছি।

—অফিসার তাহলে! মারো, ভাইসব!

—কমরেড! আমায় মারতে চাও মারো, কিন্তু আগে একবার তোমাদের কমাণ্ডারকে যে-জন্য এসেছি সে খবরটা জানিয়ে দেবার সুযোগ দাও। আমি আবার বলছি ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে খুবই জরুরি। পালিয়ে যাব বলে যদি তোমাদের ভয় থাকে তাহলে আমার হাতিয়ার কেড়ে নাও।

তলোয়ারের বেল্ট্ খুলতে শুরু করে লোকটা।

পল্টন-কমাণ্ডার ওর রিভলবার আর তলোয়ার নিয়ে নেয়। অফিসারের ঘোড়াটায় চেপে বসে হুকুম দেয়—তল্লাসী করো।

তল্লাসী হয়ে যাবার পর বন্দীকে নিয়ে পল্টন কমাণ্ডার আর আরেকজন কসাক গ্রামের দিকে রওনা হল। বন্দী চলেছে হেঁটে, ওর পাশাপাশি কসাক পাহারাওয়ালা, আর পেছন পেছন ওরই ঘোড়ায় চেপে পল্টন কমাণ্ডার। মাঝে মাঝে লোকটা থামছিল সিগারেট জ্বালাবার জন্য। ভালো তামাকের গন্ধ পেয়ে পাহারাওয়ালাটির বড়ো লোভ জাগল।

বলল--আমায় একটা দাও না।

পুরো সিগারেট-কেস্টাই অফিসার তুলে দিল লোকটার হাতে। একটা সিগারেট বের করে কসাক বেমালুম সিগারেট-কেস্টা নিজের পকেটে পুরলে।

লালফৌজের কমাণ্ডার কোনো কথা বললে না। শুধু গাঁয়ের ভেতর ঢুকবার সময় একবার জিজ্ঞেস করলঃ

—কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে?

—এখুনি জানতে পারবে।

—তবু বলো না!

—কোম্পানি কমাণ্ডারের কাছে।

—তোমাদের ব্রিগেড কমাণ্ডার বোগাতিরিয়েভের কাছে নিয়ে যাবে?

—ও নামে কোনো লোক নেই এখানে।

—আছে। আমি জানি কাল সে সহকারীদের নিয়ে বাথ্মুৎস্কিনে এসেছে।

—এ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।

—ব্যস্‌, অনেক হয়েছে কমরেড! আমি জানি অথচ তোমরা জানো না! এটা নিশ্চয়ই সামরিক গোপন খবর নয়, বিশেষ করে তোমাদের শত্রুরাও যখন সে খবর রাখে।

—চলো, চলো!

—আমি তো চলছিই। তাহলে বোগার্তিরিয়েভের কাছে নিয়ে যাচ্ছ?

—চোপ রও! বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার হুকুম নেই আমাদের।

—কিন্তু আমার সিগারেট্‌-কেস্‌টা নেবার হুকুম আছে!

—চলো, জিভ সামলে রেখো! নয়তো সঙীন দিয়ে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।

ওরা এসে দেখল কোম্পানি কমান্ডার ঘুমুচ্ছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে হাই তুলল সে। প্রথমটা বুঝতেই পারেনি পল্টন-কমান্ডার তাকে কী বলছে।

তারপর জিজ্ঞেস করলঃ

—তুমি কে বললে যেন? সেরদব্‌স্কি রেজিমেণ্টের কমান্ডার? মিছে বলছ না তো? তোমার দলিলপত্র কই?

কয়েক মিনিট বাদে লালফৌজের কমান্ডারকে সে নিয়ে এল ব্রিগেড কমান্ডার বোগার্তিরিয়েভের কাছে। কাকে ধরে আনা হয়েছে জানতে পেরেই বোগার্তিরিয়েভ যেন ভুতে পাওয়ার মতো লাফিয়ে উঠল। তড়বড়্‌ করে পাতলুনের বোতাম এঁটে একটা বাতি জ্বালিয়ে অফিসারকে বলল বসতে।

জিজ্ঞেস করল—কী ভাবে আপনি...কেমন করে ধরা পড়লেন আপনি?

—নিজে ইচ্ছে করেই এসেছি। আপনার সঙ্গে আড়ালে কথা বলতে চাই। আর সবাইকে বেরিয়ে যেতে হুকুম দিন।

বোগার্তিরিয়েভ হাত নাড়লো। কোম্পানি-কমান্ডার আর বাড়ির কর্তা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল,—লোকটা এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। বোগার্তিরিয়েভের মুখে কৌতূহলের ভাব ফুটে উঠেছে। একটা টেবিলের পাশে বসল সে। অফিসার ভরোনভ্‌স্কি কালো গোঁফের নিচে মুচ্‌কি হাসলো। বলল—আগে আমার নিজের সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাই, তারপর আপনাকে বলব কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। অভিজাত বংশে জন্ম আমার। জারের সামরিক বিভাগে স্টাফ-ক্যাপ্টেন ছিলাম। জার্মান যুদ্ধের সময় লড়াইয়ে কাজ করেছি। ১৯১৮ সালে সোভিয়েত সরকারের হুকুমে আমায় সেনাবিভাগে নেওয়া হল। এখন আমি লাল সেরদব্‌স্কি রেজিমেণ্টের কমান্ডার। কিছুদিন থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যাতে আপনাদের দিকে আসা যায়...মানে যারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়ছে।

—বড্ডো বেশীদিন অপেক্ষা করেছেন ক্যাপ্টেন!

—জানি। কিন্তু আমি শুধু নিজে নয়, আমার ফৌজের সমস্ত লাল সেপাইদের নিয়েই এদিকে চলে আসতে চেয়েছিলাম, বিশেষ করে যাদের ওপর বেশি ভরসা করা চলে তাদের নিয়ে—কমিউনিস্টরা ওদের সঙ্গে বেইমানি করেছে, ভাই-ভাই লড়াইয়ের মধ্যে টেনে এনেছে তাদের। ভেবেছিলাম এইভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করব।

—বোগার্তিরিয়েভের দিকে নজর পড়তেই তার মুখে অবিশ্বাস-ভরা একটা হাসি দেখে ভরোনভ্‌স্কি ছোট মেয়ের মতো চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি বলতে থাকেঃ

—আমার ওপর বা আমার কথাবার্তায় আপনার খানিকটা অবিশ্বাস হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আপনার জায়গায় হলে আমি তাই মনে করতাম। কিন্তু আমি আপনাকে

অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছি...।— জোব্বাকোটটা পেছনে ঠেলে দিয়ে পকেট থেকে একখানা পেন্সিল-কাটা ছুরি বের করে ভরোনভ্স্কি ছুরি দিয়ে কোটের সেলাই খুলে কতগুলো হলদে দলিলপত্র আর একটা ছোট ফটোগ্রাফ বের করে। বোগাতিরিয়েভ সাবধানে দলিলগুলো পরীক্ষা করে। একটার মধ্যে সুপারিশপত্র আছে—বাহক ১১৭ নম্বর লিউবোমিরস্কি রেজিমেণ্টের লেফটেন্যাণ্ট ভরোনভ্স্কি, স্বাক্ষর আর শীলমোহর একটা রণাঙ্গন-হাসপাতালের প্রধান সার্জনের। অন্য দলিলপত্র আর ফটোগ্রাফটায় ভরোনভ্স্কির বিবরণের সত্যতা পুরোপুরি প্রমাণ হল।

—বেশ, তাহলে এবার কী করতে হবে? —বোগাতিরিয়েভ প্রশ্ন করে।

—আপনাকে এই কথাটা জানাতে এসেছি যে আমি আর আমার সহকারী ভল্কভ আমাদের হেফাজতে যে লালফৌজী সেপাইরা রয়েছে তাদের বুঝিয়েছি। এখন একমাত্র কমিউনিস্টরা বাদে সেরদ্বাস্কি রেজিমেণ্টের গোটা দলটাই যে কোনো মুহূর্তে আপনাদের পক্ষে চলে আসার জন্য তৈরি। সেপাইরা বেশির ভাগই সারাতভ আর সামারা প্রদেশের চাষাভুষো। তারা বলশেভিকদের সঙ্গে লড়তে রাজি। আমরা শুধু রেজিমেণ্টের আত্ম সমর্পণের শর্ত নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ফয়সালা করতে চাই। এই সময়টায় রেজিমেণ্ট আছে উস্ত্-খপেরস্কে। বারো-শো রাইফেলধারী। কমিউনিস্ট চক্র আটত্রিশজনকে নিয়ে, তা ছাড়া আরো তিরিশ জন স্থানীয় কমিউনিস্টকে নিয়ে গড়া হয়েছে একটা পল্টন দল। রেজিমেণ্টের কামানগুলো দখল করব আমরা, কিন্তু গোলন্দাজদের বোধহয় সাবাড় করে দিতে হবে কারণ ওদের বেশির ভাগই কমিউনিস্ট। আমার ফৌজের সেপাইরা গরম হয়ে আছে ওদের দেশ-গাঁয়ে খাদ্য দখল চলছে বলে। এই অবস্থাটার সুযোগ নিয়েই আমরা ওদের কসাকদের পক্ষে আনতে পারছি। কিন্তু ওদের ভয়, ধরা দিলে হয়তো ওদের ওপর অত্যাচার হবে। এটা অবিশ্যি খুঁটিনাটির ব্যাপার তবু আমি এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে চাই।

—অত্যাচার আবার কীরকম হবে?

—এই ধরুন খুন বা লুটতরাজ...

—না সেটা আমরা হতে দেব না।

—আরেকটা কথা। সেপাইরা চায় যাতে সেরদব্স্কি রেজিমেণ্টটাকে না ভাঙা হয়, গোটাগুটিই আপনাদের পাশাপাশি একটা আলাদা সামরিক ইউনিট হিসাবে তারা বলশেভিকদের সঙ্গে লড়তে চায়।

—এ বিষয়টা ঠিক করার এক্তিয়ার আমার নেই।

—বুঝতে পেরেছি। আপনি আপনার ওপরওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগ করে খবরটা আমায় দেবেন?

—হ্যাঁ। ভিয়েশেনস্কার সদর দপ্তরকে জানাতে হবে।

—মাপ করবেন, আমার সময় বড্ডো অল্প। ফিরতে দেরি হলে গরহাজির থাকাটা রেজিমেণ্টের কমিসারের নজরে পড়ে যাবে। আশা করি আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে একমত হতে পারব আমরা। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। রেজিমেণ্টটা হয়তো দনিয়েৎস্ ফ্রণ্টে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে কিংবা নতুন দল এসে জায়গা দখল করতে পারে। তাহলে...

—আমি এখ্খুনি ভিয়েশেন্স্কায় লোক পাঠাচ্ছি।

—আরেকটা ব্যাপার। আপনাদের কসাকদের বলে দিন আমার হাতিয়ারগুলো ফিরিয়ে দিতে। শুধু হাতিয়ারই কেড়ে নেয়নি—একটু থেমে ভরোনভ্স্কি অপ্রতিভ-

ভাবে হাসল—আমার সিগারেট কেস্‌টাও নিয়েছিল! যাক্‌ সে সব ছোটখাট ব্যাপার, কিন্তু সেগারেট কেস্‌টা আমার কাছে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া সম্পত্তির মতো।...

—আপনার সব জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ভিয়েশেন্‌স্কার জবাবের কথা কীভাবে জানাব আপনাকে?

—দু'দিন পরেই উস্ত্‌-খপেরস্ক থেকে একজন স্ত্রীলোক আসবে বাখ্‌মুৎস্কিনে। তার সংকেত ভাষা হবে...এই ধরুন 'ইউনিয়ন'। তাকে আপনি জানিয়ে দিতে পারবেন। অবিশ্যি, যে শর্তগুলোর কথা আমি বললাম সেই অনুসারে...

আধঘণ্টার মধ্যে একজন কসাক দূত ঘোড়া নিয়ে ছুটল ভিয়েশেন্‌স্কার দিকে।

পরদিন কুদীনভের নিজস্ব আরদালি এসে হাজির হল বাখ্‌মুৎস্কিনে। ব্রিগেড-কমাণ্ডারের আস্তানায় এসে ঘোড়া বাঁধবার জন্য না দাঁড়িয়েই সিধে ঘরে ঢুকে সে বোগাতিরিয়েভের হাতে একটা প্যাকেট দিলে "জরুরী এবং গোপনীয়" লেখা। বোগাতিরিয়েভ তাড়াতাড়ি লেপাফা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়লে—কুদীনভের ছরকুটে হাতের লেখাঃ

"খবরটা উৎসাহজনক। সেরদব্‌স্কি রেজিমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইবার এবং যে-কোনো উপায়ে তাহাদের আত্মসমর্পণ করাইবার জন্য আপনাকে আমি ক্ষমতা দিতেছি। আমার অভিমত এই যে উহাদের অনুরোধ আমরা মানিয়া লইব এবং কথা দিব যে আমরা পুরো রেজিমেণ্টটিকেই গ্রহণ করিতে রাজি, এমন কি উহাদের হাতিয়ার পর্যন্ত কাড়িয়া লইব না, কিন্তু একমাত্র এই শর্তে যে তাহারা রেজিমেণ্টের কমিসার ও কমিউনিস্টদের, বিশেষ করিয়া আমাদের ভিয়েশেন্‌স্কা, ইয়েলান্‌স্কা ও উস্ত্‌-খপেরস্ক্‌ কমিউনিস্টদের, ধরিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিবে। কামান, রসদ ট্রেন ও রেজিমেণ্টের সাজসজ্জাও অবশ্যই দখল করিতে হইবে। যতো তাড়াতাড়ি করা যায় ব্যাপারটি সারিয়া ফেলুন। রেজিমেণ্ট যখন এপক্ষে চলিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে তখন যতো বড়ো সম্ভব বাহিনী গড়িয়া লইয়া তাহাদের ধীরে ধীরে ঘিরিয়া ফেলিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রও কাড়িয়া লইবেন। যদি বাধা দিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে শেষ মানুষটি অবধি খতম করিবেন। সাবধানে অথচ স্থিরসংকল্প লইয়া কাজ করুন। অস্ত্র কাড়িয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা রেজিমেণ্টকে ডন নদীর ডান পাড় দিয়া ভিয়েশেন্‌স্কায় লইয়া আসিবেন যাহাতে তাহারা রণাঙ্গন হইতে দূরে থাকে এবং খোলা স্তেপের ভিতর দিয়া মার্চ করিয়া আসে। তাহা হইলে উহাদের পালাইবার উপায় থাকিবে না। আমরা উহাদের দুইজন কি তিনজন করিয়া একেক কোম্পানিতে ভাগ করিয়া দিব, দেখিব কীভাবে উহারা লাল-ফৌজের সহিত লড়াই করে। তাহার পর দনিয়েৎসের লোকদের সহিত যদি একবার আমরা মিলিত হইতে পারি তো ইহাদের সহিত তাহারা যাহা খুশি করুক—যদি শেষ প্রাণীটি অবধি ফাঁসিতে ঝুলাইয়াও মারে তাহাতেও আমি আপত্তি করিব না। আপনার সাফল্যে আমি আনন্দিত। প্রতিদিন দূতে মারফত খবরাখবর দিবেন।---কুদীনভ।"

'পুনশ্চ' বলে লেখা হয়েছেঃ

"সেরদব্‌স্কি রেজিমেণ্ট যদি স্থানীয় কমিউনিস্টদের আমাদের হাতে সমর্পণ করে, তাহা হইলে তাহাদের কড়া পাহারায় ডন-পাড়ের গ্রামগুলির ভিতর দিয়া ভিয়েশেন্‌স্কায় লইয়া আসিবেন। প্রহরী হিসাবে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য কসাকদের বাছিয়া লইবেন (জঙ্গী এবং বয়স্ক হওয়া চাই), আর গ্রামগুলিতে আগেই খবর পাঠাইয়া জানাইয়া দিবেন যে তাহারা আসিতেছে। আমাদের নিজেদের হাত নোংরা করিয়া লাভ নাই—প্রহরীরা ঠিক মতো কাজ করিলে গ্রামের মেয়েরাই বল্লম দিয়া উহাদের ব্যবস্থা করিবে। আমাদের পক্ষে

সেইটিই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। যদি আমরা গুলি চালাই আর লালরক্ষীদের কানে সে খবর পেঁছায় তাহা হইলে তাহারাও কসাক বন্দীদের গুলি করিয়া মারিবে। তাহার চেয়ে সহজ হইবে জনতাকে উহাদের উপর লেলাইয়া দেওয়া, রক্তপিপাসু ডালকুত্তার মতো জনতার ক্রোধ জাগাইয়া দেওয়া। সকলে মিলিয়া খুন করো, কোনো প্রশ্ন করা নয়, কোনো জবাব শোনা নয়!"

॥ চোদ্দ ॥

এপ্রিলের শেষদিকে এক নম্বর মস্কো-রেজিমেণ্ট বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে দারুণভাবে হেরে গেল। জায়গাটা সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় লাল-বাহিনী লড়তে লড়তে ঢুকে পড়ল আস্তোনভস্কি গ্রামে, তারপরে কাদার সমুদ্রে পড়ে খাবি খাওয়ার অবস্থা। কমাণ্ডিং অফিসারের কড়া হুকুমে ওরা প্রাণপণে রাস্তা করে এগোচ্ছে এমন সময় দু' কোম্পানি ঘোড়সওয়ার কসাক ওদের ঘেরাও করল। ফৌজের প্রায় তিনভাগের এক ভাগ খুইয়ে অবশেষে রেজিমেণ্টকে ক্ষান্তি দিতে হল।

লড়াইয়ের সময় ইভান আলেক্সিয়েভিচের পা জখম হয়েছিল। মিশকা কশেভয় ওকে বের করে এনে গোলাবারুদের গাড়ির একজন ড্রাইভারকে বাধ্য করল ইভানকে তার গাড়িতে নেবার জন্য।

রেজিমেণ্টকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল ইয়েলান্স্কা গ্রাম অবধি। গোটা অঞ্চলটায় লালফৌজের অগ্রগতি সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হল এই পরাজয়ের ফলে। সবাই একসঙ্গে পেছু হটতে শুরু করে। খপার নদীর মুখে বরফ ভাঙতে থাকার ফলে এক নম্বর মস্কো রেজিমেণ্ট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তাই ওরা ডন পার হয়ে ডান তীরে এসে উস্ত্-খপেরস্কে থামে। সেইখানেই ওরা অপেক্ষা করতে থাকে নতুন ফৌজের আশায়। ওরা পেঁছুবার কয়েকদিনের মধ্যেই সেরদবস্কি রেজিমেণ্ট এসে যোগ দেয় ওদের সঙ্গে। এক নম্বর মস্কো রেজিমেণ্টের সেপাইদের সঙ্গে সেরদবস্কি সেপাইদের তফাত অনেক। মস্কো রেজিমেণ্টের প্রধান জঙ্গী অংশটা গড়ে উঠেছিল মস্কো, তুলা আর নিজনি-নভগোরদের কারখানা মজুরদের নিয়ে—ওরা লড়ত হন্যে হয়ে, এক-বগ্গার মতো। মাঝে-মাঝে শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়েও নামত আর ক্রমাগত জখম হয়ে বা মরে গিয়ে ফৌজের লোক খোয়া যেত। আস্তোনভস্কি গাঁয়ে হেরে যাবার পর ওরা পেছু হটেছে তবু ওদের গোলাবারুদের গাড়ি একখানাও হাতছাড়া হয়নি। এদিকে সেরদবস্কি রেজিমেণ্টের সেপাইদের হুড়মুড় করে দলে ভর্তি করা হয়েছিল সারাতভ প্রদেশের সেরদবস্ক থেকে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই বয়স্ক চাষী, অধিকাংশই নিরক্ষর। অনেকে আবার ধনী পরিবার থেকে আমদানি। অধিনায়করা বেশির ভাগই প্রাক্তন সম্রাজশাহী ফৌজী অফিসার। লালরক্ষী কমিসারটি মেরুদণ্ডহীন, সেপাইদের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। কমাণ্ডিং

অফিসার ভরোনভ্স্কি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা গোপনে উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল যাতে সেপাই-দের দমিয়ে দিয়ে কসাকদের হাতে রেজিমেণ্ট তুলে দেবার জন্য তাদের ওস্কানো যায়।

সেরদব্স্কি রেজিমেণ্ট আসার পর স্তকমান, ইভান আর মিশ্‌কাকে নতুন রেজিমেণ্টে বদলি করা হল। আরো তিনজন সেরদব্স্কি সেপাইয়ের সঙ্গে এক আস্তানায় থাকার জায়গা হল ওদের। স্তকমান উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে ওর নতুন সাথীদের তিতবিরক্ত মেজাজ। একবার ওদের সঙ্গে একটা জোর কথা-কাটাকাটির পর বুঝে ফেলল রেজিমেণ্টের সামনে ভয়ানক বিপদ। একদিন সন্ধ্যার সময় দু'জন সেরদব্স্কি সেপাই এসে ঢুকল ঘরে। স্তকমান বা ইভানকে সম্ভাষণ জানিয়ে একটা কথাও না বলে টিপ্পনি কাটলেঃ

—লড়াইয়ের সাধ মিটে গেছে। ওদিকে দেশের ঘরবাড়ি লুটে ফসল কেড়ে নিচ্ছে আর এখানে আমরা লড়ছি ভগবান্ জানে কিসের জন্য!

স্তকমান জিজ্ঞেস করে--কেন লড়ছ তা জানো না বুঝি?

—না জানি না! কসাকরা তো আমাদের মতোই কিসানের ছেলে। ওরা কেন বিদ্রোহ করছে সে আমাদের জানা আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো করেই জানি!

স্তকমানের স্বাভাবিক সংযম এক মুহূর্তের জন্য ভেঙে পড়ে। ও বলে—তুমি জানো কী ধরণের ভাষায় কথা বলছ এখন, শুয়োর কোথাকার? শ্বেতরক্ষীদের মতো কথাবার্তা!

—'শুয়োর' টুয়োর বোলো না, আচ্ছামতো দিয়ে দেব! শুনেছ ভাই লোকটার কথা?

দ্বিতীয় জন ফোঁড়ন কাটলে—আস্তে আস্তে, এই লম্বা-দাড়ি! তোর মতো এর আগে ঢের দেখেছি। তুই কি ভেবেছিস কমিউনিস্ট বলে আমাদের মাথা কিনে নিয়েছিস? সাবধান, নয়তো ঝাঁঝরা করে দেব একেবারে! —স্তকমানের দিকে এগিয়ে আসে লোকটা।

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে স্তকমান বললে—তোমরা বিপ্লবের দুশমনদের মতো কথা বলছ। সোভিয়েত হুকুমতের সঙ্গে বেইমানি করার জন্য তোমাদের কাঠগড়ায় তুলব।

সেরদব্স্কি সেপাইদের একজন জবাব দিলে—গোটা রেজিমেণ্টকে তো কাঠগড়ায় তুলতে পারবে না হে। কমিউনিস্টদের জন্য চিনি আর সিগারেট বরাদ্দ, আমাদের কিছুই জোটে না।

মিথ্যে কথা!—বিছানার ওপর সোজা হয়ে উঠে ইভান আলেক্সিয়েভিচ চেঁচায়—তোমরা যা পাও আমরাও তাই পাই।

আরেকটি কথাও না বলে স্তকমান বড়ো কোটখানা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে যায়। ওরা কেউ ঠেকাতে চেষ্টা করে না, কিন্তু পেছন থেকে ঠাট্টা করে। রেজিমেণ্টের কমিসারকে স্তকমান পেল সদরদপ্তরের বাড়িতে। পাশের একটা কামরায় ডেকে নিয়ে তাকে সেরদব্স্কি সেপাইদের সঙ্গে ঝগড়ার কথাটা জানাল। ওদের গ্রেপ্তার করার প্রস্তাবও করল সেই সঙ্গে। কমিসার ওর কথা শুনে দাড়ি চুলকোয় আর শিঙের ফ্রেম-ওয়ালা চশমাজোড়া দুর্বল হাতে নাকের ওপর বসাতে চেষ্টা করে।

—অবস্থাটা বিচার করার জন্য কাল কমিউনিস্টদের একটা মিটিং ডাকব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ওদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব বলে মনে হয় না।

—কেন নয়? —সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে স্তকমান।

—মানে কি জানো কমরেড স্তকমান...আমি নিজেই লক্ষ্য করেছি রেজিমেণ্টের মধ্যে

কিছু গলদ আছে। হয়তো কোনো বিশেষ ধরণের প্রতিবিপ্লবী সংগঠন কাজ করছে. শুধু ধরতে পারছি না এই যা। কিন্তু রেজিমেণ্টের বেশির ভাগই তাদের খপ্পরে। ওরা হল চাষী মানুষ, সুতরাং কী করতে পারো তুমি? অবস্থা সম্পর্কে ডিভিশনের বড়োকর্তাদের জানিয়েছিলাম. এও বলেছিলাম যে রেজিমেণ্ট ফিরিয়ে নিয়ে তাঁরা নতুন-ভাবে গড়ুন।

—কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরই এই রকম ধরণধারণ দেখে রাজনৈতিক বিভাগকে আগেই খবর দেননি কেন?

—দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা জবাব দিতে দেরি করছে। রেজিমেণ্টকে যেই ফিরিয়ে নেয়া হবে সঙ্গে সঙ্গে যারা শৃঙ্খলাভঙ্গ করছে তাদের কড়া শাস্তি দেওয়া হবে। —ভ্রূকুটি করে আবার কমিসার বলে—ভরোনভ্স্কি আর সেনানীমণ্ডলীর প্রধান ভলকভ্কে আমার সন্দেহ হয়। আগামী কাল চক্রের বৈঠক হয়ে যাবার পর আমি ঘোড়া নিয়ে উস্ত মেদ্ভেদিয়েৎস্-এ যাব রাজনৈতিক বিভাগের সঙ্গে অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে। বিপদটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য জরুরি ব্যবস্থা করতে হবে।

—কিন্তু চক্রের বৈঠকটা এখনই ডাকা যায় না? সময় তো আমাদের জন্য বসে থাকবে না কমরেড!

—সেতো জানি. কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ কমিউনিস্টই বাইরের ঘাঁটিগুলোতে ডিউটিতে আছে। আমিই সেটা জোর দিয়ে করিয়েছি, কারণ এ অবস্থায় পার্টির বাইরের লোকদের ওপর অতটা ভরসা করা ঠিক নয় বলে মনে হয়েছিল। তা ছাড়া কমিউনিস্টদের যেটা আসল কেন্দ্র—গোলন্দাজবাহিনী—তারা আসবে আজকে রাতে। রেজিমেণ্টের মধ্যে এই গোলমালের ভয়ে আমিই ওদের ডেকে পাঠিয়েছি।

সদর-দপ্তর থেকে ঘরে ফিরে এসে স্তকমান ইভান আর মিশ্কাকে মোটামুটিভাবে কমিসারের সঙ্গে ওর আলাপের কথাটা জানিয়ে দেয়। সবাই শুতে যাবার পর ও বসে-বসে রেজিমেণ্টের অবস্থা নিয়ে একটা বিশদ বিবরণ লিখে ফেলে। তারপর মাঝরাতে ঘুম ভাঙায় মিশ্কার। চিঠিটা ওর হাতে দিয়ে বলেঃ

—এক্ষুণি যেখান থেকে হয় একটা ঘোড়া জোগাড় করে এই চিঠি নিয়ে উস্ত মেদভেদিয়েৎস্-এ চলে যাও। যেমন করে হোক জান কবুল করেও এ-চিঠি চোদ্দ নম্বর ডিভিশনের রাজনৈতিক বিভাগের কাছে পৌঁছে দেবে। ওখানে যেতে তোমার কতোক্ষণ লাগবে? ঘোড়া পাবে কোথায়?

পায়ে বুটজুতো ঢোকাতে ঢোকাতে মিশ্কা জবাব দেয়—টহলদার ঘোড়সওয়ারের একটা ঘোড়া চুরি করে নেব। উস্ত্-মেদভেদিয়েৎস্ পৌঁছতে খুব বেশি হলে দুঘণ্টা। ঘোড়াগুলো অতি বাজে, না হলে আরো তাড়াতাড়ি পারতাম। কোন্ ঘোড়াটা নিতে হবে তাও জানি। —চিঠিটা নিয়ে সে জোব্বাকোটের পকেটে পুরলে।

স্তকমান অবাক হয়ে বলে—ওখানে রাখলে যে?

—ধরা পড়লে সহজেই যাতে নাগাল পাই।— মিশকা জবাব দেয়।

—হ্যাঁ, কিন্তু...। —স্তকমান যেন ভরসা পায় না।

—যদি আমাকে ওরা ধরে তহলে সঙ্গেসঙ্গেই নিয়ে মুখে পুরতে পারব।

—বাহাদুর ছেলে! —ক্ষীণভাবে হাসে স্তকমান, তারপর একটা বেদনাময় আবেগের বশে মিশ্কাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ঠাণ্ডা কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে ওকে চুমু খায়। বলে—তাহলে বেরিয়ে পড়ো!

মিশ্কা বেরিয়ে এসে টহলদারদের সবচেয়ে সেরা ঘোড়াটার বাঁধন খুলে নেয়—কোনো ঝামেলা হয় না। তারপর সন্তর্পণে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে বার-ঘাঁটির পাশ দিয়ে এগিয়ে যায় রাইফেলের ঘোড়ায় আঙুল রেখে। একেবারে সদর রাস্তায় এসে তবে কাঁধের ওপর রাইফেল ঝোলায়। তারপর খুদে সারাতভ ঘোড়াটিকে হাঁকায় তার গতিবেগের শেষ বিন্দুটিকেও শুষে নেবার জন্য।

* *

ভোরের দিকে ফিন্‌ফিনে বৃষ্টি শুরু হয়। বাতাসের গজরানি। পুব দিক থেকে ছুটে আসছে ভারি-ভারি ঝোড়ো মেঘ। সকাল হতেই স্তকমানের আস্তানার সেরদব্‌স্কি-সেপাইরা উঠে বেরিয়ে গেল। আধঘণ্টা পর তল্‌কাচেভ নামে একজন ইয়েলান্‌স্কাবাসী কমিউনিস্ট ধাক্কা দিয়ে ঘরের দরজা খোলে। স্তকমান ইভানের মতো তল্‌কাচেভও সেরদব্‌স্কি রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললেঃ

—স্তকমান, কশেভয়. তোমরা আছ ঘরে? বেরিয়ে এসো!

—কী ব্যাপার? ভেতরে এসো না! —বড়ো কোটটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি গায়ে চাপাতে চাপাতে স্তকমান বলে।

স্তকমানের পেছন পেছন এগিয়ে এসে বিড়বিড় করে বলে তল্‌কাচেভ—রেজিমেণ্টের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। এইমাত্র গোলন্দাজরা আসছিল, পায়দল-সেপাইরা তাদের কামান কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। এরা গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে কিন্তু গোলন্দাজরা হামলার পাল্‌টা জবাব দেয়, তারপর কামানের কুলুপগুলো সারিয়ে নিয়ে নৌকোয় করে তারা নদীর ওপারে চলে গেছে। গির্জাবাড়ির পাশে এখন একটা সভা হচ্ছে...রেজিমেণ্টের সবাই...।

ইভান আলেক্সিয়েভিচ্‌কে স্তকমান হুকুম দেয়—শিগ্‌গির পোশাক পরো! তল্‌কাচেভের জামার আস্তিন চেপে ধরে জিজ্ঞেস করে—কমিসার কোথায়? বাদবাকি কমিউনিস্টরাই বা কোথায়?

—জানি না। কেউ কেউ পালিয়েছে, আমি ছুটে এসেছি তোমাদের কাছে। টেলিগ্রাফ দখল করেছে ওরা, কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমাদের সরে পড়া দরকার। কিন্তু কী ভাবে? —দু'হাঁটুর মাঝে হাত রেখে লোকটা অসহায়ের মতো বিছানায় বসে পড়ে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়ির দরজার কাছে শোনা যায় পায়ের শব্দ, ছ'জন সেরদব্‌স্কি সেপাই ছুটে আসে বাড়ির মধ্যে। ওদের মুখগুলো লাল, শয়তানি মতলবে কঠিন হয়ে উঠেছে।

চেঁচিয়ে ওঠে—কমিউনিস্টরা সব মিটিঙে চলো জলদি!

ইভানের সঙ্গে চোখাচোখি হয় স্তকমানের। ঠোঁট চেপে থাকে ও। জবাব দেয়—আমরা আসছি।

হাতিয়ার রেখে এসো। লড়াইয়ে তো যাচ্ছো না।— একজন সেপাই বলে। কিন্তু স্তকমান যেন শুনতে পায়নি এমনিভাবে রাইফেলখানা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। ও-ই বেরিয়ে আসে সবার আগে।

চত্বরটার মধ্যে এগারো-শো লোকের গলা শোনা যাচ্ছে। রেজিমেণ্টের কর্তাদের কেউ নজরে পড়ে কিনা দেখতে দেখতে ভিড়ের দিকে এগোয় স্তকমান। ওর পাশ দিয়ে

চলে গেল কমিসার, দু'জন সেপাই তার হাত ধরে রেখেছে, আরেকজন তাকে পেছন থেকে-গুঁতোচ্ছে। মরার মতো ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে কমিসার ভিড় ঠেলে এগোয়। দু'এক মিনিট বাদে স্তকমান দ্যাখে জনতার মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াচ্ছে সে। চারদিকে চোখ বুলোয় স্তকমান; ওর পেছনেই ইভান আলেক্সিয়েভিচ, তার পাশে সেই লোকগুলো যারা ওদের সভায় টেনে এনেছে।

অসংখ্য গলার গর্জনের মধ্যে কমিসারের ক্ষীণ গলার স্বর শোনা যায়—লালফৌজের কমরেড! এই রকম সময়, শত্রুরা যখন আমাদের এত কাছে তখন সভা-সমিতি করা, কমরেড...।

তাকে আর বলতে দেওয়া হয় না। টেবিলের আশেপাশে লালফৌজের ধূসর টুপিগুলো যেন হাওয়ার দুলুনিতে দুলতে থাকে, অনেকগুলো হাতের মুঠো এগিয়ে আসে কমিসারের দিকে, চিৎকার ওঠেঃ

—ও এখন বুঝি আমরা সব কমরেড হলাম!

—চামড়ার কোর্তা খুলে ফেল!

—খুন করো! সঙীন চালাও! কমিসারগিরির আমরা অনেক দেখেছি!

স্তকমান দেখল প্রকাণ্ড চেহারার একজন বয়স্ক লালফৌজী সেপাই ঠেলেঠুলে টেবিলে উঠে কমিসারের ছোট দাড়িটা চেপে ধরল। টেবিলটা কেঁপে উঠল, তারপর সেই লোকটা আর কমিসার দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল আশপাশের লোকগুলোর বাড়িয়ে-ধরা হাতের ওপর। যেখানে টেবিলটা ছিল সেখানে একসার ধূসর ফোজাকোট যেন থিক্‌থিক্ করছে। অসংখ্য গলার গম্‌গমে গর্জনের মধ্যে হারিয়ে গেল কমিসারের মরীয়া চিৎকার।

তক্ষুনি স্তকমান ভিড় ঠেলে এগিয়ে জনতার মাঝখানে যাবার চেষ্টা করে, নির্দয়ভাবে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয় পাশের লোকগুলোকে। কেউ ওকে বাধা দেয় না, শুধু হাতের মুঠো আর রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ঠেলে সামনে এগিয়ে দেয়। পিঠ থেকে রাইফেলের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে, কসাক টুপি খসে পড়েছে মাথা থেকে।

উল্টোনো টেবিলটার কাছে একজন পল্টনী অফিসার ওর পথ রুখে দাঁড়ায়। ধমক দিয়ে বলে—গুঁতোগুঁতি করে কোথায় চলেছ?

—আমি কিছু বলতে চাই! সাধারণ একজন সেপাইকে একটা কথা বলতে দিন!—টেবিলটাকে সোজা করে বসাতে বসাতে স্তকমান ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বললে। পাশের একজন লোক ওকে টেবিলে উঠে দাঁড়াতেও সাহায্য করে। কিন্তু চত্বরের গোলমালটা কমেনি। স্তকমান চড়া গলায় চেঁচালঃ

—চুপ করুন!

এক মুহূর্ত পরে গোলমালটা একটু চাপা পড়ে। স্তকমান আবেগভরে কাঁপা গলায় চিৎকার করে বলতে শুরু করেঃ

—লালফৌজের কমরেডগণ! ধিক্ আপনাদের! সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়টাতেই আপনারা জনগণের সরকারের সঙ্গে বেইমানি করছেন। দুশমনের ঠিক প্রাণটা লক্ষ্য করে যখন শক্ত হাতে আঘাত হানা দরকার তখনই আপনারা টালবাহানা করতে শুরু করলেন। সোভিয়েত দেশ যখন শত্রুর লোহার বেড়ির মধ্যে পড়ে অস্তিত্ব বাঁচাবার জন্য লড়ছে তখন আপনারা সভা-সমিতি করছেন। পুরোদস্তুর বেইমানির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন আপনারা! কেন তা জানেন? কারণ আপনাদের নিজেদের কমাণ্ডাররাই কসাক জেনারেল-

দের হাতে তুলে দিচ্ছে আপনাদের। এই সব সাবেকী অফিসার সোভিয়েত সরকারের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি, আপনাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তারা রেজিমেণ্ট সঁপে দিচ্ছে কসাকদের হাতে। হুঁশিয়ার হোন্ আপনারা। আপনাদের হাত দিয়েই তারা মজুর কিসানের সরকারের টুঁটি টিপে ধরতে চায়।

দু'নম্বর কোম্পানির কমাণ্ডার একজন প্রাক্তন অফিসার—কাঁধে রাইফেলটা প্রায় তুলতে গিয়েছিল, কিন্তু স্তকমান ওর হাবভাব লক্ষ্য করে ফেলেছে। সে চেঁচিয়ে উঠলঃ

—খবরদার! গুলি করার সময় যথেষ্ট পাবে! একজন সেপাই কমিউনিস্টের কথা শুনতেই হবে আপনাদের। আমরা কমিউনিস্টরা আমাদের সমস্ত জীবন সঁপে দিয়েছি, সমস্ত রক্ত শেষ-বিন্দুটি পর্যন্ত দিয়েছি মজুর আর নিপীড়িত চাষীভাইদের সেবায়। সামনাসামনি মরণকে মোকাবিলা করার অভ্যেস আমাদের আছে। আমাকে মারতে পারেন...।

'ঢের শুনেছি', 'শেষ করতে দাও'—নানারকম পরস্পরবিরোধী ধ্বনি শোনা যেতে থাকে।

—...মারতে পারেন, কিন্তু আবারও বলছিঃ সজাগ হোন্ আপনারা। এখন মিটিং করার সময় নয়, শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযান চালাতে হবে।

—সৈন্যদের অর্ধনীরব ভিড়ের ওপর একবার চোখ বুলোয় স্তকমান। রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার ভরোনভ্স্কিকে দেখতে পায় খানিক দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। জোর করে হাসছে আর পাশের একজন লালফৌজী সেপাইয়ের কানে কানে কথা বলছে।

ভরোনভ্স্কির দিকে আঙুল দেখিয়ে স্তকমান চেঁচিয়ে ওঠে—আপনাদের রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার...। বলতে বলতেই অফিসারটা ওর মুখ চেপে ধরে পাশে দাঁড়ানো লোকটিকে কী যেন বলে, স্তকমানের কথা শেষ হবার আগেই এপ্রিলের বাদলা দিনের ভিজে বাতাসে একটা গুলির আওয়াজ হল। স্তকমান বুক চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে; ওর লোহার মতো ধূসর খালি মাথাটা আর নজরে পড়ে না। কিন্তু আবার দু'পায়ে খাড়া হয়ে ওঠে ও, দাঁড়িয়ে টলতে থাকে।

স্তকমানকে উঠতে দেখে ইভান ভাঙা-গলায় বলে ওঠে—অসিপ দাভিদোভিচ্!—জোর করে ওর দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে ইভান, কিন্তু আশেপাশের লোকেরা ওর হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলেঃ

—চোপ রও! রাইফেলটা দে, এই শুয়ার!

ইভানের হাতিয়ার খুলে নিয়ে পকেট্ হাতিয়ে দেখে ওরা, তারপর চত্বর থেকে টেনে বের করে নিয়ে যায় ওকে। অন্য কমিউনিস্টদেরও সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে বের করে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়। এক সওদাগর বাড়ির পাশের গলিতে পাঁচ-ছটা গুলির আওয়াজ হয়—একজন কমিউনিস্ট মেশিনগান-চালক তার মেশিনগানটা হাতছাড়া করতে চায়নি বলে তাকে খুন করা হল।

এদিকে স্তকমানের তখন নিঃশ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল, খড়িমাটির মতো সাদা হয়ে গেছে মুখটা, ঠোঁটে লাল রক্তের ফেনা কাটছে, টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে টলছে সে। শেষবারের মতো মনের সবটুকু জোর দিয়ে, দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্র করে সে চেঁচিয়ে বলেঃ

—ওরা তোমাদের ধাপ্পা দিয়েছে। বেইমানগুলো...নিজেদের দোষ মাফ করিয়ে নিয়ে নতুন অফিসারের গদি পেয়েছে...কিন্তু কমিউনিজম বেঁচে থাকবে...কমরেডরা... হুঁশিয়ার হও...।

ভরোনভ্স্কির পাশে দাঁড়ানো অফিসারটা আবার রাইফেল কাঁধে তোলে। দ্বিতীয় বুলেটটার ঘায়ে স্তকমান সোজা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সৈন্যদের পায়ের কাছে। একজন সেরদব্স্কি-সেপাই টেবিলের ওপর উঠে গলা হাঁকড়ায়ঃ

—ভালো ভালো বুলিপের কথা আমরা ঢের শুনেছি, কমরেড; কিন্তু সবই ছেঁদো কথা আর ধমকানি। এখন কুকুরের মতো মরতে বসেছেন এই চমৎকার বক্তাটি। কমিউনিস্টরা নিপাত যাক্, মেহনতী চাষীদের দুশমনরা নিপাত যাক্! আমাদের চোখ খুলে গেছে, আমরা জানি কে আমাদের শত্রু। ওরা আমাদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে কী বলেছিল? বলেছিল সবাই এক সমান হবে, নানা জাতের লোক ভাই-ভাই হবে! কমিউনিস্টরা তো এই কথাই বলেছিল। কিন্তু আসলে আমরা কী পেয়েছি? মানুষে মানুষে হানাহানি, ভাইসব! আমার বাবা আমাকে চিঠি দিয়েছেন, চোখের জলের দাগ সে চিঠিতে - বলেছেন ওরা নাকি দিনে-দুপুরে ডাকাতি করছে, চুরি করছে। আমার বাবার কাছ থেকে সমস্ত ফসল ওরা কেড়ে নিয়েছে, ডিক্রি জারি করে নাকি সব মেহনতী চাষীদের হাতে দেবে। আর আমাদের ঘর থেকে যা লুটে নিয়েছে তা খেয়ে যদি গরিব চাষীদের পেট মোটা হয়, তাহলে জিজ্ঞেস করি এ সব কমিউনিস্টদের ডাকাতি আর মানুষ মারা ছাড়া আর কী? গুলি করে খুন করে মারো ওদের!

বক্তাকে আর বক্তৃতা শেষ করতে হল নাঃ পশ্চিম দিক থেকে কসাক ঘোড়সওয়ারদের দুটো স্কোয়াড্রন কদম চালে এসে গাঁয়ের ভেতর ঢুকল। ডনের দক্ষিণ পাড় ধরে মার্চ্ করে নেমে এল কসাক পদাতিক ফৌজ। আর স্পেশাল ব্রিগেডের কমাণ্ডার বোগাতিরিয়েভ তার দলবল আর পাহারাদার হিসেবে আধ স্কোয়াড্রন সেপাই নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ঢুকল চত্বরের মধ্যে।

সেরদব্স্কি রেজিমেণ্ট চট্পট্ দু'সারিতে ভাগ হয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে শুরু করল। দূরে বোগাতিরিয়েভের দলটা এসে দাঁড়াবামাত্র কমাণ্ডার ভরোনভ্স্কি এমন এক কড়া সুরে হুকুম দিলে যা লালফৌজী সেপাইরা আগে কোনোদিন শোনেনিঃ

-রেজিমেণ্ট! এ্যাট্টেন...শন্!

* * *

বিদ্রোহী স্কোয়াড্রনগুলো উস্ত্-খপেরস্কে এসে সেরদব্স্কি রেজিমেণ্টকে ঘিরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিগেড কমাণ্ডার বোগাতিরিয়েভ ভরোনভ্স্কিকে নিয়ে সলা-পরামর্শ করতে চলে গেল। চত্বরের কাছেই একজন সওদাগরের বাড়িতে বসল বৈঠক। খুব সংক্ষেপে কাজ। চাবুকটা হাতে রেখেই ভরোনভ্স্কিকে নমস্কার জানায় বোগাতিরিয়েভ। বলেঃ

—খুব চমৎকার কাজ হয়েছে! আপনার এটা একটা কৃতিত্ব হয়ে রইল। কিন্তু কামানগুলোকে বাঁচাতে পারলেন না কেন?

—নেহাৎই দৈব দুর্বিপাক, কমাণ্ডার।— জবাব দেয় ভরোনভ্স্কি—গোলন্দাজরা প্রায় সব্বাই কমিউনিস্ট, আমরা যখন হাতিয়ার কেড়ে নিতে গেলাম তখন ওরা মরীয়া হয়ে বাধা দিলে। আমাদের দু'জনকে মেরে ওরা চাবি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

—আপশোসের কথা!— টেবিলের ওপর টুপিখানা ছুঁড়ে একটা নোংরা রুমালে ঘাম-ভেজা মুখটা মুছে বোগাতিরিয়েভ গম্ভীরভাবে হাসে—যাক্, বেশ ভালোই কাজ হল! আপনি গিয়ে আপনার সেপাইদের এবার বলুন।... বলুন যে ওদের হাতিয়ার সব দিয়ে দিতে হবে।

কসাক অফিসারের হুকুমের সুরে ঘাবড়ে গিয়ে ভরোনভ্স্কি তোৎলাতে থাকেঃ
—সব হাতিয়ার?
—এক কথা দুবার বলতে পারি না আমি। বলেছি 'সব', তার মানে 'সব'।
—কিন্তু আমাদের তো কথা হয়েছিল রেজিমেণ্টের হাতিয়ার কেড়ে নেয়া হবে না। অবিশ্যি মেশিন-গান বা হাত-বোমার কথা বুঝি...সে সব অস্ত্র আমরা বিনাশর্তেই ছেড়ে দেব নিশ্চয়। কিন্তু লালফৌজের সাজসরঞ্জাম...
—লালফৌজ-টালফৌজ নেই এখন!— বোগাতিরিয়েভের ঠোঁটদুটো শয়তানিতে কুঁচকে ওঠে, পায়ের ওপর চাবুকটা ঠোকে।— এখন ওরা আর লালফৌজের লোক নয়, ওরা ডন এলাকার রক্ষক ফৌজ...তা যদি ওরা না হতে চায় তো হবার রাস্তা দেখিয়ে দেব। এখন আর মরাকান্নার সময় নেই। আপনারা আমাদের দেশের ক্ষতি করেছেন, আর এখন পেশ করছেন শর্ত। আমাদের মধ্যে কোনো শর্ত হতে পারে না। বুঝেছেন?
সেরদব্স্কি রেজিমেণ্টের সেনানীমণ্ডলীর কর্তা বোগাতিরিয়েভের কথা শুনে চটে যায়। কালো সাটিনের গলাবন্ধের বোতামে আঙুল ঘষতে ঘষতে সে কড়াগলায় প্রশ্ন করেঃ
—আপনি তাহলে আমাদের বন্দী বলে ধরে নিয়েছেন? অবস্থাটা কি তাই?
—আমি তা বলিনি আর আজেবাজে আন্দাজ করে আমাকে জ্বালাতন করারও কোনো অর্থ দেখি না।— কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বোগাতিরিয়েভ বলে।
ওর হাবভাবে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে এ দুজনে অফিসার সম্পূর্ণ তার দয়ার ওপরে আছে।
মুহূর্তের জন্য ঘরটা নীরব হয়ে যায়। চত্বরের দিক থেকে একটা চাপা গর্জন আসে। ভরোনভ্স্কি ঘরের মধ্যে পায়চারি করে আর দাঁতে নখ কাটে। তারপর উর্দির বোতাম এঁটে বোগাতিরিয়েভের দিকে ফেরেঃ
—আপনার কথা বলার ঢং আমাদের কাছে অপমানজনক, আপনার মতো একজন রুশ অফিসারের মুখে শোভা পায় না। সে কথা আমি আপনার মুখের ওপরেই বলছি আর আপনি যখন আমাদের চ্যালেঞ্জ করলেন তখন...তখন কী করতে হবে তা আমরাও জানি। ক্যাপ্টেন ভলকভ্! আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি এখুনি চত্বরে গিয়ে অফিসারদের জানিয়ে দাও তারা যেন কোনক্রমেই কসাকদের হাতে অস্ত্র তুলে না দেয়। রেজিমেণ্টকে হুকুম দাও হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়াতে: আমি এখুনি এই ..বোগাতিরিয়েভ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা শেষ করে চত্বরে আসছি।
রাগে বোগাতিরিয়েভের মুখখানা বিকৃত হয়ে গেছে, কথা বলার জন্য মুখ খোলে সে। কিন্তু যখনই বুঝতে পারে সে এর মধ্যেই অনাবশ্যক অনেকখানি বলে ফেলেছে তখন চুপ করে যায়। মুহূর্তের মধ্যে সুর পাল্টে ফেলে। মাথার টুপি চাপড়ে, চাবুকটা আগের মতোই নাড়াচাড়া করতে করতে সে অপ্রত্যাশিত মোলায়েম আর বিনীতকণ্ঠে বলেঃ
—আপনারা আমাকে ভুল বুঝলেন মশাইরা। আমি অবিশ্যি কোনো বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা পাইনি, জাঙ্কার আকাদামি থেকে পাশ করেও বেরোইনি, তাই হয়তো যা বলতে চেয়েছি ভালো করে বোঝাতে পারিনি। কিন্তু আমরা সবাই তো একই দলে। আমাদের ভেতর মন-কষাকষির ভাব না থাকাই ভাল। আমি শুধু বলেছিলাম আপনাদের লালফৌজী সেপাইদের এখুনি বে-হাতিয়ার করতে হবে, বিশেষ করে যাদের ওপর আমরা বা আপনারা কেউই ভরসা করতে পারি না। আমি এই কথাটাই বলছিলাম।

—তা যদি হয় তো সেকথা আরো পরিষ্কার করে বলা উচিত ছিল কমাণ্ডার। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আপনার রণংদেহি সুর আর সমস্ত হাবভাব...।—মাথা নেড়ে ভরোনভ্স্কি আরেকটু নরম করে বলতে থাকে, তবু বলার ধরণে একটা বিরক্তির আভাস থেকে যায়—আমরা নিজেরাও তো এ ব্যাপারে একমতই ছিলাম যে যাদের ওপর ভরসা করা যায় না, বা যারা এদিক-ওদিক করছে তাদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে...

—হ্যাঁ, সেই কথাই আমি বলছিলাম।

—বেশ তো. আমরা ঠিক করেছিলাম নিজেরাই তাদের হাতিয়ার কেড়ে নেব: কিন্তু আমাদের জঙ্গী দলটাকে ইউনিট হিসাবেই বজায় রাখব। যেমন করে হোক তাদের আমরা বজায় রাখবই। আমরাই তাদের পরিচালনার ভার নেব আর লালফৌজের দলে কাজ করে যে কলঙ্ক আমাদের হয়েছে সসম্মানে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। সেটুকু সুযোগ আমাদের দিতেই হবে।

—আপনাদের গ্রুপে কতোজন সঙীনধারী থাকবে?

—প্রায় দু'শো।

—আচ্ছা, ঠিক আছে।— বোগাতিরিয়েভ অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়। এর পর আসে একটা অস্বস্তিকর থমথমে ভাব। ভলকভ্ই প্রথম সেটা ভাঙে।

প্রশ্ন করে—আমি যাব তাহলে?

ভরোনভ্স্কি জবাব দেয়—হ্যাঁ। গিয়ে যাদের আমরা তালিকা বানিয়েছিলাম তাদের হাতিয়ার ছেড়ে দিতে হুকুম দাও।

বিদ্রোহী কসাকরা কিন্তু এর মধ্যেই মহা উৎসাহে রেজিমেণ্টের অস্ত্র কেড়ে নিতে শুরু করেছিল। আলোচনার ফলাফলের জন্য তারা সবুরও করেনি। কসাকদের লুব্ধ হাত আর চোখ রেজিমেণ্টের রসদগাড়ি তন্নতন্ন করছে, শুধু গোলাবারুদই দখল করেনি, ভালো ভালো জুতো, পট্টি, কম্বল, পাতলুন, খাবারও কেড়ে নিয়েছে। কসাক ন্যায়বিচারের এই অভিজ্ঞতার পর প্রায় কুড়িজন সেরদব্স্কি সেপাই ওদের রুখতে চেষ্টা করলো। তল্লাসী করতে ব্যস্ত একজন কসাককে রাইফেলের কুঁদোর গুঁতো মেরে একজন খেঁকিয়ে উঠল—এ্যাই চোট্টা! আমার তামাকের থলিতে হাত দিয়েছিস কেন? ফিরিয়ে দে!

সঙ্গীরা ওকে থামালো। কিন্তু একটা উত্তেজিত চিৎকার উঠল তখনিঃ

—কমরেডরা, হাতিয়ার সামলাও!

—ওরা আমাদের ধাপ্পা দিয়েছে!

—রাইফেল হাতছাড়া কোরো না!

হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যায়। প্রতিরোধকারী লালফৌজী সেপাইদের একটা দেয়ালের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে বিদ্রোহী ঘোড়সওয়ার ফৌজ তাদের দু'মিনিটের মধ্যে কচুকাটা করে ফেলল।

ভলকভ্ চত্বরে আসার পর হাতিয়ার কাড়া শুরু হল আরো তাড়াতাড়ি। সেরদব্স্কি সেপাইদের সার দিয়ে দাঁড় করানো হল, মাটির ওপর ওদের রাইফেল, হাতবোমা, কার্তুজ বেল্ট, টেলিফোনের সাজসরঞ্জাম, কার্তুজের বাক্স, মেশিনগানের বেল্ট স্তূপাকার করে রাখা হল।

চত্বরে চলাফেরা করছিল বোগাতিরিয়েভ। সেরদব্স্কি সেপাইদের সামনে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে মাথার ওপর ত্রাস-জাগানো ভঙ্গিতে চাবুক উঁচিয়ে সে চেঁচালঃ

—শোনো যা বলছি! আজ থেকে তোমরা হতভাগা কমিউনিস্টগুলো আর তাদের ফৌজের সঙ্গে লড়বে। যারা আমাদের সঙ্গে চলবে তাদের মাফ করা হবে কিন্তু যারা অন্য-রাস্তায় যাবার চেষ্টা করবে তাদের কপালে ওই পুরস্কার! —দেয়ালের নিচে আকারহীন একটা সাদা স্তূপের মতো যে-লোকগুলো প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে ছিল তাদের দিকে চাবুক ঘুরিয়ে দেখাল বোগাতিরিয়েভ।

লালফৌজের সেপাইদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল, কিন্তু প্রতিবাদ করে একটা গলারও আওয়াজ উঠল না, কেউ বেরিয়ে এল না সারি ছেড়ে। ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক কসাকরা একটা নিরেট বেড়ির মতো চত্বরটাকে ঘিরে ধরেছে, গির্জার পিল্‌পের কাছেই সেরদব্‌স্কি মেশিনগানগুলো দিয়ে সেরদব্‌স্কি সেপাইদেরই নিশানা করা হল, কসাক মেশিনগান-চালকরা গুলি ছুঁড়বার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেগুলোর পেছনে।

এক ঘণ্টার মধ্যে বাদবাকি রেজিমেণ্টের ভেতর থেকে নির্ভরযোগ্য লোকদের বেছে নিল ভরোনভ্‌স্কি আর ভলকভ্‌। নতুন গড়া ফৌজী দলের নাম দেওয়া হল "এক নম্বর বিশেষ বিদ্রোহী ব্যাটালিয়ন"। সেদিনই তারা চলে গেল লড়াইয়ের ময়দানে। বাদবাকি প্রায় শ' আটেক লোককে ডনের পাড় ধরে জবরদস্তি মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ভিয়েশেন্‌স্কার দিকে।

সেরদব্‌স্কি মেশিন-গানেই সাজানো তিনটে কসাক স্কোয়াড্রন ওদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল।

উস্ত্‌-খপেরস্ক ছেড়ে যাবার আগে বিদ্রোহী স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডারদের একজনকে ডেকে পাঠাল বোগাতিরিয়েভ। তাকে বুঝিয়ে বলল:

—কমিউনিস্টদের নজরে রাখবে বারুদের কারখানার মতো। কাল সকালে ওদের ভিয়েশেন্‌স্কার পথে নিয়ে যাবে নির্ভরযোগ্য শান্ত্রীদের পাহারায়। আজই গ্রামে গ্রামে লোক পাঠিয়ে খবর দাও কারা যাচ্ছে। গ্রামের লোকরাই নিজেদের বিচার মাফিক সাজা দেবে ওদের।

। পনেরো ।

গ্রিগর মেলেখফ পাঁচদিন রইল তাতারস্কে। এর মধ্যে সে নিজের আর শাশুড়ীর পরিবারের জন্য বেশ ক'একর জমিতে ফসল বুনেছে। তারপর ওর বাপ ক্লান্ত হয়ে উকুনের বোঝা নিয়ে রেজিমেণ্ট থেকে ফিরে আসার পর ও আবার তৈরি হয় নিজের ডিভিশনে ফিরে যাবার জন্য। সেরদব্‌স্কি রেজিমেণ্টের কর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার কথা কুদীনভ ওকে গোপনে জানিয়েছিল, ও যাতে তাড়াতাড়ি রণাঙ্গনে ফিরে আসে সে অনুরোধও করেছিল।

যেদিন তাতারস্ক ছেড়ে কারগিনে রওনা হবার কথা, সেদিনই দুপুরে বেলায় গ্রিগর ডনে এল ঘোড়াকে জল খাওয়াতে। নদীর জল প্রায় বাগিচাগুলোর কিনারা অবধি উঠে

এসেছে। গাঙের কাছে নেমে যেতেই গ্রিগরের নজরে পড়ল—আক্সিনিয়া। ওর মনে হল যেন ইচ্ছে করেই আক্সিনিয়া জল তোলার ছল করছে, রয়ে-সয়ে ভরছে বালতিগুলো —যেন প্রতীক্ষা করছে ওরই আসার জন্য। বিচিত্র স্মৃতির জোয়ারে উদ্বেল হয়ে ওঠে গ্রিগরের মন, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যায় ও।

পায়ের শব্দ শুনে আক্সিনিয়া ফিরে তাকায়। ওর মুখে একটা চমক লাগার ভাব। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে দেখা-হওয়ার এই আনন্দ আর মনের পুরনো ব্যথাটুকু। এমন একটা করুণ অপ্রতিভ হাসি নিতান্ত বেমানান হয়ে ফুটে ওঠে ওর গর্বময় মুখশ্রীতে যে গ্রিগরের বুকে দোলা দিয়ে যায় করুণা আর ভালোবাসা। স্মৃতির প্রলেপে মৃদু হয়ে যায় কামনার কাঁটা-বেঁধা মন। ও ঘোড়া থামিয়ে বলেঃ

—এই যে আক্সিনিয়া মণি।

—ভালো তো!

—অনেক দিন বাদে আবার কথা হল।

—হ্যাঁ, অনেক দিন।

—তোমার গলার স্বরটাই আমি ভুলে গিয়েছিলাম...

—তোমার তো ভুলতে দেরি হয় না।

—সত্যিই কি দেরি হয় না?

ঘোড়াটা পিঠের দিকে চাপ দিচ্ছিল, গ্রিগর ঠেলে সরিয়ে দেয়। আক্সিনিয়া মাথা নিচু করে বাঁকের ডগা দিয়ে বালতিটা টেনে আনতে চেষ্টা করে, কিন্তু আংটার মধ্যে ডগাটা গলাতে পারে না। নিমেষের জন্য দুজনই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

একটা বুনো হাঁস ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে উড়ে যায় ওদের মাথার ওপর দিয়ে। নদীর ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে ডাঙায়, অতৃপ্তের মতো চেটে নিচ্ছে খড়ি-মেশানো মাটি। ওপারে বানের জলে ডোবা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাদা ফেনা তুলে ছুটেছে ঢেউগুলো। আক্সিনিয়ার ওপর থেকে চোখ ঘুরিয়ে গ্রিগর নদীর ওপারে তাকায়। জলের মধ্যে ফ্যাকাশে ধূসর গুঁড়ি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পপলার গাছ। পাতাহীন ডালগুলো দুলছে, আর আনকোরা শিষ্‌গজানো বেতস বন হাল্‌কা-সবুজ মেঘের মতো ঝুঁকে আছে নদীর ওপর। গলার স্বরে একটা বিরক্তি আর তিক্ততার আভাস ফুটিয়ে গ্রিগর বলেঃ

—আচ্ছা...তোমাতে আমাতে কথা হবার মতো কিছু কি নেই? চুপ করে আছ যে?

কিন্তু আক্সিনিয়া এতক্ষণে মনের জোর ফিরে পেয়েছে, মুখের পেশীতে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য না এনে ও জবাব দেয়ঃ

—আমাদের যা বলার ছিল সবই ফুরিয়ে গেছে নিশ্চয়.

—সত্যিই তাই?

—তাই তো হওয়া উচিত। বছরে একবারই ফুল ধরে গাছে।

—আমাদের গাছের ফুল আগেই ফুটে গেছে মনে কর?

—তোমার তা মনে হয় না?

—কেমন যেন অদ্ভুত লাগে...। —গ্রিগর ঘোড়াটাকে জলের দিকে ছেড়ে দিয়ে আক্সিনিয়ার দিকে তাকিয়ে করুণভাবে হাসেঃ কিন্তু আমার বুকের ভেতর থেকে তোমাকে কিছুতেই ছিনিয়ে বের করে দিতে পারি না আক্সিনিয়া। এদিকে আমার ছেলেপুলেরা বড়ো হয়ে গেল, আমার নিজেরই চুল অর্ধেক পেকে গেছে, তোমার আমার

মধ্যে এত বছরের ব্যবধান যেন একটা গহ্বরের মতো! তবু তোমার কথাই ভাবি· ঘুমের মধ্যে তোমাকে স্বপ্ন দেখি, এখনো ভালোবাসি তোমাকে। তোমার কথা ভাবতে ভাবতে অনেক সময় মনে পড়ে লিস্তনিৎস্কির বাড়িতে কীভাবে কাটিয়েছিলাম আমরা। কী ভালোবাসতাম একজন আরেকজনকে...! মাঝে মাঝে যখন আগের দিনগুলোর কথা ভাবি তখন মনে হয় জীবনটা একটা উল্টোনো শূন্য পকেটের মতো...

--আমারও তাই মনে হয়...কিন্তু আমার যেতে হবে...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলা...।

মন শক্ত করে ও বালতিগুলো তোলে, রোদ-পোড়া হাতদুটো বাঁকের ওপর রাখে। ঢালু পাড় বেয়ে উঠতে যাচ্ছিল আক্‌সিনিয়া। কিন্তু হঠাৎ গ্রিগরের দিকে মুখ ফেরায়। একটা পেলব লাবণ্যময় লাজে গালদুটো ওর সামান্য রাঙা হয়ে উঠেছেঃ

—ঠিক এই জায়গাটিতেই আমাদের প্রথম ভালোবাসা, গ্রিগর। তোমার মনে পড়ে? যেদিন কসাকরা ফৌজী ছাউনিতে তালিম নিতে গিয়েছিল?-- হাসতে হাসতে বলে আক্‌সিনিয়া। ওর গলার স্বরে একটা উৎফুল্ল ভাব ফুটে উঠেছে।

--আমার সবই মনে আছে!

ঘোড়াটাকে টেনে বাড়ির উঠোনে এনে জাব্‌নার গামলার সামনে বেঁধে দিল গ্রিগর। পান্তালিমন বাড়িতেই ছিল গ্রিগরকে বিদায় দেবে বলে। চালাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বুড়ো জিজ্ঞেস করেঃ

-কিরে, বেরিয়ে পড়বি তো এখুনি? তোর ঘোড়াটাকে একটু দানা-টানা দেব?

- বেরিয়ে পড়ব কোথায়? অনামনস্কভাবে বাপের দিকে তাকায় গ্রিগর।

--কেন, কার্গিনে?

--আজ যাচ্ছি না।

সে কি?

মনটা বদলালাম।- শুকনো ঠোঁট চেটে আকাশের দিকে তাকিয়ে গ্রিগর বললে মেঘ করছে, মনে হয় বৃষ্টি হবে। শুধু শুধু ভিজে তো কোনো লাভ নেই।

--তা সত্যি।-- বুড়ো সায় দেয় বটে কিন্তু গ্রিগরকে বিশ্বাস করতে পারে না, কারণ ক'মিনিট আগেও বাড়ির পেছনের খোঁয়াড়-ঘর থেকে দেখেছে ওকে আক্‌সিনিয়ার সঙ্গে গল্প করতে। মনে-মনে চিন্তিত হল বুড়ো---আবার পুরনো খেলা শুরু হয়েছে। নাতালিয়ার সঙ্গে আবার খোঁটাখুটি না বেধে যায়। নিকুচি করেছে, এমন একটা ষাঁড়ের জন্ম কি আমি দিয়েছি?-- পেছন ফিরে চলে-যাওয়া ছেলের পিঠের দিকে তাকিয়ে বুড়ো খুব ভালো করে মনে করতে চেষ্টা করে। প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়তেই আর সন্দেহ থাকে না। - আমিই দিয়েছি জন্ম শয়তানটার! তবে বাপকেও হার মানিয়েছে বেটা। আবার আক্‌সিনিয়ার মাথাটা চিবিয়ে সংসারে ঝামেলা ডেকে আনবে. তার আগেই যদি ওটাকে সাবাড় করতে পারতাম! কিন্তু কেমন করে তা করি?

আগের দিন হলে বুড়ো হয়তো গ্রিগরকে আক্‌সিনিয়ার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে দু'এক ঘা কষিয়ে দিতেও পেছ-পা হোত না। কিন্তু এখন সে কিছুই বলে না। এমন কি গ্রিগরের হঠাৎ মন-বদলাবার আসল কারণ যে তার জানা আছে তাও প্রকাশ করে না। গ্রিগর তো আর এখন জোয়ান দামাল কসাক 'গ্রিশ্‌কা' খোকাটি নয়, সে যে এখন ফৌজী ডিভিশনের কমান্ডার. সেনাপতি, যার তলায় হাজার হাজার কসাক. যদিও মেডেল-তকমা সে আঁটে না। আর পান্তালিমন--সে তো

জীবনে কোনোদিন সার্জেণ্টের ওপরে উঠতে পারল না—সে কেমন করে একজন সেনাপতির গায়ে হাত তুলবে, হলেই-বা সে তার ছেলে! শৃঙ্খলা বোধ রয়েছে বলে এসব নিয়ে বুড়ো আর কোনোরকম মাথাই ঘামাতে পারে না, শুধু বুঝল তার হাত বাঁধা, গ্রিগরের কাছ থেকে সে অনেক দূরে সরে এসেছে। কালও জমিতে লাঙল দেবার সময় গ্রিগর একবার ধমকের সুরে চেঁচিয়ে উঠেছিলঃ অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? লাঙলটা ধরো না! বুড়ো চুপ করে মেনে নিয়েছিল, জবাবে একটা কথাও বলেনি।

বিড়বিড় করে বুড়ো বলে—বৃষ্টি দেখে ভয় পেয়েছে!— বৃষ্টির কোনো চিহ্নই নেই, আকাশে তো মাত্র একটুকরো ছোট্ট মেঘ। নাতালিয়াকে বলে দেবে নাকি বুড়ো? কথাটা মনে হতে একটা সোয়াস্তি জাগে। পান্তালিমন ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল কিন্তু পরে আবার সুবুদ্ধির উদয় হতেই ফিরে এসে কাজে লাগে—পাছে একটা ঝগড়াঝাটির সৃষ্টি হয় ভয় সেইটেই।

* *

বাড়ি ফিরে এসেই আক্‌সিনিয়া বালতিগুলো খালি করে দিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। উৎকণ্ঠাভরে তাকিয়ে থাকে মুখটার দিকে—বয়েসের ছাপ পড়েছে, কিন্তু এখনো সুন্দর। এখনো আগের সেই কলঙ্কময়ীর মোহময় আকর্ষণটুকু বজায় আছে, কিন্তু যৌবনশেষের স্বল্পায়ু বর্ণচিহ্ন পড়তে শুরু করেছে গালের ওপর, চোখের পাতা হলদে হয়ে আসছে, চুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ধূসরের বিরল কয়েকটা রেখা। করুণ অবসাদে নিষ্প্রভ হয় এসেছে চোখদুটো। আয়নার ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ও, তারপর ঘুরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে বিছানায়—কাঁদতে থাকে ... উজাড়-করা মিষ্টি মন-জুড়োনো কান্না ও অনেকদিন কাঁদেনি।

সন্ধ্যে অবধি বিছানায় পড়ে থাকে আক্‌সিনিয়া, তারপর উঠে চোখমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ায়, পাগলের মতো এমন হুড়মুড় করে পোশাক পরতে শুরু করে যেন হবু-বরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য তৈরি হচ্ছে কনে। পরিষ্কার শেমিজ পরে মেহগিনি-রঙা একটা পশমী স্কার্ট আঁটে ও। মাথায় রুমাল বেঁধে একবার আয়নায় নিজের চেহারাটা দ্যাখে, তারপর বেরিয়ে যায়।

ঘুঘুর ডানার মতো ছাই-রঙা ছায়া নেমে আসছে তাতারস্কের আকাশে। ডন পাড়ের পপ্‌লার গাছগুলোর ওপাশে একটা ক্ষীণ ফ্যাকাশে চাঁদ উঠছে, জলের ওপর দিয়ে চাঁদের আলো ঢেউ-খেলানো ফিতের মতো। গরুভেড়ার দল এখনো ফিরছে স্তেপের মাঠ থেকে। আঙিনায় ঢুকবার সময় গরুগুলো ডাকে। নিজের গরুটার দুধ দোয়াবার জন্য আর অপেক্ষা করে না আক্‌সিনিয়া। খোঁয়াড় থেকে বাছুর বের করে তাকে মায়ের কাছে ঠেলে দেয়। তারপর মেলেখভদের বাড়ির বেড়ার কাছে গিয়ে দ্যাখে দারিয়া সবে দুধ দোয়ানো শেষ করে বালতি হাতে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। আক্‌সিনিয়া বেড়ার ওপর দিয়ে ডাকেঃ

—দারিয়া!

—কে ও?

—আমি। আক্‌সিনিয়া! এক মিনিটের জন্য আমার ঘরে আসবে?

—আমায় আবার কী দরকার হল তোমার?

—খুব দরকার। এসো না, যিশুর দিব্যি।

—আগে এই দুধটুকু ছে'কে নি, তারপর আসছি।

——আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকব কিন্তু তোমার জন্য।

ক'মিনিট বাদে বেরিয়ে আসে দারিয়া, দ্যাখে আস্তাখভদের ফটকের কাছে অপেক্ষা করছে আক্‌সিনিয়া। ওকে উৎসব-দিনের পোশাক পরতে দেখে অবাক হয় দারিয়া।

—এত তাড়াতাড়ি পোশাক পরা হয়ে গেল যে পড়শি!

—স্তেপান তো নেই তাই ঘরে কাজকম্মও তেমন নেই। একটা তো মাত্তর গরু...

—কেন ডেকেছিলে?

—ঘরের ভেতরে এসো না একটুখানি!— গলার স্বর কাঁপে আক্‌সিনিয়ার। আলাপের কারণটা আন্দাজ করে দারিয়া চুপচাপ ওর পেছু-পেছু রান্নাঘরে ঢোকে। আলো না জেবলেই আক্‌সিনিয়া সোজা গিয়ে ওর তোরঙ্গটার মধ্যে হাতড়াতে থাকে, তারপর দারিয়ার হাতখানা নিজের শুকনো তপ্ত হাতে চেপে ধরে তাড়াতাড়ি একটা আংটি গলিয়ে দেয় ওর আঙুলে।

—এ আবার কি? আংটি নাকি গো? আমাকে দিচ্ছ না তো? —অবাক হয়ে বলে দারিয়া।

—হ্যাঁ, সোনার আংটি। তুমি এটা রাখো।

—ধন্যবাদ। এর বদলে তোমায় কী কাজ করে দিতে হবে বলো ?

—তোমাদের গ্রিগরকে বোলো...একবার আমার কাছে আসতে।

—আবার সেই পুরনো খেলা? —একটা দুর্বোধ্য হাসি দারিয়ার মুখে।

—না, না! কী ভেবেছ তুমি? —ভয় পেয়ে যায় আক্‌সিনিয়া, চোখে জল এসে পড়ে—ওকে একটু স্তেপানের কথাটা বলতাম। হয়তো ওকে ছুটি করিয়ে দিতে পারবে।

দারিয়া ঠাট্টা করে—আমাদের ওখানে এলে না কেন? যদি এতই কাজের কথা তাহলে ওর সঙ্গে বাড়িতেই আলাপ করতে পারতে।

—না, না! নাতালিয়া আবার কী ভাববে...বড্ডো বিচ্ছিরি দেখায়...

—ঠিক আছে, বলে দেব'খন। ও কী করে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

* *

খাওয়া শেষ হল গ্রিগরের। চামচে রেখে হাত দিয়ে গোঁফ মোছে। টেবিলের তলায় কার পায়ের ছোঁয়া নিজের পায়ে লাগছে টের পেয়ে মুখ তুলে তাকায়, দ্যাখে দারিয়া চোখ মট্‌কাচ্ছে প্রায় বোঝাই যায় না এমনিভাবে।

—যদি পিয়োত্রার জায়গায় ওর আমাকে বসাবার মতলব থাকে আর ওইরকম কিছু বলে তবে ওকে খুনই করে ফেলব। ঢে'কিশালে নিয়ে মাথার ওপর ঘাগরা বে'ধে কুত্তীর মতো চাবকাবো!— এলোমেলো ভাবতে থাকে গ্রিগর। কিন্তু টেবিল ছেড়ে উঠে একটা সিগারেট জেবলে ও আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় সি'ড়িদরজার কাছে। দারিয়াও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এসে পড়ে। সি'ড়ির ওপর ওর পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গা ঘে'ষে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে:

—এই হতচ্ছাড়া! যাও এবার...উনি ডাকছেন।

—কে? —দম নিয়ে প্রশ্ন করে গ্রিগর।

—সে!

একঘণ্টা বাদে যখন নাতালিয়া আর ছেলেপিলেগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে, গ্রিগর আঁট

করে বড়ো কোটখানা গায়ে জড়িয়ে আক্‌সিনিয়ার সঙ্গে বেরিয়ে এল আস্তাখভ বাড়ির ফটক দিয়ে। অন্ধকার গলিটার মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে দাঁড়ায় ওরা, তারপর সেই রকম নিঃশব্দেই চলে যায় স্তেপের মাঠে—নিঃঝুম অন্ধকার আর কচি ঘাসের নেশা-ধরা গন্ধ ডাক দিয়েছে স্তেপের মাঠ থেকে। বড়োকোটের কিনারা দিয়ে আক্‌সিনিয়াকে জড়িয়ে কাছে টেনে নেয় গ্রিগর, টের পায় ও কাঁপছে। জ্যাকেটের নিচে আক্‌সিনিয়ারও বুকটা থেকে-থেকে ভয়ানকভাবে ঢিপঢিপ্‌ করে।

॥ ষোলো

পরদিন গ্রিগর রওনা হবার আগে নাতালিয়ার সঙ্গে খানিকটা কথা-কাটাকাটি হয়ে যায়। এক পাশে ওকে ডেকে নিয়ে নাতালিয়া ফিস্‌ফিস করে জিজ্ঞেস করেঃ

—কাল রাতে কোথায় গিয়েছিলে? বাড়ি ফিরতে অতো দেরি হল কেন?

—খুব দেরি হয়েছিল?

—না, তা নয় তো কি? জেগে উঠে মোরগের প্রথম ডাক শুনলাম, তখনো তুমি ফিরে আসোনি...

—কুদীনভ এসেছিল। ফৌজের ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা ছিল। সে সব তোমাদের মেয়েমানুষদের মাথায় ঢুকবে না।

—কিন্তু এখানে সে রাত কাটাতে এল না কেন?

—ভিয়েশেন্‌স্কায় যাবার তাড়া ছিল।

—কোথায় উঠেছিস এসে?

—আবোন্‌শিচকভদের বাড়ি। বোধহয় ওদের কোনো দূর সম্পর্ক হয়।

—আর জেরা করে না নাতালিয়া। মনে হয় যেন খানিকটা বুঝতে পেরেছে, তবু ওর চোখে আসল ভাবটা ধরা পড়ে না। গ্রিগরও নিশ্চিত হতে পারে না ওর কথা নাতালিয়া বিশ্বাস করেছে কি করেনি।

তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে নেয় গ্রিগর। পান্তালিমন বের হয় ঘোড়ার জিন আঁটতে। ইলিনিচ্‌না ওর মাথার ওপর ক্রুশ এঁকে চুমু খেয়ে চাপা গলায় বলেঃ

ঈশ্বরকে ভুলিস্‌নি রে বাছা, ঈশ্বরকে ভুলিস্‌নি। তুই নাকি কতগুলো খালাসিকে কেটেছিস্‌ শুনলাম...হা রে ভগবান্‌! গ্রিগর তুই ভেবে দ্যাখ্‌ কী করছিস! চেয়ে দ্যাখ তোর খোকাখুকিগুলো কী চমৎকার, যাদের মেরেছিস্‌ তাদেরও হয়তো ছেলেপিলে ছিল। তুই ছোটবেলায় কতো শান্ত ছিলি রে, আর এখন তোর মন থেকে দয়ামায়া উপে গেছে, তুই একটা নেকড়ে হয়েছিস। গ্রিগর তোর মা কি বলে শোন্‌। জীবনটা তোর মানত করা নয়, অলক্ষুণে একটা তলোয়ার ঘাড়ের ওপর যদি এসে পড়ে...

ম্লান হাসি হেসে গ্রিগর মায়ের শুকনো হাতে চুমু খেয়ে নাতালিয়ার কাছে যায়। একটা নিস্পৃহ আলিঙ্গন দিয়ে নাতালিয়া মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু ওর চোখে জল দেখতে পায় না গ্রিগর, তার বদলে শুধু ঘৃণা আর চাপা রাগ। ছেলেদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গ্রিগর বেরিয়ে আসে।

রেকাবে পা রেখে যখন ও ঘোড়ার ঝাঁকড়া চুল চেপে ধরে তখন ওর মনে হয়— জীবনটা নতুন পথে চলতে শুরু করেছে অথচ তবু প্রাণে আমার আবেগ নেই, বুকখানা ফাঁকা।...এখন আর সে ফাঁক আক্‌সিনিয়া ভরাতে পারবে না সে তো দেখতেই পাচ্ছি...।

ফটকের কাছে জড়ো-হাওয়া বাড়ির লোকজনদের দিকে একবারও ফিরে তাকাল না গ্রিগর। সাধারণ হাঁটার বেগে ঘোড়া চালাল রাস্তা ধরে। আস্তাখভদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় আড়চোখে একবার জানালাগুলোর দিকে তাকাল—সামনের ঘরের শেষ জানলাটার কাছে বসে আছে আকসিনিয়া। হেসে একটা ছুঁচের কাজ-করা রুমাল নাড়ল সে, তারপর হঠাৎ সেটা হাতের মধ্যে দলা করে চেপে ধরল ঠোঁটের ওপর, কালকের রাত জেগে কালো-হয়ে-যাওয়া চোখদুটোর ওপর।

ঘোড়সওয়ারের ফৌজী কদমে তাড়াতাড়ি চড়াই বেয়ে উঠতে থাকে গ্রিগর। টিলার মাথায় উঠে দ্যাখে দুজন ঘোড়সওয়ার আর একটা মালগাড়ি ধীরে ধীরে মেঠো পথ ধরে এগিয়ে আসছে ওরই দিকে। সওয়ার দুজনকে চিনতে পারে গ্রিগর—আন্তিপ্ ব্রেখোভিচ্ আর গাঁয়ের ওদিককার একজন জোয়ান কসাক। বলদ-টানা গাড়িটার দিকে চেয়ে ও আন্দাজ করে—মরা কসাকদের নিয়ে বাড়ি ফিরছে নিশ্চয়। কসাকদের কাছে এসে ও জিজ্ঞেস করলঃ

—কাদের নিয়ে বাড়ি ফিরছ হে?

—আলেক্সি শামিল, ইভান তমিলিন আর ইয়াকভ পদ্‌কভা।

—মরে গেছে?

—লড়াইয়ে মরে গেছে!

—কখন?

—কাল সাঁঝের বেলায়।

—কামানগুলো ঠিক আছো তো?

—হ্যাঁ। লালফৌজ আচম্‌কা এসে গোলন্দাজদের আস্তানায় হানা দিয়েছিল।

গ্রিগর টুপি খুলে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। বলদগুলোকে থামায় গাড়ির চালক। গাড়ির পাটাতনে মৃত কসাক তিনজন পাশাপাশি শুয়ে, মাঝখানে আলেক্সি শামিল। ওর পুরনো নীল শার্টখানা ছেঁড়া। দুফালা হয়ে যাওয়া মাথাটার মাঝখানে খালি হাতাটুকু গোঁজা, বুকের ওপর চাপা নোংরা নেকড়া-জড়ানো ঠুঁটো হাতখানা। একটা বন্য উন্মত্ততা যেন জমাট বেঁধে রয়েছে দাঁতহীন মুখের বিকৃত হাসিটুকুর মধ্যে; কিন্তু চক্‌চকে চোখজোড়া নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে শান্ত আর আপাত-করুণ বেদনার্ত দৃষ্টি নিয়ে, তাকিয়ে আছে স্তেপের আকাশে উড়ে-যাওয়া মেঘের দিকে।

তমিলিনের মুখটা চেনাই যায় না। বাস্তবিকপক্ষে সেটা মুখ তো নয়, একটা লাল আকারহীন পিণ্ডবিশেষ, চ্যাপ্‌টা তলোয়ারের ঘায়ে তেরছা করে কাটা।

ইয়াকভ পদ্‌কভা জাফরানি হল্‌দে। ঘাড় থেকে ওর মাথাটা প্রায় আলাদা হয়ে গেছে। শার্টের বোতামশূন্য কলারের ভেতর দিয়ে তলোয়ার-পোঁচানো কণ্ঠার শাদা হাড় বেরিয়ে আছে। কপালের আড়াআড়ি একটা কালো বুলেটের জখম। মুমূর্ষু কসাকটির

মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে নিশ্চয়ই কোনো লালফৌজী সেপাইয়ের মনে করুণা হয়েছিল, একেবারে নাকের ডগা থেকে সে গুলি করেছে—মুখখানা তাই ঝলসে গেছে, বারুদের কালো ফুট্‌কি ফুট্‌কি দাগ।

গ্রিগর ওদের বললে—এসো ভাই, আমাদের মৃত বন্ধুদের মনে করে ওদের আত্মার শান্তি কামনা করে একটু ধূমপান করা যাক্‌!—একপাশে ঘোড়াটাকে সরিয়ে নিয়ে ও জিনের পেটি খুলল, মুখ থেকে লাগামের লোহা খুলে রশিটা বেঁধে দিল ঘোড়ার সামনের বাঁ পায়ে, তারপর সেটাকে সবুজ রেশমি শিষ-গজানো ঘাসের ওপর ছেড়ে দিল চরবার জন্য। আস্তিপ আর অন্য কসাকটিও খুশি হয়েই ঘোড়া থেকে নেমে ঘাস খেতে ছেড়ে দেয় ওদের ঘোড়া দুটোকে। কসাকরা মাটিতে শুয়ে সিগারেট ফোঁকে। ঝাঁকড়া লোমওলা বলদগুলো ঘাস খাবার চেষ্টা করছিল। ওদের দিকে চেয়ে থেকে গ্রিগর জিজ্ঞেস করেঃ

—কিন্তু শামিল মরল কিভাবে?

—দোষটা ওর নিজেরই।

—কেমন?

—ব্যাপারটা হয়েছিল এইরকম। কাল দুপুরে আমরা বেরিয়েছিলাম টহলদারীর কাজে। আমরা ছিলাম চোদ্দজন, শামিলও ছিল দলে। বেশ শরীফ মেজাজেই চলছিল ও, আগে থেকে কোনো অমঙ্গলের আভাস পাবারও কথা নয় ওর। ঠুঁটো হাতখানা নেড়ে জিনের ডগায় লাগাম রেখে একবার বললেঃ 'আমাদের গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ ফিরবে কবে? ওর সঙ্গে আরেকদিন গানবাজনা মদ হলে বেশ হত!' সারা রাস্তাই গান গাইছিল ও। কোথাও লাল-সেপাইদের চিহ্নও দেখতে পেলাম না। শেষে একজন সার্জেণ্ট বললে, এবার নেমে ঘোড়া আর সওয়ার সবাই একটু বিশ্রাম করা যাক। আমরা তাই ঘোড়া থেকে নেমে একটা নিচু জায়গায় ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম। পাহাড়ে রইল একজন শান্ত্রী। আলেক্সিকে ঘোড়ার জিনের পেটি আল্‌গা করতে দেখে আমি বললামঃ আলেক্সি, পেটিটা বোধহয় আল্‌গা না করাই ভালো। ধরো যদি হঠাৎ পালিয়ে যাবার দরকার হয়? তখন এক হাতে তুমি কেমন করে ফের আঁটবে? আলেক্সি কিন্তু নাক কুঁচকে বললেঃ সে আমি তোমার চেয়ে তাড়াতাড়ি পারব। আমাকে শেখাতে এসো না হে বাচ্চা।—পেটির বাঁধন খুলে ঘোড়ার মুখ থেকে লাগামের লোহাটা বের করে নিল সে। ওখানে শুয়েই আমাদের তামাক, গালগল্প আর ঝিমুনি চলতে লাগল। আমাদের শান্ত্রীটিও কিন্তু ঝোপের আড়ালে বসে ঝিম্‌চ্ছিল। হঠাৎ খানিকটা দূরে শুনতে পেলাম ঘোড়ার নাকঝাড়ার আওয়াজ। নড়ার ইচ্ছে ছিল না, তবু উঠে টিলার মাথায় গেলাম। দেখলাম লাল সেপাইরা সিধে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। তাড়াতাড়ি ঢালু জায়গাটায় নেমে আমি চেঁচিয়ে বললামঃ লালফৌজ আসছে। ঘোড়ায় চাপো! ওরা প্রথমটা আমাকে বিশ্বাস করেনি কিন্তু পরে ওদের কমাণ্ডারের হুকুম কানে গেল। আমাদের সার্জেণ্ট তলোয়ার বের করে হামলা চালাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমাদের দলে মাত্র চোদ্দজন লোক আর ওদের আধ স্কোয়াড্রন, সঙ্গে মেশিনগানও আছে। আমরা ঘোড়া ছোটালাম। বেকায়দা জায়গায় ছিলাম বলে ওরা মেশিনগান চালাতে পারল না, তাই রাইফেল ছুঁড়তে শুরু করল। কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো ওদের চেয়ে দড়ো, ভালোই উৎরে গেলাম। তারপর ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পাল্টা গুলি চালাতে শুরু করলাম আমরাও। এতক্ষণে আমার নজরে পড়ল শামিল তো সঙ্গে নেই। যখন আমরা ঘোড়ায় উঠতে যাচ্ছিলাম ও তখন নিজের ঘোড়ার দিকে দৌড়ে গিয়ে ভালো হাতখানা জিনের ডগায় রেখে রেকাবে একটা পা উঠিয়েছে। কিন্তু জিনে উঠে

বসার চেষ্টা করতেই পেটিটা হড়কে নেমে গেল ঘোড়ার পেটের নিচে। কীভাবে যেন ঘোড়াটা ছিটকে বেরিয়ে পালিয়ে এল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আলগা জিনখানা দোলাতে দোলাতে। শামিল একা পড়ে গেল লাল সেপাইদের হাতে। এইভাবে নিজের মরণ আলেক্সি নিজেই ডেকে এনেছে। পেটিটা আল্‌গা করে না রাখলে ও বেঁচে থাকতো এতক্ষণ। ওরা ওকে এমনভাবে কুপিয়ে কাটল যে রক্ত দেখলে তোমার মনে হত যেন বলদ জবাই করা হয়েছে। লালফৌজকে তাড়িয়ে দেবার পর খাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমরা ওকে তুলে নিয়ে আসি।

কোচোয়ানটি অধীর হয়ে বলে—আচ্ছা এবার তাহলে আমরা উঠি?

কসাকদের বিদায় জানিয়ে গ্রিগর শেষবারের মতো ওর মৃত প্রতিবেশীদের দেখবার জন্য গাড়িটার কাছে যায়। এবারই ওর নজরে পড়ে তিনজনের প্রত্যেকের পা খালি, অথচ ওদের পায়ের কাছে তিন জোড়া জুতো সাজানো।

—ওদের জুতো খুলে নিল কে? জিজ্ঞেস করে গ্রিগর।

—আমাদের কসাকরাই ওকাজ করেছে গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ। ওদের বুটগুলো ভালো ছিল, ফৌজের সবাই ভাবলে ওগুলো বরং খুলে নিয়ে যাদের পুরনো হয়ে গেছে, তাদের দেয়া যাক। তাই ওদেরগুলো নিয়ে তার বদলে তিন জোড়া পুরনো জুতো রেখে দিয়েছি।

গ্রিগর দুল্‌কি চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে সারা পথ এক গতিতে ছুটল কারগিনের দিকে। মৃদু হাওয়ায় ঘোড়ার চুলগুলো উড়ছিল। রাস্তার এধার ওধার ছুটে পালাতে থাকে লম্বা লম্বা বাদামি মেঠো ইঁদুর, ভয় পেয়ে শিস্‌ কাটে। স্তেপের মাঠের নিথর নীরবতার সঙ্গে ওদের এই তীক্ষ্ণ উদ্বিগ্ন শিসের যেন একটা অদ্ভুত মিল আছে। রাস্তার পাশের ঢিবিগুলোর ওপর দিয়ে নিচু হয়ে উড়ে যায় ধেড়ে কোঁচ্‌বক। সূর্যের আলোয় সাদা বরফের মতো চক্‌চকে একটা কোঁচ্‌বক তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে উঠে যায় আকাশের একেবারে মাথায়—তাড়াতাড়ি উড়তে গিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দেয়, যেন নীল সমুদ্রে সাঁতার কেটে চলেছে। প্রায় দু'শো গজ উড়ে আবার নিচে নামতে থাকে—এবার ডানা ঝাপ্‌টাচ্ছে আরো তাড়াতাড়ি। মাটির খুব কাছাকাছি এসে সবুজ ঘাসের পটের সামনে শেষবারের মতো ডানা কাঁপিয়ে সবুজের সমুদ্রে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বকটা।

পুরুষ কোঁচবকগুলোর আকুতিভরা কামনাকুল ডাক শোনা যাচ্ছে চারদিক থেকে। রাস্তার খানিকটা দূরে গ্রিগর দেখল তিন ফুটেরও বেশি জায়গা জুড়ে পরিষ্কার একটা মাটির গোল দাগ, একটা মাদী বকের জন্য লড়াই করতে গিয়ে কোঁচবকদের পায়ের ঘষায় তৈরি হয়েছে বৃত্তটা। জায়গাটুকুর মধ্যে একটা ঘাসের শীষও আস্ত নেই, শুধু ধূসর ধুলো জমা, তাতে পাখিগুলোর পায়ের দাগ। সোমরাজ আর মুড়ো ঘাসের ডাঁটিতে পালক লেগে আছে। কাছেই একটা ছাই-রঙা মাদী বক বাসা ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছিল, উড়বার সাহস না পেয়ে ছোট ছোট পিট্‌পিটে পায়ে তাড়াতাড়ি দৌড়তে লাগল বুড়ি মানুষের মতো পিঠ কুঁজো করে। ঘাসের মধ্যে ঢুকে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

বসন্ত-মুকুলিত এক অদৃশ্য মহাশক্তিমান স্পন্দনময় জীবন আপনাকে মেলে ধরছে স্তেপের প্রান্তরে। ঘাসের অঢেল সমারোহ। আড়ালে লুকোনো বাসাগুলোর মধ্যে পাখি আর পশুরা জুটি বাঁধছে। চষা জমিতে অসংখ্য কচি অঙ্কুর ছেয়ে আছে সরু সরু কুঁচির মতো। শুধু গেল-বছরের ঘাসের মুড়োগুলো স্তেপের ওপর প্রহরীর মতো

দাঁড়িয়ে-থাকা ঢিবিগুলোর গায়ে বিষণ্ণভাবে জড়াজড়ি করে মাটির ওপর নুয়ে আছে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়। কিন্তু টাটকা সতেজ হাওয়া এসে নিষ্ঠুরভাবে তাদের শুকনো শেকড় ভেঙে, উপড়ে নিয়ে এলোমেলো উড়িয়ে দিচ্ছে জীবন্ত স্তেপের প্রান্তরে।

* *

গ্রিগর কারগিনে এলো সন্ধ্যে লাগার মুখে। পরদিন সকালে ডিভিশনের ভার হাতে নিল সে। ভিয়েশেন্‌স্কার বড়োকর্তাদের শেষ নির্দেশ না মেনে নিজেই সহকারী সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে আক্রমণের জন্য তৈরি হল। রেজিমেণ্টের তখন ভয়ানক গোলাবারুদের অভাব। গোলাবারুদ জোগাড় করতে হলে হামলা চালানো দরকার, লালফৌজের কাছ থেকেই তা দখল করা দরকার। প্রধানত এই কারণেই গ্রিগর আক্রমণের সংকল্প করেছে।

সন্ধ্যের দিকে একটা পদাতিক ও তিনটে অশ্বারোহী রেজিমেণ্টকে আনা হল কারগিনে। ডিভিশনের মোট বাইশটা মেশিনগানের মধ্যে মাত্র ছ'টা নেওয়া হবে, কারণ অন্যগুলোতে লাগাবার মতো অতো কার্তুজ-বেল্‌ট্ নেই। পরদিন সকালে শুরু হয় কসাক বাহিনীর আক্রমণ। গ্রিগর নিজেই ভার নিয়েছে তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্টের। টহলদারদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে ও তাড়াতাড়ি রেজিমেণ্টটাকে নিয়ে আসে দক্ষিণের দিকে। আগেই খবর পাওয়া গিয়েছিল ওখানে নাকি দুটো লালফৌজী রেজিমেণ্ট মোতায়েন হয়েছে কসাকদের ওপর হামলা চালাবার জন্য।

কারগিন থেকে প্রায় দু মাইল দূরে একজন সংবাদবাহক এসে ধরল গ্রিগরকে। কুদীনভের কাছ থেকে একটা চিঠি এনেছে সে। চিঠিতে বলা হয়েছেঃ

"দুই নম্বর সেরদব্‌স্কি রেজিমেণ্ট আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সমস্ত সৈন্যের হাতিয়ার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কুড়িজন বাধা দিয়াছিল, তাহাদের মারা হইয়াছে। চারটি কামান পাওয়া গিয়াছে (হতভাগা গোলন্দাজগুলি আগেই চাবি লইয়া পলাইয়াছিল), সেই সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে দুই শতেরও বেশি গোলা আর নয়খানি মেশিনগান। লাল সিপাহীদের আমরা ফৌজী কোম্পানিগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া ছড়াইয়া দিব এবং নিজেদের লোকদের সঙ্গেই তাহাদের লড়িতে বাধ্য করিব। একটি ব্যাপার আমি প্রায় ভুলিতেই বসিয়াছিলাম। আপনাদেরই গ্রামের দুইজন কমিউনিস্ট প্রতিবেশী ইভান কতলিয়ারভ ও মিশকা কশেভয় এবং সেই সঙ্গে আরো অনেক ইয়েলান্‌স্কা-বাসী কমিউনিস্ট ধরা পড়িয়াছে। তাহাদের ভিয়েশেন্‌স্কার রাস্তা ধরিয়া আনা হইতেছে। আপনাদের খবরাখবর কী? যদি কার্তুজের প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে দূত মারফত খবর দিন, আমরা পাঁচশত কার্তুজ পাঠাইয়া দিব।--কুদীনভ।"

তাড়াতাড়ি চিঠি পড়ছিল গ্রিগর, কিন্তু ইভান আর মিশ্‌কার গ্রেপ্তারীর খবরটা পাওয়ামাত্র চেঁচিয়ে আরদালিকে ডাকে। প্রোখর জাইকভ সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে আসে ঘোড়া নিয়ে, গ্রিগরের মুখের ভাব দেখে ভয় পেয়ে সেলাম ঠুকে বসে পর্যন্ত।

গ্রিগর চিৎকার করে বলে ঃ রীয়াব্‌চিকভ! কোথায় রীয়াব্‌চিকভ?

—সারির শেষে আছে।

—শিগ্‌গির গিয়ে ডেকে আনো।

জাইকভ ছুটে যায়। মিনিট দুয়েক বাদে রীয়াব্‌চিকভ ঘোড়া চালিয়ে আসে গ্রিগরের কাছে।

গ্রিগরের পাশে সংবাদবাহককে দেখতে পেয়ে সে বলে

—ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে কোনো চিঠি?

—হ্যাঁ। রেজিমেণ্ট আর ডিভিশনের ভার নাও তুমি। আমি চললাম।

—বেশ তো, তা নয় হল। কিন্তু এত তাড়া কিসের? চিঠিতে কী আছে? কে লিখল? কুদীনভ?

—সেরদব্‌স্কি রেজিমেণ্ট উস্ত্‌-খপেরস্কে ধরা দিয়েছে।

—বাহবা! তাহলে আমরা এখনো জিন্দা আছি! এখ্‌নি চললে নাকি?

—এখ্‌খ্‌নি।

—আচ্ছা। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন্‌। ফিরে এসে দেখবে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি।

সজোরে ঘোড়ার পিঠে চাব্‌ক হাঁকায় গ্রিগর।

—মিশ্‌কা আর ইভানকে আমার জ্যান্ত পেতেই হবে।...পিয়োত্রাকে কে মেরেছিল জানা দরকার।...মিশ্‌কা আর ইভানকে বাঁচাতেই হবে...যেমন কোরে হোক্‌।...আমাদের দ্‌শ্‌মন ওরা, তব্‌ তো একসময় বন্ধ্‌ত্ব ছিল।—ভাবতে ভাবতে গ্রিগর ঘোড়া চালায় উৎরাইয়ের পথে।

॥ সতেরো ॥

সেরদব্‌স্কি রেজিমেণ্ট আত্মসমর্পণ করার পরের দিন সকালে পঁচিশ জন বন্দী কমিউনিস্ট উস্ত্‌-খপেরস্ক্‌ থেকে বেরিয়ে মার্চ্‌ করে চলল কড়া শান্ত্রী-পাহারায়। পালাবার কোনো চিন্তাই ওদের মাথায় আসেনি। বন্দীদের মাঝখানে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে ইভান আলেক্সিয়েভিচ্‌। কসাক পাহারাদারদের দিকে ঘৃণাভরা আক্ষেপভরা চোখে তাকিয়ে থেকে ও ভাবছিলঃ এই শেষ। আমাদের যদি বিচার না হয় তাহলে তো খতম হয়ে গেলাম।

কসাকদের মধ্যে বয়স্ক দাড়িওয়ালা লোকই সংখ্যায় বেশি। ওদের নায়ক একজন ব্‌ড়ো 'সনাতনপন্থী', আগে আতামান রেজিমেণ্টে সার্জেণ্ট ছিল। বন্দীরা উস্ত্‌-খপেরস্ক ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে হ্‌কুম দিয়েছে গল্প করা বা ধ্‌মপান করা চলবে না, কোনো প্রশ্নও তারা করতে পারবে না।

পিস্তল উঁচিয়ে ওদের চড়া গলায় জানিয়ে দিয়েছে—ওরে শয়তানের সাগরেদরা, ঈশ্বরের নাম নে। যাচ্ছিস্‌ তো মরতে, শেষ সময়টাতে আর পাপ বাড়াস্‌নে। বজ্জাত লম্পটগ্‌লো, প্রভু ঈশ্বরকে ভুলেছিস। নিজেদের বেচে দিয়েছিস সেই অপবিত্র শয়তানের কাছে। দ্‌শমনের কলঙ্ক লাগিয়েছিস নিজেদের গায়ে।

বন্দীদের মধ্যে সেরদব্‌স্কি রেজিমেণ্টের কমিউনিস্ট ছিল দ্‌'জন। ইভান ছাড়া

আর বাদবাকিরা সবাই ইয়েলান্‌স্কা জেলার রুশ—লম্বা বলিষ্ঠ তরুণ সব, সোভিয়েত ফৌজ যখন ওদের এলাকায় আসে তখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। ওরা মিলিশিয়া সেপাইদের কাজ করত, কেউ কেউ গ্রাম বিপ্লবী কমিটির সভাপতিও ছিল। যখন বিদ্রোহ শুরু হয় তখন উস্ত্‌-খপেরস্ক্‌-এ পালিয়ে আসে লালফৌজে যোগ দেবার জন্য। শান্তির সময় ওদের সবাই কারিগরী কাজ করতঃ ছুতোর মিস্ত্রি, পিপে-ওয়ালা, রাজমিস্ত্রি, রুটিওয়ালা, মুচি, দর্জি। ওদের একজনেরও বয়েস পঁয়ত্রিশের বেশি মনে হয় না, সবচেয়ে তরুণ যে তার বয়েস কুড়ি। সবল জোয়ান, দেহের খাটুনির জন্য প্রকাণ্ড হাতগুলো গিঁট-জাগানো। পাহারাদার বুড়ো কুঁজো কসাকদের তুলনায় ওদের দেখতে-শুনতে অন্যরকম, তফাতটা নজরে পড়ার মতো।

ইভানের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ইয়েলান্‌স্কার একজন কমিউনিস্ট ওকে জিজ্ঞেস করলেঃ আচ্ছা, ওরা আমাদের বিচার করবে? তোমার কী মনে হয়?

—আমার সন্দেহ আছে।..

—মেরে ফেলবে নাকি?

—তাই মনে হয়।

—কিন্তু ওরা তো বন্দীদের ওপর গুলি চালায় না, কসাকবাই বলছিল। মনে আছে তোমার?

ইভান আলেক্সিয়েভিচ চুপ করে থাকে, কিন্তু একটা আশার আলো জাগে ওর মনে। ভাবে--সে কথাটা ঠিক। ওরা আমাদের গুলি করতে সাহস পাবে না। ওদের স্লোগান ছিল—কমিউন নিপাত যাক্‌, লুঠেরাজি আর গুলিবাজি নিপাত যাক্‌। ওরা নাকি বন্দী করার বেশি আর কিছু করে না, শুনতে তো পাই। একবার চাবুক, তারপর কয়েদ। সে অবিশ্যি ভয় পাবার মতো কিছু নয়। শীতকাল অবধি কয়েদে থাকব, তারপর ডনে নতুন বিপ্লব শুরু হবে, আমাদের দেশের লোকরা শ্বেতরক্ষীদের তাড়িয়ে দিয়ে আমাদের বের করে আনবে।

আলোর শিখার মতোই জ্বলে উঠেছিল আশাটা, আলোর শিখার মতোই ম্লান হয়ে গেল।--- না, গুলি ওরা করবেই আমাদের। শয়তানের মতো বর্বর সব। হে জীবন, বিদায়! আমরা ঠিক পথটা বেছে নিতে পারিনি। হায় রে! আমাদের উচিত ছিল কোনোরকম দয়ামায়া না দেখিয়ে ওদের সঙ্গে লড়া। ছেড়ে না দিয়ে শেষ পর্যন্ত কচুকাটা করাই উচিত ছিল।--- হাত মুঠো করে ও মাথা নাড়তে থাকে নিষ্ফল রাগে, তারপরেই মাথার পেছন থেকে একটা ঘুষি খেয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ার জোগাড় হয়।

ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে এসে পাহারাদারদের জিম্মাদার সার্জেণ্টটা ওকে ধমক লাগায় --এ্যাই শুয়োর হাতের মুঠো পাকাচ্ছিস কেন? চাবুক দিয়ে ইভানকে একটা ঘা কষায়। ইভানের রগ থেকে থুতনি অবধি মুখের ওপর একটা কালশিটে দাগ পড়ে যায়।

কাঁপা গলায়, অনুরোধের হাসি হেসে ইয়েলান্‌স্কার একজন লোক বলে—কাকে মারছেন? আমাকেই মারুন না দাদু! উনি তো দুখী মানুষ, ওকে কেন পেটাচ্ছেন?— ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে ইভানের সামনে দাঁড়ায় লোকটি।

সার্জেণ্ট গর্জে ওঠে—তোকেও অনেক ধোলাই দেওয়া হবে রে! কসাক ভাইসব, পেটাও বেটাদের! মারো কমিউনিস্টগুলোকে!

লোকটার পাতলা শার্টের ওপর সার্জেণ্টের চাবুকের ছিলা এত জোরে নেমে আসে যে আগুনের মুখে গাছের পাতার মতো কাপড়ের ফালিগুলো কুঁকড়ে যায়। কাটা জায়গাটা

থেকে রক্ত বেরিয়ে শার্ট ভিজে যায়। রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে সার্জেণ্ট ঘোড়া দিয়ে বন্দীদের গঁুতোয় আর চাবুক চালায় নির্মমভাবে।

আবার ছিলাটা নেমে আসে ইভানের ওপর। চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয় কালশিটে-পড়া আগুন, পায়ের নিচে মাটি দুলে ওঠে আর নদীর ওপারে সবুজ বনটা মনে হয় যেন কাঁপছে। ঘোড়ার রেকাবটা চেপে ধরে ইভান সার্জেণ্টকে জিন থেকে টেনে নামাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তলোয়ারের চ্যাপ্টা দিকের এক ঘায়ে সোজা ছিটকে পড়ে তেতো ধুলো-ভরা মাটির ওপর। নাক আর কান থেকে গরম রক্ত বেরিয়ে আসে।

ভেড়ার পালের মতো ওদের একসঙ্গে তাড়িয়ে নেবার সময় পাহারাদাররা অনেকক্ষণ ধরে নিষ্ঠুরভাবে মারতে থাকে ওদের। মাটিতে পড়ে ইভান যেন স্বপ্নের মধ্যে শুনতে পায় চেঁচামেচি, আশেপাশে পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ, ঘোড়ার নাকের ঘোঁত ঘোঁত শব্দ। ওর খালি মাথায় ঘোড়ার এক ফোঁটা গরম ঘাম পড়ে। খুব কাছেই, একেবারে মাথার ওপর কে যেন ভয়ানক খিঁচুনির মতো ফোঁপাতে ফোঁপাতে চেঁচিয়ে উঠল—

—শুয়োর! নরকে পচে মর্! নিরস্ত্র লোকদের ধরে মারছে! তুই...

ইভানের জখম পা-টাকে মাড়িয়ে দিল একটা ঘোড়া, পায়ের থোড়ার মাংসের মধ্যে চেপে বসল নালের ভোঁতা কাঁটাগুলো। তারপরেই একটা ভিজে ভারি দেহ ঘাম আর রক্তের নোন্‌তা গন্ধ নিয়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ল ওর পাশে। ইভান শুনতে পেল বোতলের ভেতর থেকে তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ার মতো লোকটার গলা থেকে গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরুচ্ছে।

মারধোর করা শেষ হয়ে যাবার পর কসাকরা ওদের নদীর পাড়ে খেদিয়ে নিয়ে এসে ওদের দিয়েই জখমগুলো ধুইয়ে নিল। হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে ইভান কেটে ছড়ে-যাওয়া জ্বালা-ধরা ঘাগুলো ধুয়ে আঁজলা ভরে জল খেল, ও ভয় পাচ্ছিল হয়তো ওর অদম্য পিপাসা মেটাবার মতো সময় পরে আর পাবে না।

প্রথম গ্রামটার কাছাকাছি আসতে কসাকদের মধ্যে একজন আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। বন্দীরা প্রথম বাড়ির উঠোনটা সবে পার হয়ে এসেছে এখন সময় একদল লোক হুড়মুড়িয়ে ছুটে এল ওদের দিকে হাতে উকোন-ঠ্যাঙা, কোদাল, বর্শা আর শাবল নিয়ে।

কসাক মেয়ে-পুরুষদের দেখামাত্র ইভানরা বুঝে ফেলল ওদের মৃত্যু তাহলে হবে এইভাবেই।

একজন কমিউনিস্ট বলে ওঠে—কমরেড, এইবেলা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাখি!

নদীতে গা-হাত-পা ধুয়ে নেবার পর ইভানের মনের বলও বেড়ে গিয়েছিল। যখন দেখল কসাকরা মেয়ে-পুরুষ সবাই দৌড়ে আসছে ওদের দিকে তখন ও তাড়াতাড়ি আশপাশের কমরেডদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে চাপা গলায় বললেঃ

—ভাইসব, কীভাবে লড়তে হয় তা আমরা ভালোই জানতাম; এবার আমাদের শিখতে হবে মাথা উঁচু করে মরতে। শেষ নিঃশ্বাসটুকু অবধি একটি জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে ঃ একটি চিন্তাই আমাদের সান্ত্বনা হয়ে থাকবে। ওরা আমাদের বর্শা দিয়ে খোঁচাতে পারে, কিন্তু সোভিয়েত হুকুমতকে তো আর বর্শার খোঁচা দিয়ে সরাতে পারবে না। কমিউনিস্ট ভাইসব! বীরের মতো মরো যাতে আমাদের দুশমনরা দেখে উপহাস করতে না পারে।

প্রথমবার ওদের মারপিট করার পর থেকেই যা কিছু ঘটে যাচ্ছে সব একটা যন্ত্রণাময় দুঃস্বপ্নের মতো। কুড়ি মাইল রাস্তা গ্রামের পর গ্রাম পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ওদের, সব জায়গাতেই ওদের স্বাগত জানায় একেক পাল অত্যাচারী জনতা। বুড়ো, মেয়ে, বড়ো বড়ো ছেলেরা ওদের মারে, রক্ত-মাখা ফুলে-ওঠা মুখে থুতু ছিটোয়, পাথর আর শক্ত মাটির ডেলা ছোঁড়ে, চোখে ধুলো আর ছাই দেয়। মেয়েদের পাশবিকতা যেন আরেকটু বেশি, ওরা আরো নিষ্ঠুর আর বিচিত্র ধরনের অত্যাচার চালায়। শেষের দিকে পঁচিশ জন মানুষকে যেন আর মানুষ হিসাবে চেনাই যায় না—দেহ আর মুখ এমন পৈশাচিকভাবে বিকৃত করে দিয়েছে ওরা। কাদা-মেশানো চাপ চাপ নীলচে-কালো রক্তে মাখামাখি।

প্রথম প্রথম পঁচিশ জনের প্রত্যেকেই আঘাত এড়াবার জন্য পাহারাদারদের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকবার চেষ্টা করছিল। সবাই চাইছিল ঠেলে মাঝখানে আসতে, ফলে সবাই মিলে গাদাগাদি করে একটা জমাট দেহপিণ্ডের মতো হয়ে গেছে। কসাকরা কিন্তু কেবলই ওদের আলাদা করে ফাঁক ফাঁক হয়ে হাঁটতে বাধ্য করছিল। মারপিটের হাত থেকে বাঁচবার সামান্য ভরসাটুকুও ওদের আর রইল না, এলোমেলো ধুঁকতে ধুঁকতে চলল ওরা শুধু একটিমাত্র বাসনার তাড়নায়ঃ জোর করে এগোতেই হবে, পড়া চলবে না। কারণ একবার যদি পড়ে তাহলে আর উঠতে হবে না। প্রথম দিকে সবাই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখছিল, উকোন-ঠ্যাঙার লোহার কাঁটা কিংবা বর্শার ভোঁতা ডগা মুখের সামনে এলে অক্ষমভাবে হাতের তেলো দিয়ে চোখ আড়াল করছিল। কিন্তু শেষে সব কিছু সম্পর্কে একটা পরম উদাসীনতা পেয়ে বসল ওদের। প্রথম প্রথম ওরা দয়া ভিক্ষা করছিল, অসহ্য যন্ত্রণায় মরীয়া হয়ে পশুর মতো গজরাচ্ছিল, সেই সঙ্গে কাতরানি আর শাপমন্যি। কিন্তু দুপুর নাগাদ নীরবে হাঁটতে লাগল সবাই। শুধু একজন ইয়েলান্‌স্কার লোক, বয়েসে সকলের ছোট আর রেজিমেণ্টের সকলের প্রিয় রসিক মানুষ, সেই শুধু মাথার ওপর একেক ঘা পড়লে কঁকিয়ে কেঁদে উঠছিল। জ্বরের তাড়সে কাঁপুনির মতো কাঁপতে কাঁপতে ধুঁকে ধুঁকে চলছিল লাঠির বাড়িতে ভাঙা একখানা পা টেনে টেনে।

এক গ্রামে এসে একজন বন্দী আর ঠিক থাকতে পারল না। করুণ ছেলেমানুষি গলায় কাঁদতে কাঁদতে সে শার্টের কলার ছিঁড়ে কসাকদের দেখাল একটা ছোট জং-ধরা ক্রুশ, গলার সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা।

—কমরেড্‌রা আমি মাত্র কদিন হল পার্টিতে যোগ দিয়েছি।...দয়া করো! আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। আমার দু'দুটো বাচ্চা আছে।...দয়া করো! তোমাদেরও তো ছেলেপুলে আছে।

বঁড়শির মতো নাকওয়ালা এক বুড়ো জবাব দিল—আমরা তোমার কমরেড হলাম কিসের খাতিরে? জিভ সামলে রাখ! তাহলে এখন একটু কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে? কিন্তু যখন তোমরা আমাদের কসাকদের গুলি করে মেরেছিলে, দেয়ালের ধারে দাঁড় করিয়েছিলে, তখন তো ঈশ্বরের কথা মনে পড়েনি?— জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে বর্শাটা ঘুরিয়েই সে লোকটার মাথার ওপর বাড়ি মারল।

ইভান আলেক্সিয়েভিচ চোখে যা দেখছে আর কানে যা শুনছে তার কোনো ছাপই পড়ছে না ওর মনে, এক মুহূর্তের জন্যও ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে না এসব ঘটনা। বুকটা ওর পাথরের মতো হয়ে গেছে। একবার শুধু একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ও। দুপুর বেলায় ওরা একটা গাঁয়ে ঢুকেছিল গালাগাল আর ঘুষি খেতে খেতে। অতি কষ্টে পথ ধরে চলেছে। হঠাৎ এক পাশে নজর যেতে ইভান দ্যাখে বছর সাতেক বয়েসের একটি

শিশু মায়ের ঘাগরা আঁকড়ে ধরে আছে। চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছে, চেঁচিয়ে কাঁদছেঃ

—মা গো! ওকে মেরো না! উঃ, মেরো না ওকে! ...আমার কষ্ট লাগে...ভয় লাগে...কতো রক্ত!

মেয়েমানুষটি একজন বন্দীর দিকে বর্শা তাক করছিল, হঠাৎ সে কেঁদে উঠে হাতিয়ার ফেলে ছেলেটাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পালিয়ে গেল পাশের গলিটার মধ্যে। ছেলেটার কান্না আর অস্থির কাকুতি ইভানকে বিচলিত করে, চোখে ওর জল উপচে উঠে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। ওর নিজের ছোট খোকাটি আর বউয়ের কথা মনে করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। হঠাৎ ওদের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অধীর বাসনা জাগে, যেন ওদের চোখের সামনে মরতে না হয় ওকে।...তার চেয়ে বরং আগেই...

কোনোরকমে পাগুলো টেনে-টেনে ক্লান্তিতে টলতে টলতে ওরা চলেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে স্তেপের মাঠে একটা কুয়ো। সার্জেন্টের কাছে ওরা জল খাবার অনুমতি চায়।

—জলের কোনো দরকার নেই। এর মধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। চলো, চলো! —চেঁচায় সার্জেন্ট।

কিন্তু পাহারাদারদের একজন ওদের হয়ে বলেঃ

—অতোটা কড়া হয়ো না আকিম সাজোনোভিচ! ওরাও আমাদেরই মতো মানুষ!

—মানুষ কি রকম! কমিউনিস্টরা মানুষ নয়। আর আমাকেও শেখাতে এসো না! এদের ভার আমার ওপর না তোমাদের?

বুড়ো কসাক জবাব দিলে—তোমাদের মতো কমান্ডার   আছে। এসো হে তোমরা, জল খেয়ে নাও।

—ঘোড়া থেকে নেমে কুয়ো থেকে এক কলসি জল তুলল সে। বন্দীরা সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঘিরে দাঁড়ায়। ওদের নিষ্প্রভ চোখগুলো জ্বলে ওঠে। পাঁচিশ জোড়া হাত এগিয়ে আসে কলসিটার দিকে। কাকে প্রথম খেতে দেবে বুঝতে না পেরে বুড়ো ইতস্তত করে। একটা অন্তহীন মুহূর্ত এইভাবে কেটে যাবার পর সে কলসির জলটুকু ঢেলে দেয় নিচু কেঠো গামলার মধ্যে। একপাশে সরে গিয়ে চেঁচায়ঃ

—এই, তোরা কি গরুভেড়া? এক এক করে খা!

কাঠের গামলার শেওলা-ধরা সবুজ পচা তলায় জলটা গড়িয়ে গেল। বন্দীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল গামলাটার কাছে।

ভুরুদুটো বুড়োর কুঁচকে ওঠে সহানুভূতির আবেগে। এক এক করে এগারো কলসি জল তুলে সে গামলায় ঢালে।

হাঁটু গেড়ে বসে জল খায় ইভান। তেষ্টা মিটে যাবার পর ও মাথা তোলে—অস্বাভাবিক নির্মল, প্রায় চোখ-ধাঁধানো স্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে ডন-পাড়ের রাস্তায় খড়িমাটির মতো তুষার-ধবল ধুলোর আস্তরণ, দুরান্ত পাহাড়ের নীল, আর তারই মাথায় এক টুকরো মেঘ—সাদা কেশর-দোলানো খরস্রোত নদী ছাড়িয়ে আকাশের দুস্তর নীল চাঁদোয়ার মাঝে ছোট একটুকরো মেঘ। হাওয়ার টানে ঝলমলে সাদা পাল উড়িয়ে ভেসে চলেছে উত্তরমুখো নদীর দূরে বাঁকটার ওপর তারই মুক্তাভ সাদা ছায়া।

* *

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বন্দীরা এসে পৌঁছোয় তাতারস্কে। আরেকটু বাদেই গোধূলি

—বসন্তের স্বল্পস্থায়ী গোধূলি। বেলা প্রায় ডোবে, সূর্যের বলয় রেখা পশ্চিমের ধূসর মেঘের কিনারা ছুঁয়েছে।

গাঁয়ের প্রকাণ্ড গোলাঘরটার ছায়ায় তাতারস্কের কসাক পদাতিক কোম্পানির সেপাইরা কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। ইয়েলান্‌স্কা কোম্পানিগুলো লালফৌজের চাপে অসুবিধায় পড়েছিল, তাই ওদের সাহায্য করবার জন্য এরা চলেছে ডনের ডান তীরে। নতুন জায়গায় মোতায়েন হবার আগে গোটা কোম্পানি গাঁয়ে ঢুকেছে তাদের আত্মীয়স্বজনদের দেখতে, আর সেই সঙ্গে নিজেদের খাবার-দাবারের ঘাটতি পুরিয়ে নিতে।

ওদের এখুনি আবার চলতে শুরু করার কথা। কিন্তু কমিউনিস্ট বন্দীদের ভিয়েশেন্‌স্কায় নিয়ে যাবার কথা ওদের কানে এসেছে—দলের মধ্যে নাকি মিশ্‌কা কশেভয় আর ইভান আলেক্সিয়েভিচ্‌ও আছে, শিগ্‌গীরই তাতারস্কে এসে পড়বে। তাই ওরা একটু দেরি করেই যাবে ঠিক করেছে। তাতারস্কের শহরতলির লড়াইয়ে পিয়োত্রা মেলেখভের পাশাপাশি যে-সব কসাকদের আত্মীয়রা মারা গিয়েছিল, বিশেষ করে তারাই বন্দীদের দেখবার অপেক্ষায় রয়েছে।

নিজেদের ভেতর অলসভাবে কথাবার্তা বলছে ওরা। গোলাঘরের দেয়ালের পাশে রাইফেলগুলো পালা করে রেখেছে। তামাক খাচ্ছে, সূর্যমুখীর বিচি চিবোচ্ছে, মেয়ে বুড়ো বাচ্চারা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ওদের। গোটা গ্রামখানাই আজ পথে। বাড়ির ছাদের ওপর ছোকরারা উঠে বসে আছে দূর থেকে বন্দীদের দেখবার জন্য।

অবশেষে কাঁচ গলায় কে চেঁচিয়ে ওঠেঃ

—এই যে এসে পড়েছে!

—তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় সেপাইরা, লোকজন ভিড় করে চেঁচায়, ছেলে-ছোকরার দল বন্দীদের দিকে ছুটে যাবার সময় দুদ্দাড় করে পায়ের আওয়াজ হয়।

একজন বুড়ো বললে—আমাদের শত্তুররা এলো!

—মারো শয়তানদের! আমাদের লোকদের খুন করেছে ওরা!— আরেকজন বলে ওঠে—মিশ্‌কা কশেভয় আর তার বন্ধুর এবার সৎকার করব।

আনিকুশ্‌কার বউয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল দারিয়া মেলেখফ। বন্দীদের দল এগিয়ে আসার সময় ও-ই প্রথম চিনতে পারে ইভান আলেক্সিয়েভিচ্‌কে।

চেঁচামেচি, মেয়েদের চিৎকার আর কান্নার ওপর গলা তুলে সার্জেণ্ট হাঁকড়ায়ঃ তোমাদের গাঁয়ের একজনকে এনেছি। কুত্তীর বাচ্চাটার রক্ত মাখো এবার নিজেদের গায়ে! আমাকে এবার খৃষ্টান ভাইয়ের মতো একটা চুমু দাও!—হাত বাড়িয়ে ইভানকে দেখিয়ে দিল সার্জেণ্ট।

কিন্তু আরেকটি কোথায়? মিশ্‌কা কশেভয় কোথায়? —আন্তিপ ব্রেখোভিচ্‌ ভিড়ের মধ্যে পথ করে এগোতে থাকে, রাইফেলটা কাঁধ থেকে খুলে নিয়েছে সে।

—তোমাদের লোক শুধু একজন। আর কেউ ছিল না! কিন্তু ওই একজনকেই তোমরা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করতে পারো। —লাল রুমালে মুখের ঘাম মুছে জবাব দেয় সার্জেণ্ট।

মেয়েদের তারস্বরে চেঁচানি আর ফোঁসানি বেড়ে গিয়ে এমন একটা মাত্রায় ওঠে যার ওপরে আর ওঠা যায় না। দারিয়া ঠেলে পথ করে এগোয় বন্দীদের দলটার দিকে—দ্যাখে সামনে কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছে ইভান আলেক্সিয়েভিচ, জখমে রক্তে মুখখানা নীলচে-কালো। কপালের চামড়া ছিঁড়ে ফর্‌ফর্‌ করছে, মাথার তালুতে রক্তমাখা চুলের

মধ্যে এক জোড়া পশমী দস্তানা। চড়া রোদ আর মাছির হাত থেকে কাটা জখমগুলোকে বাঁচানোর জন্য চাপানো হয়েছিল। ঘায়ের সঙ্গে এ'টে গিয়ে সেগুলো মাথার ওপরেই রয়ে গেছে।

ফাঁদে পড়ার মতো মুখের ভাব করে চারদিকে তাকায় ইভান, ভিড়ের মধ্যে নিজের বউ আর বাচ্চা ছেলেটিকে খোঁজে, অথচ আবার ভয়ও পায় পাছে দেখা হয়ে যায়। যে কোনো কাউকে একবার অনুরোধ জানাতে ইচ্ছে হয় যেন দৈবাৎ ওরা এখানে এসে থাকলেও তাদের সরিয়ে নিয়ে যায়। ও বুঝতে পারছে তাতারস্কের ওপাশে যাওয়া আর ওর পক্ষে সম্ভব নয়, এখানেই সে মরবে, আবার ওর পরিবার ওকে মরতে দেখবে তাও সে চায় না। কাঁধ দুটো জড়োসড়ো করে আস্তে আস্তে কায়ক্লেশে মাথাটা ঘোরায়, চোখদুটো বুলিয়ে নিতে থাকে পাড়াপড়শিদের চেনা মুখগুলোর ওপর। একটা মুখেও দেখতে পায় না করুণা বা সমবেদনার চিহ্ন। কসাক মেয়ে পুরুষ সবাই বিদ্বেষভরা শয়তানি চোখে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

দারিয়া এসে দাঁড়াল ওর সামনে। ঘৃণায়, যন্ত্রণায়, একটা সাংঘাতিক কিছু এইখানেই করে ফেলতে হবে এমনি এক পূর্বানুভূতির আবেগে হাঁপাতে থাকে দারিয়া—ইভানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু বুঝতে পারে না সে ওকে দেখেছে কিনা বা চিনতে পেরেছে কিনা।

একই রকম উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার ভাব নিয়ে ইভানও ওর এক চোখ অনবরত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল জনতাকে (আরেকটা চোখ জখম হয়ে বুজে গেছে)। হঠাৎ নজর পড়ল দারিয়ার ওপর। ভয়ানক নেশার ঘোরে টলতে থাকার মতো অনিশ্চিত পায়ে এগিয়ে এল ও। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয় হয়ে মাথাটা ঘুরছে। আরেকটু হলেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কিন্তু যে সঙ্গীন মুহূর্তটাতে সবকিছু অবাস্তব মনে হতে থাকে, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে থাকে সে মুহূর্তটা ওর কাছে অসহ্য। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে ও পায়ের ওপর খাড়া হয়ে থাকে। ঠোঁটের ওপর হাসির মতোই একটা আর্ত অস্পষ্ট ভঙ্গি ফুটে ওঠে, আর এই আবছা হাসিটুকু দেখে দারিয়া অসোয়াস্তি বোধ করে। এত তাড়াতাড়ি এত জোরে-জোরে ওর বুকটা দুরদুরিয়ে ওঠে যে মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডটা ওর গলার কাছে উঠে এসেছে।

মুখটা ওর ক্রমেই ফ্যাকাশে হয়ে আসে, দারুণভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে সিধে এগিয়ে যায় ইভান আলেক্সিয়েভিচের দিকে।

—এই যে কেমন আছো ভাই?— জিজ্ঞেস করে দারিয়া। ওর গলার গম্‌গমে আবেগভরা স্বরে আর অস্বাভাবিক উচ্চারণভঙ্গিতে জনতার কলরব থেমে গেল। ইভানের সাদামাটা অথচ সবল জবাবটা পরিষ্কার শুনতে পাওয়া গেল এই নীরবতার মধ্যেঃ

—তুমি কেমন আছো বোনটি?

—এবার তোমার বোনটিকে বলো কীভাবে তুমি মেরেছ... —গলা বুজে এলো দারিয়ার, বুকে হাত চেপে রইল সে, মুহূর্তের জন্য আর কথা বলার ক্ষমতা রইল না তারঃ...কীভাবে মেরেছ তোমার ভাইটিকে, আমার স্বামীকে?

—না বোন, আমি তাকে মারিনি।

গলা চড়িয়ে বল্‌লে দারিয়া—তাহলে তাকে এ পৃথিবী থেকে সরালো কে? কে সে? তাই বলো আমাকে।

—জামুরস্কি রেজিমেণ্ট...

—তুমিই মেরেছ! তুমিই...। কসাকরা বলেছে তোমাকে ওরা পাহাড়ের ওপর দেখেছিল। একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে ছিলে তুমি। অস্বীকার করতে চাও, কুকুর কোথাকার?

—সে লড়াইয়ে আমি ছিলাম বটে...। —ইভানের বাঁ-হাতখানা মাথার ওপর উঠে জখম জায়গায় সেঁটে-থাকা দস্তানার ওপর নড়ে বেড়ায়। গলার স্বরে একটা পরিষ্কার সন্দেহের সুর নিয়ে ও বলতে থাকেঃ সে লড়াইয়ে আমি ছিলাম বটে কিন্তু তোমার স্বামীকে যে মেরেছে সে আমি নই, মিখাইল কশেভয়। সেই গুলি চালিয়েছিল। পিয়োত্রা ভাইয়ের রক্তের দাগ আমার হাতে নেই।

ভিড়ের ভেতর থেকে জাকভ পদ্‌কভার বিধবা স্ত্রী তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—তাহলে গাঁয়ের কোন্‌ মানুষটিকে তুই খুন করেছিস্‌ রে দুশমন? কাদের ছেলেমেয়ে তুই অনাথ করেছিস?— থমথমে আবহাওয়াটাকে আরো ঘোরালো করে মেয়েরা পাগলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

পরে দারিয়া বলেছিল ও ঠিক মনেই করতে পারে না কিভাবে কোথা থেকে ঘোড়সওয়ারী কারবাইন-বন্দুকখানা ওর হাতের মধ্যে এল। হয়তো কেউ দিয়েছিল ওকে। মেয়েদের চিৎকারটা বেড়ে উঠতেই ও হাতের মধ্যে একটা অজানা জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করল, একবারও না তাকিয়েই ও বুঝে নিল সেটা একটা রাইফেল। প্রথমে সে নলটা চেপে ধরেছিল কুঁদো দিয়ে ইভানকে মারবে বলে। কিন্তু বন্দুকের নিশানা-মাছিটা ওর হাতের তেলোয় এমন ব্যথা দিল যে আঙুল সরিয়ে নিয়ে ও রাইফেলখানা ঘুরিয়ে নিল, তারপর কাঁধে বসিয়ে নিয়ে ইভানের বাঁ দিকের বুকটা নিশানা করল।

দারিয়ার চোখে পড়ল ইভানের পেছন থেকে কসাকরা তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছে, গোলা-ধরের দেয়ালটা হয়ে গেল সম্পূর্ণ ফাঁকা। কানে এল একটা ভয়ার্ত চিৎকারঃ তুমি কি পাগল হলে! নিজের আত্মীয়কে খুন করবে? সবুর, গুলি কোরো না!— জনতার পাশবিক প্রত্যাশার তাগিদ, স্বামীর মৃত্যুর শোধ নেবার বাসনা আর খানিকটা নিজেকে অন্য মেয়েদের তুলনায় অন্যরকম কিছু বলে আচম্‌কা দেখিয়ে দেবার দেমাক থাকলেও, দারিয়া ইতস্তত করছিল—মনে-প্রাণে ইচ্ছা না থাকলেও চেতনার গভীরে আগে থাকতেই নির্ধারিত হয়ে-থাকা একটা কাজের দিকে ও ভয়ংকর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সাবধানে বন্দুকের ঘোড়াটা আঙুলে ঠাহর করতে লাগল সে। তারপর হঠাৎ—এমন কি নিজেও ভাবতে পারার আগেই সে জোরে ঘোড়াটা টিপে দিল।

পেছন দিকে রাইফেলের ধাক্কা ওকে প্রায় ছিট্‌কেই ফেলে দিয়েছিল। শব্দে কানে তালা লেগে যায় ওর। কিন্তু কুঁচকে-থাকা চোখদুটোর ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় ইভানের মুখটা আচম্বিতে ভীষণভাবে বদলে গেল চিরতরের জন্য, দেখতে পায় যেন অনেক উঁচু থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ইভান হাতজোড়া ছুঁড়ে আবার গুটিয়ে নিল, তারপর সোজা হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে। দুপাশে ছড়ানো হাতের আঙুল মাটি খিম্‌চে ধরছে।

দারিয়া কী করেছে তা তখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি। রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধরাশায়ী মানুষটার দিকে পেছন ফিরিয়ে একটা অস্বাভাবিক সহজ সাধারণ ভঙ্গিতে সে ওড়নাটা ঠিক করে, অগোছালো চুলগুলো ভেতরে গুঁজে দেয়।

একজন কসাক ওকে অপ্রত্যাশিত সম্মান দেখিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দেয়। বলে—এখনো নড়ছে লোকটা!

কী বলা হল, কার কথা বলা হল তা না বুঝেই দারিয়া ফিরে তাকায়, শুনতে পায় একটা গভীর, একঘেয়ে একটানা গোঙানি। শব্দটা যেন কারুর গলা থেকে বেরুচ্ছে না. বেরিয়ে আসছে একেবারে হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে। গোঙানি থেকে মৃত্যুর কাতরানি। এতক্ষণে দারিয়া বোঝে গোঙাচ্ছে যে সে ইভান আলেক্সিয়েভিচ, ওরই হাতে তার মরণ ঘটল।

হন্‌হন্‌ করে হাল্‌কা পায়ে ও গোলাবাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে গেল চত্বরের দিকে। অল্প ক'টা মাত্র চোখ ঘুরে দেখল ওকে, কারণ জনতার মনোযোগ এখন ঘুরে গেছে আস্তিপ ব্রেখোভিচের দিকে। কুচকাওয়াজের মাঠে ছুটবার মতো তাড়াতাড়ি পায়ের ডগায় ভর দিয়ে ব্রেখোভিচ ছুটে এসেছে ইভান আলেক্সিয়েভিচের কাছে। কোনো একটা কারণে সে একটা সঙীন লুকিয়ে রেখেছিল পেছনে। ধীরস্থিরভাবে রয়ে-সয়ে ও গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসল, তারপর ইভানের বুকের ওপর সঙীনের ডগাটা তাক্‌ করে চাপা গলায় বলল:

—এবার তাহলে মর্‌ কোত্‌লিয়ারভ!— গায়ের পুরো শক্তি দিয়ে ও সঙীনের বাঁট্‌টা ঠেলে দিল।

ইভান মরল অনেক সময় নিয়ে, যন্ত্রণা পেয়ে। ওর স্বাস্থ্যবান্‌ পেশল দেহ ছেড়ে বের হতে চায়নি প্রাণ। তৃতীয়বার সঙীনের ঘা খেয়েও ও মুখ হাঁ করে ছিল, রক্তমাখা দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা কাতর ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে এল—'আহ্‌-আঃ!' করে।

আস্তিপকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে পাহারাদার সার্জেণ্টটা বললে—এ্যাই, যা এবার যমের দরজায়!— রিভলবার তুলে বেশ ধীর-স্থিরভাবে টিপ্‌ করলে ইভানের দিকে।

ওর গুলির আওয়াজটা যেন একটা সংকেতের কাজ করে—কসাকরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দীদের ওপর। আক্রান্ত মানুষগুলো দল ভেঙে এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ল। চিৎকারের সঙ্গে মিলে গেল রাইফেলের গুলির শুকনো কাটা-কাটা আওয়াজ...

* * *

এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রিগর মেলেখফ তাতারস্কে এসে পেঁাছোয়। ঘোড়াটাকে ও পাগলের মতো ছুটিয়েছিল। উস্ত্‌-খপেরস্ক থেকে বেরিয়ে যখন স্তেপ পার হচ্ছে তখন ঘোড়াটা বসে পড়ল। জিনখানা টানতে টানতে ও নিয়ে এল সবচেয়ে কাছের গ্রামটিতে, সেখানে একটা জরাজীর্ণ টাট্টুঘোড়া ভাড়া করল। কিন্তু তবু অনেক দেরি হয়ে গেল আসতে। তাতারস্ক পদাতিক বাহিনী ততোক্ষণে পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সারা গ্রাম নিশ্চুপ, জনশূন্য। আশেপাশের পাহাড়গুলোয় রাতের ঘন কালো ছায়া নেমে আসছে।

গ্রিগর ঘোড়া চালিয়ে উঠোনে আসে। ঘোড়া থেকে নেমে ঘরের ভেতর ঢোকে। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে না। ঘন আঁধারের মধ্যে গুন্‌গুন্‌ করছে মশা; দেয়ালের কুলুঙ্গিতে আবছা চক্‌চকে দেবীপট। ঘরের অনেকদিনের চেনা মন ছট্‌ফট্‌-করা গন্ধটা ও বুকভরে টেনে নেয় নিঃশ্বাসের সঙ্গে। ডাকে—

—ঘরে কেউ আছো? মা? দুনিয়া?

সামনের ঘর থেকে শোনা গেল দুনিয়ার গলা—গ্রিগর, তুমি?— খালি পায়ের থপ্‌থপ্‌ আওয়াজ আসে, তারপর ওর বোনের সাদা মূর্তিটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় ঘাগরার ফিতে আঁটতে আঁটতে।

গ্রিগর বললে—এত সকালেই শুয়ে পড়েছিস্ যে? মা কই?

—যা কাণ্ড...বলতে বলতে চুপ করে যায় দুনিয়া. গ্রিগর টের পায় ও তাড়াতাড়ি উত্তেজিতভাবে নিঃশ্বাস ফেলছে।

—ব্যাপার কী? বন্দীরা কতোক্ষণ আগে এসেছিল এখানে?

—ওদের মেরে ফেলেছে।

—কী?

—কসাকরা ওদের খুন করেছে। উঃ গ্রীশা! আমাদের দারিয়া হতচ্ছাড়ি মড়াখাকী ...রাগভরা কান্নায় গলা বুজে আসে দুনিয়ার—ইভান আলেক্সিয়েভিচ্‌কে ও নিজের হাতে খুন করেছে...গুলি করে মেরেছে...

—কী বাজে বকছিস্?— বোনের জামার কলার ভয়ানকভাবে চেপে ধরে গ্রিগর চেঁচিয়ে ওঠে। দুনিয়ার চোখের জল চিক্‌চিক্ করে. ওর চোখের তারায় জমাট বাঁধা ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে গ্রিগরের আর সন্দেহ থাকে না।

—আর মিশকা কশেভয়? স্তকমান?

—ওরা দলের মধ্যে ছিল না।

সংক্ষেপে ভাঙা-ভাঙাভাবে দুনিয়া লালরক্ষী বন্দীদের ওপর খুনখারাপি আর দারিয়ার কীর্তির কথা বলে।

—দারিয়ার সঙ্গে মা ভয়ে এক ঘরে রাত কাটাতে চায়নি. তাই পড়শীদের বাড়ি গেছে শুতে। আর দারিয়া বাড়ি ফিরেছিল মাতাল হয়ে. জানোয়ারের মতো পাঁড় মাতাল। সে এখন ঘুমিয়েছে।

—কোথায়?

—গোলাঘরে।

গ্রিগর ঘুরে বেরিয়ে উঠোনের ভেতর দিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে গোলাঘরের দরজাটা সপাটে খুলে দিল। দারিয়া মেজের ওপর পড়ে ঘুমুচ্ছে, নির্লজ্জভাবে ঘাগরাখানা ওপর দিকে তোলা। পাতলা হাতদুটো দুপাশে ছড়ানো, ডান গালটা গাঁজলা লেগে চিক্‌চিক্ করছে. খোলা মুখ থেকে দিশি ভদ্‌কার উগ্র গন্ধ। ভোঁস্ ভোঁস্ করে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে দারিয়া. মাথাটা বেয়াড়াভাবে ঘাড়ের মধ্যে গোঁজা, বাঁ গালটা মেজের ওপর চাপা।

তলোয়ার চালাবার এমনতরো একটা উগ্র ইচ্ছা গ্রিগর কোনোদিন অনুভব করেনি। কয়েক সেকেণ্ড দারিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে রইল সে। দাঁতে দাঁত পিষছে। টলছে, গোঙাচ্ছে আর অদম্য ঘৃণা আর অবজ্ঞা নিয়ে তাকিয়ে আছে পায়ের তলায় পড়ে-থাকা দেহটার দিকে। তারপর এক পা এগিয়ে গিয়ে দারিয়ার মুখের ওপর চাপিয়ে দিল লোহার নাল-বসানো বুটের গোড়ালিটা. সারা শরীরের ভার ছেড়ে দিল ওই গোড়ালিটার ওপর। যখন টের পেল ওর বুটের নিচে দারিয়ার নাকটা মড়মড় করছে আর গাল হড়কে যাচ্ছে তখন ও ঘ্যাঁসঘেঁসে গলায় গর্জে উঠলঃ

—বিষ-কেউটে কোথাকার!

মদের ঝোঁকে দারিয়া কঁকিয়ে উঠে বিড়বিড় করে কী যেন বলে। গ্রিগর দু'হাতে মাথা চেপে ধরে ছুটে বেরিয়ে আসে উঠোনে।

সে রাতেই ও ঘোড়ায় চেপে আবার ফিরে যায়. মাকে দেখবার জন্যও একবারটি দাঁড়ায় না।

॥ আঠারো ॥

মে-মাসের গোড়ার দিকে একদিন দুপুর বেলায় ভিয়েশেন্স্কা জেলার সিন্গিন গাঁয়ের আকাশে দেখা দেয় একটা এরোপ্লেন। ইঞ্জিনের গরুগরু আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে ছেলেপিলেরা, মেয়েরা আর বুড়োরা ছুটে বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে। গলা লম্বা করে. হাতের তেলোয় চোখ আড়াল করে ওরা তাকিয়ে দ্যাখে মাথার ওপর মেঘলা আকাশে এরোপ্লেনটার চক্কোর দেওয়া। বিমান আস্তে আস্তে যতোই নিচে নামে, ইঞ্জিনের শব্দও ক্রমে জোরালো আর গম্গমে হয়ে ওঠে। গাঁয়ের বাইরে গরু-চরানো মাঠে একটা ফাঁকা মসৃণ জায়গা খুঁজছিল বিমানটা।

উর্বর-মস্তিষ্ক এক খুনখুনে বুড়ো ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিল—আর এক মিনিটের মধ্যে বোমা ফেলতে শুরু করবে রে! হুঁশিয়ার!— রাস্তার কোণায় জমা ভিড়টা জলের ছিটের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কান্না-জুড়ে-দেওয়া ছেলেদের টেনে সরিয়ে নেয় মায়েরা। বুড়োরা বেড়া টপ্কে ফল-বাগানের ভেতরে গিয়ে ঢোকে। শুধু একজন বুড়ি একা পড়ে গেল রাস্তার মোড়ে। সেও ছুটতে পারত, কিন্তু ভয়ের চোটে হয় ওর পা চলছিল না, কিংবা একটা বেড়ালের ওপর হোঁচট খেয়েছিল, তাই পড়ে গেল। আর যেখানে পড়ল সেখানেই শুয়ে সে গোদা-গোদা পা-গুলো বিশ্রিভাবে ছুঁড়তে লাগল আর চাপা গলায় বলতে লাগলঃ

—ওরে, আমাকে বাঁচা! ওরে মরে গেলুম রে!

বুড়িকে বাঁচাতে এল না কেউ। গোলাবাড়ির ঠিক মাথার ওপর ভয়ানক গর্জন করে উড়তে লাগল এরোপ্লেন। বুড়ির অন্তরাত্মা তখন শুকিয়ে গেছে, এক লহমার জন্য এরোপ্লেনের ডানার ছায়া তার চোখ থেকে দিনের আলো মুছে নিল। ঠিক এমনি সময় ভয়ে আধমরা অবস্থায় বুড়ি আশেপাশে বা নিচে কোনোকিছু ঠাহর করতে না পেরে বাচ্চা-ছেলের মতো কাপড় ভিজিয়ে ফেলল। নিশ্চয়ই এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে এরোপ্লেনটা যে গরু চরার মাঠে নেমেছে তা লক্ষ্যই করেনি, দুজন মানুষকেও দ্যাখেনি কালো চামড়ার জার্কিন পরে বিমানচালকের আসন থেকে নেমে আসতে। সাবধানে চারদিকে তাকাতে তাকাতে ওরা সসঙ্কোচে এগোতে লাগল গাঁয়ের দিকে।

কিন্তু বুড়ির যে কর্তাটি লুকিয়েছিল ফলবাগানের মধ্যে সে বড়ো সাহসী বুড়ো। শিকারীর খপ্পরে-পড়া চড়ুইপাখির মতো যদিও তার বুক দুরদুর করছিল তবু সাহস করে সে সব ব্যাপারটা দেখেছে। সেই প্রথম ওদের ভেতর চিনতে পারলো অফিসার পিয়োত্র বোগাতিরিয়েভকে—তারই রেজিমেন্টের এক বন্ধুর ছেলে সে। বিদ্রোহী স্পেশাল ব্রিগেডের কমাণ্ডার গ্রিগর বোগাতিরিয়েভের খুড়তুতো ভাই পিয়োত্র শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে দনিয়েৎস্ অবধি পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই যে সে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাত ঝুলিয়ে খরগোশের মতো বসে বুড়ো এক মুহূর্ত কৌতূহলভরে চেয়ে থাকে। শেষে যখন নিশ্চিত হয় যে পিয়োত্র বোগাতিরিয়েভই আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে ওর

দিকে তখন ও উঠে দাঁড়ায়, দ্যাখে পা দুটো সত্যিই ওকে খাড়া করে রাখতে পারে কি না। চমৎকার খাড়া রয়েছে অবিশ্যি, তবু একটু কেঁপে ওঠে যেন। এইভাবে বুড়ো ধীরে ধীরে ফলবাগান থেকে বেরিয়ে আসে।

ধুলোয় লুটোনো বুড়ির কাছে না গিয়ে বুড়ো সিধে হেঁটে যায় পিয়োত্র আর তার সঙ্গীর কাছে, যাবার সময় কসাক-টুপিটা খুলে নেয়। পিয়োত্র বোগাতিরিয়েভ বুড়োকে চিনতে পারল। হাত নেড়ে হেসে ওকে ডাকল।

বুড়ো বললে—আরে, এ দেখছি সত্যি সত্যিই পিয়োত্র বোগাতিরিয়েভ।

—হ্যাঁ, আমিই, দাদু!

—ভগবান তাহলে বুড়ো বয়সে আমায় উড়ো জাহাজও দেখালেন! আমরা তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।

—এ তল্লাটে তো লাল-টাল কেউ নেই, না দাদু?

—না রে বাছা। চিরা নদীর ওপারে উক্রেইনের দিকেই কোথাও ঠেলে দেওয়া হয়েছে ওদের।

—আমাদের সিনগিনের কসাকরাও বিদ্রোহ করেছে?

—বিদ্রোহ ওরা করেছিল ঠিকই, তবে অনেককেই ফিরিয়ে আনতে হয়েছে।

—সে কি?

—মানে ওরা মারা পড়েছিল।

—অ্যাঁ? আমার বাড়ির সবাই, বাবা—ওরা ভালো আছে তো?

—সবাই বেঁচে বর্তে আছে। কিন্তু তুমি তো দনিয়েৎস্ থেকেই এলে? ওখানে আমার ছেলে তিখনকে দ্যাখোনি?

—হ্যাঁ, সে আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে। আচ্ছা, দাদু, আমাদের কলটাকে একটু পাহারা দিন না যাতে বাচ্চাকাচ্চারা না হাত দেয়। আমি একটু বাড়ি ঘুরে আসি। —অন্য লোকটার দিকে ঘুরে সে বলল—এসো হে।

পিয়োত্র আর তার বন্ধু গেল গাঁয়ের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে ফলবাগান, চালাঘর, ভাঁড়ারঘর আর প্রত্যেকটা আনাচ-কানাচ থেকে ভীতসন্ত্রস্ত লোকজন বেরিয়ে আসে। তারা এরোপ্লেনটা ঘিরে ধরে, তখনো সেটা থেকে পেট্রল আর তেলের গন্ধ বেরুচ্ছিল। ডানার অনেকগুলো জায়গায় বুলেট আর গোলা বেঁধার দাগ। জোর-দাবড়ানো ঘোড়ার মতো গরম বিমানখানা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

যে বুড়োটি পিয়োত্রাকে প্রথম চিনতে পেরেছিল সে এর মধ্যে ছুটে তার বউয়ের কাছে গেছে ছেলের খবর দিয়ে তাকে খুশি করবার জন্য। কিন্তু বুড়ির তখন পাত্তা নেই। সে আগেই উঠে বাড়িতে ঢুকেছে পোশাক বদলাতে। বুড়ো বাড়ির মধ্যে ঢুকে ওকে দেখে চেঁচাতে লাগল:

—পিয়োত্র বোগাতিরিয়েভ এসেছে গো। তিখনের কুশল এনেছে। —তারপর বুড়িকে কাপড় বদলাতে দেখে, অথচ তার কারণটা জানতে না পেরে সে একেবারে খেপে উঠল। হেঁড়ে গলায় বলতে লাগল—হতচ্ছাড়ি বুড়ি, কাপড় জামা আঁটা হচ্ছে কেন? কেউ তোকে দেখতে আসছে না রে শুঁট্‌কো ডাইনি!

গাঁয়ের বুড়োরা দেখতে-দেখতে এসে হাজির হল পিয়োত্র বোগাতিরিয়েভের বাপের ঘরে। সকলেই চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে টুপি খুলে, দেবীপটের সামনে ক্রুশ-প্রণাম করে চট্‌পট্ বেঞ্চিতে বসে পড়ল লাঠি ভর দিয়ে। এক গেলাস ঠাণ্ডা দুধে চুমুক দিতে দিতে

পিয়োত্রা বলে চলল কেমন করে ও নভোচেরকাসের ডন গভর্নমেণ্টের নির্দেশে ডন জেলায় উড়ে এসেছিল বিদ্রোহী কসাকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য, উড়োজাহাজে করে গুলিগোলা আর অফিসারদের পাঠিয়ে লালরক্ষীদের বিরুদ্ধে ওদের লড়াইয়ে সাহায্য করতে। পিয়োত্রা এও জানিয়ে দিল যে শিগ্‌গিরই দনিয়েৎস্‌-ফৌজ দনিয়েৎসের পুরো রণাঙ্গন ধরে হামলা শুরু করবে, বিদ্রোহী ফৌজের সঙ্গে হাত মেলাবে। বুড়ো কসাকরা তরুণদের আরো ভালো করে তাঁবে আনতে পারছে না বলে ওদের গালমন্দও করল— ছোকরা কসাকরাই তো রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়েছিল আর লালদের এনে ঢুকিয়েছিল ডনের মাটিতে।

—অবিশ্যি শেষ অবধি তোমাদের সুবুদ্ধি হয়েছে, জেলা থেকে সোভিয়েত সরকারকে তাড়িয়েছ, তাই ডন গভর্নমেণ্ট তোমাদের সব অপরাধ মার্জনা করবেন।

একজন বুড়ো সন্দেহের সুরে বললে—কিন্তু পিয়োত্রা গ্রিগরিয়েভিচ, সোভিয়েত সরকার তো আমাদের এখনো রয়েছে, তবে কমিউনিস্টদের ভাগানো হয়েছে এই যা। আমাদের ঝাণ্ডাও তেরঙা নয়, লাল-সাদা।

—আর আমাদের হারামী ছোকরাগুলো এখনো একজন আরেকজনকে দেখলে 'কমরেড' বলে ডাকে।— জুড়ে দিল আরেকজন।

পিয়োত্রা বোগাতিরিয়েভ গোঁফের নিচে মুচ্‌কি হেসে সকৌতুকে নীল চোখজোড়া কুঁচকে জবাব দিলেঃ

—তোমাদের সোভিয়েত সরকার বসন্তের দিনের বরফের মতো। রোদটা আরেকটু চড়া হোক, গলে যাবে। কিন্তু যারা ফ্রণ্ট থেকে পালানোর ব্যাপারে সর্দারি করেছিল তাদের আমরা দনিয়েৎস্‌ থেকে ফিরে এসেই শায়েস্তা করব।

বুড়োরা খুব খুশি হয়ে স-রবে সায় দিলে—ঠিক হ্যায়। শয়তানগুলোকে কোতল কর! শেষ লোকটা অবধি সাবাড় করে দাও!

* *

সন্ধ্যের দিকে বিদ্রোহীদের অধিনায়ক কুদীনভ আর সেনানী-অধ্যক্ষ সাফোনভ তিন-ঘোড়ায় টানা একটা তারান্‌তাস্‌-গাড়িতে* চেপে সিন্‌গিনে এলো। এরোপ্লেন নামবার খবর তারা আগেই দূত মারফত পেয়েছিল। আহ্লাদে আটখানা হয়ে দৌড়ে ঢুকল বোগাতিরিয়েভের বাড়িতে, জুতোর কাদাটুকু মোছার ফুরসত নেই।

কুদীনভ ভিয়েশেন্‌স্কায় ফিরে আসার পর বিদ্রোহী বাহিনীর বড়ো-কর্তাদের একটা গোপন বৈঠকে ঠিক হল ডন গভর্নমেণ্টের কাছে সাহায্য চাওয়া হবে। বলশেভিকদের সঙ্গে সন্ধির আলাপ চালানো হয়েছিল আর ১৯১৮ সালে রণাঙ্গন ছেড়ে চলে এসেছিল বলে বিদ্রোহীরা অনুতপ্ত ও দুঃখিত এই কথা জানিয়ে একটা চিঠি লেখার জন্যও বলা হল কুদীনভকে। চিঠিতে কুদীনভ হলপ করল যে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই পুরোদমে চালিয়ে যাওয়া হবে যতোক্ষণ না জিত হয়, আর অনুরোধ জানাল এরোপ্লেনে করে যেন সেনানী অফিসার আর কার্তুজ পাঠানো হয়।

পিয়োত্রা বোগাতিরিয়েভ বিদ্রোহীদের সঙ্গেই রয়ে গেল, আর কুদীনভের চিঠি নিয়ে পাইলট ফিরে গেল নভোচেরকাসে। তখন থেকেই ডন সরকার আর বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হল। দনিয়েৎসের ওপার থেকে প্রায় রোজই বিমান

* তারানতাস্‌— রুশ দেশের স্প্রিং-বিহীন চার-চাকাওয়ালা গাড়ি—অ।

উড়ে আসে অফিসার, কার্তুজ আর অল্পস্বল্প পরিমাণ হাল্‌কা-কামানের গোলা নিয়ে। ডন ফৌজের সঙ্গে যে-সব উত্তর ডন-দেশী কসাক পেছু হটে গিয়েছিল তাদের চিঠিপত্র নিয়ে আসে বৈমানিকরা, আর তাদের আত্মীয়স্বজনদের জবাবও নিয়ে যায়।

দনিয়েৎস্‌ রণাঙ্গনের অবস্থা বুঝে আর নিজের সামরিক প্রয়োজন অনুযায়ী ডন শ্বেত ফৌজের কমান্ডার জেনারেল সিদোরিন জঙ্গী কাজকর্ম, নির্দেশ, রিপোর্ট ইত্যাদি পাঠায় কুদীনভকে—বিদ্রোহী রণাঙ্গনের কোন্‌ দিকে লালফৌজী ডিভিশন সরানো হচ্ছে সে-সব খবরাখবরও জানায়। সিদোরিনের সঙ্গে পত্রালাপের কথা খুব বাছা-বাছা কয়েক-জনকেই জানায় কুদীনভ, বাদবাকি সকলের কাছে গোপন রাখে।

আগু-পিছু

। এক ।

১৯১৯ সালের মে মাস নাগাদ সোভিয়েত সরকার বুঝতে শুরু করল ডন প্রদেশের বিদ্রোহ গুরুতর আকার নিয়েছে, কঠোরভাবে তা দমন করা দরকার। বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় তাই লাল বাহিনীগুলোর সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হল। এইবারই প্রথম গ্রিগর মেলেখফ আর তার ফৌজী ডিভিশন টের পেতে শুরু করল প্রচণ্ড এক আক্রমণের পুরোদস্তুর চাপ। গ্রামের পর গ্রাম হাতছাড়া করে ওরা উত্তরে ডনের দিকে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। কারগিনের আশেপাশে গ্রিগর জোর বাধা দেয় বটে, তবে শত্রুপক্ষের প্রবলতর শক্তির চাপে শেষ পর্যন্ত কারগিন ছেড়ে যেতে বাধ্য তো হয়ই, কুদীনভের কাছে ওকে নতুন ফৌজও চেয়ে পাঠাতে হয়। ওর আবেদনে সাড়া দিয়ে তিন নম্বর ডিভিশনের কমাণ্ডার মেদ্‌ভেদিয়েভ তার হেপাজতের আট স্কোয়াড্রন ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দেয়। এসব স্কোয়াড্রনের সাজসজ্জার বহর দেখে গ্রিগর তো অবাক হয়ে যায়। প্রত্যেকের হাতে প্রচুর পরিমাণ কার্তুজ, প্রত্যেকের নতুন উর্দি, লালফৌজী বন্দীদের কাছ থেকে নেওয়া ভালো ভালো জুতো। এত গরম সত্ত্বেও অনেকের গায়ে চামড়ার জার্কিন, আর প্রায় প্রত্যেকেরই সঙ্গে পিস্তল কিংবা দূরবিন। নতুন ফৌজের সাহায্য পেয়ে লালফৌজের অগ্রগতি কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা গেল। এই অবসরটুকুর সুযোগ নিলে গ্রিগর। কুদীনভ অনেকদিন ধরে ওকে ডাকছিল, এবার তাই সাড়া দিয়ে ভিয়েশেনস্কায় ঘোড়া ছুটিয়ে এল একবার আলাপ-আলোচনা করতে।

ভোরবেলা ভিয়েশেন্‌স্কাতে পৌঁছোয় গ্রিগর। ডন নদীতে বানের জল নেমে যেতে শুরু করেছে, বাতাসে পপ্‌লার গাছের উগ্র মিষ্টি আঠালো গন্ধ। নদীর ধার দিয়ে ওকগাছের রসালো ঘন-সবুজ পাতার স্বপ্নিল মর্মর। নি-ঘাস মাটির ঢিবিগুলো থেকে ভাপ ওঠে। ওপরে খোঁচা-খোঁচা সবুজ সরু ঘাস দেখা দিতে শুরু করেছে। সোঁতা-গুলোয় এখনো চক্‌চক্‌ করছে বদ্ধ জল, আর ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে ওপর দিয়ে।

কুদ্‌নভকে খুব গম্ভীর চিন্তিত মুখে বসে থাকতে দ্যাখে গ্রিগর, কি যেন একটা ব্যাপারে ডুবে আছে। গ্রিগর আস্তে আস্তে ঢোকে, কিন্তু সে মুখ তোলে না—একমনে একটা প্রকাণ্ড বীভৎস সবুজ মাছির পাগুলো টেনে টেনে বের করতে থাকে। একটা পা টেনে ধরে মাছিটাকে নিজের বড়ো খস্‌খসে হাতটার মধ্যে চেপে ধরে, তারপর কানের কাছে এনে মন দিয়ে শোনে বন্দী পোকাটার উত্তেজিত ভন্‌ভনানি।

হঠাৎ গ্রিগরকে দেখে কুদ্‌নভ বিরক্তি আর ঘেন্নার ভাব দেখিয়ে মাছিটাকে টেবিলের নিচে ছুঁড়ে দেয়। পাতলুনে হাত মুছে ক্লান্তভাবে হেলান দেয় চেয়ারের চক্‌চকে পিঠে। বলে— বোসো হে গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্‌।

গ্রিগর জিজ্ঞেস করে—কেমন আছো চীফ?

—ভালোই, যতোটা ভালো থাকা যায় আর কি। তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার কেমন? ঠেলে তাড়িয়ে দিচ্ছে তো?

—হ্যাঁ, সারা লাইন জুড়ে।

—ওদের কি চিরা নদীর কাছে ঠেকিয়েছিলে?

—না বেশিদিন পারা যায়নি। তবে মেদ্‌ভেদিয়েভের নতুন সেপাইরা এসে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এই তো তাহলে অবস্থা, মেলেখফ!— কুদ্‌নভ ছাইরঙা চামড়ার ককেসীয় কোমর-বন্ধটা হাতে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বগলশের ম্যাড়মেড়ে রুপোলি রংটার দিকে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেঃ যতোদূর বুঝতে পারছি অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে উঠবে এর পর। দনিয়েৎসে কিছু একটা ঘটেছে। হয় আমাদের বন্ধুরা লালফৌজী সারি ভেঙে ওদের ঠেলে নিয়ে আসছে আমাদের ওপর, নয়তো আমরাই যে সব ঝামেলার মূলে সেটা বুঝতে পেরে লালফৌজ আমাদের একটা সাঁড়াশির মধ্যে চেপে ফেলতে চেষ্টা করছে।

—আর ক্যাডেটদের তরফের খবর কি? এরোপ্লেনে ওরা শেষ কি রিপোর্ট পাঠিয়েছে?

—তেমন কিছু নয়। ওদের যে কী মতলব সে তো তোমার আমার মতো লোকদের জানাবে না ভাই! লাল ফৌজের সারি ভেঙে ওরা আসতে চাইছে আমাদেরই সাহায্যের জন্য। লড়াইয়ের সারি ভাঙা তো চাট্টিখানি কথা নয়, আর তুমি-আমি ভালো করেই জানি দনিয়েৎসে লালফৌজের তাকত্‌ কতো। আমরা এখন অন্ধকারে, নাকের ডগায় যেটুকু দেখা যায় তার ওপারে আর দেখবার উপায় নেই।

—হ্যাঁ, এখন কী নিয়ে আমার সঙ্গে কথা হবে বলো তো? যে বৈঠকের জন্য আমাকে ডাকলে তার কী হল?— ক্লান্তিতে হাই তুলে বলে গ্রিগর। বিদ্রোহের ফলাফল কী দাঁড়াবে তা নিয়ে ওর বিশেষ ভাবনা নেই। এ ব্যাপারে ওর আর কোনো উদ্বেগ আছে বলে মনে হয় না। ঘানি-টানা ঘোড়ার মতো দিনের পর দিন একই প্রশ্ন ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে, অবশেষে মনে-মনে হাল ছেড়ে দিয়ে ভেবেছেঃ

সোভিয়েতের সঙ্গে এখন আর কোনো আপোস তো হবেই না জানা কথা। ওদের অনেক রক্ত ঝরিয়েছি আমরা। তবু ওদের আসতে দেব ডন এলাকায়। ক্যাডেট গভর্নমেন্ট যদিও আমাদের মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে এখন, পরে ওরাই আমাদের ছাল ছাড়িয়ে নেবে। চুলোয় যাক্‌। যে-দিক দিয়েই শেষ হোক্‌ এ-ঝামেলা চুকে যাওয়াই ভালো।

গ্রিগরের চোখের দিকে তবু তাকায় না কুদ্‌নভ। একটা ম্যাপের ভাঁজ খোলে। তারপর শুনিয়ে দেয়ঃ

—তোমার আসার আগেই এখানে আমাদের একটা বৈঠক সভা হয়ে গেছে, আমরা ঠিক করেছি...

—কাকে নিয়ে সভাটা হল? প্রিন্স্‌কে নিয়ে?

এই কামরাতেই গেল শীতকালে যে জঙ্গী পরিষদের সভা হয়েছিল ককেসীয় জেনারেল সাহেবকে নিয়ে, সে-কথা মনে পড়তে কথার মাঝখানেই বলে উঠল গ্রিগর।

কুদীনভ ভুরু কোঁচকায়, মুখখানা আঁধার করে জবাব দেয়—তিনি আর এখানে নেই।

হঠাৎ আগ্রহ দেখিয়ে গ্রিগর জিজ্ঞেস করে—সে কী ব্যাপার?

—বলিনি তোমাকে? কমরেড গিয়র্‌গিদ্‌জে মারা গেছেন।

—'কমরেড' তাকে বলো কীভাবে? যতোক্ষণ ভেড়ার-চামড়ার কোর্তা গায়ে চড়াতেন ততোক্ষণই 'কমরেড'। ভগবান্‌ না করুন, ক্যাডেটদের সঙ্গে যদি আমরা যোগ দিতাম, আর উনি যদি এর মধ্যে পটল না তুলতেন তাহলে নিশ্চয় এতদিন গোঁফে মোম পালিশ করতেন আর তোমার সঙ্গে হাতে হাত না মিলিয়ে বাড়িয়ে দিতেন তাঁর কড়ে আঙুলখানা! এই যে এই রকম!

—গ্রিগর ওর নোংরা কাল্‌চে আঙুলটা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁত বের করে হাসে।

কুদীনভ তবু ভুরু কুঁচকে থাকে, ওর গলার স্বরে আর চোখের চাউনিতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে বিরক্তি, অসন্তোষ আর চাপা রাগের ভাব।

গর্‌গর্‌ করে বলে—হাসার কিছু নেই এতে। আরেকজনের মরা নিয়ে তামাশা কোরো না।

গ্রিগর হেসে জবাব দেয়ঃ সাদা-মুখো আর সাদা-হাতওয়ালা ওই কর্নেলটার জন্য আমার মনে একটুও দুঃখ নেই...

—যা হোক, উনি মারা গেছেন ..

—লড়াইয়ে?

—বলা শক্ত।... সে এক অদ্ভুত গল্প। সত্যি যে কি হয়েছিল তা বোঝা ভার। আমারই হুকুমে তাঁকে সংবহন-বিভাগে নেওয়া হয়েছিল। মনে হয় কসাকদের সঙ্গে ওঁর বনিবনা হচ্ছিল না। দুদোরেভ্‌কার কাছে তখন লড়াই চলছে। উনি যে রসদগাড়িগুলোর সঙ্গে ছিলেন লড়াইয়ের সারি থেকে তা প্রায় দুমাইল পেছনে। একটা মালগাড়িতে বসেছিলেন, এমন সময় একটা আন্দাজে-ছোঁড়া বুলেট সোজা এসে বিঁধল তাকে, বালির ওপর উলটে পড়লেন উনি। কসাকরা তো তাই বলে। ওরা ওঁকে কবর না দিয়েই ফেলে চলে যায়।... কসাকরাই নিশ্চয় খুন করেছে, হারামীর ঝাড়!

—মেরে তো ভালোই করেছে।

—ওসব কথা আর বেশি বোলো না; পরে বিপদে পড়বে।

—চটে যেয়ো না, তামাশা করছিলুম শুধু।

—ওসব তামাশা যেন আর না শুনি। তাহলে তোমার মতে অফিসারদের খুন করাই উচিত? আবার সেই 'তক্‌মা-ধারী নিপাত যাক্‌'? এতদিনেও কি তোমার কাণ্ডজ্ঞান হবে না গ্রিগর?

—তোমার গল্পটা যা বলছিলে বলো।

—বলার আর কিছু নেই। আমার ধারণা হল কসাকরাই তাঁকে মেরেছে, তাই বেরিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললাম। ওরা অবিশ্যি অস্বীকার করল, কিন্তু চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম মিছে কথা বলছে। কিন্তু কী করতে পারো তুমি

ওদের নিয়ে, বলো। সামনে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করলেও হলপ করে বলবে এ তো আকাশ থেকে ভগবানের শিশির পড়ছে।— হাতের মধ্যে বেল্ট্‌খানা দুম্‌ড়ে কুদীনভ উত্তেজিত হয়ে বলে—একটি লোক যিনি সত্যি সত্যিই যুদ্ধবিদ্যাটা জানতেন তাঁকে ওরা খুন করল, উনি না থাকাতে এখন আমার মনে হচ্ছে যেন ডান হাতখানাই হারিয়েছি। কে এখন আমাদের নক্‌শা-পত্তর ছকবে? কথা বলতে আমরা সবাই পারি, কিন্তু যখনই কোনো জরুরি কৌশল নেবার প্রশ্ন এসে যায় তখন আমাদের জারিজুরি খাটে না। পিয়োত্র বোগাতিরিয়েভ আসাতে বেঁচে গিয়েছি, না হলে কথা বলার মতো লোকই খুঁজে পেতাম না। এবার আসল ব্যাপারে আসিঃ আমাদের সেপাইরা দনিয়েৎসে যদি লড়াইয়ের সারি ভেঙে না এগোয় তাহলে আর দাঁড়াবার উপায় থাকবে না। তাই আগে যা বললাম তেমনিই ঠিক করেছি—তিরিশ হাজার সৈন্যের গোটা বাহিনীটাকে লাগিয়ে দেব শত্রুর ঘেরাই ভেঙে বেরুবার জন্য। যদি তোমাদের উল্‌টে তাড়িয়ে আনে তাহলে ডনের দিকে পেছু হটে আসবে। উস্ত্‌-খপেরস্ক থেকে কাজান্‌স্কা অবধি ডনের ডান পাড় সাফ করে আমরা গড়খাই খুঁড়ব, আত্মরক্ষা করব.

কথার মাঝখানে বাধ পড়ে দরজায় জোর ধাক্কা হবার শব্দে। কুদীনভ চেঁচিয়ে বলে—ভেতরে এসো!

ছয় নম্বর বিশেষ ব্রিগেডের কমান্ডার গ্রিগর বোগাতিরিয়েভ এল। বলিষ্ঠ লাল মুখটা ঘামে চক্‌চক্‌ করছে, ফ্যাকাশে ভুরুজোড়া রাগে কোঁচকানো। টুপি না খুলেই সে টেবিলের ধারে বসে।

সামান্য হেসে বোগাতিরিয়েভের দিকে চেয়ে কুদীনভ জিজ্ঞেস করে কী মনে করে এলে?

—কার্তুজ দাও আমাদের! বোগাতিরিয়েভ দাবি জানায়।

—কিছু কিছু তো দিয়েছি। আরো কতো চাই? এখানে কি আমাদের কার্তুজের কারখানা আছে ভেবেছ?

—হ্যাঁ, কী দিয়েছ! একেকজন সেপাইয়ের জন্য একটা করে কার্তুজ! ওরা মেশিন-গান চালাচ্ছে আমাদের ওপর আর আমরা শুধু মাথা গুঁজে লুকোবার ঠাঁই খুঁজছি। এটাকে কি যুদ্ধ বলো তুমি?

কুদীনভ বললে—একটু সবুর, বোগাতিরিয়েভ। আমরা কতগুলো দরকারি বিষয় নিয়ে আলাপ করছি।— চলে যাবার জন্য বোগাতিরিয়েভ উঠে দাঁড়াতে ও আবার বললে —চলে যেও না কিন্তু। তোমার কাছে লুকোবার কিছু নেই আমাদের।— তারপর গ্রিগরের দিকে ফিরলে—তাহলে বুঝতে পেরেছ মেলেখফ, যদি এদিকেও আমরা সামলাতে না পারি তাহলে আমাদের জোর করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যারা ফৌজে নেই তাদের ফেলে যাব, আমাদের সব মালপত্তর রেখে পায়দল সেপাইদের রসদগাড়িতে তুলে দিয়ে তিনটে কামান নিয়ে মার্চ করে যাব দনিয়েৎসের দিকে। তোমাকে আমরা সেনাপতি হিসাবে রাখতে চাই। তোমার আপত্তি নেই তো?

—আমার কাছে সবই সমান। কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোর কী হবে? মেয়ে-বউরা বুড়োরা সব যে শেষ হবে।

—কী আর করা...আমাদের সবশুদ্ধ গোরে যাবার চেয়ে ওরাই বরং মরুক।

বোগাতিরিয়েভ হেসে মাথা নাড়ে। ফোঁড়ন কেটে বলে—আর সামনের বছরে আমাদের মেয়ে-বউরা কতোগুলো চাষীর জন্ম দেবে জানো? গুনে শেষ করতে পারবে

না। লালগুলো এখন মেয়েমানুষের জন্য হন্যে হয়ে আছে। এই সেদিন একটি গাঁ থেকে পেছু হটে এলাম, আমাদের সঙ্গে সব্বাই বেরিয়ে এল শুধু একটি জোয়ান বউ ছাড়া। সকাল বেলায় দেখি বউটি কাঁকড়ার মতো হামাগুড়ি দিয়ে আসছে আমাদের দিকে। কমরেডরা তার এমন হাল করে দিয়েছে যে আর সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

কুদীনভের ঠোঁটের কোণদুটো ঝুলে পড়ে। বেরুবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় গ্রিগর। কিন্তু যাবার আগে কুদীনভকে জিজ্ঞেস করেঃ

—যদি আমার গোটা ডিভিশনটাকে বাজ্‌কিতে নিয়ে আসি তাহলে কি খেয়া পার হয়ে ভিয়েশেন্‌স্কা যাবার কোনো ব্যবস্থা থাকবে?

—কী শখ! ঘোড়সওয়াররা তো ঘোড়া নিয়ে সাঁতরেই ডন পার হতে পারবে? ঘোড়সওয়ার সেপাইদের নৌকোয় চাপিয়ে খেয়া পার করার কথা কে কবে শুনেছে?

—কিন্তু আপনি তো জানেন আমার দলে ডন-পারের লোক বেশি নেই। আর চিরার ওদিককার কসাকরা সাঁতারে তেমন দড়ো নয়। ওদের সারা জীবন স্তেপের মাঠে-মাঠেই কেটেছে, সেখানে সাঁতার কাটবে কোথায়?

—ঘোড়া দিয়েই ব্যবস্থা করবে। কুচকাওয়াজে আর জার্মান যুদ্ধের সময়ও ওদের তাই করতে হয়েছিল।

—আমি পদাতিক সেপাইদের কথা বলছি।

—খেয়া তো রয়েছে। আমরা বড়ো নৌকোও তৈরি রাখব। ভয় পেয়ো না।

—তাছাড়া ফৌজের বাইরের লোকজনও আসবে।

—তা জানি।

—সকলে যাতে নদী পার হতে পারে তার বন্দোবস্ত রাখবে, নয়তো আমি এসে তোমাদের জান বের করে নেব। লোকজন নদীর এপাশে পড়ে থাকবে সেটা কোনো তামাশার কথা নয়।

—ঠিক আছে। আমি দেখব। দেখব কি করতে পারি।

—আর কামানের কী করা হবে?

—মর্টারগুলো উড়িয়ে দিও, তবে ফিল্ড-কামান সব নিয়ে এসো এখানে। এপারে কামান বয়ে আনার মতো বড়ো বড়ো নৌকো আমরা মজুত রাখব।

* *

লড়াইয়ে সেই খালাসী ক'জনকে মারার পর থেকেই গ্রিগর একটানা এক নিস্পৃহ, অনুভূতিহীন উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে। নিরাশভাবে মাথা নিচু করে চলাফেরা করে, হাসেও না একটিবার। ইভান আলেক্সিয়েভিচের মরার পর পুরো একটি দিন ওর খুব কষ্টে আর যন্ত্রণায় কেটেছিল, তারপর তাও শেষ হল। জীবনে কেবল একটা আকর্ষণই ওর রয়ে গেছে (অন্ততপক্ষে ওর নিজের তাই ধারণা)—সে হল আকসিনিয়ার সম্পর্কে ওর তীব্র কামনা,—নতুন এক দুর্নিবার শক্তি নিয়ে সেটা আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। স্তেপের প্রান্তরে যেমন শরতের হিম-জমা অন্ধকার রাতে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে পথিককে ডাকে কোনো ছাউনির আগুন, তেমনি এক আকসিনিয়াই শুধু ওকে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সেনাপতিদের সদর দপ্তর থেকে ফিরে আসার সময় ও আকসিনিয়ার কথাই ভাবছিলঃ আমরা তো এদিকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছি কিন্তু ওর কি হবে?—

নাতালিয়া ছেলেপুলে নিয়ে মাকে নিয়ে পড়ে থাক্ এখানেই, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব আকসিনিয়াকে। একটা ঘোড়া জোগাড় করে দেব ওকে, আমার দলবলের সঙ্গে ও-ও যাবে।

ডন পার হয়ে বাজ্‌কিতে এল গ্রিগর। নিজের আস্তানায় ঢুকে নোটবইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখলঃ

"আক্‌সিনিয়া, আমাদের তো বোধহয় ডনের বাঁ পাড়ে পেছু হটে যেতে হবে। তা যদি হয় তো সব ফেলে রেখে ঘোড়ায় চেপে ভিয়েশেন্‌স্কা চলে এসো। সেখানে আমার খোঁজ কোরো। আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।"

চিঠিখানা ভাঁজ করে আঠা দিয়ে জুড়ে প্রোখর জাইখভের হাতে দিল গ্রিগর। লজ্জায় লাল হয়ে, অযথা কড়া মেজাজ দেখিয়ে নিজের বিব্রতভাবটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করলেঃ

—ঘোড়ায় চেপে তাতারস্ক্ চলে যাও। এই চিঠিটা আক্‌সিনিয়া আস্তাখভকে দেবে। আমার আত্মীয়রা কেউ যেন না দেখে ফেলে। রাতেই বরং দিও চিঠিটা। জবাবের কোনো দরকার নেই। তারপর তোমার দু'দিনের ছুটি। শিগগির রওনা হও!

প্রোখর ঘোড়া নেবার জন্য বেরুচ্ছিল, কিন্তু পেছন থেকে আবার ডাকল গ্রিগরঃ

—আমার বাসায় গিয়ে মা কিংবা নাতালিয়াকে বোলো ওরা যেন কাপড়চোপড় আর অন্য কিছু দামি জিনিস থাকলে তা ডনের এপারে পাঠিয়ে দেয়। যব-গম ওরা মাটি চাপা দিয়ে রাখতে পারবে, কিন্তু গরুভেড়াগুলো বরং খেদিয়ে দিক্ এপারে।

॥ দুই ॥

জুন মাসের গোড়ার দিকে বিদ্রোহী-বাহিনী গোটা রণাঙ্গন জুড়ে পেছু হটতে শুরু করেছিল। প্রতিটি ইঞ্চি জমি ছাড়ার আগে ওরা লড়াই করেছে, তবে পেছু হটেছে। ওদের আগেই ডনের দিকে ভয়ে পালিয়ে এসেছিল গাঁয়ের লোকজন। বুড়োরা আর মেয়েরা তাদের যতো ঘোড়া-বলদ বেঁধে জড়ো করেছে, গাড়িগুলো বোঝাই করেছে তোরঙ্গ, থালা-বাসন, দা-কুড়ুল, শস্য আর বাচ্চা-কাচ্চা দিয়ে। গাঁয়ের গোরুভেড়ার পাল মালিকরা আলাদা আলাদা করে নিয়ে এসেছে রাস্তার পাশ দিয়ে। ফৌজের আগে-আগে প্রকাণ্ড লম্বা সারি বেঁধে উদ্বাস্তুরা চলেছে ডন-পাড়ের গ্রামগুলোর দিকে। ধুলো মেখে, রোদে পুড়ে কালো হয়ে মেয়েরা গোরুভেড়া খেদিয়ে নিয়ে আসছে। রাস্তার ধার দিয়ে চলেছে ঘোড়সওয়াররা। চাকার ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্ শব্দ, ঘোড়া আর ভেড়ার নাক ঝাড়া, গোরুর হাম্বা ডাক, শিশুদের কান্না আর এই দলের সঙ্গেই পালাতে-থাকা টাইফাস্-রুগীদের কাতরানিতে গ্রাম আর চেরী-বাগিচাগুলোর নিথর নৈঃশব্দ্য ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে যাচ্ছে। হাজার সুরের এই পাঁচমিশালি গর্জন এতই অনভ্যস্ত যে কুকুরগুলোরও ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে যায়, অন্য সময়ের মতো আর পথ-চলা মানুষ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় না বা গাড়িগুলোর পেছন পেছন মাইল-খানেক রাস্তা ছুটে আসে না।

৪ঠা জ্বনের সকালে আকাশটা জ্বড়ে আছে অনড় কুয়াশা। সারা আকাশে এক চিলতে মেঘও দেখা যায় না—শ্বধ্ব দক্ষিণ দিকে ঠিক স্বর্য ওঠার আগে ছোট একটুকরো টকটকে চোখ-ঝলসানো লাল মেঘ ওঠে। মেঘের যে-ধারটা প্বর্বদিকে ফেরানো সেদিকটা দেখলে মনে হয় রক্ত ঝরে পড়ছে। নদীর বাঁ পাড়ে বালির ঢেউয়ের মাথায় যখন স্বর্য উঠল তখন সে মেঘ অদ্শ্য হয়ে গেল।

দ্বপ্বর নাগাদ এমন গরম পড়ে যা জ্বনের গোড়ার দিকে সচরাচর পড়ে না। বর্ষার আগের মতো বাতাসের ভাপ। সেই ভোর থেকেই ডনের ডান পাড় ধরে উদ্বাস্তুদের গাড়িগ্বলো চলেছে ভিয়েশেন্স্কার দিকে। গাড়ির চাকার শব্দ, ঘোড়ার নাক-ঝাড়া. বলদের ডাক আর মান্বষের গলার স্বর ভেসে আসছে নদীর ওপর দিয়ে।

গ্রিগরের চিঠিটা আক্সিনিয়ার হাতে দিল প্রোখর জাইকভ। ইলিনিচ্নাকে গ্রিগরের মৌখিক উপদেশটুকুও জানিয়ে দিল। তারপর দ্বদিন বাড়িতে কাটিয়ে ৪ঠা জ্বন তারিখে রওনা হল ভিয়েশেন্স্কার দিকে। বাজ্কিতে ওর কোম্পানির দেখা পাবে এমনি ধারণা হয়েছিল ওর। কিন্তু দ্বরের কামান গর্জনের আওয়াজটা যেন চিরার ওপার থেকেই আসছে মনে হয়। লড়াই চলেছে এমন জায়গায় যাবার খ্বব একটা ইচ্ছা প্রোখরের নেই। তাই ও ঠিক করল বাজ্কির দিকেই যাবে, সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করবে গ্রিগর আর এক-নম্বর ডিভিশন এসে পেঁাছোনো অবধি।

ধীরে স্বস্থে, প্রায় পায়চারি-চালেই চলে প্রোখরের ঘোড়া গ্রমকের সদর রাস্তা ধরে। পথের মাঝে দেখা হয়ে যায় উস্ত্-খপেরস্কের একটা সদ্য-গড়ে-ওঠা রেজিমেন্টের কর্তাদের সঙ্গে। ওদের দলেই ভিড়ে যায় প্রোখর। হাল্কা স্প্রিং-ওলা দ্রশ্কি আর একজোড়া ছোট গাড়িতে চেপে যাচ্ছিল ওরা। ছোটগাড়ির একটাতে দলিলপত্র আর টেলিফোনের সরঞ্জাম; আরেকটাতে একজন আহত ব্বড়ো কসাক আর বঁড়শির মতো নাকওলা একটি লোক। ভয়ানক দ্বর্বল লোকটা, মাথায় অফিসারদের ছাই-রঙা কারাকুল-পশমের টুপি। দেখলে মনে হয় সবে টাইফাসে ভুগে উঠেছে। থ্বতনি অবধি গ্রেটকোট ঢেকে শ্বয়ে আছে. তব্ব চাইছে কেউ এসে পা-দ্বটো তার গরম কিছ্ব দিয়ে ঢেকে দিক্; আর হাড়-জাগানো হাতে কপালের ঘাম ম্বছতে ম্বছতে গালিগালাজ করছে আর রাগে ফুঁশ্ছে।

—ওরে হারামী! পায়ের তলা দিয়ে যে বাতাস ঢুকছে! পলিকার্প, একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দে তো আমায়। ঠিক যে সময়টা আমাকে বেশি দরকার সে সময়টাতেই মরতে বসেছি...।— শ্বন্য চোখ দ্বটো চারদিকে ঘোরে ওর।

যাকে পলিকার্প্ বলে ডাকছিল সে ঘোড়া থেকে নেমে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল গাড়িটার কাছে। বললেঃ

—সে কি সামইলো ইভানোভিচ. এত গরমে আছ তব্ব ঠাণ্ডা লাগবে!

—বলছি আমাকে ঢেকে দাও!

বিনীতভাবে হ্বকুম তামিল করে পলিকার্প্, তারপর আবার ফিরে আসে।

প্রোখর চোখের ইশারায় র্বগীকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেঃ লোকটা কে?

—উস্ত্-মেদভেদিয়েৎজের একজন অফিসার। আমাদের স্টাফের সঙ্গেই ছিল।—কসাকটি জবাব দেয়।

ওদের সঙ্গে উস্ত্-খপেরস্কের একদল বাস্তুহারাও আসছিল। ঘরোয়া নানারকম টুকিটাকি জিনিসে বোঝাই একটা গাড়ির ওপর একজন ব্বড়ো কসাক বসে আছে। প্রোখর তাকে ডেকে বললেঃ

—ওহে, তোমরা আবার কোন্ চুলোয় চললে?

—আমরা যাচ্ছি ভিয়েশেন্স্কা—জবাব দেয় লোকটি।

—তোমাদের ওরা ভিয়েশেনস্কায় ডেকে পাঠিয়েছে নাকি?

—কেউ ডেকে পাঠায়নি, তবে নিজেদের মরণ ডেকে আনতে কেই-বা চায়? একবার ভয় ধরলে তখন আর পালাবার দিশে পাওয়া যায় না।

প্রোখর বলে—আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ভিয়েশেন্স্কায় কেন চললে? তোমরা তো ইয়েলান্স্কাতে ডন পার হয়ে ওপারের স্তেপের মধ্যেই ক'হপ্তা কাটিয়ে দিতে পারতে। তা নয়, ভিয়েশেন্স্কায় তোমাদের যেতেই হবে! কেন্তু কেন, তা জানো না! আর ওই ছাইভস্মগুলোই বা কিসের জন্যে?— গাড়ির বস্তাগুলোর দিকে চাবুক দেখিয়ে চটা মেজাজে জিজ্ঞেস করে প্রোখর।

—জামা-কাপড়, ঘোড়ার গলাবন্ধ, ময়দা আর জমি-জিরেতের জন্য দরকারী সব জিনিস এনেছি। ওগুলো তো আর ফেলে আসতে পারি না। ফিরে এসে হয়তো দেখব ঘর-বাড়ি সব ফাঁকা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত সব জিনিস করা হয়েছে, এ কি আর অতো সহজে ফেলে আসা যায় বাছা। সম্ভব হলে বাড়িখানাও বগলদাবা করে আনতাম যাতে লাল বেটারা না দখল করতে পারে, ওলাউঠা হোক বেটাদের!

—কিন্তু প্রকাণ্ড বারকোশখানা? ওটা কেন সঙ্গে টেনে এনেছ? আর ওই চেয়ার-গুলো? ওগুলোর ওপর নিশ্চয়ই ওদের লোভ হত না?

—ফেলে আসার জো ছিল না। হয় ওরা ভেঙে ফেলত নয় পুড়িয়ে ফেলত। না বাবা, আমার পয়সায় ওদের বড়োলোকী চলবে না। গোটা বাড়িটা একেবারে সাফ করে এনেছি!— ধুঁকিয়ে-ধুঁকিয়ে চলা ঘোড়াগুলোর ওপর চাবুক নাচিয়ে বাঁটটা পেছনের দিকে ঘুরিয়ে একটা বলদ-টানা গাড়ির দিকে দেখিয়ে বুড়ো আবার বললেঃ

—ওই যে মেয়েটা গায়ে চাদর জড়িয়ে বসে বলদ হাঁকাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? ও হল আমার মেয়ে। গাড়িটার মধ্যে ওর একটা শুয়োর আছে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে। গাড়ির ভেতরেই কাল রাত্তিরে শুয়োরটা বিইয়েছে। বাচ্চাগুলোর কুঁই-কুঁই ডাক শুনতে পাচ্ছ না? না হে, আমার ওপর খেয়ে লাল বেটারা মোটা হবে সেটি চলবে না, মড়ক লাগুক্ বেটাদের!

প্রোখর ফোঁড়ন কাটে—খেয়া পার হবার সময় আমার কাছ থেকে একটু দূরে থেকো দাদু! নয়তো তুমি আর তোমার শুয়োরের পাল আর তোমার যতো রাজ্যের জিনিস সব ডনের তলায় গড়াগড়ি দেবে।

—কেন, কেন? অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে বুড়ো।

—কারণ লোকজন মরছে, জিনিসপত্র খোয়াচ্ছে আর তুমি বুড়ো শয়তান দুনিয়ার সম্পত্তি টেনে নিয়ে চলেছ মাকড়সার মতো।— শান্তিপ্রিয় প্রোখর সাধারণত এত চেঁচায় না--তোমাদের মতো গোবর-খোর আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।— ঘোড়াটাকে গুঁতো দিয়ে দুলকি চালে চলতে থাকে প্রোখর। ওর পেছন থেকে আচম্কা একটা শুয়োর-ছানার আকাশ-ফাটা চিৎকার ওঠে অন্য সব শব্দ ছাপিয়ে।

ছোটগাড়িটার মধ্যে শুয়েছিল যে অফিসারটি সে ভুরু কুঁচকে কাঁদো-কাঁদো গলায় হাঁকড়ে ওঠে—ওটা আবার কোন্ শয়তান্? শুয়োর এলো কোত্থেকে অ্যাঁ? এই পলিকার্প্!...

পলিকার্প্ খবর দেয়—গাড়ি থেকে একটা শুয়োর পড়ে গিয়েছিল, ঠ্যাঙের ওপর দিয়ে চাকা চলে গেছে।

—শুয়োরের মালিককে বল্ গলা কেটে দিতে। বেটাকে বল্ যে এখানে রুগী মানুষ আছে।...একে তো এতেই বাঁচি না তার আবার গলাফাটানো চিৎকার! যা শিগ্‌গির!

গাড়ির পাশে পাশে যাচ্ছিল প্রোখর, ও দেখল অফিসারটি কপাল কুঁচকে শুয়োরের চ্যাঁচানি শুনছে আর ছাইরঙা টুপিটা দিয়ে বৃথাই কান ঢাকতে চেষ্টা করছে। পলিকার্প আবার এগিয়ে এল সামনে।

—শুয়োরটাকে সে মারতে চাইছে না, সামইলো ইভানিচ্। বলছে নাকি ভালো হয়ে যাবে। আর যদি সেরে না ওঠে তা হলে আজই সন্ধ্যায় কেটে ফেলবে।

অফিসারটা ফ্যাকাশে মুখে খাড়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। বসে পা দুটো ঝুলিয়ে দেয় গাড়ির পাশে।

—আমার রিভলবার কই? ঘোড়া থামাও! শুয়োরের মনিবটা কোথায় আছে? তাকে আমি মজা দেখাচ্ছি! কোন্ গাড়িটার মধ্যে?

শেষ পর্যন্ত হিসেবী বুড়ো কসাকটি বাধ্য হল শুয়োরের গলায় ছুরি চালাতে।

প্রোখর হাসতে হাসতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। একটু বাদেই নতুন আরেক সারি গাড়ির সঙ্গে দেখা—উস্ত্-খপেরস্কেরই গাড়ি সব। কম্‌সে-কম দুশো তো হবেই। সেই সঙ্গে ওদের ঘোড়সওয়ার, গরুভেড়া। সব মিলিয়ে প্রায় মাইল দুয়েক রাস্তা জুড়ে চলেছে। প্রোখর ভাবল—খেয়াঘাটে বেশ এক মজার ব্যাপারই হবে!

সারির একেবারে ও-মাথা থেকে একটি মেয়ে চমৎকার ঘন পাটকিলে-রঙ একটা ঘোড়ায় চেপে ছুটে এল ওরই দিকে। কাছে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়াল। দামি কামদার জিনে চেপে বসেছে, পেটি আর আসনটা চৌরস নিদাগ চামড়ার, ঝক্‌ঝক্ করছে, রুপোর বল্‌গা-মুখ আর আংটাগুলো চকচকে। মেয়েটি জিনে বসেছে বেশ স্বচ্ছন্দে, দুরন্তভাবে। শক্ত কালচে হাতে ঠিক মতো ধরা আছে ঘোড়ার রাশ। কিন্তু সুপুষ্ট জঙ্গী ঘোড়াটা যে তার মনিবানীকে পরোয়াই করে না সেটা বেশ বোঝা যায়। চোখ ঘুরিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সে হলদে দাঁতের পাটি বের করে মেয়েটির ঘাগরার নিচে উঁকি-দেওয়া হাঁটুটা কামড়াতে চেষ্টা করে।

মেয়েটার চোখ অবধি একটা নীল পরিষ্কার রুমাল জড়ানো। মুখের কাছ থেকে রুমাল সরিয়ে সে প্রোখরকে জিজ্ঞেস করেঃ

—বাবা, তুমি কতগুলো গাড়িতে করে জখম মানুষ নিয়ে যেতে দেখেছ?

—গাড়ি তো অনেক যেতে দেখলাম, তাতে হয়েছে কী?

মেয়েটি আস্তে আস্তে জবাব দেয়—আমি আমার স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছি না। পায়ে জখম হয়েছিল, উস্ত্-খপেরস্ক থেকে তাকে জঙ্গী হাসপাতালের ডাক্তাররা নিয়ে আসছিল। কিন্তু তারপর বোধহয় ওর ঘা-টা পচে যায়, তাই আমাকে বলে ওর ঘোড়াটা ওকে দিয়ে আসবার জন্য। এই সেই ঘোড়া।

জানোয়ারটির পিঠে চাপড় মারল মেয়েটি—ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে উস্ত্-খপেরস্ক অবধি গিয়েছিলাম, ঘোড়া চালাচ্ছি তো চালাচ্ছিই, তার খোঁজ আর পাই না।

মনে-মনে কসাক মেয়েটির সুডোল ভরাট মুখখানার তারিফ জানিয়ে প্রোখর খুশি হয়ে শোনে তার নিচু খাদের মিষ্টি মোলায়েম গলার আওয়াজটা। তারপর বলে ওঠেঃ

—আরে তুমি তোমার স্বামীর খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন গো? যাক্ না সে জঙ্গী হাসপাতালে! তোমার মতো খাপসুরত মেয়েকে তো যে-কেউ বিয়ে করে ফেলবে, ঘোড়াটাকেও যৌতুক হিসেবে পাবে। আমি নিজেই তৈরি!

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে মেয়েটি হাঁটু অবধি ঘাগরা টেনে দেবার জন্য একটু নিচু হয়।— তামাশা না করে বলোই না কোনো জঙ্গী হাসপাতাল দেখেছ কিনা?

প্রোখর একটা নিঃশ্বাস ফেলে পেছনে খানিক দূরে এক সার গাড়ি দেখিয়ে বলে— ওই দলটার মধ্যে তুমি জখম আর রুগীদের পাবে।

মেয়েটি চাবুক হাঁকিয়ে চট্ করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েই ছুট্ লাগায়।

ধীরে ধীরে চলেছে সব গাড়ি। বলদগুলো অলসভাবে লেজ নেড়ে ভন্‌ভনে ঘোড়া-মাছি তাড়ায়। এমন গরম পড়েছে আর বাতাসও এমন দম-আটকানো ভাপ্‌সা, বাজ-পড়ার মতো থম্‌থমে, যে রাস্তার ধারে গজিয়ে-ওঠা সূর্যমুখীর কচি পাতাগুলো নেতিয়ে পড়েছে।

আরেকবার প্রোখর এক সার গাড়ির পাশে ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যায়। দলের মধ্যে জোয়ান কসাকরাই সংখ্যায় ভারী, দেখে অবাক হয় প্রোখরঃ হয় এরা নিজেদের ফৌজী কোম্পানি থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে নয়তো পালিয়ে এসে যোগ দিয়েছে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে, ওদের সাথে-সাথেই নদীর পারঘাটা অবধি যাবে। ওদের কেউ-কেউ গাড়িগুলোর পেছনে ফৌজী ঘোড়া বেঁধে নিয়েছে। শুয়ে-শুয়ে গল্প করছে বউদের সঙ্গে, নয়তো বাচ্চা-কাচ্চাদের দেখাশুনা করছে। কেউ-কেউ পুরোদস্তুর তলোয়ার আর রাইফেল ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপেছে। ওদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে প্রোখর ঠিক বুঝে ফেলে— নিশ্চয় ফৌজীদল ছেড়ে এখন চম্পট দিচ্ছে সব।

বলদগুলো আস্তে-আস্তে গম্ভীর-চালে এগিয়ে চলে। ওদের ঝুলে-পড়া জিভের ডগা বেয়ে সুতোর মতো নাল গড়ায় একেবারে মাটি অবধি। ঘোড়ায় টানা মালগাড়িগুলোও চলেছে একই রকম ঢিমে-তেতালা, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই নেই। গোটা দলটার চলার বেগ বড়ো জোর ঘণ্টায় তিন-চার মাইল। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে একটা কামানের আওয়াজ আসতেই কিন্তু চট্‌পট্ সারবন্দী ঘোড়াগুলো সজাগ হয়ে ওঠে। এক-ঘোড়া আর জোড়া-ঘোড়ার মালগাড়িগুলো লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসে, কদম-চালে ছোটানো হয় ঘোড়াদের, চাবুকের সাঁই সাঁই শব্দ, চিৎকার। বলদগুলোর পিঠের ওপর বেতের চাবুক পড়ে সপ্‌সপ্ করে, জোরে তড়বড় করে ছোটে গাড়ির চাকা। ভয় পেয়ে সকলেই গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। রাস্তা থেকে ঘন ধুলোর মেঘ উঠে পেছনে ভেসে আসে, খেতের ফসল আর ঘাসের ডাঁটিতে এসে জমে সেই ধুলো।

প্রোখরের নিজের ছোট ঘোড়াটা এতক্ষণ কেবলি ঘাসের দিকে যাবার চেষ্টা করছিল। নাক ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে তে-পাতা, সর্ষে আর রাইয়ের গোছা ছিঁড়ে নিচ্ছিল। কামানের আওয়াজটা আসতেই প্রোখর ঘোড়ার পাঁজরায় গোড়ালির গুঁতো মারে। সেও যেন বুঝতেই পেরেছিল এখন পেট ভরাবার সময় নয়, তাই স্বেচ্ছায় থম্‌কা-কদমে ছুটতে লাগল।

ক্রমেই আরো ঘনঘন কামান ছোঁড়া হতে থাকে। কামানের কড়কড় আওয়াজের সঙ্গে সুর মেলায় রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার তীব্র শব্দ। ফলে গুমোট বাতাসের মধ্যে জাগে একটা গুরুগুরু মেঘ ডাকার মতো গর্জন।

হে প্রভু যিশু!— গাড়িতে বসে ক্রুশপ্রণাম করে একটি যুবতী। নিজের বাচ্চাটির মুখ থেকে দুধ-চকচকে বাদামি মাইয়ের বোঁটা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে জামার তলায় ঢাকে ফুলে-ওঠা হল্‌দে স্তনটা।

বলদগুলোর পাশাপাশি লম্বা পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে এক বুড়ো জিজ্ঞেস করল প্রোখরকে—ও সেপাই, ওরা কি আমাদের লোক কামান চালাচ্ছে, নাকি আর কেউ?

—ওরা লাল-সেপাই, দাদু। আমাদের কামানের গোলাই নেই একটাও।

—হে স্বর্গের দেবী, ওদের বাঁচাও! বুড়ো হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দেয়, পুরনো কসাক-টুপিটা খুলে হাঁটতে-হাঁটতেই পুব দিকে মুখ ফিরিয়ে ক্রুশ-প্রণাম করে।

দক্ষিণদিকে একটা টিলার ওপাশ থেকে তেল্‌তেলে কালো একখণ্ড মেঘ উঠছিল। সারা দিগন্ত ছেয়ে ফেলল সে মেঘ, আকাশ আড়াল হল তার কুহেলি পর্দার আড়ালে।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—ওই দ্যাখো, উদিকে কী সাংঘাতিক আগুন লেগেছে!

—কী হতে পারে ব্যাপারটা?— কোথায় আগুন লাগল? — গাড়ির চাকার আওয়াজ ছাপিয়ে নানা কণ্ঠের প্রশ্ন।

—চিরা নদীর পাড় বরাবর লেগেছে।

—চিরার ধার দিয়ে লালসেপাইরাই আগুন লাগাচ্ছে।

—ভগবান্ না করুন...

—দ্যাখো কী বিরাট ধোঁয়ার মেঘ উঠেছে! মনে হচ্ছে অনেকগুলো গাঁয়েই আগুন দিয়েছে ওরা।

—ইভান, সামনের লোকদের বলো একটু তাড়াতাড়ি করতে!

কালো ধোঁয়ার আস্তরণটা ক্রমেই আরো বেশি করে আকাশ ছেয়ে ফেলতে থাকে। কামানের আওয়াজও ক্রমেই একটানা জোরালো হয়ে ওঠে। আধঘণ্টার মধ্যে দখ্‌নে বাতাসে সদর রাস্তা অবধি ভেসে আসে একটা ঝাঁঝালো ভয়াল গন্ধ—প্রায় মাইল কুড়ি দূরে চিরা নদীর পাড়ে কতগুলো গ্রাম পুড়ছে।

* *

গ্রমক্-এর রাস্তাটা এক জায়গায় এসে ধূসর পাথরের কতকগুলো চাঁইয়ের পাশ কাটিয়ে হঠাৎ মোড় নিয়েছে ডনের দিকে। রাস্তাটা পড়েছে একটা সরু নালায়। সোঁতার ওপর একটা কাঠের গুঁড়ির সাঁকো। আবহাওয়া শুকনো থাকলে হলদে বালি আর রং চঙে পাথর-নুড়ি চিক্‌মিক্ করে, কিন্তু একবার বর্ষা হয়ে গেলে পাহাড় থেকে ঢল নামে, বৃষ্টির ঘোলা জল প্রচণ্ড তোড়ে ছুটে আসে সোঁতার মধ্যে, পাথর ধুয়ে ভাসিয়ে গর্জন করে ধেয়ে যায় ডনের দিকে। এমনি বর্ষার দিনে সাঁকোটা জলের নিচে তলিয়ে গেলেও বেশিদিন সেভাবে থাকে না। ক্ষণস্থায়ী পাহাড়ী বন্যা খুব জোরালো হলে দেয়াল আর থাম্বাসমেত বেড়া উপড়ে ফেলে বটে, তবে দেখতে-দেখতেই আবার শান্ত হয়ে যায়—সোঁতার তলায় আবার নতুন করে ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে নুড়িপাথরগুলো।

সোঁতার দু'পাড়ে বেতস আর বন-ঝাউয়ের ঘন ঝোপঝাড়। তাদের ছায়ায় ভয়ানক গরমের দিনেও বেশ ঠাণ্ডা থাকে। ভিয়েশেন্‌স্কা মিলিশিয়ার এগারোজন সেপাই সাঁকোর কাছে আস্তানা গেড়ে ঠাণ্ডা ছায়ার নিচে বসে আমোদ-আহ্লাদ করছিল।

ওদের ওপর হুকুম আছে—মিলিটারির উপযুক্ত বয়েসের যে-কোনো কসাককে ভিয়েশেন্‌স্কার দিকে যাবার চেষ্টা করতে দেখলে গ্রেপ্তার করতে হবে। প্রথম বাস্তুহারা গাড়িগুলো যতোক্ষণ না দূরে দেখা দিল ততোক্ষণ ওরা সাঁকোর নিচে শুয়ে, তাস পিটিয়ে, সিগারেট ফুঁকে কাটাল। কেউ-কেউ জামা-কাপড় খুলে শার্ট আর পাতলুন থেকে উকুন বাছতে লেগে গেল—সেপাইদের হাবাতে উকুন। দুজন আবার অফিসারের হুকুম নিয়ে ডন নদীতে স্নান করতেও চলে গেল।

কিন্তু বিশ্রাম হল অল্পক্ষণ, কারণ বাস্তুহারারা তখন অন্তহীন বন্যার মতো সাঁকোর

কাছে এসে পড়েছে। ঝিমন্ত ছায়া-ঢাকা ছোট্ট জায়গাটা যেন আচম্বিতে মানুষ-জনে হৈ-হল্লায় গরম হয়ে উঠল, যেন গাড়িগুলোর সঙ্গে স্তেপ-প্রান্তরের তপ্ত হাওয়া খানিকটা চলে এসেছে ডন-পারের পাহাড় এলাকা থেকে।

সেপাই-ঘাঁটির কমাণ্ডার, ঢ্যাঙা পাতলা, কমিশনহীন অফিসার লোকটা, সাঁকোর কাছে দাঁড়িয়েছিল রিভলবারের খাপে হাত রেখে। প্রায় গোটা কুড়ি গাড়ি সে বিনা বাধায় ছেড়ে দিল, কিন্তু তারপরেই সারির মধ্যে বছর পঁচিশের একজন জোয়ান কসাককে দেখে হুকুম দিলেঃ

—থামো!

কসাকটি ভুরু কুঁচকে রাশ টেনে ধরে।

গাড়ির কাছে এসে কমাণ্ডার জেরা করে—কোন্ রেজিমেণ্টের লোক তুমি?

—তা দিয়ে তোমার দরকার?

—তোমার রেজিমেণ্ট কোন্‌টা, তাই জিজ্ঞেস করছি। বলো।

—আমি রুবিয়েঝিন্ কোম্পানির সেপাই। তুমি কে?

—নেমে পড়ো!

—তুমি কে তাই জানতে চাই।

—বলছি তুমি নামো—কমাণ্ডারের কান অবধি লাল হয়ে ওঠে। তারপর ঢাকনা খুলে রিভলবারটা বের করে সে বাঁ হাতে তুলে নেয়।

কসাক যুবক তার বউয়ের হাতে লাগামটা গুঁজে দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে গাড়ি থেকে।

কমাণ্ডার ফের জিজ্ঞেস করে—তুমি রেজিমেণ্ট ছেড়ে এসেছ কেন? কোথায় চলেছ?

—আমার অসুখ করেছিল। পরিবার নিয়ে বাজ্‌কিতে চলেছি।

—অসুখের জন্য ছুটি নিয়েছ এমন কোনো প্রমাণপত্তর আছে তোমার কাছে?

—প্রমাণপত্তর পাব কোথায়? কোম্পানিতে একটিও ডাক্তার ছিল না।

—তাহলে নেই বলছ! কারপেঙ্কো!— সেপাইদের একজনকে ডাকে সে—এ লোকটাকে স্কুলবাড়িতে নিয়ে যাও তো।

কসাক ছেলেটি জিজ্ঞেস করে—তোমরা কে?

—দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা কে!

—আমাকে যে কোম্পানিতে ফিরে যেতে হবে। আমাকে আটকাবার কোনো এক্তিয়ার আপনাদের নেই।

—আমরা নিজেরাই তোমাকে চালান করে দিচ্ছি। সঙ্গে হাতিয়ার আছে?

—একটা রাইফেল।

—চট্ করে বের করো, নয়তো ভুঁড়ি ফুটো করে দেব। জোয়ান কস্যাক, মানুষ, এদিকে বউয়ের ঘাগরার পেছনে লুকোচ্ছ! তোমাকে আমরা আস্ত রাখব বলতে চাও?— চলে যাবার সময় কমাণ্ডার ওর ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে বললে—নোংরা জানোয়ার!

একটা কম্বলের তলা থেকে রাইফেলখানা টেনে বের করল কসাকটা। সকলের সামনে বউকে চুমো খাবার ইচ্ছে ছিল না, তাই ওর হাতটা ধরে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। তারপর পাহারাদারের সঙ্গে সঙ্গে চলল ইস্কুলে।

সরু গলিটার মধ্যে খানিকক্ষণ ভিড় জমিয়ে আবার গাড়িগুলো হুড়মুড় করে সাঁকোর ওপর ওঠে।

একঘণ্টার মধ্যে ঘাঁটির সেপাইরা প্রায় পঞ্চাশজন ফৌজ-পালানো কসাককে গ্রেপ্তার করে ফেলল। কেউ-কেউ ঠেকাতে চেষ্টা করেছিল, বিশেষ করে একজন বয়স্ক, লম্বা-গোঁফওয়ালা গুন্ডা-চেহারার কসাক। কমান্ডার যখন তাকে গাড়ি থেকে নামতে বলল সে চাবুক কষাল ঘোড়ার পিঠে। দুজন মিলিশিয়া সেপাই জানোয়ারদুটোর লাগাম চেপে ধরে সাঁকোর ওপারে নিয়ে দাঁড় করালো। দ্বিতীয়বার আর চিন্তা না করেই কসাকটা তেরপলের তলা থেকে একটা রাইফেল বের করে কাঁধের ওপর চড়ালো।

চেঁচিয়ে বললে—পথ ছাড়ো বলছি! নয়তো খুন করব, হতভাগার দল!

মিলিশিয়া সেপাইরা বলতে লাগল—নেমে পড়ো হে, নেমে পড়ো! যে কথা মানবে না তাকে গুলি করে মারার হুকুম আছে। এক সেকেন্ডের মধ্যে তোমাকে আমরা বাগ মানাতে পারি।

—চাষীর গুষ্টি! কাল খুন করছিলি লালদের, আর আজ বন্দুক তাক করছিস কসাকদের ওপর।... ভোম্‌রা পাঁঠা সব! ভাগ্‌ নয়তো গুলি করব।...

মিলিশিয়া-সেপাইদের একজন গাড়ির সামনের চাকার ওপর লাফিয়ে উঠল। অল্পক্ষণ হাতাহাতির পর লোকটার হাত থেকে কেড়ে নিল রাইফেলখানা। বেড়ালের মতো সামনের দিকে ঝুঁকে কসাকটা তেরপলের তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা চ্যাপ্‌টা তলোয়ার বের করে নিল খাপ থেকে, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে গাড়ির পাশের দিকে তলোয়ার চালাল। মিলিশিয়া সেপাইদের একজন চট্‌ করে লাফিয়ে সরে গেল, নয়তো আরেকটু হলেই তার মাথা কাটা পড়ত।

কসাকের বউ খেপে পাগল-হয়ে-ওঠা স্বামীকে কেঁদে-কেটে বারণ করতে লাগল—তিমোফেই, ফেলে দাও ওটা! তিমোফেই! উঃ...! ও কী করছ।...ঠেকাতে যেয়ো না, তোমায় মেরে ফেলবে যে!

কিন্তু লোকটা তখন গাড়ির ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ইস্পাত-নীল চক্‌চকে তলোয়ারটা মাথার ওপর ঘোরাচ্ছে, আর মিলিশিয়া-সেপাইদের কাছে ঘেঁষতে না দিয়ে কেবলই গালিগালাজ করছে। চোখ লাল করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে গর্জাচ্ছে—হট্‌ যাও, নয়তো কোতল করব!

অনেক কষ্টে ওর হাতিয়ারটা কেড়ে নেওয়া হল। তারপর ওকে শুইয়ে ফেলে বেঁধে ফেলল ওরা। গাড়ি তল্লাসী করতে গিয়ে ওরা বুঝল লোকটার এত গোঁয়ার্তুমি করে বাধা দেবার আসল কারণটা কী—গাড়ির মধ্যে একটা বড়ো জালা ভর্তি ঘর-চোলাই ভদ্‌কা।

ছোট রাস্তাটা এর মধ্যে আবার গাড়িতে জানোয়ারে ঠাসাঠাসি। গাড়িগুলো এমন ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে যে বলদ আর ঘোড়াগুলোকে জোয়াল থেকে খুলে নিতে হল, হাত দিয়ে টেনে আনতে হল গাড়িগুলোকে সাঁকোর কাছে। ঘোড়া-মাছির উৎপাতে অস্থির হয়ে বিশ্রি রকম ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করতে করতে ঘোড়া আর বলদগুলো গাড়ির বোম্‌ ভেঙে বেড়া ডিঙিয়ে ছুটল, মনিবদের কোনো হুকুমই মানল না। সাঁকোর ওপর অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগল গালাগালি, চাবুকের সপাসপ্‌ আওয়াজ আর মেয়েদের কান্নাকাটি। পেছনের গাড়িগুলো নড়বার মতো খানিকটা জায়গা পেয়ে ফিরে চলল—আবার উঠল বড়ো রাস্তাটার ওপর। ডনের দিকে বাজ্‌কিতে যাবার জন্য তৈরি হল তারা।

পলাতকদের গ্রেপ্তার করে পাহারাদার সঙ্গে দিয়ে পাঠানো হল বাজ্‌কিতে। কিন্তু ওদের সকলের হাতেই অস্ত্র ছিল, তাই পাহারাদারদের ক্ষমতা হল না ওদের বাগ মানিয়ে

রাখার। সাঁকোটা পেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত্রী আর বন্দীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি। খানিক বাদে শান্ত্রীরা ফিরে এল ঘাঁটিতে। কসাক পলাতকরা জঙ্গী কায়দায় মার্চ্ করে চলল ভিয়েশেন্‌স্কার দিকে।

* * *

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। ভিয়েশেন্‌স্কার উল্টো দিকে বাজ্‌কিতে এসে পেঁছিয় প্রোখর। সমস্ত পথঘাট গলি জুড়ে হাজার হাজার বাস্তুহারা গাড়ি, ডনের পারে প্রায় দু'মাইল জায়গা নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। হাজার খানেকেরও বেশি মানুষ গাছ-গাছালির নিচে ছড়িয়ে আছে ওপারে গিয়ে উঠবার অপেক্ষায়। খেয়া নৌকায় কামান, রেজিমেন্ট অফিসার আর সামরিক রসদপত্র পার করা হচ্ছে। দাঁড়-টানা নৌকোয় পদাতিক সৈন্যদের ওঠানো হল। ডনের ওপর গোটা বারো ওই ধরনের নৌকো। পার-ঘাটের কাছে থিক্ থিক্ করছে মানুষের ভিড়।

ঘোড়সওয়ার বাহিনীর প্রথম দলটা পেছু হটার মুখে মাঝরাত নাগাদ এসে পড়ল সেখানে, ভোর হলেই তারা নদী পার হবে। কিন্তু এক নম্বর ডিভিশনের ঘোড়সওয়ারদের এদিকে কোনো খবরই নেই, প্রোখর তার স্কোয়াড্রনের অপেক্ষায় বাজ্‌কিতেই থাকবে ঠিক করল। জিন চড়ানো ঘোড়াটাকে সে একটা উদ্বাস্তু গাড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে চলে গেল ভিড়ের ভেতর চেনা-জানা কাউকে খুঁজে পায় কিনা দেখতে।

দূর থেকে ওর নজর পড়ল আক্‌সিনিয়া আস্তাখোভার ওপর—নদীর দিকেই সে নেমে আসছে বুকের ওপর একটা ছোট পুঁট্‌লি চেপে ধরে, কাঁধের ওপর গরম জ্যাকেট-খানা ফেলে। ওর মন-কাড়া সুন্দর চেহারা কয়েকজন পদাতিক সেপাইয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আক্‌সিনিয়াকে ওরা চেঁচিয়ে ডাকে, অশ্লীল রসিকতায় সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে। লম্বা কটা-চুলো একজন কসাক পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরতে যায়, ওর লালচে ঘাড়টার ওপর ঠোঁট চেপে ধরে। কিন্তু লোকটাকে ও ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিয়ে কী যেন বলে, আর মুখ ভ্যাংচায়। সেপাইগুলো হৈ-হৈ করে ওঠে। কসাকটা তখন টুপি খুলে ভাঙা গলায় সাধাসাধি করেঃ একটা ছোট্ট চুমো দাও শুধু, ব্যস্!

আক্‌সিনিয়া তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যায়। ওর ঠোঁটের ওপর খেলে যায় একটা বিদ্রুপের হাসি। প্রোখর ওকে ডাকল না। ভিড়ের মধ্যে পাড়া-পড়শিদের কাউকে পাওয়া যায় কিনা তাই দেখতে লাগল। লোকজনের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে এগোয়। কানে আসে অনেকগুলো মাতাল গলার আওয়াজ আর হাসি, তারপরেই দ্যাখে একটা গাড়ির নিচে ঘোড়ার কম্বল পেতে বসেছে তিন বুড়ো। একজনের দু-পায়ের মাঝখানে এক কুঁজো ঘর-চোলাই ভদ্‌কা। ফুর্তিবাজ তিন বুড়ো খোকা পালা করে ভদ্‌কা খাচ্ছে একটা ঝিনুকের খোলায় তৈরি তামা-বাঁধানো মগ থেকে, আর সেই সঙ্গে চিবুচ্ছে শুঁট্‌কি মাছ। মদের ঝাঁঝ আর মাছের নোন্‌তা গন্ধ পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রোখর—খিদেয় পেট জ্বলছিল ওর।

একজন ওকে কাছে ডাকল—ওহে সেপাই, এসো, আমাদের সঙ্গে বসে একটু খাও!—প্রোখর আর ঘেন্নাপিত্তি না করে বসে গেল। ক্রুশ-প্রণাম করে হাসিমুখে অতিথিবৎসল বুড়োর হাত থেকে এক মগ মদ নিলে।

দলের মধ্যে আরেকজন বললে—যতোক্ষণ বেঁচে আছ টেনে নাও হে! এই ব্রীম-মাছটায় লাগাও দিকি একটা কামড়। কখন বলব সেই অপেক্ষায় থাকবে—তার কি

দরকার নেই। বুড়োরা বিজ্ঞ বিচক্ষণ মানুষ। কেমন করে বাঁচতে হয়, ভদ্‌কা খেতে হয় সে-সব এখনো তোমাদের মতো ছোকরাদের শিখতে বাকি।

প্রোখর নিজের আগ্রহেই পিপাসা-ভরা ঠোঁট চেপে ধরে মগের কিনারায়, তারপর একবারও দম না নিয়ে তলা অবধি শুষে নেয় সবটুকু।

ভদ্‌কার মালিক সেই মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান্ বুড়োটা মোটা গলায় বললে—আমার যথাসর্বস্ব গেছে! মদ খাবো না কেন বলো? সঙ্গে করে দুশো পুড্ গম এনেছি, ওদিকে বাড়িতে ফেলে এসেছি হাজার পুড্। পাঁচজোড়া বলদ নিয়ে এসেছিলাম এতদূর অবধি, এখন তাও ছেড়ে দিতে হবে ওদের নদী পার করাতে পারব না বলে। এতদিন ধরে যা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে করলুম এখন তা সবই গেল। তাই বলি, গাও হে গান! এসো বন্ধুরা! —মুখটা লোকটার কালো হয়ে ওঠে, চোখে জল এসে পড়ে।

—অমন চেঁচিও না, এফিম ইভানিচ্! যদি প্রাণে বাঁচি তো আবার বড়লোক হব।— দলের মধ্যে একজন পাল্‌টা জবাব দেয়।

কেন চেঁচাব না?— বুড়ো কসাকের গলা আরো চড়ে যায়, গালের ওপর চোখের জলের দাগ—আমার ফসল নষ্ট হবে, গাই-বলদ মারা পড়বে। লাল-বেটারা এসে ঘরে আগুন দেবে। আমার ছেলে তো গেল শরৎকালেই খুন হয়েছিল। তবে চেঁচাব না কেন বলো? কার জন্য এত খেতখামার সম্পত্তি করলুম? আগের দিনে গরমকালে দশ-দশটা জামা গায়েই পচত ঘামে, আর এখন পরনে নেংটি, খালি পা। টেনে নাও হে শরাপ!

ওরা কথা বলতে বলতে প্রোখর এদিকে একটা গোটা ব্রীম মাছ সাবাড় করেছে, সাত মগ ভদকা খেয়ে এমন মাতাল হয়ে পড়েছে যে যখন বিদায় নেবার সময় হল তখন পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারে না।

ভদ্‌কা-ওয়ালা বুড়ো বললে—ও সেপাই, তোমার ঘোড়ার জন্য দরকার হলে খানিকটা দানা দিতে পারি।

আশেপাশের কারুর কথা না ভেবেই প্রোখর বিড়বিড় করে বললে—আমি এক বস্তা নেব।

সেরা জাতের ওট্ দানা এক বস্তা ঢেলে দিলে বুড়ো, নিজে ওর কাঁধের ওপর তুলেও দিলে। প্রোখরকে জড়িয়ে ধরে বুড়ো নাকী কান্না জুড়ে দিলে—থলিটা কিন্তু ফেরত দিও বাছা। ভুলো না, ভগবানের দোহাই!

—ফেরত-টেরত দেব না। দেব না বলেছি, তার মানেই সত্যি-সত্যি দেব না।— গোঁয়ারের মতো, কী বলছে কিছু না বুঝেই বলে বসে প্রোখর।

গাড়ির কাছ থেকে টলতে টলতে সরে যায়। পিঠের ওপর থলিটা দুলছিল, তার ফলে গুঁতো খেতে-খেতে আরো তাড়াতাড়ি এগোয় ও। প্রোখরের মনে হয় যেন বরফ-পিছল মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে ও—খুরে নাল না থাকলে ঘোড়া যেমন বরফের ওপর পা হড়কে টলে-টলে চলে তেমনি। কোনোরকমে কয়েক পা গিয়ে ও থামল —মাথায় টুপি ছিল কি ছিল-না তাই মনে করতে চেষ্টা করছে। গাড়ির সঙ্গে বাঁধা একটা ঘোড়া ওটের গন্ধ পেয়ে এগিয়ে এসে বস্তার কোণাটা কামড়ে ধরল। ফুটো দিয়ে হড়-হড় করে বেরিয়ে এল ওটের দানা। বোঝাটা একটু হাল্‌কা হয়েছে বুঝতে পেরে প্রোখর আবার চলতে শুরু করে।

হয়তো বাকি ওট-দানাটুকু ও বয়ে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড

ষাঁড় সেই রাস্তায় আসতে আসতে হঠাৎ ওকে খুরের গুঁতো মেরে বসল। ষাঁড়টা এতক্ষণ ডাঁশমাছি আর ঘোড়া-মাছির কামড়ে অস্থির হয়ে, গরমে আর একটানা দাঁড়িয়ে থেকে একেবারে খেপে গিয়েছিল—কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিল না। প্রোখরই আজ এই প্রথম ওর পাগলামির শিকার নয়। যাহোক প্রোখর তো গুঁতো খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল, ওর মাথাটা ঠুকে গেল একটা চাকার মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে ও অচেতন।

মাঝরাতে জেগে ওঠে প্রোখর। মাথার ওপর সীসের মতো ধূসর মেঘ—ভেসে চলেছে পশ্চিম-মুখো। মেঘের ফাঁকে এক লহমার জন্য উঁকি দিয়ে গেল নতুন চাঁদ, তারপরেই আকাশ আবার মেঘে ঢেকে গেল। বাতাসটাও যেন আগের চেয়ে ঠান্ডা। যে গাড়িটার পাশে প্রোখর শুয়ে আছে তারই খুব ধার ঘেঁষে চলেছে ঘোড়সওয়ার বাহিনী। অসংখ্য নাল-আঁটা খুরের চাপে ককিয়ে উঠছে মাটি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে বুঝতে পেরে জানোয়ারগুলো ঘোঁত-ঘোঁত করে নাকের আওয়াজ করছে। রেকাবের সঙ্গে তলোয়ারের খাপ ঠন্‌ঠন্‌ করে গুঁতো খায়। মুহূর্তের জন্য জ্বলে ওঠে সিগারেটের লাল্‌চে আগুন। প্রোখরের নাকে আসে ঘোড়ার ঘাম আর চামড়ার সাজ-সরঞ্জামের সোঁদা গন্ধ। পরিচিত গন্ধ পেয়ে লোভীর মতো নাকের ফুটো বড়ো করে ও ভারী মাথাটা উঁচু করে।

জিজ্ঞেস করে— তোমরা কোন্‌ রেজিমেন্টের লোক, ভাই?

—ঘোড়সওয়ার।— অন্ধকারে কে যেন তামাশা করে জবাব দেয়।

—তা তো বুঝলুম। কিন্তু কোন রেজিমেন্ট তাই শুধোচ্ছি।

—পেতলুরার।— একই গলায় জবাব আসে।

—হারামী কাঁহাকা!— গালাগাল ঝেড়ে প্রোখর দু-একমুহূর্ত সবুর করে ফের একই প্রশ্ন করেঃ

—তোমরা কোন্‌ রেজিমেন্টের লোক, কমরেড?

—বকোভ্‌স্কি।— জবাব আসে এবার।

প্রোখর সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু মাথায় রক্ত ওঠে, গলা বেয়ে বমি উঠে আসে যেন। আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ও। সকাল নাগাদ নদীর দিক থেকে একটা তাজা ঠান্ডা হাওয়া আসে।

ঘুমের ঘোরেই ও শুনতে পায় মাথার ওপর কার গলার স্বরঃ

—লোকটা তো মরেনি।

—গা গরম আছে...মাতাল!— প্রোখরের কানের কাছেই আরেকজন জবাব দেয়।

—রাস্তা থেকে টেনে সরিয়ে দাও! মড়া জানোয়ারের মতো পড়ে আছে। তোমার বর্শার ধারটা একটু বুঝিয়ে দাও তো ওকে—ফের বললে প্রথম লোকটি।

বর্শার ডান্ডা দিয়ে দ্বিতীয় লোকটা খুব জোরে একটা গুঁতো মারল আধা-অচেতন প্রোখরের পাঁজরায়, এক জোড়া হাত ওর পা'দুটো চেপে ধরে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে।

কে যেন হুকুমের সুরে চড়া গলায় বললে—গাড়িগুলোর জোয়াল খুলে দাও! ঘুমোবার আর সময় পেল না! লাল সেপাইরা এদিকে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল, আর এরা ঘুমুচ্ছেন নাকে তেল দিয়ে! গাড়ি সব হটিয়ে দাও, এক মিনিটের মধ্যে গোলন্দাজরা কামান নিয়ে বেরিয়ে যাবে। জলদি! রাস্তা জুড়ে রয়েছে দ্যাখো!.. আপদ যতো!

গাড়ির ওপরে নিচে যতো উদ্বাস্তু শুয়েছিল সবাই নড়ে চড়ে উঠল। তড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠল প্রোখর। ওর হাতে রাইফেলও নেই, তলোয়ারও নেই। আগের দিন

সন্ধ্যায় মাতলামি করে ডান পায়ের জুতোটাও খোয়া গেছে। কোনো কিছুর তাল না পেয়ে গাড়ির তলায় নিজের জিনিসপত্তরগুলো খুঁজতে চেষ্টা করে, কিন্তু একদল গোলন্দাজ আর চালক এগিয়ে এসে কোনো মায়ামমতা না দেখিয়েই সিন্দুক-তোরঙ্গ শুদ্ধ গাড়িটাকে উলটে দেয়। এক মিনিটের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায় ওদের কামান যাবার রাস্তা।

চালকরা ছুটে গেল ঘোড়াগুলোর দিকে। চওড়া চামড়ার পেটি কাঁপছে, টান হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় গাড়ির দাগ ধরে ক্যাঁচক্যাঁচ করে এগোচ্ছে ফিল্‌ড্‌ কামানের বড়ো বড়ো চাকা। মালগাড়ির বোমের সঙ্গে গোলাবারুদের একটা গাড়ির চাকার গুঁতো লেগে সেটা মট্‌ করে ভেঙে গেল।

প্রোখরকে যে বুড়ো লোকটা আগের দিন অতো সেবাযত্ন করেছিল সে গাড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল—তোরা লড়াই ছেড়ে ভেগে পড়ছিস! আচ্ছা সেপাই তো সব, চুলোয় যা হতভাগারা!—

গোলন্দাজ-দলটা চুপচাপ চলে গেল, নদী পার হবে বলে তাড়া আছে ওদের। ভোরের আলো-আঁধারিতে প্রোখর অনেকক্ষণ ধরে খোঁজে ওর রাইফেল আর ঘোড়া। কিন্তু কোনোটাই পায় না। নদীর একেবারে পাড়ে এসে পায়ের আরেক পাটি জুতো খুলে জলে ছুঁড়ে দেয়। তারপর মাথায় বার বার করে জল দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণাটা একটু আরাম করতে চেষ্টা করে।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়সওয়াররা নদী পার হতে শুরু করে। ডন নদী যেখানে সমকোণের মতো বাঁক ঘুরে পশ্চিমমুখো চলে গেছে ঠিক সেই জায়গাটায় কসাকরা তাদের ঘোড়াগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। জটলা করে দাঁড়িয়ে রইল ঘোড়ার দল, কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে পা দেবার কোনো উৎসাহই ওদের নেই। কসাকরা চাবুক হাঁকড়ে চেঁচিয়ে ওদের ঠেলতে থাকে। চাঁদ-কপালে একটা কুচকুচে কালো ঘোড়া সাঁতরাতে শুরু করতেই অন্য ঘোড়াগুলো তার পেছন পেছন চলল। জলের মধ্যে আছাড়ি-পিছাড়ি করে নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করতে থাকে ওরা। কসাকরা ছ'খানা বজরায় চেপে ওদের পিছু-পিছু চলে, প্রত্যেকটা বজরার গলুইয়ে একেকজন দাঁড়িয়ে আছে হাতে দড়ির ল্যাসো নিয়ে যে-কোনো জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি হয়ে।

স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার চেঁচিয়ে উঠল—ঘোড়াগুলোর সামনে যেয়ো না! স্রোতের ওপর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাও। যেন ভেসে না যায় দেখো।— বলতে বলতে হাতের চাবুকটা সে সাঁই করে নামিয়ে নিয়ে নিজের কাদা-মাখা বুটের ওপর ঠোকর মারে।

জোরালো স্রোতের টানে ঘোড়াগুলো ভেসে যেতে থাকে। কালো ঘোড়াটা অনায়াসেই অন্য ঘোড়াগুলোকে পেছনে ফেলে সবার আগে গিয়ে ওঠে নদীর বাঁ পাড়ের বালির চড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা পপ্‌লারের ঘন পাতাঢাকা ডালের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় সূর্য। কালো ঘোড়াটার গায়ে এসে পড়ে লাল আলোর ছটা—ভিজে চক্‌চকে কেশরগুলো ঝল্‌কে ওঠে উজ্জ্বল কাল্‌চে শিখার মতো।

ঘোড়াগুলো সব নিরাপদেই ওপারে গিয়ে উঠল। কসাকরা আগেই সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করছিল। ঘোড়ারা পাড়ে উঠতেই যার যার ঘোড়া বেছে নিয়ে লাগাম চড়ানো হল। এদিকে এপার থেকে নৌকোয় করে ততক্ষণে জিনগুলোকে নদী পার করা হচ্ছে।

নিজের স্কোয়াড্রনের খোঁজ খবর করে প্রোখর আবার ফিরে এল উদ্বাস্তু গাড়িগুলোর কাছে। গাছ-গাছড়া, ভাঙা বেড়া আর ঘুঁটে জেবলে আগুন করা হয়েছে, বাতাসে সব-জায়গায় তারই ঝাঁঝালো গন্ধ। মেয়েরা সকালের খাবার খেয়ে নিচ্ছে। রাতে আরো

কয়েক হাজার উদ্বাস্তু এসে জুটেছিল ডনের ডান তীরের স্তেপ-জেলাগুলো থেকে। আগুনে ঘিরে অনেক গলার গুঞ্জন। প্রোখরের কানে আসে কথাবার্তার কয়েকটা টুকরো:

—আমরা নদী পার হতে পারব কখন?

—যদি আমাদের নদী পার হওয়া না-ই থাকে কপালে তো সব ফসলের দানা ডনের জলে ফেলে দেব, তবু লালদের হাতে ছেড়ে দেব না।

—এও চোখে দেখতে হল...হা ভগবান্...

—লালদের ওপর হুকুম আছে ছ'বছরের বাচ্চা থেকে একেবারে বুড়ো অবধি সকলকে কোতল করার।...

খুব জাঁকালো করে সাজানো একটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে পাকা-চুল এক বুড়ো বক্তৃতা ঝাড়ছিল। চেহারা আর মাতব্বরী ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় কোনো গাঁয়ের আতামান মোড়ল।

—আমি তাঁকে বললাম, 'তাহলে কি লোকজন সব নদীর পাড়েই মারা পড়বে? ওপারে আমরা কখন যেতে পারব? লালরা এসে তো একেবারে কচুকাটা করবে আমাদের।' শুনে তো সেনাপতি মশায় বললেন, 'ভয় পাবেন না বুড়ো কর্তা! যতোক্ষণ না সব লোক পার হচ্ছে ততোক্ষণ আমরা ঘাঁটি আগলে থাকব। আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের স্ত্রী পুত্র বাবা মাকে কষ্ট পেতে দেব না।'

মেয়েরা আর বুড়োরা লোকটাকে ঘিরে ধরে একাগ্রভাবে শুনছিল তার কথা। দম নেবার জন্য একটু থামতেই সবাই একসঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করে দিল:

—তাহলে কামানগুলো কেন আগেই পার হয়ে গেল?

—তাছাড়া ঘোড়সওয়াররাও এসে পড়েছে।

—গ্রিগর মেলেখফ নাকি রণাঙ্গন ছেড়ে সরে পড়েছে?

—এখন তাহলে আমাদের বাঁচাবে কে? সেপাইরা আগে ভাগেই চলে গেল লোকজন সব পড়ে রইল পেছনে।

—যে যার নিজের ঘর সামলাচ্ছে এখন।

—মোড়লদের আমরা লাল সেপাইদের কাছে পাঠাব রুটি আর নুন সঙ্গে দিয়ে। হয়তো তাতে ওরা দয়া-মায়া দেখাবে, সাজা দেবে না।

রাস্তার মোড়ে একজন ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হল। জিনের ডগায় রাইফেল ঝুলছে, পাশে দুলছে একটা বর্শা।

—আরে এ যে আমার মিশ্‌কা!— আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল একটি বুড়ি। গাড়ি ঘোড়া ঠেলে, গাড়ির বোম ডিঙিয়ে বুড়ি ছুটল সওয়ারের দিকে। রেকাব চেপে ধরে ঘোড়সওয়ারকে দাঁড় করালো। ঘোড়সওয়ার মাথার ওপর একটা ছাই-রঙের মুখ-আঁটা লেপাফা উঁচু করে ধরে চেঁচিয়ে উঠল:

—প্রধান সেনাপতির জন্য একটা চিঠি আছে! পথ ছাড়ো!

—মিশ্‌কা, ওরে আমার খোকা!—

আকুল হয়ে বলে উঠল বুড়ি। জ্বলজ্বলে মুখটার ওপর ক'গাছি পাকা চুল এসে পড়েছে। ঘোড়ার গায়ের ওপর সমস্ত শরীরটা চেপে ধরে মুখে একটা কাঁপা-কাঁপা হাসি নিয়ে বুড়ি জিজ্ঞেস করল:

—আমাদের গাঁয়ের ভেতর দিয়েই এলি?

—হ্যাঁ। লালফৌজ এখন সেখানেই আছে...

—আমাদের ঘর…

—ঘর রেহাই পেয়েছে, তবে ফিওদোতেরটা পর্নড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের চালাঘরেও আগন্ন লেগেছিল, কিন্তু লালরক্ষীরা নিজেরাই তা নিভিয়ে দেয়। ফিওদোতের বউ পালিয়ে এসেছিল। বলল যে ওদের অফিসার নাকি বলেছে গরিব কসাকদের একটা ঘরেও আগন্ন দেওয়া হবে না, কিন্তু বর্জোয়াদের বাড়ি সব পোড়ানো হবে।

বর্নড়ি ক্রুশ প্রণাম করে বললে—ঈশ্বরের কী মহিমা! খ্রীষ্ট ওদের রক্ষা করন্ন!

কড়া-মেজাজী এক বর্নড়ো চটে গিয়ে কথার মাঝখানে বললেঃ

—হ্যাঁ গো মেয়ে কী বলছ তুমি? তোমার পড়শির বাড়ি পর্নড়িয়ে দিল আর তুমি বলছঃ ঈশ্বরের কী মহিমা!

বর্নড়ি চট্ করে পাল্টা জবাব দিলে—পড়শি তো আমার দ্যাখ্-দ্যাখ্ করে নতুন আরেকখানা বাড়ি তুলে ফেলবে, আমাদেরটা পোড়ালে আমরা কী করতুম? ফিওদোতরা মাটির তলায় এক ঘড়া সোনা পর্নতে রেখেছে, আর আমরা সারা জীবন খেটে মরলাম অন্যের সেবা করে।

ঘোড়সওয়ার জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে—মা গো আমায় যেতে দাও! এই লেপাফাখানা তাড়াতাড়ি পেশছে দিয়ে আসতে হবে।

বর্নড়ি ঘর্নরে একটুখানি হেঁটে চলল ঘোড়ার পাশাপাশি, তারপরেই আবার ছর্নটে এল গাড়ির কাছে। সংবাদবাহক তখন চেঁচাচ্ছেঃ

—রাস্তা ছাড়ো! প্রধান সেনাপতির একটা জরর্নরি চিঠি আছে। সরো, হাটো!

ঘোড়াটা লাফিয়ে পাশের দিকে সরে যায়, লোকজন অনিচ্ছার সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে দেয়, ঘোড়সওয়ার ঠিক নিজের রাস্তা বর্নঝে চলে। তারপর দেখতে দেখতে সে গাড়িগর্নলোর আড়ালে, ঘোড়া আর বলদগর্নলোর পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়—শর্নধর্ন নদীর দিকে এগিয়ে যাবার সময় সওয়ারের বর্শাটা বিরাট জনতার ভিড়ের ওপর মাথা জাগিয়ে দর্নলতে থাকে।

॥ তিন ॥

পরদিন সারাদিন ধরে গোটা বিদ্রোহী বাহিনী আর তাদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদেরও পার করে দেওয়া হল নদীর ওপারে। শেষ খেয়ায় পার হল গ্রিগর মেলেখফের এক নম্বর ডিভিশনের ভিয়েশেন্স্কা রেজিমেণ্ট। সন্ধ্যা অবধি গ্রিগর বাছা-বাছা বারোটা স্কোয়াড্রন নিয়ে লাল বাহিনীর চাপ ঠেকিয়ে রেখেছিল, তারপর পাঁচটা নাগাদ যখন কুদীনভের কাছ থেকে খবর পেল ফৌজ আর উদ্বাস্তুরা সবাই নদী পার হয়েছে তখন সে হর্নকুম দিল পেছর্ন হটার।

বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা অনর্নসারে ডন এলাকার গ্রাম-জেলা থেকে সংগ্রহ করা ফৌজী কোম্পানিগর্নলো যার-যার নিজের গ্রামের মর্নখোমর্নখি নদীর পাড়ে ঘাঁটি করে থাকবে। যেখানে একেকটা গ্রামের মধ্যে ফারাক বেশি হয়ে যাবে সেখানে স্তেপ-এলাকার কসাকদের দিয়ে গড়া কোম্পানিগর্নলোকে মোতায়েন করল সেনাপতিমণ্ডলী। বাদবাকি

সবাই, মজুত হিসাবে রণাঙ্গনের পেছন দিকে থাকবে। এইভাবে ডনের বাঁ পাড়ে প্রায় এক শো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রইল বিদ্রোহীদের যুদ্ধ-সারি—কাজানস্কা জেলার দূরতম গ্রামাঞ্চল থেকে খপেরের মোহানা অবধি।

দুপুর নাগাদ একেকটা কোম্পানি থেকে খবরাখবর আসতে থাকে। বেশির ভাগ খবরেই জানা যাচ্ছে তারা নিজের নিজের ঘাঁটি এর মধ্যেই দখল করে বসেছে। ঘাঁটিতে পৌঁছবামাত্র তারা তাড়াতাড়ি গড়খাই-লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে। চটপট গড়খাই খুঁড়ে, উইলো, ওক আর পপ্‌লার গাছ কেটে করাত চালিয়ে ওরা বেড়া তৈরি করছে, মেশিন-গানের ঘাঁটি বানাচ্ছে।

সন্ধ্যা নাগাদ সব জায়গায় পরিখা খোঁড়া শেষ হয়। ভিয়েশেনস্কার পেছনে এক নম্বর আর তিন নম্বর কামানশ্রেণীকে আড়াল করে রাখা হল পাইন-বনের মধ্যে। আটটা কামানের জন্য সবশুদ্ধ আছে মাত্র পাঁচটা গোলা। কার্তুজও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কুদীনভ জরুরি নির্দেশ দিয়ে দূত পাঠিয়েছিল—সমস্ত রকম রাইফেল-ছোঁড়া যেন একদম বন্ধ থাকে; প্রত্যেক কোম্পানি সবচেয়ে সেরা বন্দুকের টিপ্ দেখে একজন কি দুজনকে বেছে নেবে, তাদের যথেষ্ট পরিমাণে বুলেট সরবরাহ করবে যাতে তারা লাল-মেশিনগান-ধারীদের অথবা নদীর ডান পাড়ের গ্রামগুলোর রাস্তায় যারাই এসে দেখা দেবে তাদের তাক্ করে গুলি ছুঁড়তে পারে। লালফৌজ যদি নদী পার হতে চেষ্টা করে একমাত্র তাহলেই গুলি ছুঁড়তে পারবে অন্য কসাকরা। সে রাতে ভিয়েশেনস্কা আর তার আশপাশের মাঠ-ময়দানে আগুন বা আলো জ্বালানো নিষেধ হয়ে গেল। ডনের গোটা পাড়টা নীল্‌চে-বেগুনি কুয়াশায় ঢাকা। পরদিন খুব ভোর থাকতে ওদিককার ঢালু পাড়ে লালফৌজী টহলদাররা এসে হানা দিলে। একটু বাদেই উস্ত্-খপেরস্ক থেকে কাজানস্কা অবধি প্রত্যেকটা পাহাড়েই মাঝে মাঝে ওরা উদয় হতে লাগল, মাঝে মাঝে আড়ালে চলে যেতে থাকল। তারপর টহলদাররা একেবারে অদৃশ্য হল। সেই দুপুর অবধি একটা খাঁ-খাঁ মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা। দক্ষিণের দিকে কিন্তু তখনো আগুন-লাগা গ্রামগুলো থেকে কাল্‌চে ধূমল শিখা উঠছে থামের মতো। হাওয়ায় ছড়িয়ে-পড়া মেঘ আবার জমা হতে থাকে আকাশে। দিনের বেলায় মেঘের বুকে ফ্যাকাশে বিজলির ঝিলিক। ঝুলে-পড়া মেঘের স্তূপে কাঁপন ধরায় বাজের গুর্‌গুর্ আওয়াজ। তারপর তুমুল ধারায় নামে বৃষ্টি। ডন-পাড়ের খড়িমাটি-পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঢেউয়ের দোলার মতো সে বৃষ্টি ছুটে যায় হাওয়ার টানে—ছুটে যায় গরমে নেতিয়ে-পড়া সূর্যমুখীর খেত ডিঙিয়ে, শুকনো ফসল পার হয়ে। ধুলোমাখা কচি পাতাগুলো আবার সজীব হয়ে ওঠে বর্ষার জল পেয়ে, রসে চেকনাই হয়ে ওঠে বসন্তের মুকুল, গোল গোল সূর্যমুখী আবার তাদের কালো-হয়ে-ওঠা মাথাগুলো উঁচু করে দাঁড়ায়, বাগানে বাগানে জাগে পাকা তরমুজের মধু গন্ধ। বাষ্প ওঠে তৃষ্ণা-ভরা মাটির বুক থেকে।

ডনের ডান পাড় ধরে একেবারে সেই আজভ সাগর অবধি প্রহরীর মতো মাথা জাগিয়ে সার বেঁধে চলে গেছে যে পাহাড়ী টিলাগুলো তাদেরই চূড়ায় আবার বিকেলের দিকে হানা দিতে শুরু করল লাল টহলদারী ফৌজ। সাবধানে গাঁয়ের দিকে ঘোড়া চালিয়ে এল ওরা। ওদের পেছু-পেছু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পদাতিক ফৌজও নেমে এল। প্রহরী-টিলাগুলোর ওপর যেখান থেকে আগে পলোভ্‌ৎসিয়ান শান্ত্রীরা আর যাযাবর দলগুলো শত্রুর আসা-যাওয়া লক্ষ্য করত এখন তারই পেছনে বসানো হল লালফৌজের কামানশ্রেণীকে।

ভিয়েশেন্স্কার ওপর গোলা ছুঁড়তে শুরু করল একসার কামান। প্রথম গোলাটা ফাটলো চত্বরের ওপর। একটু বাদে গোলার বিস্ফোরণে আর শ্রাপ্নেলের দুধ-সাদা ছিপি থেকে ধূসর ধোঁয়ার ছোট-ছোট কুণ্ডলী বেরিয়ে সমস্ত জায়গাটা ভরে ফেলল। তারপর আরো তিনটে কামান থেকে তোপ দাগা হল ভিয়েশেন্স্কার ওপর, ডন-পাড়ের কসাক পরিখাগুলোর ওপর। কট্‌কট্ করে উঠল মেশিনগান। টিলাগুলোর কাছে রসদগাড়ি এগিয়ে এল। পাহাড়ের ঢালু গায়ে পরিখা খোঁড়া হল।

গোটা রণাঙ্গন জুড়ে শোনা যাচ্ছে কামানের গর্জন। খাড়া টিলাগুলোর ওপর থেকে লালফৌজী কামান সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ অবধি নদীর উল্‌টো তীরে সমানে গোলাবর্ষণ করে চলল। গোটা যুদ্ধরেখা জুড়ে বিদ্রোহীদের দখল-করা গড়খাই-খোঁড়া মাঠ-ঘাট সব নিস্তব্ধ নিঝুম। কসাকদের ঘোড়াগুলোকে গোপনে নদীর খাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। নল খাগড়া জলা ঘাসে সে সব জায়গা দুর্ভেদ্য, গরমে ওদের বিশেষ কষ্টও হবে না। উঁচু উঁচু অসিয়ার-লতা আর গুল্মের আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে থাকবে যে লালফৌজী পর্যবেক্ষকদের নজরেই পড়বে না তারা।

মাঠের ঢালাও সবুজের মধ্যে একটি প্রাণীরও দেখা মেলে না, মাঝে মাঝে শুধু উদ্বাস্তুদের খুদে খুদে মূর্তিগুলোকে ডনের পাড় থেকে দূরে ছুটে যেতে দেখা যায়; লাল মেশিনগান-চালকরা ওদের নিশানা করে দুয়েকটা গোলা ছোঁড়ে। বুলেটের ভারি শিসের আওয়াজে ভয় পেয়ে উদ্বাস্তুরা মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে। যতোক্ষণ না সন্ধ্যা নামে ততোক্ষণ ঘন ঘাসের ভেতরেই মাথা গুঁজে থাকে। তারপর দৌড়ে পালিয়ে যায় বনের দিকে, একবার পেছন ফিরে তাকায়ও না। জোর কদমে ছোটে উত্তরের দিকে—বনজঙ্গলগুলো সেখান থেকে যেন ওদের হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে অ্যাল্‌ডার আর বার্চের ঘন ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে।

দুদিন একটানা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হতে থাকে ভিয়েশেন্স্কার ওপর। শহরের লোকজন মাটির তলার ঘর ছেড়ে বেরোয় না। গোলার ঘায়ে ঝাঁঝরা হয়ে-যাওয়া রাস্তাগুলোর ওপর জীবনের লক্ষণ দেখা যায় শুধু রাতে। বিদ্রোহীদের সামরিক কর্তারা বুঝতে পারে এত সাংঘাতিক গোলাবর্ষণের মানেই হল এর পর লালফৌজ নদী পার হতে শুরু করবে। ওদের আশঙ্কা—ভিয়েশেন্স্কার উলটো তরফ থেকেই লাল বাহিনী নদী পার হয়ে আসবে শহরটা দখল করে দীর্ঘ যুদ্ধরেখার মধ্যে একটা গোঁজ ঢুকিয়ে দেবার মতলবে। তাহলে সমস্ত রণাঙ্গন দু'ভাগে ভাগ হয়ে পড়বে, তারপর পাশ থেকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেওয়া হবে বিদ্রোহীদের। কুদীনভের হুকুমে প্রচুর কার্তুজ-বেল্‌ট্ সমেত কুড়িটারও বেশি মেশিনগান বসানো হল ভিয়েশেন্স্কাতে। লালফৌজ যদি নদী পার হবার জোগাড় করে তবেই শুধু বাদবাকি গোলা ছোঁড়া চলবে এই রকম হুকুম দেওয়া হয়েছে গোলন্দাজ কমাণ্ডারদের। যতো খেয়ানৌকা আর দাঁড়ি-নৌকা সব নিয়ে আসা হল ভিয়েশেন্স্কায় উজানে খাড়ির মধ্যে। সেখানে কড়া পাহারা বসল।

বড়োকর্তাদের এই আশঙ্কার যেন কোনো যুক্তিই খুঁজে পায় না গ্রিগর মেলেখফ। সামরিক মন্ত্রণা সভায় গ্রিগর জোরের সঙ্গে নিজের মতটা জানিয়ে দিল তাদের।

—ভিয়েশেন্স্কাতে ওরা নদী পার হবে এমন সম্ভাবনা আছে বলে আপনারা মনে করেন? এই দেখুনঃ নদীর এ পাড়টা ঠিক ঢোলের ওপরকার চামড়ার মতো নেড়া, পরিষ্কার, বালিঢাকা। ডনের পাড়েও গাছগাছালির কোনো চিহ্ন নেই। এরকম একটা ফাঁকা নদীর পাড়ে মেশিনগান তো ওদের শেষ মানুষটা অবধি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

না, না, ভিয়েশেন্‌স্কা দখল করার চেষ্টা ওরা করবে না। বরং নদী যেখানে অগভীর, বালুর চড়ায় যেখানে পারঘাটা আছে কিংবা বনবাদাড় আর ছোটখাটো ঝোপঝাড় আছে সেখানেই ওরা পার হবার চেষ্টা করবে। এইরকম জায়গাগুলোয় আমাদের বিশেষ পাহারা বসানো দরকার, বিশেষ করে রাত্রে। আমাদের মজুত সেপাইদের ওসব জায়গায় মোতায়েন করতে হবে—কসাকদের সাবধান করে দিতে হবে যেন কোনো রকম আওয়াজ বা ওদের ওদের কোনোরকম গন্ধও যেন শত্রুরা টের না পেয়ে যায়।

একজন বললে—ওরা ভিয়েশেন্‌স্কা দখল করে নেবার চেষ্টা করবে না বলছ? তাহলে আমাদের ওপর এত গোলা ছুঁড়ছে কেন?

—যাও ওদেরই গিয়ে জিজ্ঞেস করো গে! —জবাব দিলে গ্রিগর—ওরা কি শুধু ভিয়েশেন্‌স্কার ওপরেই গোলা ফেলছে নাকি? কাজান্‌স্কা ইয়েরিন্‌স্কাতে কী করছে? আমাদের চেয়ে বরং ওদেরই গোলাগুলি বেশি। আমাদের হতচ্ছাড়া গোলন্দাজ ফৌজের আছে মাত্র পাঁচটা গোলা, আর সে পাঁচটারও ওক-কাঠের খোল!

কুদীনভ হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে—ঠিক জায়গায় ছেড়েছ একদম!

তিন নম্বর গোলন্দাজ ফৌজের কমাণ্ডার চটে ওঠে—এরকমভাবে সমালোচনার এখন কোনো মানে হয় না। খুব বুঝে-শুনে অবস্থাটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।..

কুদীনভ ভুরু কুঁচকে বেল্‌ট্‌ নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তারপর অভিমত দেয়—মেলেখফ তোমাদের গোলন্দাজদের নিয়ে ঠাট্টা করে কিছু অন্যায় করেনি। তোমাদের বার-বার করে বলা হয়েছিল ফাল্‌তু গোলা নষ্ট না করতে, অবস্থা ঘোরালো হলে কাজে দেবে এই জন্য। কিন্তু তা তো নয়, যা চোখে পড়ল তার ওপরেই গোলা ছুঁড়ে বসো তোমরা, এমনকি ওদের রসদগাড়ির ওপরেও। সুতরাং সমালোচনা হলে তাতে তোমাদের রাগ করার কিছু নেই। মেলেখফ যা বলেছে তোমাদের অবস্থা ঠিক তেমনিই—হাসি পাবার কথাই বটে।

গ্রিগরের যুক্তি কুদীনভের মনে ধরেছিল, তাই সে নদী পার হবার উপযোগী সমস্ত জায়গায় কড়া পাহারা বসানো আর হাতের কাছে মজুত সৈন্য রাখার প্রস্তাবে দৃঢ় সমর্থন জানাল।

* *

লালফৌজ ভিয়েশেন্‌স্কার উল্‌টো দিক থেকে নদী পার হবার চেষ্টা করবে না, বরং আরো সুবিধাজনক জায়গা বেছে নেবে বলে গ্রিগরের যে ধারণা ছিল সেটাই যেন পরদিন সত্যি হয়ে দাঁড়াল। সকাল বেলায় গ্রমকের উল্‌টো দিকে ঘাঁটি করে বসা ফৌজী কোম্পানির কমাণ্ডার খবর দিল, সারা রাত ধরে ওরা নদীর ওপারে সৈন্য চলাচলের শব্দ পেয়েছে। অসংখ্য গাড়ির ওপর চাপিয়ে তক্তা আনা হয়েছে গ্রমকে, তারপরেই নদীর ওপার থেকে কসাকদের কানে ভেসে এসেছে করাতের আওয়াজ, হাতুড়ি আর কুড়োলের শব্দ। লালফৌজ কী যেন একটা তৈরি করছিল তা বেশ বোঝা গিয়েছে। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি ওরা একটা ভেলা-পুল তৈরি করছে। দুজন বে-পরোয়া কসাক নদীর উজানে প্রায় আধ-মাইল এগিয়ে, কাপড়চোপড় খুলে, মাথায় শেওলাপানা ঢেকে নিঃশব্দে ভেসে এল স্রোতের টানে। নদীর একেবারে পাড় ঘেঁষে সাঁত্‌রে আসার সময় ওদের কানে এল, একটা মেশিন-গান ঘাঁটির কাছে দাঁড়িয়ে লাল সেপাইরা কথা বলছে। কিন্তু জলে কোনো কিছুই নেই, লালরা যে পুল বানাচ্ছে না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লালফৌজের প্রস্তুতির খবর কানে আসামাত্র গ্রিগর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে সেই জায়গাটায় ছুটে এল। রাস্তার বেশির ভাগটাই সে ঘুর-পথে এসেছিল, শুধু শেষ দু'মাইল সে খোলা মাঠের ভেতর দিয়েই যাবে ঠিক করল—একমাত্র ঝুঁকি, ওর ওপর লালফৌজ গোলা ছুঁড়তে পারে সেই সম্ভাবনাটুকু আছে। ময়দানের ওপাশে ডনপাড়ের বনবাদাড় থেকে সবুজ এক গোছা বেতস মাথা উঁচিয়ে আছে, সেই দিকটা নিশানা করে ও ঘোড়ার চাবুক তুলল। ঘোড়ার পাছার ওপর এসে পড়ল চাবুকটা, সঙ্গে সঙ্গে পেছনে কান চিতিয়ে দিয়ে পাখির মতো উড়ে চলল জানোয়ারটা বেতসগাছগুলো লক্ষ্য করে। মাঠের ভেতর একশো গজও যায়নি গ্রিগর এমন সময় নদীর ওপারে একটা মেশিনগান কট্‌কট্‌ করে উঠল। মেঠো ইঁদুরের মতো সাঁৎ সাঁৎ করে ওর পাশ কাটিয়ে ছুটল বুলেট। শয়তানগুলো আমায় দেখতে পেয়েছে তাহলে!— ভাবলে গ্রিগর মনে মনে। লাগাম আল্‌গা করে ও নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ল, ঘোড়ার বালামচিতে ঠেকল ওর গাল। গ্রিগরের মতবলটা যেন আঁচ করতে পেরেই লাল মেশিনগান-চালকটি আরো নিচে নিশানা করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। ঘোড়ার সামনের খুরের তলা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে বুলেটগুলো আর শীতের শেষের বরফ-গলা জলে ভেজা কাদামাটি ছিট্‌কে উঠছে।

গ্রিগর রেকাবে ভর দিয়ে উঠে ঘোড়ার টান-টান হয়ে থাকা ঘাড়ের সঙ্গে নিজের শরীরটা প্রায় মিলিয়ে দিয়েছিল। বেতসের সবুজ ঝোপটা ওর দিকে অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে। অর্ধেক পথ পার হয়ে আসতেই ওদিককার পাহাড় থেকে একটা ফিলড্‌-কামান গর্জন করে উঠল। বিস্ফোরণের শব্দে জিনে বসেই কেঁপে উঠল গ্রিগর। শ্রাপ্‌নেলের কাতরানি শিস্‌টা তখনো ওর কানে লেগে আছে, বাতাসের সাংঘাতিক আলোড়নে নুয়ে পড়া নলখাগড়াগুলো তখনো মাথা তোলেনি এমন সময় আবার গর্জে ওঠে কামানটা। বুক-চাপা দম-আটকানো আওয়াজটা যেন চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে তারপরেই হঠাৎ থেমে যায় এক সেকেণ্ডের একশো-ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্য। আর এই একটি লহমাতেই ওর চোখের সামনে জেগে ওঠে একটা কালো মেঘ, প্রচণ্ড আঘাতে মাটি কেঁপে ওঠে, ঘোড়ার সামনের পা-দুটো যেন শূন্যেই কোথায় গিয়ে পড়ে...।

গ্রিগর হুমড়ি খেয়ে মাটির ওপর এমন জোরে আছড়ে পড়ল যে ওর হাঁটুর কাছে পাতলুন ফেঁসে গেল, ফিতে ছিঁড়ে গেল। বিস্ফোরণের ফলে বাতাসের একটা বিপুল আলোড়ন ওকে ঘোড়া থেকে ছিট্‌কে ফেলে দিল খানিক দূরে। পড়ে যাবার পর মাটিতে গাল রেখে ঘাসের ওপরেই খানিকটা হামা দিয়ে এগিয়ে গেল ও।

প্রথমটা গ্রিগর দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, তারপর উঠে দাঁড়াল। ওপর থেকে কালো বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে ঘাসের চাপড়া আর কাদার ছিটে। গোলার গর্ত থেকে প্রায় হাত কুড়ি তফাতে শুয়ে আছে ঘোড়াটা। মাথা নিশ্চল। পেছনের পা, ঘামে-ভেজা পাছা আর লেজটা থর-থর করে কেঁপে উঠছে এককেবার।

মেশিনগানটা চুপ মেরে গিয়েছিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক কোনো সাড়াশব্দ নেই এক নলখাগড়ার বনে নীল মাছরাঙাদের ভয়-পাওয়া ডাক ছাড়া। ঘোরটা কাটিয়ে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করে গ্রিগর ঘোড়ার কাছে যায়। ওর পা কাঁপছে, ভয়ানক ভারী ভারী লাগছে। মনে হচ্ছে যেন অনেকক্ষণ এক ভাবে বেকায়দা বসে ছিল সে। ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনটা খুলে নিল ও। কাছাকাছি গোলার ঘায়ে ছিন্নভিন্ন ঝোপটার নলখাগড়ার মধ্যে ও সবে ঢুকেছে এমন সময় আবার কট্‌কট্‌ করে উঠল মেশিনগান। বুলেটের শিস্‌-কেটে ছুটে চলার আওয়াজ কিন্তু ওর কানে এল না, ওরা নিশ্চয় কোনো নতুন লক্ষ্য নিশানা

করে গোলা ছুঁড়ছে। ঘণ্টাখানেক বাদে গ্রিগর নিরাপদে এসে পৌঁছুল কোম্পানী কমাণ্ডারের আস্তানায়।

লোকটা বললে—এখন তো তোপ দাগা বন্ধ করেছে ওরা। আজ রাতে আবার শুরু করবে। আমাকে কয়েকটা কার্তুজ পাঠিয়ে দেবেন, জনা-পিছু মাত্র দুটো করে আছে।

—কার্তুজ আসবে আজ সন্ধ্যায়। ওপাড়টা নজরে রাখতে কিন্তু ভুলো না এক মুহূর্তও।

—নজর তো রেখেছি ঠিকই! ভাবছিলাম কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ডেকে আজ রাতেই তাদের সাঁতার কেটে দেখে আসতে বলব ওরা কী বানাচ্ছে।

—গেল রাতে কাউকে পাঠালে না কেন তাহলে? —জেরা করে গ্রিগর।

—দুজনকে তো পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে সাহস পেল না ওরা। নদীর একদম পাড় ঘেঁষে সাঁতরে এলো কিন্তু কাছাকাছি যেতে চাইল না। আর এখন সে রকম লোক পাবেনই বা কোথায়? বিপদ মাথায় করে যাওয়া একবার একটা ঘাঁটির মধ্যে পা দিয়েছেন কি হয়ে গেল! দেশ-গাঁয়ের এত কাছাকাছি থাকলে কসাকদের অতো বেপরোয়া ভাব থাকে না। জার্মান যুদ্ধের সময় ক্রস্‌-পদক পাবার লোভে ওরা শয়তানের মতো হন্যে হয়ে ছুটত, কিন্তু এখন শান্ত্রীর কাজে পাঠাতে গেলেও পায়ে তেল দিতে হয়। তাছাড়া মেয়েমানুষগুলোও কম জ্বালাচ্ছে না। এখানে এসে স্বামীদের দেখা পেয়ে যায়, গেল রাতটা তো গড়খাইয়ের মধ্যেই কাটিয়ে গেল সব। অথচ ওদের তাড়ানোও সোজা নয়। কাল ওদের বের করে দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কসাকরা আমায় শাসালে—ভালো চাও তো চুপ্‌টি করে শান্ত ছেলের মতো থাকো, নইলে কতো ধানে কতো চাল বুঝিয়ে দেব!

কমাণ্ডারের ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে গ্রিগর গেল গড়খাইয়ের মধ্যে। ডনের পাড় থেকে প্রায় গজ পঞ্চাশেক এঁকে বেঁকে চলে গেছে পরিখাগুলো। এ্যাকোশিয়া আর কচি পপ্‌লার গাছের ঝোপঝাড় গড়খাইয়ের হলদে ঢিবিগুলোকে শত্রুর চোখের আড়াল করে রেখেছে। সামনের সারির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য পরিখা খুঁড়ে আনা হয়েছে বেড়ার আড়াল-করা কসাকদের বিশ্রামের জায়গা অবধি। মাটির তলার আস্তানাগুলোর বাইরে শুকনো মাছের আঁশ, মাটনের হাড়গোড়, সূর্যমুখীর বিচি, তরমুজের খোসা, আর এঁটোকাঁটার স্তূপ। গাছের ডালে ঝুলছে সদ্য-ধোয়া মোজা, সুতীর পাতলুন, পায়ের পট্টি, মেয়েদের শেমিজ আর ঘাগরা। প্রথম আস্তানাটা থেকে বেরিয়ে এল একটি অল্পবয়েসী মেয়ের মাথা, উশ্‌কো-খুশ্‌কো চুল, ঘুমে ঢুলু-ঢুলু চোখ। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উদাসীনভাবে চারদিকে তাকায়, তারপর মেঠো ইঁদুরের মতো ফের ঢুকে পড়ে গড়খাইয়ের কালো গর্তের ফাঁকে।

দুনম্বর আস্তানা থেকে নিচু গলায় গানের আওয়াজ ভেসে আসছিল। পুরুষদের গলার সঙ্গে মিশে আছে একটা চাপা, সরু অথচ পরিষ্কার মেয়েলি কণ্ঠ। তিন নম্বর গর্তের মুখের কাছে ছিমছাম পোশাক-পরা একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক বসে আছে ঘুমন্ত এক কসাকের উশ্‌কোখুশ্‌কো মাথাটা কোলে নিয়ে। লোকটা এদিকে আরামে চোখ বুজে আছে আর সে চট্‌পটে হাতে লোকটার চুলে কাঠের চিরুনি চালিয়ে কালো উকুন বের করে মারছে কিংবা 'বুড়ো কর্তার' মুখের ওপর থেকে মাছি তাড়াচ্ছে। ডনের ওপারে মেশিন-গানের ক্রুদ্ধ আওয়াজ আর উজানের দিক থেকে কামানের গোলার চাপা বিস্ফোরণের শব্দটা

কানে না এলে মনে হত বুঝি-বা একদল কাঠুরে বনের মধ্যে বিশ্রাম করছে। বিদ্রোহী ফৌজের সেপাইদের ঠিক সেইরকমই শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছিল।

গেল পাঁচ বছরের যুদ্ধে গ্রিগর এমনতরো অদ্ভুত লড়াইয়ের সারি কোনোদিনও দ্যাখেনি। হাসি চাপতে না পেরে ও গড়খাই-আস্তানাগুলোর পাশ কাটিয়ে যায়, আর কেবলই দেখতে পায় মেয়েরা তাদের স্বামীদের খিদমত করছে, জামায় তালি দিচ্ছে, কাপড় ধুয়ে, রান্নাবান্না করে, বাসনকোসন মেজে দিচ্ছে।

কোম্পানি কমাণ্ডারের সঙ্গে তার আস্তানায় ফিরে এসে গ্রিগর বললে—এখানে তো দিব্যি আরামেই আছো দেখছি, কী বলো!

টিপ্‌পনি শুনে বিরক্ত হয় লোকটা। জবাব দেয়— এ নিয়ে গজ্‌গজ্‌ করার কী আছে!

—আরামটা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? গ্রিগর ভুরু কোঁচকায়—এখুনি মেয়েদের তাড়াও এখান থেকে। এটা কি তোমাদের বাড়ির উঠোন না গাঁয়ের হাট? লালফৌজ ওদিকে নদী পার হয়ে আসবে, অথচ ওদের সাড়াশব্দও পাবে না তোমরা। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলোকে ভাগাও। কাল আবার আসব আমি, আবার যদি ধারে-কাছেও ঘাগরা দেখি তো তোমার মাথাই আগে নেব।

লোকটা সাগ্রহে সায় দিলে—আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি নিজেও মেয়েদের এখানে আসাটা পছন্দ করি না, কিন্তু কসাকদের নিয়ে কী করা যায় বলুন তো? শৃঙ্খলা-টিঙখলা তো চুলোয় গেছে। মেয়েরাও তাদের স্বামীদের দেখতে চায়। আজ তিন মাস হল লড়াই চালাচ্ছি...!—বলতে বলতে হঠাৎ লাল হয়ে লোকটা ঘাসের বিছানার ওপর বসে পড়ল মেয়েলি আঙরাখাটা ঢাকবার জন্য, গ্রিগরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আড় চোখে তাকাতে লাগলো আস্তানার একটা কোণার দিকে যেখানে চটের পর্দায় ওপাশ থেকে ওর বউয়ের হাসিভরা কালো চোখজোড়া উঁকি দিচ্ছিল।

॥ চার ॥

ভিয়েশেন্‌স্কায় এসে আক্‌সিনিয়া উঠল শহরতলিতে ওরই এক পিসির বাড়ি—নতুন গির্জাবাড়িটার কাছেই। প্রথম দিনটা ও গ্রিগরের খোঁজে ঘুরে ঘুরে কাটাল। কিন্তু ভিয়েশেন্‌স্কায় গ্রিগর আসেনি। পরদিন সারাদিন ধরে রাস্তায় বুলেটের শিস্‌ আর গোলা ফাটার আওয়াজ। বাড়ি ছেড়ে বেরুবার মতো সাহস জোগাল না আকসিনিয়ার।

বড়ো ঘরে একটা সিন্দুকের ওপর শুয়ে ও মনে মনে ভাবছিল আর রাগে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল—বলল ভিয়েশেন্‌স্কায় আসবার জন্য। এখানে দুজনে মিলব বলে কথাও দিল, অথচ এখন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ভগবান্‌ জানেন!—জানলার কাছে বসে ওর বুড়ি পিসিমা একটা মোজা বুনছে আর একেকবার গুলির আওয়াজ হতেই ক্রুশ প্রণাম করছে।

—উঃ ভগবান্! এ কী সাংঘাতিক ব্যাপার! কেন লড়ছে ওরা বলো তো, কেন এই খেয়োখেয়ি?—বিড়বিড় করে বলতে বলতেই জানলার কাঁচটা ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়ল ঘরের মেঝেয়।

আকসিনিয়া বললে—ও পিসিমা, জানলা থেকে সরে এসো। হঠাৎ গুলি লেগে যাবে। —বুড়ি চশমার তলা দিয়ে বেয়াড়া ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল আকসিনিয়ার দিকে। বিরক্তির সুরে বললে :

—আকসিনিয়া, তুই একটা গাধা। আমি কি ওদের শত্তুর নাকি? আমাকে কেন গুলি করবে?

—হঠাৎ তো লেগে যেতে পারে? কোথায় বুলেট যাচ্ছে সে তো ওরা দেখতে পাচ্ছে না।

—ও, তাহলে ওরা আমায় মারবে! কোথায় গুলি চালাচ্ছে তা ওদের দেখতে হবে না বুঝি? ওরা কসাকদের মারছে, কসাকরা ওদের দুশমন। আমি তো বুড়ি বিধবা, আমায় কী জন্য মারতে যাবে? কোথায় রাইফেল কামান তাক করতে হবে তা ওরা নিশ্চয়ই জানে।

সেদিন দুপুরে গ্রিগর ঘোড়ার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে রাস্তা দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছিল। জানলা থেকেই ওকে দেখতে পেয়েছিল আকসিনিয়া। সিঁড়ি দরজায় ছুটে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল 'গ্রিশ্‌কা!' বলে। কিন্তু গ্রিগর ততোক্ষণে রাস্তার মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পেছনে শুধু ওর ঘোড়ার পায়ের ধুলো আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসছে। এখন আর ওর পেছনে ছুটে লাভ নেই। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রাগে কাঁদতে থাকে আকসিনিয়া।

ওর পিসি বললে—ঘোড়া চালিয়ে গেল ও তো স্তেপান নয়। অমন পাগলের মতো ছুটে গেলি কেন তাহলে?

—আমাদের গাঁয়ের একজন লোক।—কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেয় আকসিনিয়া।

—তবে কাঁদছিস্ কেন রে?—খুঁতখুঁতে বুড়িটা ওকে জেরা করে।

—তা জেনে তোমার কি হবে? ও তোমার ব্যাপার নয়।

—ও, তাই বুঝি। আমার ব্যাপার নয়! তাহলে তোরই কোনো নাগর-টাগর গেল বুঝি ঘোড়া দাবড়িয়ে? শুধু-শুধু তো আর অমন চোখের জল ফেলবি না। এত বয়েস হল, আর কিছুই শিখিনি এ্যাদ্দিনে বলতে চাস?

সন্ধ্যের দিকে প্রোখর জাইকভ এল ঘরে। আকসিনিয়া তখন বড়ো কামরাটায় ছিল, প্রোখরের গলার আওয়াজ পেয়ে সে দৌড়ে এসে খুশিভরা গলায় 'প্রোখর!' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

প্রোখর ফোঁড়ন কাটলে—উঃ, তোমাকে খুঁজতে আমার কী নাকালটাই হতে হয়েছে। পা দুটো একেবারে খয়ে গেল। গ্রিগর তো ওদিকে পাগল হবার জোগাড়! সব জায়গায় গুলি চলছে, লোকজন জ্যান্ত গোরে যাচ্ছে, আর ও খালি বলছে : নিয়ে এসো তাকে, নইলে তোমাকেও মাটিতে পুঁতব।

প্রোখরের জামার হাতা ধরে সিঁড়ি দরজার কাছে টেনে আনে আকসিনিয়া। জিজ্ঞেস করে—কোথায় সেই হতচ্ছাড়া মানুষটা?

—হুম্! কোথায় সে নেই? লড়াইয়ের সারি থেকে পায়ে হেঁটে এসেছিল। ওর ঘোড়াটা মারা পড়েছিল, তাই। শেকল-বাঁধা কুকুরের মতো খিট্‌খিটে মেজাজ হয়ে উঠল।

খালি জিজ্ঞেস করে—ওকে পেয়েছ? আমি জবাব দি—কোথায় পাব তাকে? পয়দা তো করতে পারব না। সে বলে—একটা মেয়ে জলজ্যান্ত গায়েব হয়ে যাবে তা তো হয় না।— আমার ওপর কী তম্বি! মানুষ তো নয়, যেন নেকড়ে বাঘ। যাক্, এবার চলো তাহলে।

এক মিনিটের মধ্যে আর্কাসিনিয়া ওর ছোট্ট পুলিন্দাটা বেঁধে পিসির কাছে চট্‌পট্ বিদায় নিতে আসে।

বুড়ি জিজ্ঞেস করে—স্তেপান ডেকে পাঠিয়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ পিসিমা।

—ও, বেশ তো ওকে আমার স্নেহ জানাস্ আর বলিস্ যেন এসে দেখা-টেখা করে।

বিদায় দেবার সময় পিসিমা কী বলল সে সব কানেও না তুলে ছুটে বেরিয়ে আসে আর্কাসিনিয়া। রাস্তা দিয়ে এত তাড়াতাড়ি ছোটে যে হাঁপাতে থাকে, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। শেষকালে প্রোখরও ওকে একটু আস্তে হাঁটার জন্য অনুরোধ করে।

—আরে শোনো, শোনো! যখন জোয়ান ছিলাম আমি নিজেও কতো মেয়ের পেছনে ছুটেছি, কিন্তু তোমার মতো এমন হুড়মুড় করিনি কখনো। একটু সবুরও কি করতে পারো না? আগুন লেগেছে নাকি?

এক বাড়ির রান্নাঘরে আঁট করে বন্ধ জানলার খড়খড়ির আড়ালে একটা তেলের পিদিম জ্বলছিল অনেক ধোঁয়া ছড়িয়ে। টেবিলের কাছে বসে গ্রিগর। সবে রাইফেলটা সাফ করে পিস্তলের নলচেটা ঘষতে শুরু করেছে এমন সময় দরজায় ক্যাঁচ করে শব্দ হল— চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আর্কাসিনিয়া। ওর ফ্যাকাশে সরু কপালটা ঘামে ভেজা, বড়ো বড়ো রাগভরা চোখদুটো এমন উদ্দাম আবেগে জ্বলছে যে ওকে দেখামাত্র খুশিতে বুকের ভেতরটা নেচে উঠল গ্রিগরের।

ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে আর্কাসিনিয়া বললে—তুমি আমায় বললে এখানে আসতে .. আর নিজেই হাওয়া হয়ে গেলে!—ঠিক এই মুহূর্তে ওর কাছে একমাত্র গ্রিগর ছাড়া কারো অস্তিত্বই নেই—ঠিক যেমন ছিল না বহুদিন আগেও ওদের প্রথম প্রেমাবেগের দিনটিতে। এবারও গ্রিগর না থাকার ফলে সারা পৃথিবীটাই যেন মরে গিয়েছিল, আর ও কাছে আসতেই ফের বেঁচে উঠল তা। প্রোখরকে গ্রাহ্য না করেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রিগরের বুকে, একটা তীব্র বন্য আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওর খস্‌খসে গালে চুমু খেতে লাগল, ওর নাকে, ভুরুতে, চোখে, ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিস্‌ফিস্ করে এলোমেলা কী বলতে লাগল আর কাঁদতে লাগল, ফোঁপাতে লাগল ঃ

—তোমার জন্য আমি যে এদিকে শেষ হয়ে গেলাম...আমি বড়ো কাহিল হয়ে পড়েছি, গ্রিশ্‌কা সোনা আমার, আমার বুকের রক্ত, আমার প্রাণ!

—হ্যাঁ, এবার...এখন তো দেখছ...কিন্তু একটু সবুর আর্কাসিনিয়া, থামো!—অপ্রতিভ হয়ে বিড়বিড় করে বলে গ্রিগর, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রোখরের চোখ এড়াতে চায়। আর্কাসিনিয়াকে বেঞ্চির ওপর বসিয়ে ওর মাথার শালটা সরিয়ে অগোছালো চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

—তুমি একেবারে...।—কী বলতে গিয়েছিল গ্রিগর।

—হ্যাঁ, আমি জানি কী বলবে। কিন্তু তুমি...

—না গো, তুমিই...তোমার একেবারে প্রেমের রোগ ধরে গেছে!

গ্রিগরের কাঁধটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে আর্ক্‌সিনিয়া। কান্নার সঙ্গেই মিশিয়ে দেয় হাসি, তাড়াতাড়ি ফিস্‌ফিস্ করে বলেঃ

—বাঃ বললেই হল! তুমিই তো ডেকেছিলে। পায়ে হেঁটে এলাম সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে, আর এসে দেখি তুমি নেই। ঘোড়া চালিয়ে ছুটে গেলে, দৌড়ে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে ডাকলাম কিন্তু ততোক্ষণে তুমি পগার পার। ওরা তো তোমাকে মেরেও ফেলতে পারত, তা হলে আর তোমার শেষ দেখাটাও পেতাম না।

মিষ্টি মোলায়েম মেয়েলি ঢঙে ফিসফিস্ করে কথাগুলো বলছিল আকসিনিয়া, আর সারাক্ষণ কেবলি বোকার মতো গ্রেগরের গোল কাঁধে হাত বুলিযে দিচ্ছিল। কোমল চোখদুটো মেলে সে একভাবে চেয়ে রয়েছে গ্রিগরের চোখের দিকে। ওর তাকানোর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা করুণ, খিন্ন, অথচ সাংঘাতিক কাঠিন্য ভরা শরাহত পশুর চোখের মতো। এমন বেদনাময় আর অস্বস্তিকর সে দৃষ্টি যে গ্রিগর তাকাতে পারে না। চোখের পাতা নামিয়ে ও জোর করে হাসে। চুপ করে থাকে। আকসিনিয়ার গালদুটো যেন ক্রমেই আরো বেশি করে লাল হয়ে ওঠে আর একটা ধোঁয়াটে নীল কুয়াশায় ঢাকা পড়ে ওর চোখের তারা।

বিদায় না জানিয়েই বেরিয়ে আসে প্রোখর। সিঁড়ির কাছে থুতু ফেলে পা দিয়ে আবার সেটা ঘষে মাড়িয়ে দেয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ও স্থির ধারণা করে ফেলে—এসব স্রেফ মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়!—পেছনের ফটকটা সে যেন ইচ্ছে করেই একটু জোরে ভেজিয়ে দেয়।

* *

দুটো দিন যেন স্বপ্নের মতো কেটে গেল ওদের। দিন আর রাত একাকার, চারদিকের সবকিছু ওরা ভুলেই গিয়েছিল। মাঝে মাঝে একেকবার জড়তা-ভরা সংক্ষিপ্ত একটু ঘুম দিয়ে গ্রিগর জেগে উঠেছে, দেখেছে আবছা আলোয় আকসিনিয়া ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—যেন ওর সমস্ত চেহারাটা খুঁটিয়ে মুখস্ত করে নিচ্ছে। আকসিনিয়া যেমনটি থাকে তেমনিই কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে হাতের তেলোয় গাল রেখে ওর দিকে চেয়েছিল নিষ্পলক চোখে।

গ্রিগর জিজ্ঞেস করলে— কী দেখছ অমন চেয়ে চেয়ে?

—তোমায় প্রাণ ভরে দেখে নিতে চাই। ওরা তোমাকে মারবে, আমার মন যেন তাই বলছে।

বেশ, মন যদি তাই বলে তো চেয়ে থাকো!—হাসলে গ্রিগর।

তিনদিনের দিন গ্রিগর বাইরে বেরুল, আকসিনিয়ার আসার পর এই প্রথম সে বেরুচ্ছে। কুদীনভ এদিকে দূতের পর দূত পাঠিয়েছে একটা বৈঠকের জন্য ওকে সেনানী দপ্তরে আসার অনুরোধ জানিয়ে। কিন্তু গ্রিগর তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে এই বলে যে ওকে বাদ দিয়েই বৈঠক চলতে পারে। প্রোখর ওর জন্য বড়োকর্তাদের কাছ থেকে একটা নতুন ঘোড়া জোগাড় করে এনেছিল, রাতে ঘোড়া চালিয়ে গড়খাইয়ে গিয়ে ওর জিনসাজগুলোও ফিরিয়ে এনেছিল। গ্রিগরকে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হতে দেখে আকসিনিয়া ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেঃ

—কোথায় চললে?

—তাতারস্কে গিয়ে একবার দেখে আসতে চাই আমাদের লোকরা কী ভাবে গ্রাম বাঁচাচ্ছে; বাড়ির সবাই গেল কোথায় তাও দেখে আসব।—জবাব দিলে গ্রিগর।

—ছেলেপুলেদের জন্য মন কাঁদছে বুঝি?—একটু কেঁপে উঠে লালচে কাঁধের ওপর শালটা একটু ভালো করে জড়িয়ে নিল আকসিনিয়া।

—হ্যাঁ।

—গ্রিগর, তুমি যেও না। যাবে না তো?—আকসিনিয়া অনুরোধ জানায়, চোখদুটো ওর চক্‌চক্‌ করছে—তোমার পরিবার কি আমার চেয়েও প্রিয় হলো তোমার কাছে? তাই নাকি? তোমার মন বড়ো এদিক ওদিক করছে। তুমি কি ভাবো নাতালিয়ার সঙ্গে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকব? ওভাবেই কি তুমি আমাকে পাবে ভেবেছ? বেশ, তাহলে যাও! কিন্তু আমার কাছে আর মুখ দেখাতে এসো না! তোমাকে আমি ফিরিয়ে নেব না আর! এভাবে আমাকে নিয়ে খেলবে সে আমি চাই না। চাই না আমি!

নীরবে বাড়ির উঠোনে এসে গ্রিগর ঘোড়ায় চাপে। সন্ধ্যা না লাগতেই গাঁয়ের মাঠ-জমিতে এসে পেঁছোয়। রাস্তাটা চলে গেছে 'কন্যা কুমারী বনের' ভেতর দিয়ে—সেখানে প্রতি বছর সন্ত পিটার দিবসে বনের মাঠ-জমি ভাগ বাঁটরা করে দেবার পর কসাকরা ভদ্‌কা খায়। আলেক্সি-বাদাড়টা বনের ঘেসো জমির মধ্যে একটা অন্তরীপের মতো ঢুকে গেছে। অনেক বছর আগে নেকড়ের দল এই বাদাড়টায় আলেক্সি নামে এক তাতারস্ক-বাসী কসাকের একটা গরু মেরেছিল। আলেক্সি মারা গেছে অনেককাল হল, কবরের পাথরে খোদাই নামের মতো ওর স্মৃতিও মুছে গেছে, পড়শি আর আত্মীয়রা ওর পদবীটা অবধি ভুলে গেছে, কিন্তু ওর নামে সেই বাদাড়টা আজো অবধি দাঁড়িয়ে আছে আকাশের গায়ে ঘন-সবুজ ওক আর এল্‌ম্‌ গাছের ডগা উঁচিয়ে। তাতারস্ক কসাকরা এখানে এসে প্রায়ই গাছ কাটে ঘরের খুঁটি বেড়া বানাবার জন্য। কিন্তু প্রত্যেক বছরই শীতের শেষে পুরনো গাছের কাটা গুঁড়িগুলোর আশেপাশে নতুন নতুন তাজা চারা গজিয়ে ওঠে, দু' একবছর চোখের আড়ালে বেড়ে উঠে শেষে আবার আলেক্সি বাদাড় তার সবুজ ডালপালা ছড়াতে থাকে। শরৎকালে বরফ-ঢাকা ওক পাতার সোনালি টোপরে সেজে ওঠে আবার।

গেল-বছরে রাস্তার ওপর নতুন গাছ গজিয়েছে, সেই পথ ধরে ডালপালার ঠান্ডা ছায়ায় ছায়ায় গ্রিগর ঘোড়া চালিয়ে যেতে থাকে। কন্যা কুমারী বনের ভেতর দিয়ে একেবারে কালো পাহাড়ে গিয়ে ওঠে। মনে যেন স্মৃতির নেশা লেগেছে। ছেলেবেলায় তিনটে পপ্‌লার গাছের কাছাকাছি গিয়ে প্রায়ই ও বুনো হাঁসের ছানা ধরত; সকাল থেকে সন্ধ্যে গোল দিঘিটার পাশে বসে মাছ ধরত। খানিক দূরেই ছিল একটা পুরনো ক্র্যান্‌বেরি ঝোপ, একলাটি দাঁড়িয়ে। মেলেখভ-বাড়ির উঠোন থেকেই সেটা নজরে পড়ত, আর প্রত্যেক শরতে বাড়ির সিঁড়ি-দরজায় দাঁড়িয়ে গ্রিগর সেই ঝোপটা দেখে বড়ো আনন্দ পেত। দূর থেকে দেখলে মনে হত যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে লাল আগুন! গ্রিগরের দাদা পিয়োত্রা বড়ো ভালোবাসত তেতো ক্র্যান্‌বেরির চাট্‌নি।

বুকের ভেতর একটা বিমর্ষ বেদনা নিয়ে গ্রিগর তার কতোকালের চেনা এই জায়গা-গুলো দ্যাখে। ঘোড়াটা হেঁটে হেঁটে চলেছে, মাঝে মাঝে লেজ নেড়ে অলসভাবে ডাঁশ মাছি আর মশা তাড়াচ্ছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘাস নুয়ে পড়ে, আলোর ফুট্‌কি-তোলা ছায়া ঢেউ খেলে যায় বনের ফাঁকে ফাঁকে ঘেসো মাঠের ওপর দিয়ে।

তাতারস্ক্‌ পদাতিক কোম্পানি যেখানে পরিখা দখল করে বসেছিল সেখানে গিয়ে গ্রিগর বাপের খোঁজে লোক পাঠাল। ক্রিস্তোনিয়ার কাছে খবর পেয়ে বুড়ো পান্তালিমন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসে।

এই যে চীফ, নমস্কার!—গ্রিগরকে দেখতে পেয়ে বলে বুড়ো।

—এই যে বাবা!

—আমাদের দেখতে এলে নাকি?

—আসতে হল। তা, আমাদের কি? আর নাতালিয়া কোথায়?

পান্তালিমন হাত নেড়ে ভুরু কোঁচকায়। ঘন-বাদামি গালের ওপর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

গ্রিগর উদ্বিগ্ন আর তীক্ষ্ন গলায় জিজ্ঞেস করে— কেন, কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

—ওরা নদী পার হতে পারেনি...

—কেন নয়?

—নাতালিয়া এ দু'দিন বিছানায় পড়েছিল। মনে হচ্ছে টাইফাস। আর বাড়িও ওকে ছেড়ে আসবে না। তবে তুই ভয় পাস্‌নি রে খোকা। ওরা ঠিকই আছে।

—আর বাচ্চাকাচ্চারা? মিশা? পলিয়া?

—ওরাও ওখানেই আছে। কিন্তু দুনিয়া চলে এসেছে এপারে। ওখানে থাকতে সাহস পায়নি।...একা মেয়ে, বুঝিস্‌ই তো। এইমাত্র আনিকুশ্‌কার বউয়ের সঙ্গে বেরিয়েছে। আমি তো এর মধ্যে দু'বার বাড়ি ঘুরে এলাম। রাতে চুপিচুপি নৌকোয় চেপে নদী পার হয়ে গিয়েছি, ওদের দেখে এসেছি। নাতালিয়ার অবস্থা খুব খারাপ, এত জ্বর ছিল গায়ে যে ঠোঁটে রক্ত জমে গেছে।

গ্রিগর খেপে ওঠে—ওকে এপারে নিয়ে এলে না কেন?

বুড়ো বিরক্ত হয়। জবাব দিতে গিয়ে ওর কাঁপা গলায় ক্ষোভ আর তিরস্কারের সুর ফুটে ওঠে ঃ

—আর তুমি তখন কী করছিলে? তুমি এসে ওদের দেখতে পারলে না?

—আমার হাতে একটা ডিভিশনের ভার। ডিভিশনটা যাতে নদী পার হয়ে আসতে পারে তাই দেখতে হচ্ছিল—গরম হয়ে জবাব দেয় গ্রিগর।

—ভিয়েশেন্‌স্কায় তোর কীর্তিকলাপের কথা সব শুনেছি। তোর পরিবারটাকে ফেলে গেলি, কোনো চিন্তাও করলি না। বুঝলি গ্রিগর, নিজের লোকের কথা যদি মনে নাও থাকে, তবু ঈশ্বরকে ভুলিস্‌নি। আমি তো নদী এখানে পার হইনি, হলে কি আর ওদের আনতাম না ভাবিস? আমার পল্টন ছিল ইয়েলান্‌স্কায়, যতোক্ষণে আমরা এখানে এসে পৌঁছোলাম ততোক্ষণে লালফৌজ তাতারস্কে ঢুকে পড়েছে।

—ভিয়েশেন্‌স্কায় আমি কী করছিলাম সে তোমার দেখার কথা নয়! আর তুমি জানো...।—গ্রিগরের গলার আওয়াজটা ঘড়ঘড়ে, চাপা গোছের।

বুড়ো ভয় পেয়ে বললে—আমি কিছু ভেবে বলিনি।—একটু দূরে কসাকরা জটলা করছিল। তাদের দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে বললে—কিন্তু একটু আস্তে কথা বলিস্‌, ওরা ওখান থেকে শুনতে পাবে।—গলার স্বর নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—তুই তো কচি খোকাটি নোস্‌, তোর তো আরো ভালো করে বোঝা উচিত। কিন্তু পরিবারের কথা ভেবে তুই মন খারাপ করিসনি। ঈশ্বরের কৃপায় নাতালিয়া আবার ভালো হবে। তা ছাড়া লাল-ফৌজ তো ওদের সঙ্গে কোনো ঝামেলা করছে না। আমাদের একটা বাছুর মেরেছে, ব্যস, সে তো তেমন কিছুই নয়। দয়া-মায়া দেখাচ্ছে, আমাদের লোকদের কোনো ক্ষতি করবে না। অনেক ফসল কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু লোকসান না করে যুদ্ধ হয় কখনো?

—হয়তো এখন ওদের পার করে আনা যাবে, কী বলো?

—আমার তা মনে হয় না। আর নাতালিয়া রুগী মানুষ, তাকে নিয়ে যাবোই বা কোথায়? কাজটা খুব ভালো হবে না। ওরা বরং ওখানেই ভালো আছে। বাড়িই সবকিছু

দেখাশোনা করছে, আগে আমি যতোটা দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম এখন আর ততোটা নয়। তবে গাঁয়ে আগুন লাগানো হয়েছিল।

—কে লাগালো?

—চৌরাস্তায় আগুন লেগে বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের বাড়ি সব পুড়ে গেছে। কর-শুনভের বাড়ি তো পুড়ে ছাই। লুকিনিচ্‌না পালিয়েছে, কিন্তু বুড়ো গ্রিশাকা রয়ে গেছে খামারটা দেখা শোনা করবে বলে। তোর মা বলল, বুড়ো নাকি তাকে বলেছে ঃ 'আমি বাড়ির উঠোন ছেড়ে নড়ব না, খৃীস্টের দুশমনরা আমার কাছেও ঘেঁষবে না। ওরা ক্রুশচিহ্ন দেখলে ভয় পায়।' তুই তো জানিসই ইদানিং বুড়োর একটু ভিমরতি ধরেছিল। কিন্তু লালফৌজ তার ক্রুশের জন্য ভয় পায়নি। বাড়িটা আর খামার-ঘরগুলো সব পুড়ে শেষ হয়েছে, গ্রিশাকার যে কী হল তা কেউ জানে না। কিন্তু মরার সময়ও তো হয়েছিল বুড়োর। কুড়ি বছর আগে ছেলের হাতে খামার তুলে দিয়েছিল, আর আজ এই কুড়ি বছর বাদেও সে বেঁচে। তোমার বন্ধুটিই তো গাঁয়ে আগুন দিয়ে বেড়াচ্ছে, শাপ লাগুক্ তার!

—কার কথা বলছ?

—মিশ্‌কা কশেভয়। বেটা নরকে পচে মরুক!

—হতেই পারে না!

—সেই আসলে সব করেছে। একেবারে সত্যি কথা! আমাদের বাড়িতে এসে তোর খোঁজ করেছিল। তোর মাকে বলেছে লালফৌজ যখন এপারে আসবে গ্রিগরকেই প্রথম ফাঁসিতে ঝোলাবে। বলেছে—'সবচেয়ে উঁচু ওক গাছে ঝোলানো হবে ওকে। গ্রিগরকে কেটে আমি তলোয়ার নোংরা করব না।' আমার কথাও জিজ্ঞেস করেছিল। বলেছে—'বুড়ো পান্তালিমনকে বাগে পেলে তাকে একবারে তো সাবাড় করব না, চাবুক চালাতে থাকব যতোক্ষণ না কাটা জখমের ফাঁক দিয়ে ওর প্রাণটা বেরিয়ে আসে।' এই রকম শয়তান হয়ে উঠেছে সে ছোকরা! গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে ব্যবসাদার আর পুরুতদের বাড়িতে আগুন দিচ্ছে। বলছে ঃ 'ইভান আলেক্সিয়েভিচ আর স্তকমানকে খুন করার শোধ তুলব গোটা ভিয়েশেন্‌স্কা জেলা জ্বালিয়ে দিয়ে।'

আরো আধঘণ্টা বাপের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলল গ্রিগর, তারপর গেল ঘোড়ার কাছে। আকসিনিয়ার কথা বুড়ো আর বেশিকিছু বলল না বটে, তবু গ্রিগরের মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল। ভাবল—বাবা যখন শুনেছে তখন সকলেরই কানে গেছে ব্যাপারটা। কে বলল ওদের? প্রোখর ছাড়া কে বলতে পারে? ওই তো আমাদের দেখেছে। স্তেপান নিশ্চয়ই জানে না?—লজ্জায় আর নিজের ওপর চটে গিয়ে দাঁত ঘষে ও।

ক্রিস্তোনিয়া আর গাঁয়ের অন্য পড়শিদের তামাক দেয় গ্রিগর, মিনিট কয়েক কথাবার্তা বলে ওদের সঙ্গে। তারপর যেই ঘোড়ায় চাপতে গেছে এমন সময় দ্যাখে স্তেপান আস্তাখভ আসছে। ধীরে সুস্থে হেঁটে আসে স্তেপান। সম্ভাষণের জবাব দেয় বটে তবে হাত বাড়ায় না ওর দিকে।

উদ্বেগ আর কৌতূহল নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে গ্রিগর। ভাবে—জানে না তো সব? কিন্তু স্তেপানের সুন্দর মুখখানায় কোনো উৎকণ্ঠার ছাপ নেই, বরং প্রফুল্লই খানিকটা। গ্রিগর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

॥ পাঁচ ॥

পরের দু'দিন গ্রিগর এক নম্বর ডিভিশনের যুদ্ধসারি তদারক করে কাটায়। ফিরে এসে শোনে সেনাপতিমণ্ডলীর দপ্তর ভিয়েশেনস্কা থেকে একটু দূরে চর্নি গাঁয়ে বদলি হয়ে গেছে। ঘোড়াটাকে একটু জিরোতে দিয়ে ও ফের রওনা হল গাঁয়ের দিকে।

কুদীনভ ওর দিকে তাকিয়ে বেশ জাঁক করে একটু মুচকি হেসে খুশি ভরা গলায় বললে—এই যে গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ, কী দেখে এলে? খবর বলো সব।

গ্রিগর জবাব দিলে— দেখলাম কসাকদের আর লালদের নদী পার হতে।

—তা হলে তো অনেক দেখেছ! আমাদের তিনটে এরোপ্লেন এসেছে কার্তুজ আর চিঠিপত্র নিয়ে।

—আর তোমার বন্ধু জেনারেল সিদোরিন কী লিখলেন?

—মানে আমার খুড়তুতো ভাইয়ের কথা বলছ! একই রকম ঠাট্টার সুরে বলে কুদীনভ —সে তো আমাদের প্রাণপণে লেগে থাকতে বলছে যাতে লালফৌজ না পার হতে পারে। তা ছাড়া লিখেছে—ডন ফৌজ এবার একটা চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করবার জন্য তৈরি।

—লেখেন তো বেশ ভালো-ভালো কথাই!—বিদ্রূপ করে বলে গ্রিগর।

হঠাৎ কুদীনভ গম্ভীর হয়ে যায়।—ওরা এবার লালফৌজের সারি ভেঙে বেরিয়ে আসবে। শুধু তোমাকেই বলছি, দারুণ গোপনীয়। এক হপ্তার মধ্যেই ওরা লালফৌজী যুদ্ধ সারিতে ভাঙন ধরাবে। আমাদের ঘাঁটি আগলে থাকতেই হবে এখন।

—আগলে তো আছিই!

—লালফৌজ গ্রমকে নদী পার হবার জন্য তৈরি হচ্ছে। ওখানে ওরা এখনো গোলাগুলি চালাচ্ছে। কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে বলো তো? ভিয়েশেনস্কায় গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকেনি তো? পরশুদিন সারা তল্লাট তোমাকে খুঁজে বেড়ালাম। একজন ফিরে এসে খবর দিলে তুমি নাকি তোমার আস্তানায় নেই, একটি সুন্দরী মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসে বলেছে তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছ। আমি তো অবাক হয়ে ভাবলাম, তুমি বুঝি একটা মেয়েকে নিয়ে আনন্দ করছ আর আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ।

গ্রিগর ভুরু কোঁচকায়। কুদীনভের সামান্য তামাশাটুকু ওর ভালো লাগে না। জবাব দেয়—মিছে কথায় অতো কান না দিয়ে এমন খবর-বাহক জোগাড় করে নাও যার জিভ আরেকটু খাটো! বেশি লম্বা জিভওলা লোক যদি পাঠাও তো তলোয়ার দিয়ে সে জিভ আমি খাটো করে দেব।

কুদীনভ সশব্দে হেসে উঠে গ্রিগরের পিঠ চাপড়ায়। বলে—একটা ঠাট্টাও সহ্য করতে পারো না? কিন্তু আমার অনেক দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে। দুটো ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনকে আমরা নদীর ওপারে পাঠাতে চাইছি কাজানস্কার এ পাশ

থেকে লালফৌজের ওপর হামলা চালাবার জন্য। হয়তো বা ওরা গ্রমকেও নদীর পার হয়ে ওদের ভয় পাইয়ে দিতে পারে। তোমার কি মনে হয়?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গ্রিগর জবাব দেয় :

—বুদ্ধিটা মন্দ নয়।

—স্কোয়াড্রন দুটোকে তুমিই নিয়ে যাবে তো?

—আমাকে আবার কেন?

—কাজটার জন্য চাই একজন জঙ্গী কমাণ্ডার, এই আর কি। বুকের পাটা আছে এমন লোকই চাই, তামাশার ব্যাপার তো নয়। নদী পার হবার সময় এমন গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে যে কেউ হয়তো আস্ত ফিরবে না।

কুদীনভের কথায় বেশ একটু স্ফীত হয়ে গ্রিগর আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করেই ফৌজের ভার হাতে নিতে রাজি হল। জবাব দিলে—নিশ্চয় যাব।

কুদীনভ উৎসাহভরে টুল ছেড়ে উঠে ঘরের কাঠের পাটাতনের ওপর ক্যাঁচকোঁচ করে পায়চারি করতে করতে বললে—ঠিক এই লাইনের কথাই এতদিন মনে মনে ভেবেছি। শত্রুর পেছনের দিকে যাবার দরকার হবে না ফৌজের। শুধু ডনের পাড় ধরে গিয়ে দু'তিনটে গ্রামে ওদের বেশ একটু নাকানি-চোবানি খাওয়াতে হবে, তারপর কিছু কার্তুজ আর গোলা দখল করে কয়েকজন বন্দীকে ধরে নিয়ে সেই এক রাস্তায় ফিরে এলেই চলবে। সবই করতে হবে রাতে, যাতে ভোরবেলায় পারঘাটায় ফিরে আসা যায়। তোমার কি মনে হয়, তাই না? এখন ভেবে দ্যাখো একটু, তারপর কাল যে সব কসাকদের নিতে চাও বেছে নিয়ে রওনা হয়ে যেও। তুমি ছাড়া একাজ করতে পারবে এমন কেউ নেই—এ বিষয়ে আমরা একমত। যদি সফল হতে পারো ডনফৌজের তা চিরকাল মনে থাকবে। বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র আমি খোদ জেনারেল সিদোরিনের কাছে রিপোর্ট লিখে পাঠাব। তোমার সমস্ত কাজের ফিরিস্তি দেব, যাতে ফৌজে তোমার পদের উন্নতি হয়...। --বলতে বলতে যখন কুদীনভের নজরে পড়ে গ্রিগরের মুখটা এতক্ষণ বেশ শান্ত থেকে হঠাৎ রাগে কালো হয়ে বিকৃত হয়ে উঠছে তখন কথার মাঝখানেই থেমে যায়।

হাতদুটো চট্ করে পেছনে ভাঁজ করে গ্রিগর টুল ছেড়ে ওঠে—তোমায় আমি দেখাচ্ছি! তুমি ভেবেছ আমি চাকরির উন্নতির জন্য সেখানে যাবো? তুমি আমায় ভাড়া খাটাবে ভেবেছ? আরো বড়ো চাকরির লোভ দেখাচ্ছ? আমি...

—একটু সবুর...

—তোমার চাকরিতে আমি থুতু দি!

—দাঁড়াও! তুমি আমার সব কথা ভুল বুঝেছ!

—আমি ঠিকই বুঝেছি।—গ্রিগরের গলা যেন বুজে আসে। ও আবার টুলের ওপর বসে পড়ে—আর কাউকে খুঁজে নাও তুমি। একটি কসাককেও আমি ডন পার করে নিয়ে যাব না!

—তুমি শুধু-শুধুই খেপে যাচ্ছ।

—ফৌজের ভার আমি নেব না। ব্যস্ আর কোনো কথা নয়।

—বেশ তো, আমি তোমার ওপর জোরও খাটাচ্ছি না, সাধাসাধিও করছি না। তোমার যদি ইচ্ছে হয় ভার নিতে পারো। এই সময়টায় আমাদের অবস্থা সঙীন, সেইজন্যই আমরা ঠিক করেছিলাম সম্ভব হলে ওদের নদী পার হওয়ার যোগাড়যন্ত্র করতে বাধা দেব। পদোন্নতির কথাটা ঠাট্টা করে বলছিলাম। ঠাট্টা তুমি একেবারেই হজম করতে পারো না॥

মেয়েমানুষ নিয়ে তামাশা করলাম, তাতেও তুমি খেপে উঠলে। আমি জানি তুমি আধা বলশেভিক, অফিসারদের দেখতে পারো না। এত গুরুগম্ভীরভাবে নিলে তুমি ব্যাপারটা! তোমাকে একটু খ্যাপাবার জন্য ঠাট্টা করছিলাম।—কুদীনভ এমন স্বাভাবিক সুরে হাসে যে গ্রিগরের মুহূর্তেকের জন্য মনে হয় বুঝি বা ও সত্যিই তামাশা করছিল।

তবু ও গোঁয়ারের মতো বলে—যাই হোক, ফৌজের ভার আমি আর নিচ্ছি না, আবার মন বদলে গেছে।

কুদীনভ বেল্টের ডগায় আঙুল বুলোয় উদাসীনভাবে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলে :

—মন তুমি বদলেছ না ঘাবড়ে গেছ সেটা কথা নয়। যেটা আসল কথা সেটা হল তুমি আমাদের মতলবটা বানচাল করে দিচ্ছ। তবে আমরা অন্য কাউকে বেছে নিয়ে পাঠাবই। তুমি নিজেই বিচার কর আমাদের অবস্থাটা কী ঘোরালো। কন্দ্রাত মেদভেদিয়েভ আজ ওদের একটা নতুন ঘোষণা আমার কাছে পাঠিয়েছে। ওরা একটা গোটা বাহিনী পাঠাচ্ছে আমাদের উপর হামলা করতে। এই নাও, নিজেই পড়ে দ্যাখো, নয়তো আবার আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হবে না।—বাদামি রক্তের ছাপ লাগা একটা হলদে হয়ে-যাওয়া কাগজের টুকরো থলি থেকে বের করে কুদীনভ গ্রিগরের হাতে দেয়।

—এক লাটভিয়ান কমিসারের কাছে এটা ওরা পেয়েছে। শেষ কার্তুজটা ফুরিয়ে যাওয়া অবধি সেই সাপের বাচ্চাটা বাধা দিয়েছিল, তারপর সঙীন উঁচিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কসাকদের গোটা ট্রুপের ওপর। কন্দ্রাত নিজে লোকটাকে কাত করেছে। ওদের মধ্যে সাহসী লোকও আছে যারা ওদের নীতিতে চলে। এই ঘোষণা ওরা তার কাছেই পেয়েছিল।

গ্রিগর হলদে কাগজখানা নিয়ে পড়তে থাকে :

"প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সভাপতির

হুকুমনামা

॥ অভিযানকারী ফৌজের প্রতি ॥

বগুচার, ২৫শে মে, ১৯১৯।

"কলঙ্কময় ডন-বিদ্রোহ নিপাত যাক!

"শেষ মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম প্রস্তুতি সমাপ্ত। বিশ্বাসঘাতকদের চূর্ণ করিয়া দিবার জন্য যথেষ্ট ফৌজ মোতায়েন করা হইয়াছে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে আমাদের সক্রিয় বাহিনীর পশ্চাতে গত দুইমাস ধরিয়া যে ভ্রাতৃহন্তার দল আঘাত হানিতেছিল তাহাদের সহিত এবার একটা বোঝাপড়া করার সময় আসিয়াছে। ঘৃণা ও জুগুপ্সা লইয়া রাশিয়ার সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক এই কসাক দস্যুদলগুলিকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে—একটি ভুয়া লাল পতাকার নামে ইহারা ব্ল্যাক-হাণ্ড্রেড জমিদার, দেনিকিন ও কলচাকদের সহায়তা করিতেছে।

"পিটুনি ফৌজের সৈন্য, কমাণ্ডার ও কমিসারদের জানানো হইতেছে—প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত। এবার আপনারা ইঙ্গিত পাইলেই আগাইয়া যাইবেন।

"ইতর বেইমান ও ষড়যন্ত্রকারীদের পাপের বাসাগুলি এবার ভাঙিয়া দিতে হইবে—ভ্রাতৃহন্তাদের সমূলে বিনাশ করিতে হইবে। যে সমস্ত জেলা বাধা দান করিবে তাহাদের কোনো দয়াই দেখানো হইবে না! যাহারা স্বেচ্ছায় হাতিয়ার ফেলিয়া দিয়া আমাদের পক্ষে আসিবে, ক্ষমা করা হইবে শুধু তাহাদেরই! কলচাক ও দেনিকিনের সহকারীদের বিরুদ্ধে সীসার বুলেট, সঙ্গীনের ইস্পাত আর আগুন! সিপাহি কমরেডগণ, সোভিয়েত রাশিয়া

আপনাদের উপর ভরসা রাখে। বিশ্বাসঘাতকতার কালিমা হইতে ডনভূমিকে আপনাদের মুক্ত করিতেই হইবে। এইবার সেই অন্তিম মুহূর্ত!

"একযোগে সমবেত পদক্ষেপে আগাইয়া চলুন!"

ছয়

চোদ্দ নম্বর ডিভিশনের রাজনৈতিক বিভাগের হাতে স্তকমানের চিঠিটা দেবার পর মিশ্‌কা কশেভয় ২৯৪নং তাগানরগ রেজিমেণ্টে যোগ দিলে। তেত্রিশ নম্বর কুবান ডিভিশনের জন্য ফৌজী দলগুলোর সঙ্গে মিলে এদের দলটাও ডন প্রদেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কসাক বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করতে। কারগিন আর চিরানদীর ধার বরাবর কতগুলো গ্রাম দখলের লড়াইয়ে মিশ্‌কাও যোগ দিয়েছিল। যেদিন ও স্তকমানের খুন হবার খবর জানতে পারল আর শুনল ইভান আলেক্সিয়েভিচকেও ইয়েলান্‌স্কার কমিউনিস্টদের সঙ্গে মারা হয়েছে সেদিন থেকেই মিশ্‌কার মনে কসাকদের সম্পর্কে একটা দারুণ ঘৃণা জমে উঠল। বিদ্রোহী কোনো কসাক ওর হাতে পড়লে ও আর চিন্তা করতে পারত না, দয়ামায়া বলে কোনো আবেগই আর জাগত না ওর মনে। হিমের মতো ঠাণ্ডা নীল চোখে বন্দীর দিকে চেয়ে ও জেরা করত : সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে তুই লড়েছিস্‌?—তারপর জবাবের জন্য সবুর না করেই নির্মমভাবে কেটে ফেলত লোকটাকে। বন্দীদের শুধু ও খুনই করত না, মশালের আগুন দিত গ্রামের বিদ্রোহীদের পরিত্যক্ত ঘরের চালের নিচে, তারপর ভয়ে তটস্থ হয়ে গাই-বলদগুলো যখন বেড়া ভেঙে লাফাতে লাফাতে ছুটত রাস্তায় তখন সেগুলোকেও গুলি করে মারত।

আবহমান কাল ধরে কুড়েঘরের চালার নিচে কসাক জীবনযাত্রার যে দুর্ভেদ্য অচলায়তনটা পরম নির্বিবাদে টিকে রয়েছে তার বিরুদ্ধে মিশ্‌কা এক আপোসহীন বিরতিহীন সংগ্রাম চালায়, লড়ে কসাকসুলভ প্রাচুর্য আর কসাক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। স্তকমান আর ইভানের মৃত্যু ওর ঘৃণায় ইন্ধন জুগিয়েছে, ইশ্‌তেহারের সেই কথাগুলো : "ইতর বেইমানদের পাপের বাসা ভেঙে দিতে হবে, ভ্রাতৃহন্তাদের সমূলে বিনাশ করতে হবে" —এই কথাকটির মধ্যেই পরিষ্কার ধরা পড়েছে ওর অন্ধ অনুভূতিটা। ঘোষণাপত্রটা যেদিন ওর কোম্পানিকে পড়ে শোনানো হল সেদিন শুধু কারগিনেই ও আরো তিনজন কমরেডের সঙ্গে মিলে দেড়শো বাড়িতে আগুন দিলে। এক সওদাগরের আড়তে এক পিপে প্যারাফিন পেয়েছিল, তাই নিয়ে চত্বরের আশেপাশের বাড়িগুলোতে ঘুরতে লাগল এক বাক্স দেশলাই হাতের মুঠোয় নিয়ে। যেখানেই যায় পেছনে রেখে যায় ঝাঁঝালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর আগুনের শিখা—পাদরি আর ব্যবসাদারদের বাড়ি, ধনী কসাকদের বাড়ি জ্বলে, "যারা মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে অজ্ঞ কসাক জনতাকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়েছে" তাদের আস্তানায় আগুন লাগে।

পরিত্যক্ত গ্রামগুলোর মধ্যে ঘোড়সওয়াররাই ঢোকে সবার আগে। পদাতিকরা

আসার আগেই কশেভয় গিয়ে বড়ো বড়ো বাড়িগুলোতে আগুন দেয়। যেমন করে হোক তাতারস্কে গিয়ে ইভান আর ইয়েলান্স্কার কমিউনিস্টদের খুন করার শোধ ও তুলবেই গাঁয়ের পড়শিদের ওপর—এই ওর ইচ্ছা। গাঁয়ের আধখানাই পুড়িয়ে দেবে। এর মধ্যেই মনে মনে ও একটা তালিকা বানিয়ে ফেলেছে তাতারস্কে গিয়ে কোন্ বাড়িগুলোতে আগুন দেবে। আর যদি একান্তই ওর রেজিমেণ্ট সে রাস্তায় না যায়, তা হলে বিনা হুকুমেই রাতারাতি সরে পড়বে, তা যেমন করে হোক।

নিছক প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা ছাড়াও তাতারস্কে আরেকবার ঘুরে আসবার এই আকুলতার পেছনে অন্য তাগিদও ছিল। গত দু'বছর যখনই ও গাঁয়ে গেছে, দুনিয়া মেলেখভার সঙ্গে দেখা করেছে। ওদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসার অনুভূতিটা জেগেছে এখন পর্যন্ত প্রকাশ্য কোনো ঘোষণা না জানিয়ে। দুনিয়া ওকে একটা তামাকের থলি বানিয়ে দিয়েছিল, ছাগলের লোমের এক জোড়া দস্তানাও দিয়েছিল, তাছাড়া মিশ্কা ওর বুক-পকেটে সযত্নে আগলে রাখত দুনিয়ার দেওয়া একটা ছুঁচের কাজ-করা রুমাল। যখনই রুমালটা বের করত তখনই ওর মনে পড়ত কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা সাদা তুষার ঢাকা পপ্লার গাছটার কথা, ঘোলাটে আকাশ থেকে ঝিরঝির করে হয়তো হাল্কা বরফ পড়ছে, দুনিয়ার ঠোঁটদুটো কাঁপছে আর ওর চোখের পাতায় স্ফটিকের মতো চিক্চিক করছে বরফের দানা।

বাড়িতে যাবার আগে রীতিমতো খেটেখুটে তৈরি হতে লাগল মিশ্কা। কার্গিনের এক সওদাগরের বাড়ির দেয়াল থেকে রঙ্চঙা একটা কম্বল নামিয়ে নিয়েছিল, সেটাকে সে ঘোড়ার কাপড়ের নিচে বাঁধল। এক কসাকের সিন্দুকে প্রায় আনকোরা ডোরাদার একজোড়া পাতলুন পেয়েছিল। আধ ডজন মেয়েলি শাল ছিঁড়ে তিন প্রস্থ পায়ের পটি বানাল। তল্পিতল্পার মধ্যে একজোড়া উলের দস্তানাও ঢুকিয়ে নিল তাতারস্কে ঢোকার ঠিক আগেই পরে নেবে বলে। সেপাই যখন দেশে ফিরবে তখন তার সাজপোশাক হবে সেরা জাতের—এ হল অনেককালের প্রথা। মিশ্কাও কসাক ঐতিহ্যের মায়া কাটাতে না পেরে সেই পুরনো কায়দায়ই তৈরি হতে লাগল।

মিশকার ঘোড়াটা চমৎকার ঘন পাটকিলে রঙের, লড়াইয়ের সময় একজন কসাকের হাত থেকে দখল করে নিয়েছিল। জিনটা তেমন ভাল নয়, চামড়ায় দাগ পড়ে গেছে, ছেঁড়া। লোহা-পেতলগুলোয় জং ধরেছে। ঘোড়ার মুখের লাগামলোহাটারও সেই একই অবস্থা। কিছু একটা করা দরকার যাতে ওগুলো দেখতে অন্তত একটু ভালো হয়। সৌভাগ্যক্রমে একটা উৎসাহজনক প্রেরণা পেয়ে যায় মিশ্কা ঃ এক গাঁয়ের এক সওদাগর-বাড়ির বাইরে নিকেলের আস্তর-করা লোহার খাট পড়ে ছিল, তার চারটে পায়ার থামে পালিশ-করা পেতলের মুণ্ডি বসানো, রোদ পড়লে সেগুলো চক্চক্ করে। কোনো হাঙ্গামা হল না, ওগুলো খুলে নিয়ে সিল্কের সুতো দিয়ে দুটোকে বাঁধা হল লাগামের লোহার আংটার সঙ্গে আর দুটো বসানো হল ঘোড়ার কপালের আড়াআড়ি লাগামের ফিতের ওপর। বেলা-দুপুরের গন্গনে সূর্যের মতো ওর ঘোড়ার মাথার ওপর পেতলের মুণ্ডিগুলো ঝক্মক্ করে, ঘোড়াটার অবধি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। চলতে চলতে জানোয়ারটা হোঁচট খায়। কিন্তু ঘোড়া ভালো করে দেখতে না পেলেও, তার চোখে জল এলেও মিশ্কা ওগুলো সরায় না।

ডনের পাড় ধরে রেজিমেণ্ট মার্চ করে চলেছে ভিয়েশেন্স্কার দিকে। তাই ফৌজীদলের কমাণ্ডারের কাছ থেকে হুকুম নিয়ে সারাদিনের জন্য একবার ঘরের লোক-জনেদের দেখে আসা মিশ্কার পক্ষে খুব কঠিন হল না। শুধু হুকুমই নেওয়া নয়—

—অফিসার ওকে জিজ্ঞেস করলে ওর কোনো ভালোবাসার পাত্রী আছে কিনা। মিশ্‌কা 'হ্যাঁ' বলতে লোকটা ফের জিজ্ঞেস করলে :

—সঙ্গে ঘড়ি আর চেন্‌ আছে?

—না কমরেড।—জবাব দেয় মিশ্‌কা।

—খুব খারাপ কথা!—কমান্ডার মন্তব্য করে। জার্মান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ওর আছে, জানে বিজয়ের চিহ্ন না নিয়ে দেশে ফেরা এক কলঙ্কের ব্যাপার। তাই নিজের বুক পকেট থেকে একটা ঘড়ি আর মস্তোবড়ো চেন বের করে মিশ্‌কার হাতে দিয়ে কমান্ডার বলে :

—তুমি একজন সেরা লড়িয়ে! এই নাও, বাড়ি গিয়ে এটা পোরো আর মেয়েদের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দিও। আমিও এককালে জোয়ান ছিলাম, আমি বুঝি এসব। কেউ জিজ্ঞেস করলে বোলো এটা হালের আমেরিকান সোনার চেন।

ঘড়ি আর চেন এ'টে, শিবির আগুনের আলোয় দাড়িটা কামিয়ে মিশ্‌কা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে রওনা হল। ভোরবেলায় কদমচালে এসে ঢুকল তাতারস্কে।

গ্রাম সেই আগের মতোই আছে ঃ ইটের তৈরি গির্জার ছোট ঘণ্টা-ঘরটা থেকে এখনো আকাশে মাথা তুলে আছে রং-চটা গিল্টি-করা ক্রুশটা। চত্বর ঘিরে আগের সেই পুরুত আর ব্যবসাদারদের বাড়ি। কশেভয়দের হুমড়ি খেয়ে-পড়া কু'ড়ে-ঘরটার ওপর দিয়ে পপলার গাছগুলো সেই একই ভাষায় ফিসফিসিয়ে কানাকানি করছে। শুধু মাকড়সার জালের মতো সমস্ত রাস্তাগুলোকে জড়িয়ে থাকা এই থম্‌থমে নীরবতাটাকেই কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়। বাড়ির খড়খড়িগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ; এখানে ওখানে এককেটা দরজায় তালা, তবে বেশির ভাগই একেবারে হা-হা করছে খোলা। মনে হয় একটা ভয়ংকর মহামারী যেন ভারি গোদা পায়ে হে'টে গিয়েছিল গ্রামের ভেতর দিয়ে, যাবার সময় রাস্তা ঘরবাড়ির মানুষকেও সেই সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, শূন্য জনপদ নির্জন খাঁখাঁ করছে। মানুষের গলার আওয়াজ নেই, শোনা যায় না গরুর ডাক, মোরগের চিৎকার। শুধু চালার ছাঁচিতে আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে চড়ুইপাখিগুলো মহা উৎসাহে কিচিরমিচির করছে।

মিশ্‌কা সোজা ওর নিজের বাড়িতে আসে। লোকজন কেউ বেরোয় না ওকে ডেকে নেবার জন্য। সি'ড়ির কাছের দরজাটা একেবারে খোলা। চৌকাঠের পাশে পুরনো ন্যাকড়ার পটি, রক্ত জমে কালো হয়ে থাকা ব্যান্ডেজ, মুরগির পালক আর মাথা পড়ে আছে। এর মধ্যেই পচে মাছি থিক্‌থিক্‌ করছে ওগুলোর ওপর। ক'দিন আগে নিশ্চয় লালফৌজের সেপাইরা এসে খেয়ে গিয়েছিল এ বাড়িতে। তাই মেঝের ওপর হাঁড়িপাতিলের টুকরো, চিবোনো মুরগির হাড়, ফলের খোসা, ছে'ড়া খবরের কাগজ ছড়িয়ে আছে। সামনের ঘরে ঢোকে মিশ্‌কা। আগের মতোই রয়েছে সবকিছু। কিন্তু যে ভাঁড়ার-ঘরটার মধ্যে শরৎকালে তরমুজ রাখা হতো তার পাল্লা-ফটকের একটা পাট একটুখানি উ'চু করে রেখেছে কে যেন।

দরজাটার কাছে গিয়ে ও ভাবে—মা বোধহয় ভেবেছিল আমি আসব? হয়তো আমার জন্য কিছু লুকিয়ে রেখেছে ভাঁড়ার ঘরে। তলোয়ার বের করে ডগা দিয়ে দরজাটা উ'চু করে ধরে ও। ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ আসছে। হাঁটু গেড়ে বসে অন্ধকারে উ'কি মেরে শেষ পর্যন্ত ঠাহর করতে পারল— আধ বোতল ভদ্‌কা রয়েছে, সেই সঙ্গে কড়ায়ের মধ্যে কয়েকটা ভাজা ডিম, ইদুরে খাওয়া একটুকরো রুটি আর কাঠের মগ চাপা-দেয়া একটা পাত্র। টেবিল-ঢাকা কাপড় পাতা আছে, তারই ওপর সবকিছু সাজানো। তাহলে ওর মা সত্যিই ভেবেছিল ও আসতে পারে! তাই আদরের অতিথির মতো সাজিয়ে

রেখেছে সব। ভাঁড়ার ঘরটায় ঢুকতে গিয়ে ওর বুকটা আনন্দে ভালোবাসায় উথলে উঠে যেন। মেঝের পাটাতনে একটা চটের থলি আটকানো আছে দেখল ও। থলিটা খুলে ভেতরে ওরই কতগুলো ইজের গেঞ্জি পেল—পুরনো হলেও সুন্দর করে রিফু করা, ধুয়ে কেচে ইস্তিরি করা।

সমস্ত খাবার ইঁদুরে নষ্ট করে ফেলেছে, শুধু দুধ আর ভদ্‌কাটাই ছোঁয়নি। ভদ্‌কা খেয়ে মিশ্‌কা জমাট বরফ-ঠান্ডা দুধও খেল, তারপর কাপড়গুলো নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ওর মা বোধহয় ডনের ওপারে চলে গেছে। মিশ্‌কা ভাবল—এখানে থাকতে সাহস পায়নি। না থেকে বরং ভালোই করেছে, নয়তো কসাকরা মেরে ফেলত। যা মনে হচ্ছে আমার জন্যই মাকে ওরা নাজেহাল করেছে।—বাইরে এসে ঘোড়ার বাঁধন খুলল, কিন্তু পরে ঠিক করল মেলেখভদের বাড়িতে সোজা যাবে না। ওদের বাড়িটা ঠিক নদীর ধারে, ভালো হাতের টিপ্‌ হলে যে কেউ অনায়াসেই ওকে নদীর ওপার থেকে ঘায়েল করতে পারবে। করশুনভদের বাড়িতেই যাবে ঠিক করল, তারপর বিকেলের দিকে চত্বরে ফিরে আসবে, অন্ধকারের আড়ালে মখোভ আর পুরুত ব্যবসাদারদের বাড়িগুলোতে আগুন দেবে।

ঘোড়ায় চেপে অনেকগুলো উঠোনের পেছন দিয়ে গিয়ে করশুনভদের মস্তো উঠোনটায় ওঠে মিশ্‌কা। ফটক দিয়ে ঢুকে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে সবে বাড়ির মধ্যে ঢুকছে এমন সময় সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়াল বুড়ো গ্রিশাকা। সাদা মাথাটা কাঁপছে, ফ্যাকাশে চোখদুটো অন্ধের মতো কোঁচকানো। তেলচিটে কলারে লালবুটিওলা পুরনো জিরজিরে কসাক কোর্তাটা খুব যত্ন করে বোতাম আঁটা! কিন্তু পাজামাটা এদিকে খুলে পড়ার জোগাড়, হাত দিয়ে সেটাকে সামলে ধরে রাখতে হচ্ছে বুড়োকে।

সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে চাবুক নাচাতে নাচাতে মিশকা জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছেন বুড়ো কত্তা?—বুড়ো জবাব দিলে না। চোখের কঠিন চাউনির মধ্যে রাগ আর ঘৃণা জমে আছে।

মিশ্‌কা উঁচু গলায় বলে—কেমন আছেন?

—জয় হোক তাঁর!—অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দেয় বুড়ো। একইরকম রাগভরা চোখে মিশ্‌কার দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করে—গ্রিশাকা দাদু, আপনি কেন ডন পার হয়ে ওপারে গেলেন না?

—তুমি কে?—জেরা করে বুড়ো।

—মিশ্‌কা কশেভয়।

—তুই তো আমাদের খামারে কাজ করতিস, না?

—তা করতুম বটে। কিন্তু আপনি কেন ডনের ওপারে গেলেন না?

—যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, যাবোও না। কিন্তু তা দিয়ে তোর দরকার? খৃষ্টের দুশমনদের সেবা করতে লেগে গিয়েছিস বুঝি? টুপিতে ওটা লাল তারা? ওরে কুত্তীর বাচ্চা, আমাদের কসাকদের সঙ্গে লড়ছিস তাহলে? তোর নিজের পাড়াপড়শিদের সঙ্গে লড়ছিস?—প্রায় টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে বুড়ো।

মিশকা জবাব দেয়—আমি ওদের সঙ্গে লড়ছি তো বটেই। যদি কারুর দেখা পাই তো মজা দেখিয়ে দেব!

—হ্যাঁ, শাস্তরে কী লিখেছে জানিস? 'তুমি যেমন করে অন্যের বিচার করবে, ঠিক সেইভাবে তোমার নিজের বিচারও হবে।'

—ও সব ধর্মের কথা আমাকে শোনাবার দরকার নেই বুড়ো কত্তা। সে জন্যে এখানে আসিনি। এখুনি বাড়ি ছেড়ে পালান বলছি!—কড়া গলায় বললে মিশ্‌কা।

—কেন শুনি?

—কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না! বলছি এখান থেকে বেরোন!

—আমার নিজের বাড়ি আমি ছাড়ব না। আমি জানি তুই কী করতে চাস। তুই হলি খৃষ্টের দুশমনের চেলা, তার চিহ্ন তোর টুপিতে আছে। শাস্তরে আগেই বলেছিল, এখন তাই ঘটছে ঃ ছেলে দাঁড়াবে বাপের বিরুদ্ধে, ভাই লড়বে ভাইয়ের সঙ্গে...।

—আমাকে ওভাবে জড়াতে চেষ্টা করবেন না। এখানে ভাই-টাইয়ের প্রশ্ন নয়, সোজা অঙ্কের কথা। মৃত্যুর দিনটি অবধি আমার বাবা আপনাদের জন্য খেটেছিল, যুদ্ধের আগে আমিও আপনাদের গোলামি করেছি। আপনাদের জন্য খাটতে খাটতে জান কাবার হয়ে গেছে আমার, এবার হিসেব নিকেশের পালা! বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, আমি আগুন দেব। সারা জীবন ভালো ঘরে শুয়ে কাটিয়েছেন, এবার আমাদের মতো খড়ের চালার নিচে কাটান। বুঝেছেন তো বুড়োকর্তা?

—হ্যাঁ বুঝেছি। তাহলে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা! ঋষি ইসায়ার গ্রন্থে লেখা আছে ঃ 'উহাদের মধ্যে যাহারা নিহত তাহাদের বাহিরে ছুড়িয়া ফেলা হইবে, মৃত দেহ হইতে দুর্গন্ধ উঠিতে থাকিবে আর পাহাড়গুলি উহাদের রক্তের ধারায় গলিয়া যাইবে।'

—আপনার সঙ্গে আমার এখন শাস্তর নিয়ে তর্ক করার সময় নেই!—চাপা রাগের সঙ্গে বললে মিশ্‌কা—আপনি বেরোবেন কিনা?

—না রে দুশমন।

—ঠিক আপনাদের মতো লোকগুলোর জন্যই এই গণ্ডগোল আর যুদ্ধ চলছে। আপনার দোসররাই লোককে জ্বালাচ্ছে, তাদের বিদ্রোহ করতে শেখাচ্ছে।—বলতে বলতে চট্‌ করে রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামায় মিশ্‌কা।

গুলি লেগে সোজা মুখ থুবড়ে পড়ে গ্রিশাকা, কিন্তু শুয়ে শুয়েই বিড়বিড় করে বলতে থাকে ঃ

—'আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছাই সাধিত হোক্‌।' হে ঈশ্বর তোমার দাসকে আশ্রয় দাও।—বুড়ো গোঙাতে থাকে, দুটো সাদা জুলফির মাঝখানে ঝলক দিয়ে বের হয় রক্ত।

—বুড়ো শয়তান তোর অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল।—বলতে বলতে মিশ্‌কা সাবধানে বুড়োর দেহটাকে এড়িয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে ওঠে।

বারান্দায় বাতাসে বয়ে-আসা শুকনো পাতা আর ডালগুলো লাল আগুনের শিখায় জ্বলে ওঠে; সিঁড়ি দরজা আর ভাঁড়ার ঘরের মাঝখানে তক্তার পার্টিশনটায় চট্‌ করে আগুন ধরে যায়। ছাদ অবধি ধোঁয়া উঠে ঘরগুলোর ভেতর পাক খেয়ে খেয়ে ঢুকতে থাকে। কশেভয় বেরিয়ে এল বাইরে। ও যখন চালাঘর আর গোলাঘরটায় আগুন লাগায় ঘরের ভেতর থেকে ততোক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা বাইরে এসে পড়েছে, জানলার খড়খড়ির পাইন-তক্তাগুলো গ্রাস করে হাত বাড়িয়েছে ছাদের দিকে।

বিকেল অবধি মিশ্‌কা কাছাকাছি একটা ফল-বাগানে কাঁটাঝোপের ছায়ায় ঘুমোয়। ওর লেংচা ঘোড়াটা কাছেই দাঁড়িয়ে অলসভাবে ঘাস চিবোচ্ছিল। সন্ধ্যের মুখে ভারি তেষ্টা পেতে লাগল ঘোড়াটার। চিঁহি-চিঁহি করে ঘুম ভাঙিয়ে দিল মনিবের। মিশ্‌কা

উঠে বাগানের কুয়োর কাছে গিয়ে জল দিল ওকে, তারপর জিন চাপিয়ে রাস্তায় বের হল। করশুনভদের উঠোনে পোড়া লাঙল-মই থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছিল; শুধু পাথরের উঁচু ভিত আর আকাশে ঝুল-মাখা চিমনি উঁচিয়ে রাখা-ভাঙা চুল্লীটাই যা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির চিহ্ন হিসাবে।

* *

মিশ্‌কা সোজা ঘোড়া নিয়ে ঢুকেছে মেলেখভদের উঠোনে। পাল্লা-ফটক দিয়ে ঢুকতে যাবার সময় দ্যাখে ইলিনিচ্‌নাকে, আঙরাখার কোঁচড়ে জ্বালানি কাঠের চিল্‌তে বোঝাই করছিল সে।

বেশ খাতির দেখিয়ে মিশ্‌কা ডাকলে—ও মাসিমা! ওকে দেখে ভয়ে বুড়ির মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। হাতদুটো দুপাশে ঝুলে পড়তেই আঙ্‌রাখা থেকে কাঠের চিলতেগুলো খসে পড়ল।

—খবর কি, মাসিমা?

—বেঁচে থাকো! বেঁচে থাকো!—কোনো রকমে জবাব দেয় ইলিনিচ্‌না।

—বেঁচে বর্তে আছেন তো?

—বেঁচে আছি, তবে ভালো আছি কিনা সে কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না।

—আপনাদের কসাকরা সব কোথায়? ঘোড়া থেকে নেমে বুড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করে মিশ্‌কা।

—ডনের ওপারে।...

—ক্যাডেটদের আসার অপেক্ষায় আছে বুঝি?...

—আমার তো মেয়েমানুষের কাজ বাবা...এসব জিনিস আমি জানিনে...

—দুনিয়া বাড়িতে আছে তো?

—সেও ডনের ওপারে চলে গেছে।

—ওইখানে নিয়ে গেছে ওকে!—রাগে কাঁপতে থাকে মিশ্‌কার গলা—আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি মাসিমা! তোমার ছেলে ওই গ্রিগরটা সোভিয়েত সরকারের পয়লা নম্বরের দুশমন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওপারে যখন আমরা যাব, ওর গলাতেই প্রথম পড়বে ফাঁসের দড়ি। কিন্তু পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভের তো পালানোর দরকার ছিল না। উনি বুড়ো, খোঁড়া। ওঁর উচিত ছিল বাড়িতে থাকা।

—মরণের অপেক্ষায়?—কড়া গলায় প্রশ্ন করে ইলিনিচ্‌না, আবার কোঁচড়ে তুলতে থাকে কাঠের চিলতেগুলো।

—মরণ ওঁর কাছে সহজে ঘেঁষছে না। আমরা বড়ো জোর এক আধ ঘা চাবুক কষিয়ে দিতাম, কিন্তু ওকে মেরে শুধু শুধু ঝামেলা বাড়াতে যাব কেন। কিন্তু এসব নিয়ে কথা বলতে তো আসিনি আমি—বুক পকেটে ঘড়ির চেনটা ঠিকমতো বসাতে বসাতে ও বলল—আমি এসেছিলাম দুনিয়া পান্তালিয়েভ্‌নাকে দেখতে; ও যে ডন পার হয়ে ওপারে গেছে এটাই দারুণ দুঃখ রয়ে গেল। কিন্তু ওর মা হিসেবে আপনাকে বলি : আমি ওকে বহুদিন ধরেই পেতে চাইছি, তবে ঠিক এই সময়টাতে মেয়েদের নিয়ে মাথা ঘামানোর অতো সময় নেই; এখন আমাদের বিপ্লবের দুশমনদের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে, কোনো দয়ামায়া না দেখিয়ে লড়াই খতম করব। যেই যুদ্ধ শেষ হবে, সব জায়গায় সোভিয়েত হুকুমত কায়েম হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি দুনিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে পাঠাব আপনাদের কাছে।

—এসব কথা নিয়ে আলাপ করার সময় এটা নয়।

মিশ্‌কা ভুরু কুঁচকে বললে—আলবৎ এটাই সময়! বিয়ের শপথ নেওয়া হয়তো চলবে না, কিন্তু কথাবার্তা নিশ্চয়ই হতে পারে। দিনক্ষণ ঠিক করে সময় করে ওঠা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আজ এখানে আছি, কাল হয়তো ডনের ওপারে চলে যাব। সেইজন্য আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। দুনিয়াকে আপনি আর কারো হাতে তুলে দিতে পারবেন না, নয়তো খুব খারাপ হয়ে যাবে। যদি আমি মরে গেছি বলে রেজিমেন্ট থেকে চিঠি আসে তাহলে যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু এখন কিছু নয়, কারণ আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি। কোনো উপহার ওর জন্য আনতে পারিনি, তবে যদি ধনী ব্যবসাদারদের কারুর ঘর থেকে কিছু চান তো বলুন আমি এখ্খুনি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসছি...

--ভগবান্ না করুন! আজ পর্যন্ত আমি অন্যের জিনিস ছুঁইনি।

—ঠিক আছে, যা ভালো বোঝেন। যদি আমার আগেই দুনিয়ার সঙ্গে আপনার দেখা হয় তো তাকে আমার নমস্কার দেবেন। এখন তবে আসি, মাসিমা। যা বললাম ভুলবেন না কিন্তু।

কোনো জবাব না দিয়ে ইলিনিচ্না ঘরে চলে গেল। মিশ্‌কা ঘোড়ায় চেপে ফের বেরিয়ে গেল চত্বরের দিকে।

সেখানে তখন লালফৌজী সেপাইদের ভিড় জমে গেছে। পাহাড় থেকে তারা গ্রামে এসেছে রাতটা কাটাবার জন্য! রাস্তায় রাস্তায় ওদের উন্মুখর কলরব। হাল্‌কা মেশিনগান হাতে নিয়ে তিনজন সেপাই নদীর পাড়ে একটা ঘাঁটির দিকে আসছিল, মিশ্‌কাকে থামিয়ে ওরা তার দলিলপত্র খুঁটিয়ে দেখল। সেমিওন চুগুন-এর বাড়ির কাছে এসে দেখা হল আরো চারজনের সঙ্গে। একটা হাত-গাড়িতে করে ওট্ নিয়ে যাচ্ছিল দুজন, আর বাকি দুজন সেমিওনের স্ত্রীকে সাহায্য করছিল একটা সেলাইকল আর এক বস্তা ময়দা নিয়ে যেতে। মিশ্‌কাকে চিনতে পেরে সেমিওনের স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল।

মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করল—ওগুলো আবার কি জিনিস নিয়ে যাচ্ছ?

লালফৌজের সেপাইদের একজন বুক ফুলিয়ে জবাব দিলে—এগুলো পেঁছে দিয়ে আসছি এই মজুর-বউটির ঘরে। বুর্জোয়াদের এই কল আর ময়দাটা আমরা ওকে দিয়ে দিয়েছি।

* * *

ব্যবসাদার মখভ, আরো দুজন মহাজন, পুরুত আর তিনজন ধনী কসাক মিলিয়ে মোট সাতটা বাড়িতে আগুন দিয়েছে মিশ্‌কা। ওরা সবাই পালিয়েছিল দনিয়েৎসের ওপারে। আগুন লাগাবার পর মিশ্‌কা গ্রাম ছাড়ে। পাহাড়ের উৎরাইয়ে উঠে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নেয়। নিচে তাতারস্ক—কালো আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড লেলিহান শিখা মেলে দিয়ে গাঢ় লাল আগুন উঠেছে। ডনের খরবেগ স্রোতে ছায়া পড়েছে আগুনের, বাতাসের দমকে নুয়ে পড়ে শিখাগুলো হেলে যাচ্ছে পশ্চিমের দিকে, আর লোভীর মতো গ্রাস করছে দালানকোঠা।

পুবের স্তেপ-মাঠ থেকে একটা হাল্‌কা হাওয়া দিচ্ছিল। আগুনটাকে আরেকটু উস্কে দিয়ে কালো ফুল্‌কিগুলোকে উড়িয়ে চত্বর থেকে অনেকটা দূরে এনে ফেলতে লাগল সে বাতাস।

। সাত ।

চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে বিদ্রোহীরা লাল পিটুনি ফৌজের হামলা ফিরিয়ে দিতে শুরু করে। দক্ষিণে ডনের বাঁ পাড়ে দুটো বিদ্রোহী ডিভিশন একগুঁয়ের মতো আঁকড়ে থাকে তাদের পরিখা। শত্রুপক্ষকে তারা কিছুতেই ডন পার হতে দেবে না, যদিও গোটা রণাঙ্গন জুড়ে অসংখ্য লাল গোলন্দাজ কামান প্রায় বিরতিহীন নির্মম গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে ওদের ওপর। উত্তর, পূব আর পশ্চিমদিক থেকে আরো তিনটে ডিভিশন তখন সাংঘাতিক ক্ষতি স্বীকার করেও বিদ্রোহীদের এলাকা রক্ষা করে যাচ্ছে—বিশেষ করে উত্তর-পূব দিকটাতে; কিন্তু তবু তারা পিছু হটতে চেষ্টা করছে না, খপেরস্ক্ অঞ্চলের সীমানা বরাবর অটলভাবে ঠেকিয়ে যাচ্ছে শত্রুদের।

তাতারস্ক্ কসাকদের যে কোম্পানিটা নিজেদের গাঁয়ের মুখোমুখি নদীর উলটো দিকটা সামলাচ্ছিল তারা লালফৌজকে বেশ খানিকটা বিপদে ফেলে দিল। জোর করে বেকার বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল কসাকরা, তাই রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে নৌকো পার হয়ে ডনের ডান পাড়ে এল ওরা। আচমকা এক লালফৌজী পাহারা-ঘাঁটির ওপর হামলা করে চারজনকে মেরে একটা মেশিনগান দখল করল। পরদিন লালফৌজ এল ভিয়েশেনস্কার ভাঁটি থেকে এক সার কামান নিয়ে। কসাকদের পরিখাগুলোর ওপর তারা প্রচণ্ড গোলা ছুঁড়তে শুরু করে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কামানের শ্রাপ্‌নেল ছুটতে শুরু করতেই কোম্পানিটাও তাড়াতাড়ি গড়খাই ছেড়ে নদীর পাড় থেকে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে ঢোকে। একদিন পর কামানগুলোকে সরিয়ে নেয়া হল, তাতারস্ক্ কসাকরা আবার তাদের পুরনো ঘাঁটি দখল করল। কামানের গোলায় কোম্পানির কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছিল: সদ্য মোতায়েন করা ফৌজের দুটি জোয়ান ছেলে শ্রাপ্‌নেলের টুকরো লেগে মারা গেল। ভিয়েশেনস্কা থেকে সবে এসেছিল কোম্পানি কমাণ্ডারের আরদালি, সেও জখম হয়েছে।

এর পর কয়েকদিন একটু চুপচাপ। পরিখাগুলোর মধ্যে ওদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক গতিতে চলে। কসাকদের মা-বউরা প্রায়ই রাতে রুটি আর ঘর-চোলাই ভদ্‌কা নিয়ে আসে, যদিও এখন ওসবের অতোটা প্রয়োজন নেই। দুটো বেওয়ারিশ বাছুরও জবাই করেছিল সেপাইরা। তাছাড়া রোজই পুকুরে যায় মাছ ধরতে। ক্রিস্তোনিয়া হয়েছে 'মৎস্য-বিভাগের' প্রধান কর্তা। সত্তর ফুট লম্বা একটা টানা জাল নদীর পাড়ে ফেলে গিয়েছিল কোনো উদ্বাস্তু, সেইটেই সে কাজে লাগিয়েছে। মাছ ধরবার সময় পুকুরের সবচেয়ে গভীর জায়গাগুলোতে জাল ফেলে ক্রিস্তোনিয়া, আর জাঁক করে বলে নদীর ধারে এমন একটা জলা জায়গা নেই যেখানে ও একবার না পা ডোবাবে।

মোটের ওপর কোম্পানিটা বেশ মিলেমিশেই আছে। খাবার অঢেল। কসাকরা সবাই বেশ খোশমেজাজে রয়েছে, শুধু স্তেপান আস্তাখফ বাদে।

আক্‌সিনিয়া যে ভিয়েশেন্‌স্কাতে গ্রিগরের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে সে খবর সম্ভবত ও অন্য কসাকদের মুখে শুনেছিল কিংবা হয়তো ওর মনই বলছিল সে কথা। মোটের ওপর হঠাৎ সে বড়ো ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, বিনা কারণেই গালাগাল করছে ট্রুপ কমাণ্ডারকে. শান্ত্রীর কাজে যেতে সরাসরি অস্বীকার করছে।

কালো মার্কা-দেওয়া একটা স্লেজ-কম্বলের ওপর সারাদিন ও শুয়ে কাটায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর পাগলের মতো চুরুট খায়। তারপর হঠাৎ একবার ওর কানে আসে কোম্পানি কমাণ্ডার আনিকুশ্‌কাকে ভিয়েশেন্‌স্কায় পাঠাচ্ছে কার্তুজের জন্য। দুদিন বাদে এই প্রথমে ও বেরিয়ে আসে সুড়ঙ্গ থেকে। না ঘুমিয়ে চোখদুটো ওর ফোলা-ফোলা জল-টস্‌টসে হয়ে ছিল। দোলায়মান গাছগুলোর উশ্‌কো-খুশ্‌কো জ্বল্‌জ্বলে সবুজ পাতা আর সাদা-মুকুট পরা হাওয়ায়-উড়ে-যাওয়া মেঘগুলোর দিকে তাকালেই ওর চোখ যেন ঝল্‌সে যায়, কানে আসে গাছের মর্মর শব্দ। গড়খাইয়ের কিনারা দিয়ে লম্বা পা ফেলে ও আনিকুশ্‌কাকে খুঁজতে বেরোয়।

অন্য কসাকদের সামনে ওর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে ছিল না স্তেপানের, তাই এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেঃ

—আক্‌সিনিয়াকে ভিয়েশেন্‌স্কাতে খুঁজে বের করে ওকে বোলো যেন আমাকে দেখতে আসে। বোলো আমার সারা গায়ে উকুন, কোর্তা আর পায়ের পটি ধোয়া হয় না একেবারে, আর এও বোলো যে...!— এক মুহূর্ত চুপ করে স্তেপান গোঁফের আড়ালে অপ্রতিভ হাসিটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করেঃ বোলো যে আমার ওকে ভীষণ দরকার, শিগ্‌গিরই দেখা হবে ভেবে পথ চেয়ে বসে আছি।

আনিকুশ্‌কা ভিয়েশেন্‌স্কাতে এল রাতে। আক্‌সিনিয়ার আস্তানাটা খুঁজে বের করল। গ্রিগরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর পিসিমার বাড়িতেই আক্‌সিনিয়া ফিরে এসেছিল আবার। স্তেপান ঠিক যেমন বলেছিল তেমনি করে ওকে সব বুঝিয়ে বলল আনিকুশ্‌কা—তবে একটু ওজন বাড়াবার জন্য নিজের দায়িত্বে এটুকুও জুড়ে দিল যে আক্‌সিনিয়া যদি না ফেরে তাহলে স্তেপান স্বয়ং ভিয়েশেন্‌স্কায় চলে আসবে।

হুকুম তামিল করে আক্‌সিনিয়া, যাবার জন্য তৈরি হতে থাকে। ওর পিসিমা তাড়াতাড়ি ময়দার খামির মাখিয়ে কিছু পিঠে ভেজে ফেলে। তারপর দুঘণ্টা বাদে লক্ষ্মী বউটি সেজে আক্‌সিনিয়া ঘোড়ার পিঠে আনিকুশ্‌কার সঙ্গে চলে তাতারস্ক্‌ কোম্পানির ঘাঁটির দিকে।

মনে একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে স্তেপান ওর বউকে নামায়। প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে থাকে বউয়ের মুখের দিকে। অনেকখানি যেন শুকিয়ে গেছে মুখখানা। সাবধানে প্রশ্ন করে স্তেপান। ভুলেও একবার জিজ্ঞেস করে বসে না গ্রিগরের সঙ্গে ওর দেখাসাক্ষাতের কথা। শুধু একবার কথা বলতে বলতে চোখ নামিয়ে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলঃ

—কিন্তু ওদিক দিয়ে তুমি ভিয়েশেন্‌স্কায় গেলে কেন? তাতারস্কের উল্টো পাড়েই নদী পেরিয়ে গেলে না কেন?

শুকনো গলায় জবাব দিলে আক্‌সিনিয়া—বাইরের অজানা লোকদের সঙ্গে নদী পার হবার সুযোগ পায়নি ও, তাছাড়া মেলেখফদেরও বলতে ইচ্ছে হয়নি। বলার সঙ্গে সঙ্গেই আক্‌সিনিয়া বুঝতে পারল ওর কথার মানে এই দাঁড়ায় যে মেলেখফরা বাইরের নয়, তারা ওর আপনারই লোক। স্তেপানও ওর কথার এইরকমই মানে করবে আন্দাজ করে আক্‌সিনিয়া,

একটু ফাঁপরে পড়ে। খুব সম্ভব সেও তাই বুঝে নিয়েছিল। মুহূর্তের জন্য ভুরুটা কেঁপে ওঠে স্তেপানের, মুখের ওপর যেন একটা ছায়া খেলে যায়। সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে ওর দিকে তাকায় আর আক্‌সিনিয়াও সেই নীরব প্রশ্নের অর্থটা বুঝতে পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আর খানিকটা নিজের ওপরেই চটে গিয়ে লাল হয়ে ওঠে।

ওকে রেহাই দেবার জন্য স্তেপান এমন ভান করল যেন সে কিছুই লক্ষ্য করেনি। ও ততোক্ষণে খামার জমির গল্প জুড়ে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করছে, আক্‌সিনিয়া বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসবার সময় কী কী জিনিস লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল, সাবধানে রেখেছিল কিনা, এইসব।

মনে মনে আক্‌সিনিয়া স্বামীর পরম ঔদার্যটুকু লক্ষ্য করে। ওর সব প্রশ্নের জবাবও দেয় কিন্তু কেবলই একটা সঙ্কোচ অনুভব করে। আগে যা কিছু ঘটেছে সে তেমন গুরুতর নয় সেইটে ওকে বোঝাবার জন্য আর নিজের উতলা ভাবটা চাপা দেবার জন্য ও বেশ ইচ্ছে করেই একটু আস্তে-ধীরে, বুঝে-শুঝে রয়ে-সয়ে বলে।

গড়খাইয়ের আস্তানায় বসে দুজন গল্প করছিল। অন্য কসাকরা অনবরত এসে বাগড়া দিচ্ছে। প্রথমে এল একজন, তারপর আরেকজন। ক্রিস্তোনিয়া এসেই শোবার জোগাড় করতে লাগল। স্তেপান যখন দেখল একা কথা বলার আর কোনো সুযোগ নেই তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে আলাপ শেষ করে দিতেই হয়।

হাঁফ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আক্‌সিনিয়া। চট্ করে ও পুঁটলিটা খুলল। যে পিঠে-গুলো সঙ্গে এনেছিল, স্বামীকে সেগুলো বেশ খাইয়ে খুশি করে ওর ফৌজী পোশাক-আশাকের ভেতর থেকে নোংরা কাপড়গুলো বের করে নিয়ে চলে গেল কাছের ডোবা পুকুরটার মধ্যে কাচবে বলে।

বনের মধ্যে ভোর-সকালের নিঝুম ভাব। ধূসর কুয়াশা থম্‌থম্ করছে। শিশিরের ফোঁটার ভারে মাটিতে নুয়ে পড়ছে ঘাসের শীষ। ডোবাগুলোর মধ্যে ব্যাঙ ডাকছে তিরিক্ষি মেজাজে। গড়খাইয়ের খুব কাছেই কোথায় যেন ঝাঁকড়া মেপ্‌ল্ গাছের ঝোপের আড়ালে একটা কর্ণ্‌ক্রেক্ পাখি কর্কশ গলায় ডাকছিল। আক্‌সিনিয়া মেপ্‌ল্ ঝোপটার ধার দিয়ে চলে আসে। ঝোপের আগাগোড়া ঘন শেওলা পাতায় ঢাকা, মাকড়সার জাল জট পাকিয়ে ধরেছে। সরু তন্তুর গায়ে মুক্তাজালের মতো চিক্‌চিক্ করছে শিশিরের সূক্ষ্মতম বিন্দুগুলো। মুহূর্তের জন্য কর্ণ্‌ক্রেক্‌টা একটু চুপ করেছিল, কিন্তু আক্‌সিনিয়ার খালি পায়ের চাপে বসে-যাওয়া ঘাসগুলো ফের মাথা তুলতে না-তুলতেই আবার সে ডাকতে শুরু করল—জলাজঙ্গলটার ওপার থেকে উড়ে যেতে যেতে করুণ কণ্ঠে জবাব দিলে একটা পিউইট্ পাখি।

চলাফেরার সুবিধার জন্য আক্‌সিনিয়া ওর ছোট জ্যাকেট আর কাঁচুলিটা ছুঁড়ে ফেলে, ডোবার ভাপ-ওঠা গরম জলে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে কাপড়গুলো ধুতে শুরু করে। মাথার ওপর মাছি উড়ছে, মশা ভন্‌ভন্ করছে। সুগোল লাল্‌চে হাতটা কনুই অবধি ভাঁজ করে মুখের ওপর থেকে মশা তাড়াতে চেষ্টা করে আক্‌সিনিয়া। কেবলি ওর মনে পড়ে যাচ্ছে গ্রিগরের কথা,—তাতারস্ক্ কোম্পানিতে ফিরে যাবার আগে গ্রিগরের সঙ্গে ওর শেষবার ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল।

—এখনই হয়তো আবার আমার খোঁজ করতে শুরু করেছে! আজ রাতেই ফের ভিয়েশেন্‌স্কা চলে যাব।— একেবারে চূড়ান্তভাবে ঠিক করে ফেলে ও। আবার গ্রিগরের সঙ্গে দেখা হবে, এবার চট্ করে একটা মিটমাট করে ফেলবে ভেবে মনে মনে হাসে।

অদ্ভুত ব্যাপারঃ কিছুকাল হল যখনই ও গ্রিগরের কথা ভাবে ওর বাস্তব চেহারাটা কিছুতেই মনের পটে জাগে না আক্সানিয়ার। ওর চোখের সামনে যে এসে দাঁড়ায় সে আজকের সুপুরুষ বিশালদেহ কসাক গ্রিগর নয়; বিচিত্র যার জীবন, বিচিত্র যার অভিজ্ঞতা; ক্লান্তিতে কোঁচকানো চোখদুটো, কালো গোঁফের ডগায় লালের ছোপ, রগের দু'পাশে অকালে পাক ধরা, কপালে গভীর বলিরেখা. এ মূর্তি নয়—ওর চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেই আগের গ্রিশ্কা মেলেখফের ছবি, তরুণোচিত রূঢ়তা আর আনাড়িপনা যার আলিঙ্গনে, কাঁধটা অল্পবয়েসী ছেলেদের মতো সরু, সুগোল, অনবরত হাসি খেলে-যাওয়া ঠোঁটদুটোয় একটা অনির্দিষ্ট ভাঁজের রেখা। আর এ সবেরই ফলে আক্সিনিয়া ওর প্রতি একটা গভীরতর ভালোবাসা অনুভব করে, সেই সঙ্গে প্রায় মাতৃসুলভ একটা স্নেহও।

আজও তাইঃ গ্রিগরের অপরিসীম মূল্যবান্ এই প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি আক্সিনিয়া যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে করে, ওর নিশ্বাস ভারি হয়ে আসে, মুখে হাসি ফুটে ওঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্বামীর আধ-কাচা শার্টটা পায়ের নিচে ফেলে। আচমকা ওর চোখে জল ঠেলে ওঠে, মিষ্টি কান্নার সঙ্গে গলাটার মধ্যেও যেন জ্বলুনির মতো কী ঠেকে ভারি ভারি। ফিসফিসিয়ে বলে ওঠেঃ মরতেও পারো না! চিরকালের মতো আমাকে তুমি খেয়েছ!

কান্নায় মনটা তবু হাল্কা হয়, কিন্তু একটু বাদেই আশপাশের হাল্কা-নীল সকালের পৃথিবীটা হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে আসে। হাতের পেছন দিয়ে গাল মুছে ভিজে কপালের ওপর থেকে চুলটা সরিয়ে ও তাকিয়ে থাকে উদাসভাবে—জলভরা চোখে অনেকক্ষণ ধরে দেখে একটা ছোট্ট ধূসর বেলেহাঁসকে জলার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে—বাতাসে ফুলে-ওঠা কুয়াশার গোলাপী জড়োয়া-জালির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় পাখিটা।

কাপড় ধোয়া শেষ করে ঝোপগুলোর ওপর শুকোতে মেলে দেয় আক্সিনিয়া। তারপর ফিরে চলে গড়খাইয়ের দিকে।

ক্রিস্তোনিয়া জেগে উঠে দরজার মুখেই বসে ছিল। কোণাচে, ট্যারাবাঁকা পায়ের ডগাদুটোয় মোচড় দিতে দিতে কেবলি জোর করে স্তেপানের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছিল। স্তেপান কম্বলে শুয়ে চুরুট টানছে, কিছুই বলছে না, একগুঁয়ের মতো ক্রিস্তোনিয়ার প্রশ্নের জবাবে শুধু মুখ বুজে রয়েছে।

—তাহলে তুমি মনে করো লালফৌজ নদী ডিঙিয়ে এপারে আসবে না? জবাব দিচ্ছ না যে? বেশ দিও না! কিন্তু আমার যা মনে হয় ওরা পারঘাটা ধরেই পার হয়ে আসতে চেষ্টা করবে।.. পারঘাটা ধরেই আসবে ঠিক—অন্য কোনো জায়গা নেই যে পার হবার। কিংবা তুমি হয়তো ভেবেছ ওরা ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে নদী সাঁতরে পার হবে? কথা বলছ না কেন স্তেপান? মনে হচ্ছে শেষ লড়াইটা এইখানেই হয়ে যাবে, আর তুমি অমন কাঠের গুঁড়ির মতো মুখ বুজে পড়ে আছ!

স্তেপান আধ-বসা অবস্থায় চটা মেজাজে জবাব দিলে—আমাকে এমন জ্বালাচ্ছ কেন বলো তো? আচ্ছা মানুষ সব তোমরা! এদিকে আমার বউ এলো দেখতে, কিন্তু তোমাদের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায়টুকু নেই! যতো রাজ্যের বোকা-বোকা কথা শোনাতে আসে, বউয়ের সঙ্গে দুটো ভালোমন্দ কথা অবধি কইতে দেয় না।

—আচ্ছা মানুষ তো তুমি দেখছি!—গজগজ করতে করতে ক্রিস্তোনিয়া উঠে পড়ে, খালি পায়ে তালি-মারা জুতোটা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় জোর একটা ঠোক্কর খায় দরজার চৌকাঠে।

স্তেপান বুদ্ধি দেয়—চলো বনের মধ্যে যাই, এখানে ওরা আমাদের স্বস্তিতে কথা বলতে দেবে না।

আক্সিনিয়ার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে স্তেপান দরজার দিকে এগোয়। আক্সিনিয়াও বাধ্য মেয়ের মতো পেছু নেয়।

দুপুর নাগাদ গড়খাইয়ে ফিরে এল ওরা। দুনম্বর গ্রুপের কসাকরা একটা এ্যাল্ডার ঝোপের ঠাণ্ডা ছায়ায় শুয়ে গড়াচ্ছিল। আক্সিনিয়া আর স্তেপানকে দেখে ওরা হাতের তাস নামিয়ে নীরবে নিজেদের মধ্যে ইশারায় চোখ টেপাটেপি করলে। তারপর ন্যাকামি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসাহাসি করতে লাগল।

আক্সিনিয়া ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি হেসে, যাবার সময় সাদা লেসের-পাড় লাগানো অবিন্যস্ত ওড়নাটা ঠিক করে নিল একবার। ওকে ওরা বিনা মন্তব্যেই চলে যেতে দেয়; কিন্তু স্তেপান ওর পেছন পেছন হেঁটে কসাকদের একটু কাছে এগিয়ে আসতেই আনিকুশ্কা দল ছেড়ে উঠে চলে এল সামনে। খুব ভনিতা করে সম্মান দেখিয়ে স্তেপানকে কুর্নিশ করে উঁচু গলায় বললেঃ

—ছুটির দিনটা তোমার খুব ভালোই কাটল হে...এবার তো উপোস ভাঙলে!

বলতেই স্তেপান হাসে। কসাকরা যে ওকে আর ওর বউকে জঙ্গলের দিক থেকে ফিরে আসতে দেখেছে এতে ও খুশিই হয়। আক্সিনিয়ার সঙ্গে ওর মন কষাকষি হয়েছে বলে যে গুজবটা রটেছিল এতে তা অন্তত খানিকটা কমবে। জোয়ান ছোকরার মতো কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে আপখুশিভাবে দেখিয়ে দেয় ওর শার্টের পেছনটাতে এখনো ঘামের দাগ শুকোয়নি।

এবার স্তেপানের ব্যবহারে আস্কারা পেয়ে কসাকরা হেসে ওঠে আর নানারকম সরস টিপ্পনি ছাড়তে থাকে।

—বউটা কেমন গরম হয়েছে দেখেছিস্ রে! স্তেপানের শার্ট নিংড়োলে এখন জল বেরুবে, ওর কাঁধের সঙ্গে এঁটে গেছে।

—ঘোড়াটাকে খুব জোর দাবড়েছিল, এখন সারা গা দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে ঘোড়ার।

এক ছোকরা মুগ্ধ ঝাপ্সা চোখে পেছন থেকে তাকিয়ে দেখছিল আক্সিনিয়াকে যতোক্ষণ না ও গড়খাইয়ে গিয়ে পৌঁছোয়, তারপর অন্যমনস্কভাবে বলে ফেললঃ

—গোটা দুনিয়াতে এমন খাপসুরত মেয়ে খুঁজে পাবে না, মাইরি বলছি!

জবাবে আনিকুশ্কা পাল্টা প্রশ্ন করলঃ কেন, খুঁজবার চেষ্টা করেছিলে নাকি হে?

ইঙ্গিতপূর্ণ নোংরা মন্তব্যগুলো কানে যেতেই আক্সিনিয়ার মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। স্বামীর সঙ্গে ওর খানিক আগেকার ঘনিষ্ঠতার কথা মনে পড়তে আর তার বন্ধুদের অশ্লীল মন্তব্যগুলো শুনে ঘৃণায় ভুরু কুঁচকে ও গড়খাইয়ের ভেতর ঢুকে পড়ে।

এক নজরেই স্তেপান বুঝে ফেলেছে আক্সিনিয়ার মনের অবস্থা। তাই একটু তোয়াজের সুরে বললেঃ

—ওই মন্দ ঘোড়াগুলোর ওপর রাগ কোরো না, কিউশা! ওরা নিজেরাই সব পাগল হয়ে উঠেছে কিনা তাই।

—রাগ আর কার ওপর করব আমি।— ক্যানভাসের থলিটা হাতড়াতে হাতড়াতে আক্সিনিয়া ভোঁতা গলায় জবাব দেয়। স্বামীর জন্য যে সব জিনিস এনেছিল, তাড়াতাড়ি সব বের করে ফেলে। তারপর আরো চাপা গলায় বলেঃ রাগ হওয়া উচিত ছিল আমার নিজেরই ওপর, কিন্তু সে সাহসটুকু আমার নেই...

কোনো কারণে দুজনের মুখেই আর আলাপের কথা জোগায় না। মিনিট দশেক বাদে আক্‌সানিয়া উঠে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবল—ওকে বলি আমি ভিয়েশেন্‌স্কা চলে যাচ্ছি।— কিন্তু তারপরেই মনে পড়ল স্তেপানের শুকনো কাপড়জামাগুলো তো আনা হয়নি।

গড়খাইয়ের মুখের কাছে অনেকক্ষণ বসে বসে স্বামীর ঘামে-ফেঁসে-যাওয়া পাতলুন আর কোর্তাগুলো মেরামত করল আর মাঝে-মাঝেই তাকাতে লাগল পড়ন্ত সূর্যটার দিকে।

অবিশ্যি সেদিনও রওনা হল না আক্‌সিনিয়া। মনে যথেষ্টরকম জোর পাচ্ছিল না। কিন্তু পরের দিন ভোর হবার আগেই গোছগাছ শুরু করে দিল। স্তেপান ওকে আটকাবার চেষ্টা করে, আরেকটা দিন থাকতে বলে ওর সঙ্গে; কিন্তু এমন জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে আক্‌সিনিয়া যে তর্ক করার চেষ্টা করে না স্তেপান। বিদায় নেবার আগে একবার শুধু বললেঃ

—ভিয়েশেন্‌স্কাতেই থাকবে বলে মনে করেছ?

—হ্যাঁ, আপাতত।

—আমার এখানেও থাকতে পারতে কিন্তু।

—এখানে...কসাকদের মধ্যে থাকাটা আমার পক্ষে ঠিক কাজ হবে না।

—হয়তো তোমার কথাই ঠিক।— স্তেপান সায় দেয় বটে কিন্তু ওর বিদায় দেবার মধ্যে আন্তরিকতা থাকে না।

দক্ষিণ-পুব দিক থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছিল। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বয়ে রাতের দিকটায় শান্ত হয়ে আসে; কিন্তু ভোর নাগাদ বাতাস ফের ট্রান্স-কাস্‌পিয়ান মরুর প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে আসে ডনের দিকে, বাঁ পাড়ের জলা জমিতে আছড়ে পড়ে শিশির শুষে নেয়, ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দেয় কুয়াশা, ডনদেশী পাহাড়ের খড়িমাটি একটা লালচে স্যাঁতসেতে আস্তরে ঢেকে দেয়।

আক্‌সিনিয়া জুতো খুলে ফেলে। বাঁ হাতে ঘাগরার কিনারা উঁচু করে ধরে হাল্‌কা পায়ে হেঁটে চলে বনের পথ ধরে। বনের মধ্যে এখনো শিশির জমে আছে। ভিজে মাটির ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় খালি পা দুটোয় আরাম বোধ হয়। আক্‌সিনিয়ার সুঠাম নিরাবরণ পায়ের গোছ আর ঘাড়ে লোভী বাতাস সাগ্রহে চুম্বন দিয়ে যায়।

একটা খোলা জায়গায় এসে কাঁটা গোলাপ লতার একটা ফুল-ছাওয়া ঝোপের পাশে জিরিয়ে নেবে বলে বসল আক্‌সিনিয়া। কাছেই কোথাও একটা আধ-শুকনো পুকুরের নল-খাগড়ার মধ্যে বুনো হাঁস ডানা ঝাপটাচ্ছে, একটা হাঁস ফ্যাঁসফ্যাঁস করে তার জুটিকে ডাকছে। ডনের ওপারে মেশিনগানের কট্‌কট্‌ আওয়াজ, খুব দ্রুত নয় তবে প্রায় একটানা। অনেকক্ষণ বাদে একেকবার কামানের জোর গর্জন শোনা যায়। এ পারে কামানের গোলার বিস্ফোরণে গুর্‌গুর্‌ করে প্রতিধ্বনি ওঠে। এর পর কামানের আওয়াজ হতে লাগল একটু বিরতি দিয়ে দিয়ে। মাটির বুকে লুকোনো যতো রকমের শব্দ এবার যেন আক্‌সিনিয়ার কানে আসতে থাকেঃ এ্যাশ্‌গাছের সবুজ, সাদা-কিনারাওয়ালা পাতার সঙ্গে পল-কাটা নক্‌শা-তোলা ওকপাতার কাঁপা-কাঁপা মর্মর শব্দ; কচি অ্যাস্‌পেনের ঝোপ থেকে একটা জট-পাকানো চাপা নিঃশ্বাস ভেসে আসে; বহু, বহুদূরে একটা কোকিল অস্পষ্ট করুণ সুরে তার ব্যর্থ দিনগুলোর হিসেব গুনে চলেছে; পুকুরের ওপর দিয়ে

উড়ে যেতে যেতে ঝুঁটিওয়ালা এক বুলবুলি অনবরত ডাকছে 'পি-উ-ই' 'পি-উ-ই' করে। আর্কসিনিয়ার খুব কাছেই বসে একটা ছোট ছাই- রঙা পাখি রাস্তায়-জমা জল খাচ্ছে আর ছোট্ট মাথাটা পেছনে ঘুরিয়ে আরামে চোখ পিট্‌পিট করছে। মখমল-কালো ধুলো-মাখা ভোমরার দল গুন্‌গুন্‌ করে; মেঠো ফুলের পাঁপড়ি ঘিরে দোল খায় কাল্‌চে বুনো মৌমাছিরা, তারপর সুগন্ধ ফুলের রেণু মেখে ওরা অদৃশ্য হয় ফাঁপা গাছের গুঁড়ির ঠান্ডা ছায়ার ফোকলে। পপ্‌লারের ডাল বেয়ে রস গড়াচ্ছে। একটা হথর্ণের ঝোপের তলা থেকে গেল-বছরের পচা পাতার মদো ঝাঁঝালো গন্ধ চুঁইয়ে পড়ছে। নিশ্চল বসে থেকে আর্কসিনিয়া অতৃপ্তের মতো প্রাণ ভরে বনের বিচিত্র গন্ধ অনুভব করে। বহুকণ্ঠের অপূর্ব সুরে ভরা বনভূমি যেন তার বিপুল জৈব অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে। বন্যার পলিমাটি বসন্তের সরসতায় উপচে পড়ছে—এত বিচিত্র রকমের ঘাস পাতা গজিয়েছে তাতে যে ফুল আর তৃণখণ্ডের মেশামেশিতে আর্কসিনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

হাসিমুখে নীরবে ঠোঁট নেড়ে সাবধানে ও নাম-না-জানা হালকা-নীল নরম ফুলগুলোর বোঁটা ছোঁয়, সুডোল কোমরটা বাঁকিয়ে গন্ধ শুঁকতে যায়। তারপর হঠাৎ ওর নাকে আসে পাহাড়ী লিলিফুলের বুক-ভরা কামনাতুর গন্ধ। হাতড়ে হাতড়ে ও খুঁজে বের করে গাছটা, ঠিক ওর পাশেই, একটা ঘন ছায়া-ঢাকা ঝোপের নিচে। চওড়া ফ্যাকাশে সবুজ পাতাগুলো এখনো সযত্নে রোদ আড়াল করে রেখেছে তুষার-সাদা, ছোট-ছোট আলগা-নরম পাঁপড়িওলা ফুলের নুয়ে-পড়া মাটি-ছোঁয়া ডাঁটিগুলোর ওপর থেকে। কিন্তু শিশিরভেজা হলদে রঙ-ধরা পাতাগুলো শুকিয়ে যাবার জোগাড়, ফুলটাতেই ক্ষয়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে এখনই: নিচের দুটো পাঁপড়ি কুঁচকে কালো হয়ে আসছে, শুধু ওপরেরটা শিশিরের ঝিকিমিকি কান্নায় সজল, আচম্‌কা যেন চোখ-ধাঁধানো মন-কাড়া উজ্জ্বল সাদা হয়ে উঠেছে সূর্যের আলো পড়ে।

সামান্য কয়েক লহমার জন্য চোখের জলের আড়াল থেকে ফুলটার দিকে তাকিয়ে থেকে আর করুণ সুঘ্রাণে হঠাৎ কেন যেন আর্কসিনিয়ার মনে পড়ে যায় যৌবনের কথা, সুখ-কৃপণ ওর দীর্ঘ জীবনটির কথা। ও যে বুড়ি হতে চলেছে তাতে আর সন্দেহ নেই।... তরুণী যে সে কি আর আকস্মিক কোনো স্মৃতির আবেশে এমনিভাবে কাঁদতে বসবে?

কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ল আর্কসিনিয়া চোখের জল-মাখা মুখখানা হাতের আড়ালে লুকিয়ে, দলা-পাকানো ওড়নাটার মধ্যে ভিজে, টস্‌টসে গালটা গুঁজে।

বাতাসের জোর বাড়ে, পপ্‌লার আর বেতসের ডগা পশ্চিমদিকে নুয়ে পড়ে। অ্যাস্‌পেনের পাঁশুটে গুঁড়িগুলো দুলতে থাকে চঞ্চল পাতার সাদা ঝোড়ো ঘূর্ণি জড়িয়ে নিয়ে। হাওয়া নেমে আসে আর্কসিনিয়া যে কাঁটা-গোলাপ ঝোপটার নিচে শুয়েছিল সেইখানে, তারপর আচম্‌কা ভড়কে যাওয়া একদল সবুজ পাখির মতো পাতাগুলো উশ্‌খুশ করে লাল পালকের মতো পাঁপড়ি উড়িয়ে শূন্যে উঠে যায়। কাঁটা-গোলাপের ফ্যাকাশে পাঁপড়ি গায়ে ছড়িয়ে আর্কসিনিয়া ঘুমিয়ে থাকে, বনের বিমর্ষ আওয়াজ কিংবা ডনের ওপার থেকে নতুন করে কামানের গর্জন ওর কানেই আসে না। এমন কি আকাশের খাড়া সূর্যটা ওর খোলা মাথা পুড়িয়ে দিচ্ছে তবু ও টের পায় না। হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজ আর ঠিক মাথার কাছেই ঘোড়ার নাকের শব্দ শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসল ও।

কটা-গোঁফ আর সাদা-দাঁতওয়ালা এক কসাক ছোকরা তার জিন-আঁটা সাদা-নাক ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর্কসিনিয়ার পাশে। দাঁত বের করে হাসছে আর কাঁধ

ঝাঁকিয়ে নাচছে। ভাঙা-ভাঙা অথচ বেশ মোটা খাদের সুরে ছোকরা একটা মজার গান গাইতে লাগলঃ

আমি যেমন পড়ি, শুয়েই থাকি
একটি আঁখি ফিরিয়ে দেখি।
এদিকে চাই
ওঁদিকে চাই
হাত বাড়িয়ে কেউ তো নেই।
যেই পেছনে ফেরাই মাথা
সেই দেখি এক কসাক হোথা।

—দরকার নেই, আমি এমনিই উঠতে পারব।— আক্‌সিনিয়া হেসে চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে অগোছালো ঘাগরাটা ঠিক করে নিল।

ফূর্তিবাজ কসাকটা হেসে-হেসে বললে—অতো ঘাবড়িও না পেয়ারী! তোমার পা বুঝি আর চলতে চাইছিল না? নাকি বড়ো আলসেমি ধরেছিল?

একটু লজ্জা পেয়ে আক্‌সিনিয়া জবাব দিলে—ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—ভিয়েশেন্‌স্কায় যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—তোমায় আমি সঙ্গে করে পৌঁছে দিই যদি?

—কিন্তু কিসে করে যাব?

—তুমি ঘোড়ায় ওঠো, আমি হেঁটে যাচ্ছি। আমাকে শুধু একটু...—দুষ্টুমি ইঙ্গিত করে কসাক ছোকরা চোখ টিপল।

—না, তুমিই ঘোড়ায় চাপো. ভগবান্ তোমার সহায় হোন্, আমি পায়ে হেঁটেই চলে যাব।

কিন্তু কসাকটি প্রেমের ব্যাপারে খানিকটা অভিজ্ঞতা আর একটু একগুঁয়েমিরও পরিচয় দেয়। আক্‌সিনিয়াকে ওড়না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে সেই ফাঁকে সে চট্ করে শক্ত হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল, কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেতে চেষ্টা করল।

—গাধার মতো কোরো না!—চেঁচিয়ে উঠে আক্‌সিনিয়া লোকটার নাকের হাড়ের ওপর কনুইয়ের গুঁতো মারে।

—পেয়ারী আমার, ছট্‌ফট্ কোরো না! দ্যাখো না চারদিকে কী সুন্দর সবকিছু। সব প্রাণীই জুটি খোঁজে...এসো না আমরাও একটুখানি পাপই না হয় করলাম..।—ফিসফিস্ করে বলে লোকটা হাসিভরা চোখজোড়া ছোট-ছোট করে। গোঁফ দিয়ে শুড়শুড়ি দেয় আক্‌সিনিয়ার গলায়।

একটুও রাগ না করে আক্‌সিনিয়া হাত দুটো বাড়িয়ে সজোরে ঠেলে সরিয়ে দেয় কসাকটার বাদামি ঘাম-ভেজা মুখখানা। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে সে। কিন্তু লোকটা ওকে শক্ত করে চেপে ধরেছে।

—বোকা কোথাকার! আমার বড়ো খারাপ ব্যায়রাম আছে যে...ছেড়ে দাও বলছি! হাঁপাতে হাঁপাতে বলে আক্‌সিনিয়া। ও ভেবেছিল এরকম একটা সহজ চালাকি খেললে হয়তো লোকটার খপ্‌পর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

কসাকটা কিন্তু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—ওহো...তা কার ব্যায়রামটা বেশি পুরনো বলবে?—বলেই হঠাৎ আলতো করে আক্‌সিনিয়াকে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়।

এবার আক্‌সিনিয়া চট্‌ করে বুঝে ফেললে এখন আর তামাশার সময় নয়, ব্যাপারটা খুব গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রাণপণ শক্তিতে সে কসাকের বাদামি রোদ-পোড়া নাকটার ওপর একটা ঘুষি ঝেড়ে জাপটে-ধরা হাত দুটোর ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে।

—জানিস্‌ আমি গ্রিগর মেলেখফের স্ত্রী! আমার কাছে ঘেঁষিস্‌ এত সাহস তোর, বেটা হারামীর বাচ্চা।...আমি ওকে বলে দেব সব কথা, তোকে এমন আচ্ছামতো দিয়ে দেবে...।

ওর কথাতে যে কাজ হবে এখনো সে ভরসা করতে না পেরে ও একটা শুকনো শক্ত লাঠি তুলে নেয়। কিন্তু কসাক সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নাকের দুই ফুটো দিয়ে প্রচুর রক্ত ঝরছিল। খাকি কোর্তার হাতা দিয়ে জুলফির রক্ত মুছে সে গোঁসা করে বললেঃ

—আচ্ছা বোকা তো! কী বোকা মেয়েমানুষ! আগে সে কথা বলোনি কেন? উঃ, কেমন রক্ত বেরুচ্ছে দ্যাখো তো!... দুশমনরা এত রক্ত ঝরালো আমাদের, তার পরেও কিনা নিজেদের ঘরের কসাক মেয়েরা খুন বইয়ে দিচ্ছে...।

মুহূর্তের জন্য লোকটার মুখটা কালো হয়ে উঠল। রাস্তার ধারে জমা একটু জল নিয়ে সে যখন নাক ধুচ্ছে আক্‌সিনিয়া তখন চট্‌পট রাস্তার মোড় ঘুরে তাড়াতাড়ি বন পার হয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে কসাকও এসে ধরল ওকে। নীরবে হেসে আড়চোখে একবার আক্‌সিনিয়ার দিকে চেয়ে সে বুকের ওপর রাইফেলের ফিতেটা বেশ কায়দা করে টেনে দিল, তারপর জোর কদমে ছুটল সামনের দিকে।

আট ॥

সে রাতে ছোট একটা গ্রামের কাছে লালফৌজের একটা রেজিমেণ্ট ডন পার হল কাঠের তক্তা আর গাছের গুঁড়ির ভেলা বানিয়ে।

গ্রামে যে কসাক স্কোয়াড্রনটা ছিল তারা এমন বিপদের কথা ভাবতেই পারেনি। ওদের বেশির ভাগই তখন এদিক-ওদিক ফূর্তি করতে বেরিয়ে গেছে। সন্ধ্যে লাগতেই কসাকদের আস্তানায় বউরা এসে জুটেছিল স্বামীদের দেখতে। সঙ্গে তারা খাবার, কলসী আর বালতিতে করে ঘর-চোলাই ভদ্‌কাও এনেছিল। মাঝরাত না গড়াতেই সব বেহুঁশ। গড়খাই-ঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল গানের কলি, মাতাল মেয়েদের চিৎকার, বেটাছেলেদের হাসি আর শিস্‌।... যে কুড়িজন কসাকের পাহারা দেবার কথা তারাও জুটে পড়েছিল মাতালদের দলে, মেশিনগানের পাশে তারা শুধু দুজন গোলন্দাজ আর এক বালতি ভদ্‌কা রেখে গেছে।

ডনের ডান পাড় থেকে লাল সেপাই বোঝাই ভেলাগুলো রওনা দিল একেবারে

নিঃশব্দে। উলটো পাড়ে নেমে সেপাইরা সার বেঁধে নীরবে চলতে শুরু করল গড়খাই-আস্তানাগুলোর দিকে। নদী থেকে জায়গাটা প্রায় চারশো ফুট এপাশে।

সেপাই-মিস্তিরিরা যারা ভেলা বানিয়েছিল তারা তাড়াতাড়ি আবার ফিরে চলল নতুন একদল লাল সেপাইকে নিয়ে আসবার জন্য।

বাঁ-পাড়ে শুধু কসাকদের গাওয়া অসংলগ্ন গান ছাড়া মিনিট পাঁচেক আর কোনো আওয়াজই শোনা যায় না। তারপর হাতবোমার গুম্‌গুম্‌ শব্দ শুরু হয়, একটা মেশিন-গান কট্‌কট্‌ করে ওঠে, এলোমেলো রাইফেল ছোঁড়া হতে থাকে। রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেক দূর অবধি শোনা যায় কাঁপা গলায় 'হুর্‌রে' 'হুর্‌রে' আওয়াজ।

স্কোয়াড্রনটা আর টিঁকতে পারল না। সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে পেছু তাড়া করা নেহাৎ অসম্ভব বলেই ওরা পুরোপুরি কচুকাটা হল না।

তেমন কিছু ক্ষয়ক্ষতি পোষাতে হয়নি কসাকদের। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ওরা ভয়ে আধমরা হয়ে এলোমেলো ছুটতে লাগল বন-মাঠের ভেতর দিয়ে ভিয়েশেন্‌স্কার দিকে। কিন্তু নদীর ডান তীর থেকে ততোক্ষণে ভেলায় চেপে নতুন নতুন লাল সেপাই এসে পড়েছে। তৃতীয় রেজিমেণ্টের এক নম্বর ব্যাটেলিয়নের আধ কোম্পানি সৈন্য দু'দুটো মেশিন গান নিয়ে এদিকে লড়াইয়ে নেমে পড়ল বিদ্রোহী বাজ্‌কি রেজিমেণ্টের এক পাশে।

এইভাবে যে ভাঙনটা তৈরি হল সেখানে নতুন নতুন সেপাই আসতে লাগল বটে কিন্তু তারা এগোতে লাগল বড়ো আস্তে; কারণ লালফৌজের কেউ এখানকার রাস্তাঘাট চেনে না, সৈন্যদের পথপ্রদর্শকও নেই। অন্ধকারের মধ্যে চলতে গিয়ে ওরা কেবলই খানা ডোবা আর বানের জল-ভরা গভীর স্রোতের মধ্যে এসে পড়ে। সেগুলো পার হবার কোনো উপায় নেই।

যে ব্রিগেড কমাণ্ডার আক্রমণ পরিচালনা করছিল সে এবার ঠিক করল ভোর না হওয়া অবধি শত্রুর পেছু তাড়া করা বন্ধ থাক। এর মধ্যে সৈন্যদের এনে ভিয়েশেন্‌স্কার রাস্তায় জড়ো করা যাবে, তারপর গোলন্দাজ কামান তৈরি রেখে নতুন করে এগিয়ে যাবার হুকুম দেওয়া হবে।

কিন্তু ভিয়েশেন্‌স্কাতে ততোক্ষণে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হচ্ছিল যাতে ভাঙন ঠেকানো যায়। একজন দূত ঘোড়ায় চেপে এসে লালফৌজের নদী পার হবার খবর দিতেই সেনাপতি-দপ্তরে ডিউটিরত অফিসারটি কুদীনভ আর মেলেখফকে ডেকে পাঠাল। চর্নি, গরোখভ্‌কা আর দুব্রভ্‌কা গ্রাম থেকে কারগিন রেজিমেণ্টের স্কোয়াড্রনগুলোকে ডেকে আনা হল। মোটামুটিভাবে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে গ্রিগর মেলেখফ। ইয়েরিন্‌স্ক গ্রামের বিরুদ্ধে সে তিনশো তলোয়ারধারী সেপাই লাগালো যাতে ফৌজের বাঁ দিকটা জোরদার করা যায় আর পূব দিক থেকে ভিয়েশেন্‌স্কা অবরোধ করতে হলে তাতারস্ক ও লেবিয়াঝি কসাকদের শত্রুর চাপ সহ্য করার মতো সাহায্য দেওয়া যায়। পশ্চিমদিকে ডনের ভাঁটিতে বাজ্‌কি স্কোয়াড্রনকে মদত দেবার জন্য ভিয়েশেন্‌স্কার "বিদেশী" স্বেচ্ছাসেবকদের আর চিরস্কের একটা স্কোয়াড্রন পাঠালো গ্রিগর। আটটা মেশিনগান বসালো বিপজ্জনক এলকায়, আর গ্রিগর নিজেও দুটো ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রন সঙ্গে নিয়ে ভোর প্রায় দুটো নাগাদ বনের ধারে একটা ঘাঁটিতে গিয়ে বসল সূর্য ওঠার অপেক্ষায়। ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে লালফৌজের ওপর কীভাবে হামলা চালাবে তারই মতলব ভাঁজতে লাগল।

সপ্তর্ষির তারা তখনো ম্লান হয়নি আকাশে, এমন সময় ভিয়েশেন্স্কায় "বিদেশী" স্বেচ্ছাসেবক দলটা বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে নদীর পারে বাজ্কির ঘাট অবধি এসে পশ্চাদপসরণকারী বাজ্কি ফৌজের ওপর হামলা করে বসল। ওদের তারা শত্রু বলে ভুল করেছিল। কয়েক মুহূর্ত গুলি চালিয়েই ওরা পালিয়ে গেল। বন-বাদাড় আর ভিয়েশেন্স্কার মাঝখানে প্রকাণ্ড ঝিলটা স্বেচ্ছাসেবকরা হেঁটে পার হল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বুটজুতো আর কাপড়চোপড় ছুঁড়ে ফেলল। ভুলটা ধরা পড়ল খানিক বাদেই, কিন্তু ভিয়েশেন্স্কার দিকে লালফৌজের এগিয়ে আসার খবরটা বিস্ময়কর গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। গাঁয়ের মধ্যে যেসব বাস্তুহারা আস্তানা নিয়েছিল তারাই উত্তরের দিকে পালিয়ে গিয়ে সব জায়গায় গুজব ছড়িয়ে বেড়ালো—লালফৌজ ডন নদী ডিঙিয়ে যুদ্ধসারি ভেঙে ভিয়েশেন্স্কার দিকে এগিয়ে আসছে।

"বিদেশী" স্বেচ্ছাসেবকদের পালানোর খবর পেয়ে গ্রিগর যখন ডনের দিকে ঘোড়া চালিয়ে এল তখন সবে ভোরের আলো ফুটছে। স্বেচ্ছাসেবকরাও এর মধ্যে ওদের ভুল টের পেয়েছিল। তারা এবার গড়খাইয়ের দিকে ফিরে আসছিল খুব বক্‌বক্ করতে করতে। গ্রিগর ওদের দলের সামনে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এসে ঠাট্টা করে বললঃ

—নদী সাঁতরে পার হবার সময় তোমাদের কতোজন ডুবে মরল?

জলে ভিজে চুপ্‌সে যাওয়া এক রাইফেলধারী সেপাই হাঁটতে হাঁটতেই শার্ট নিংড়ে করুণ সুরে বললেঃ

—পাইক মাছের মতো সাঁতার কেটেছি। ডুবতে যাব কেন? শুধু-পাতলুন-পরা আরেকজন সেপাই অল্প কথায় জবাব দেয়—ভুল সবাই করে। কিন্তু আমাদের ট্রুপ কম্যান্ডার সত্যি-সত্যি ডুবে মরতে যাচ্ছিল আর কি। বুট খুলতে চায়নি, ভেবেছিল পট্টি খুলতে অনেক সময় লেগে যাবে। তাই জলের মধ্যেই পট্টি খুলে নেবে ভেবে সাঁতার কাটতে শুরু করল। পায়ে জড়িয়ে গেল পট্টিগুলো...আর তখন কী চিৎকার তার! মাইলখানেক দূর থেকেও গলা শোনা যাচ্ছিল!

স্বেচ্ছাসেবকদের কম্যান্ডারকে পেয়ে গ্রিগর তাকে হুকুম জানিয়ে গেল যেন সে সেপাইদের নিয়ে বনের ধারে চলে যায়, তারপর যেন প্রয়োজন হলে তারা পাশে থেকে লাল সৈন্যসারির ওপর হামলা চালাতে পারে। নিজের স্কোয়াড্রনের দিকেই ফিরে চলল গ্রিগর।

রাস্তায় সেনাপতি-দপ্তরের একজন আরদালির সঙ্গে দেখা। লোকটা ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়াল। জোরে ছুটবার ফলে ঘোড়াটা ভীষণ হাঁপাচ্ছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লোকটা বললেঃ

—আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান!

—কেন, কী হয়েছে?

—কর্তারা আমায় হুকুম দিয়েছেন আপনাকে খবর দেবার জন্য তাতারস্ক কোম্পানি গড়খাই ছেড়ে দিয়েছে। চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাবার ভয়ে ওরা মরুভূমির দিকে পেছু হটে যাচ্ছে। কুদীনভ নিজেই খবর দিয়েছেন আপনাকে সেখানে যাবার জন্য।

একেবারে নতুন ঘোড়া সমেত আধ ট্রুপ কসাক জড়ো করে গ্রিগর বনের ভেতর দিয়ে ছুটল শড়কের দিকে। প্রায় কুড়ি মিনিট জোর কদমে চলার পর তারা গোলি-ইল্‌মেন ঝিলের কাছাকাছি এসে পড়ে। বাঁ দিক দিয়ে মাঠ পার হয়ে তাতারস্কের সেপাইরা ভয়ে ছুটতে থাকে পাগলের মতো। ঝিলের ধার ঘেঁষে ঘাস-বনের ভেতর দিয়ে

লুকিয়ে লুকিয়ে ধীরে-সুস্থে চলে যুদ্ধফেরত সেপাইরা আর বয়স্ক কসাকরা; কিন্তু বেশির ভাগই যতো তাড়াতাড়ি পারে বনের দিকে ছুটে যাবার মতলব নিয়ে সিধে সামনে দৌড়োয়। মাঝে মাঝে মেশিনগান গর্জে উঠলেও ওরা তা গ্রাহ্য করে না।

রাগে চোখদুটো কুঁচকে গ্রিগর চেঁচিয়ে উঠল—পাকড়াও করো ওদের! লাগাও চাবুক!—গ্রিগরই প্রথম ঘোড়া নিয়ে তাড়া করে ছুটল ওর নিজের গাঁয়ের পড়শিদের পেছু পেছু।

দলের একেবারে শেষে হেলতে দুলতে যাচ্ছিল ক্রিস্তোনিয়া। বিশ্রিরকম নেচে-নেচে দুলে-দুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটেছে সে। আগের দিন সন্ধ্যায় মাছ ধরতে গিয়ে শর-বনে পায়ের গোড়ালি কেটেছিল, তাই ওর লম্বা লম্বা ঠ্যাঙের সবটুকু তাকত দিয়ে ছুটতে পারছিল না। মাথার ওপর চাবুক উঁচিয়ে গ্রিগর ওকে এসে ধরল। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে যেতেই ক্রিস্তোনিয়া ফিরে তাকাল। তারপর আরো জোরে ছুটতে শুরু করল সে।

মিছেই গ্রিগর চেঁচাতে থাকে—কোথায় ছুটে যাচ্ছ...? থামো! এই থামো বলছি!

কিন্তু থামবার কোনো বাসনাই নেই ক্রিস্তোনিয়ার। আরো জোরে ছুটতে গিয়ে অদ্ভুত ধরনের উটের মতো ভঙ্গিতে দৌড়োচ্ছে সে।

গ্রিগর খেপে গিয়ে ভাঙা গলায় সাংঘাতিক রকম গালাগাল পাড়তে থাকে, তারপর ঘোড়াটাকে হুমকি দিয়ে, ঘোড়া-সই মাথা নিচু করে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে হাতের চাবুকটা কষিয়ে দেয় ক্রিস্তোনিয়ার ঘাম-ভেজা পিঠে। মার খেয়ে কেঁউ কেঁউ করে ওঠে ক্রিস্তোনিয়া। তারপর পাশের দিকে একটা ভয়ানক রকম লাফ দিয়ে, ঠিক খরগোশের মতো মোচড় খেয়ে মাটিতে বসে পড়ে, তারপর ধীরে ধীরে সাবধানে পিঠে হাত বুলোয়।

গ্রিগরের সঙ্গী কসাকরা পলাতক সেপাইদের আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে, ওদের রুখে দাঁড়ায়, তবে চাবুক হাঁকায় না।

ভাঙা গলায় গ্রিগর চেঁচায় "চাবুক মারো...! চাবুক কষাও...!" আর কারুকাজ-করা চাবুকটা তড়পাতে থাকে। ওর ঘোড়াটা গা মোড়ামুড়ি করে পেছন দিকে হটে আসে, আর এগিয়ে যেতে চায় না। কষ্টেসৃষ্টে ঘোড়াটাকে বশ করে সে সামনে দৌড়োনো লোক-গুলোর পিঠের কাছে চলে আসে। সামনে ছিটকে বেরিয়ে যাবার সময় নিমেষের জন্য ওর চোখে পড়ল, একটা ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে আছে স্তেপান আস্তাখফ। মিটমিট করে হাসছে। গ্রিগর দেখল আনিকুশ্‌কা হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ার জোগাড়। হাত দুটো মুখের ওপর রেখে তীক্ষ্ণ মেয়েলি কণ্ঠে চিৎকার করছেঃ

—ভাইসব! যে যারটা সামলাও! লালফৌজ আসছে! চেপে ধরো বেটাদের!

আস্তর-লাগানো জার্কিন-পরা আরেকজন পড়শির পেছনে ধাওয়া করল গ্রিগর। লোকটার যেমন দম তেমনি হাল্‌কা পায়ে ছুটছে। গোল-কাঁধওয়ালা মূর্তিটা যেন অদ্ভুত-রকম চেনা-চেনা মনে হয়, অথচ গ্রিগর ঠিক করতে পারে না লোকটা কে। বেশ একটু পেছন থেকেই চেঁচাতে থাকেঃ

—দাঁড়া, এই বেটা হারামীর বাচ্চা! দাঁড়া, নয়তো কেটে ফেলব!

হঠাৎ জার্কিন-পরা লোকটার গতি শ্লথ হয়ে আসে। সে থেমে পড়ে। লোকটা ঘুরতেই গ্রিগরের সামনে ছেলেবেলা থেকে চেনা সেই মার্কামারা চেহারার ভঙ্গিটা ফুটে ওঠে, চরম রাগের চিহ্ন তাতে। লোকটার চেহারার পুরো আদল নজরে পড়ার আগেই অবাক হয়ে গ্রিগর আন্দাজ করে—এ তার বাবা।

পান্তালিমন গ্রিগরিয়েভিচের গাল দুটো রাগে কাঁপছে।

চড়া, ভাঙা-ভাঙা গলায় সে চেঁচিয়ে বলে—তাহলে তোর নিজের বাপকেই হারামীর বাচ্চা বলছিস? তুই তোর বাপকেই কেটে ফেলবি বলে ভয় দেখাচ্ছিস?

গ্রিগরের অনেককালের চেনা একটা বেসামাল রাগের আগুন এমনভাবে জ্বলে ওঠে বুড়োর চোখে যে সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রিগরের রাগ পড়ে যায়। জোরে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে ও চেঁচায়ঃ

—পেছন থেকে তোমাকে যে চিনতে পারিনি! কেন এত চেঁচাচ্ছ বাবা?

—'চিনতে পারোনি' মানে কি? তোমার নিজের বাপকেও চিনতে পারোনি?

বুড়োর অভিমানটা এমনই খাপছাড়া আর অকারণ যে গ্রিগর হাসতে হাসতে বাপের পাশাপাশি ঘোড়া এনে দাঁড় করায়। নরম সুরে বলেঃ

—বাবা, পাগলামো কোরো না! এমন একটা কোট গায়ে দিয়েছ যা আমি আগে কখনো দেখিনি। তাছাড়া রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়োচ্ছ, খোঁড়াচ্ছ না একটুও। তাহলে কেমন করে চিনব বলো?

আগের দিনে বাড়িতে ঠিক যেমন হত তেমনিভাবে পান্তালিমন চুপ মেরে গেল। ভয়ানক হাঁপাতে থাকলেও নিজেকে বেশ খানিকটা সামলে নিয়ে শেষে সায় দিয়ে বললেঃ

—তা ঠিকই বলেছিস, কোটটা নতুন; আমার ভেড়ার-চামড়ার কোটটা বদলে এটা এনেছিলাম। ভেড়ার চামড়া বড্ডো ভারী, বওয়া যায় না। . কিন্তু খোঁড়া পায়ের কথা যে বলছিস. এখন কি আর খুঁড়িয়ে চলার সময়? ও সবের এখন কথাই নয় রে খোকা!... মরণ শিয়রে, এদিকে তুই খোঁড়া পা নিয়ে বক্‌বক্‌ করছিস

–মরণের এখনো ঢের দেরি। ফিরে এসো বাবা! কার্তুজগুলো ফেলে দাওনি তো?

–কিন্তু ফিরে যাব কোথায়?—রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করে বুড়ো।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রিগর চড়া গলায় প্রত্যেকটা কথার ওপর জোর দিয়ে দিয়ে হুকুম করেঃ

—আমি হুকুম করছি ফিরে এসো! জানো লড়াইয়ের সময় কমান্ডারের হুকুম না মানলে আমাদের কানুনে কী বলে?

কথায় কাজ হলঃ পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ কাঁধের ওপর রাইফেলটা ঠিক করে নিয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে ধুঁকে ধুঁকে চলে। আরেকজন বুড়ো ওর চেয়েও আস্তে আস্তে হাঁটছিল। পান্তালিমন তার পাশাপাশি এসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেঃ

—এই তো সব হয়েছে আজকালকার ছেলেপিলেরা! কোথায় বলে বাপকে ভক্তি-ছেরেদ্দা করবে, লড়াই থেকে রেহাই দেবে, তা না চেষ্টা করছে, কী করে লড়াইয়ের মধ্যে বেশি করে পাঠানো যায়! হ্যাঁ ভাই! এখন দেখছি আমার পিয়োত্রাটাই ছিল অনেক ভাল—ঈশ্বর ওকে কৃপা করুন। বেশ ঠান্ডা প্রকৃতির ছেলে ছিল। আর এই পাগলাটা, মানে গ্রিশ্‌কা, যদিও ডিভিশনের কমান্ডার, যোগ্যতাও আছে, সব কিছু আছে, তবু যেন কেমন এক রকম। আমার সারা গায়ে জখম, অথচ ছুঁতে পারব না! আমার এ বয়েসে তা উনোনের ধারে উঠে গনগনে গরম ছুঁচের ওপর বসার সামিল হবে।

তাতারস্ক কসাকদের মাথায় কান্ডজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে বেশি কষ্ট পেতে হল না! তাড়াতাড়ি গোটা কোম্পানিটাকে জড়ো করে গ্রিগর তাদের সঙ্গে নিয়ে চলল। ঘোড়া থেকে না নেমে সংক্ষেপে ওদের বোঝালোঃ

—লালফৌজ নদী পার হয়েছে। তারা ভিয়েশেন্‌স্কা দখল করার চেষ্টায় আছে। ডনের পার ধরে শুরু হয়েছে লড়াই। ব্যাপারটা তামাশার নয়, বিনা কারণে তোমাদের

পালাতেও বলছি না। দ্বিতীয়বার যদি পালাও তাহলে ইয়েরিন্‌স্ক্‌-এর ঘোড়সওয়ারদের হুকুম দেব বেইমান বলে তোমাদের কেটে ফেলবে!—গাঁয়ের পাড়া-পড়শিদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয় গ্রিগর, ওদের নানা ছাঁদের পোশাক-আশাকের দিকে তাকায়, তারপর সোজাসুজি বিদ্রূপের সুরে বলে—তোমাদের কোম্পানির ভেতর যতো সব বাজে চীজের আমদানি হয়েছে, তারাই আতঙ্ক ছড়ায়। বেশ লড়িয়ে সব তোমরা!— পালিয়ে গিয়ে পাতলুন নোংরা করছ! নিজেদের আবার কসাক বলো তোমরা! আর, এই বুড়োর দল, আমার দিকে তাকাও! তোমরা বলেছিলে লড়বে, আর এখন দু'পায়ের মধ্যে মাথা লুকোবার কী হল? এখ্‌খুনি ফৌজের সারিতে দাঁড়িয়ে যাও। ডবল কদমে হেঁটে ওই ঝোপগুলোর দিকে চলো, সেখান থেকে ডনের পাড়ে! তারপর ডনের পাড় ধরে সেমিওনভ্‌স্কি কোম্পানির কাছে যেতে হবে। ওদের সঙ্গে হাত মেলাবার পর লালদের ওপর হামলা। পাশ থেকে আক্রমণ করতে হবে। কুইক্‌ মার্চ! জলদি করো!

তাতারস্কের লোকরা নীরবে শুনে গেল কথাগুলো, চুপচাপ এগিয়ে চলল ঝোপগুলোর দিকে। বুড়োরা নিরাশ হয়ে কাতরাচ্ছিল। গ্রিগর আর তার সঙ্গী কসাকরা তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবার সময় ওরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। পান্তালিমনের পাশাপাশি হাঁটছিল বুড়ো অবনিজভ। তারিফের সুরে সে বললেঃ

—তবে তোমার পুত্রটিকে ভগবান্‌ যা দিয়েছেন, বীর ছেলের বাপ হয়েছ তুমি। খাঁটি ঈগলের তেজ! ক্রিস্তোনিয়ার পিঠের ওপর চাবুকটা কী জোর কষাল। প্রত্যেকটা লোককে জোড়ায় জোড়ায় ধরে এনে ফের দাঁড় করিয়েছে!

অবনিজভের কথায় পান্তালিমনের পিতৃ-হৃদয় গর্বে ফুলে ওঠে। খুশি হয়েই জবাব দেয় সেঃ

—সে কথা আর নাই বললে! ওর মতো একটা ছেলে খুঁজে পেতে হলে সারা দুনিয়া চষে ফেলতে হয়! বুক ভর্তি মেডেল দেখেছ তো—চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ পিয়োত্রা, যদিও আমার নিজেরই বড়ো ছেলে সে,—ও এমনটা ছিল না। বড্ডো বেশি ঠান্ডা মেজাজ ছিল ওর, সে তেজই ওর ছিল না, মরে গিয়ে আপদ চুকেছে! গায়ে উর্দি থাকলে কী হয়, বুকের ভেতরটায় মেয়েমানুষের প্রাণ। আর ইটি হয়েছে ঠিক আমারই মতো! আমার চেয়েও তাকত বেশি রাখে!

* *

অর্ধেক ফৌজ নিয়ে গ্রিগর চুপি চুপি এগোলো কালমিক পারঘাটার দিকে। বন অবধি পৌঁছোনো পর্যন্ত ওদের ধারণা ছিল কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু নদীর ওপারের একটা তদারকী-ঘাঁটির নজরে পড়ে গেল ওরা। একদল বন্দুকধারী জোর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। প্রথম গোলাটা বেতসবনের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে একটা কাদাডোবার মধ্যে ছপ্‌ করে পড়ে, কিন্তু ফাটে না। দ্বিতীয়টা পড়ে রাস্তার কাছাকাছি একটা বুড়ো কালো পপ্‌লার গাছের শেকড়বাকড়ের মধ্যে। আগুন ছড়িয়ে, দারুণ গর্জনে কসাকদের কানে তালা ধরিয়ে দেয়। নরম মাটির দলা আর পচা কাঠের টুকরো এসে পড়ে ওদের ওপর।

কান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গ্রিগরেরও, আপনা থেকেই হাত তুলে চোখটা আড়াল করে সে ঝুঁকে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। টের পেল ঘোড়ার দুম্‌চিটার ওপরেই নিশ্চয় একটা ভারি ভিজে জিনিস এসে পড়ল।

বিস্ফোরণে মাটি কেঁপে ওঠে, কসাকদের ঘোড়াগুলো মাটিতে বসে পড়েই আবার সামনে ছুটে চলে, যেন কেউ ওদের সে হুকুম দিয়েছে। কিন্তু গ্রিগরের ঘোড়াটা সজোরে পেছিয়ে আসে, মাটিতে বসে পড়ে আস্তে আস্তে গড়াতে থাকে। গ্রিগর চট্ করে জিন ছেড়ে লাফিয়ে নেমে ঘোড়ার মুখের লাগাম-লোহাটা ধরে। আরো দুটো গোলা ছুটে গেল। তারপর বনের ধারে খানিকক্ষণ স্বস্তিকর নীরবতা। বারুদের ধোঁয়া থিতিয়ে বসছে ঘাসের ওপর; টাটকা ওপড়ানো মাটি, কাঠের চিলতে আর আধ পচা ডাল-পালার গন্ধ। অনেক দূরে একটা খোপের ভেতর ম্যাগ্‌পাই কিচ্‌মিচ্ করছে মহা ব্যস্ত হয়ে।

গ্রিগরের ঘোড়াটা নাক দিয়ে শব্দ করে, পেছনের পা দুটো কাঁপতে কাঁপতে শিথিল হয়ে আসে। যন্ত্রণায় হল্‌দে দাঁতের পাটি বের করে গলাটাকে সামনে লম্বা করে বাড়িয়ে দেয়। মখমলের মতো ধূসর মুখটা থেকে লাল গাঁজলা উঠছে। সারা শরীরে একটা ভয়ানক ঝাঁকুনি দিয়ে বাদামি চামড়ার নিচে কাঁপুনি খেলে যায় ঢেউয়ের মতো।

ঘোড়ায় চেপে একজন কসাক এগিয়ে এসে উঁচু গলায় বললে—শেষ হয়ে গেল নাকি হুজুর? কোনো জবাব না দিয়ে ঘোড়াটার ফ্যাকাশে চোখের দিকে তাকায় গ্রিগর। জখমটার দিকে একবারও নজর দেয় না, শুধু ঘোড়াটা যখন অনিশ্চিতের মতো ভড়বড় করে সামনে এগিয়ে শরীর গুটিয়ে নিয়ে ঝপ্ করে হাঁটু মুড়ে বসে তখন ও খানিকটা সরে যায়। মাথা নিচু করে ঘোড়াটা যেন কোনো কারণে তার মনিবের কাছে ক্ষমা চায়। একটা চাপা গোঙানির সঙ্গে ঘোড়াটা এক পাশে কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল, একবার চেষ্টা করল মাথাটা তুলতে। কিন্তু এতক্ষণে ওর সব শক্তি নিঃশেষ; কাঁপুনিটা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল। চোখজোড়া চক্‌চক্ করছে, কাঁধের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। শুধু খুরের কাছে পায়ের গোছের চুলগুলো শেষবারের মতো একবার সামান্য কেঁপে ওঠে। তির-তির করে নড়তে থাকে জিনের ঘষা পিঠটা।

ঘোড়ার বাঁ কুঁচকির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গ্রিগর একটা গভীর কাটা জখম লক্ষ্য করে—কালো গরম রক্ত বেরিয়ে আসছে। কসাকটা ঘোড়া থেকে নামতেই গ্রিগর চোখের জল না মুছে বিড়বিড় করে বলে—এক বুলেটে সাবাড় করে দাও!—নিজের মসার পিস্তলখানা ওর হাতে তুলে দিল গ্রিগর।

কসাকের ঘোড়ায় চেপে ও যেখানে স্কোয়াড্রনগুলোকে রেখে এসেছিল সেইখানে ছোটে। গিয়ে দ্যাখে লড়াই এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

ভোরের দিকে লালফৌজী সেপাইরা নতুন করে হামলা শুরু করেছিল। কুয়াশার স্রোতের মধ্যে ওদের সৈন্যরা নীরবে ভিয়োশেনস্কার দিকে মার্চ করে চলেছে। ডান দিকে ওরা মিনিট খানেকের জন্য একটা জলা ডোবার মধ্যে আটক পড়ে। তারপর বুক অবধি জল ঠেলে এগোয় কার্তুজের থলি আর রাইফেলগুলো উঁচুতে তুলে। খানিক বাদে চারটে কামান এক সঙ্গে গম্ভীরভাবে গর্জন করে ওঠে ডন এলাকার পাহাড় থেকে। পাখার মতো দেখতে গোলার ঝাঁক বনের ভেতর দিয়ে ছুটে যেতেই বিদ্রোহীরাও গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। লালফৌজ মার্চ করতে করতে এখন রাইফেল টেনে নিয়ে দৌড়োতে থাকে। বনের ভেতর শ্রাপ্‌নেল ফাটলো ওদের সামনে প্রায় আধ মাইল দূরে। গোলার ঘায়ে টুকরো টুকরো হয়ে গাছগুলো মাটিতে ছিট্‌কে পড়েছে; সাদা মেঘের মতো ধোঁয়া উঠছে। দুটো মেশিনগান পর পর কাটা-কাটা আওয়াজ করে চলল। লালফৌজের সামনের সারিতে সেপাইরা গিয়ে দাঁড়াতে থাকে। এক-এক করে বুলেটে জখম হতে থাকে নতুন নতুন মানুষ।

কেউ উপড়ে হয়ে কেউ চিৎ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্যরা কেউ শুয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল না, তাদের আর জঙ্গলের মাঝখানের দূরত্বটা ক্রমেই কমে আসে।

দ্বিতীয় সারিটার সামনে ঢ্যাঙা খালি-মাথা একজন কমান্ডার বেশ স্বচ্ছন্দে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছিল। লোকটার শরীরের সামনের দিকটা একটু ঝুঁকে পড়েছে, গ্রেট-কোটের কিনারা উঁচুতে তোলা। এগিয়ে যেতে যেতে সেপাইদের সারিটার গতি মুহূর্তের জন্য শ্লথ হয়ে আসে। কিন্তু কমান্ডার দৌড়োতে দৌড়োতেই চিৎকার করে কী যেন বললে। সেপাইরা আবার ছুটতে শুরু করল। ওদের ভাঙা গলায় বিকট 'হুর্‌রে' আওয়াজ এখন যেন চরমে উঠেছে।

কসাকদের মেশিনগানগুলো একসঙ্গে গর্জাতে শুরু করে এবার। বনের ধার থেকেও রাইফেল ছোঁড়ার জোর শব্দ হতে থাকে একটানা, দ্রুত। গ্রিগর ওর স্কোয়াড্রনদের নিয়ে বনের একটা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিল। পেছনে কোত্থেকে যেন বাজ্‌কি কোম্পানির ভারি মেশিনগানখানা অনেকক্ষণ ধরে গুলি ছুঁড়তে লাগল। লাল সৈন্যসারিটা একবার নড়ে-চড়ে শুয়ে পড়ে পাল্‌টা গুলি চালাতে লাগল। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে চলল লড়াই। কিন্তু বিদ্রোহীদের গুলিগোলায় কাজ হয়েছে—দ্বিতীয় সারির সেপাইরা আর তিষ্ঠোতে পারল না। তারা উঠে পড়ে ছুটে পালাতে লাগল তিন নম্বর সারির সঙ্গে মিশবে বলে। তিন নম্বর দলটা অল্প অল্প করে এগিয়ে আসছিল তখন। একটু বাদে লালফৌজের সেপাইরা এলোমেলো দৌড়োতে লাগল বনের ভেতরে ঘেসো জমিগুলোর মধ্যে। গ্রিগর ওর স্কোয়াড্রনগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ওদের সারবন্দী করে সাজিয়ে লাল সেপাইদের পেছু তাড়া করল সে। বনের ধারে ঠিক নদীর পাড়টিতে শুরু হল লড়াই। লালফৌজের সেপাইদের একটা অংশ মাত্র কোনোরকমে রাস্তা করে নিয়ে ছুটল ভেলাগুলোর দিকে। ভিড় করে ভেলার প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা দখল করে ওরা রওনা হয়ে গেল। বাদবাকি সেপাইরা মার খেতে খেতে নদীর একেবারে কিনারা অবধি নেমে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল।

স্কোয়াড্রনদের ঘোড়া থেকে নামিয়ে, যে-সব কসাকের হাতে ঘোড়ার ভার রয়েছে তারা যাতে বনের বাইরে না আসে সেই হুকুম দিয়ে অন্যদের নিয়ে গ্রিগর নদীর পাড়ে চলে গেল। এ-গাছ থেকে সে-গাছ অবধি দৌড়ে দৌড়ে ওরা ক্রমেই নদীর কাছাকাছি আসে। প্রায় দেড়শো লালফৌজী-সেপাই হামলাদার বিদ্রোহী পদাতিকদের হাতবোমা আর মেশিন-গান ছুঁড়ে পালটা মার দিচ্ছে। ভেলাগুলো আবার রওনা দিয়েছিল বাঁ পাড়ের দিকে, কিন্তু গুলি চালিয়ে বাজ্‌কি কসাকরা প্রায় প্রত্যেকটি দাঁড়িকে ডুবিয়ে দিল। ডান পাড়ে যেসব সেপাই রয়ে গেল তাদের কপালে যা হবার তা হবে। মনের জোর খুইয়ে ওরা রাইফেল ছুঁড়ে সাঁতার কাটবার চেষ্টা করতে লাগল। নদীর পাড়ে গর্তগুলোর ভেতর শুয়ে পড়ে ওদের নিশানা করে গুলি ছুঁড়ছে বিদ্রোহীরা। নদীর প্রখর স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ওরা অনেকেই ডুবে মরল। মাত্র দুজন নিরাপদে পার হতে পেরেছে। ওদের মধ্যে একজন খালাসীদের ডোরাদার গেঞ্জি পরা, নিশ্চয়ই পাকা সাঁতারু সে। নদীর খাড়া পাড় থেকে খানিক দূরেই জলের তলায় ডুব দিয়ে সে একেবারে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে ফের মাথা তোলে। একটা উইলোগাছের ছড়ানো নেড়া শেকড়ের আড়ালে লুকিয়ে গ্রিগর লক্ষ্য করছিল লোকটা লম্বা হাতে সাঁতার কেটে নদীর প্রায় ও-পাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। আরেকজনও নিরাপদে সাঁতার কেটে পার হল। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে লোকটা বন্দুক চালিয়ে বাকি কার্তুজগুলোও শেষ করে। কসাকদের উদ্দেশ করে হাতের মুঠি পাকিয়ে

চেঁচিয়ে সে কী যেন বলতে থাকে। তারপর কোণাকুণি সাঁতার কেটে এগোয়। লোকটার আশেপাশে জলের মধ্যে বুলেট ছিটকে পড়ছে। কিন্তু একটাও তার গায়ে লাগছে না। ডাঙার দিকে এক জায়গায় গরু বাছুরদের আগে জল খাওয়ানো হত, সেইখানে সে জল থেকে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে ধীরে সুস্থে পাড় ধরে এগোতে লাগল ওপারের গাঁয়ের দিকে।

নদীর ওপারে যেসব লালফৌজী সেপাই রয়ে গিয়েছিল তারা একটা বালির ঢিবির আড়ালে লুকিয়েছে। জল-ঘড়ার মধ্যে যতোক্ষণ না জল গরম হয়ে ফুটে ওঠে ততোক্ষণ অবধি ওদের মেশিন-গান সমানে গর্জাতে থাকে।

মেশিনগানটা ক্ষান্তি দিতেই গ্রিগর চুপিচুপি হুকুম দিলে আমার পেছন পিছন এসো! তলোয়ারটা টেনে নিয়ে ও এগোতে লাগল বালির ঢিবিটার দিকে।

পেছনে কসাকরা আসছে হাঁপাতে হাঁপাতে।

লালফৌজী সেপাইদের সঙ্গে ওদের তফাৎ যখন তিনশো ফুটও হবে না, সেই সময় তিনবার কামানের আওয়াজ হল—তারপর ঢিবির আড়াল থেকে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াল একজন কম্যান্ডার; ঢ্যাঙা, কালো জুল্‌ফিওলা কাল্‌চেপানা মুখ। চামড়ার জ্যাকেট পরা একটি স্ত্রীলোক তাকে হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে। কম্যান্ডারটি আহত। ভাঙা পাখানা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে ঢিবির ওপাশ থেকে সে বেরিয়ে এল। সঙীন-বসানো রাইফেলখানা শক্ত করে চেপে ধরে ভাঙা গলায় হুকুম দিলেঃ

—কমরেড্‌স্‌! এগিয়ে যাও! শ্বেতরক্ষীদের খতম করো!

"আন্তর্জাতিক" গান গাইতে গাইতে একদল সাহসী যোদ্ধা এগিয়ে এল পাল্‌টা আক্রমণ করতে। মৃত্যুর মুখোমুখি।

ডন নদীর পারে শেষ যে একশো-ষোলজন ধরাশায়ী হল তারা সবাই আন্তর্জাতিক ফৌজী কোম্পানির কমিউনিস্ট সদস্য।

॥ নয় ॥

সদর ঘাঁটি থেকে গ্রিগর যখন নিজের আস্তানায় ফিরে এলো তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। প্রোখর জাইকভ ওর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল পাল্লা ফটকটার কাছে।

গ্রিগর জোর করে গলার স্বরে একটা উদাসীনভাব ভাব এনে জিজ্ঞেস করল আক্‌সিনিয়ার কোনো খবর নেই?

প্রোখর হাই তুলে জবাব দিলে—না, কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে!— কিন্তু মনে মনে ও তখন শঙ্কিত হয়ে ভাবছে—দোহাই ভগবান্‌, আবার যেন আমাকে জোর করে খুঁজতে না পাঠায়! যতো রাজ্যের ঝামেলা আমার ওপর।

গ্রিগর বিরক্তির সঙ্গে বললে—একটু জল আনো তো গা-টা ধুয়ে ফেলি। সারা গায়ে ঘাম চট্‌চট্‌ করছে। জলদি!

জল আনতে বাড়ির ভেতর ঢোকে প্রোখর। গ্রিগরের হাতের আঁজলায় একটু একটু করে জল ঢেলে দেয়। গ্রিগরের বেশ আরামই লাগছিল হাত মুখ ধুতে। ঘেমো গন্ধওয়ালা কোর্তাটা টেনে উঠিয়ে বললেঃ

—পিঠের ওপরেও একটুখানি ঢেলে দাও তো!

ঘাম-ভেজা পিঠখানা ঠাণ্ডা জল লেগে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। গ্রিগর ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ছাড়ে; ছড়ে-যাওয়া কাঁধ আর লোমশ বুকে হাত ঘষে। একটা পরিষ্কার 'ঘোড়ার পিঠ-মোছা' তোয়ালে দিয়ে গা মুছে এবার বেশ ফুর্তিভরা গলায় ও প্রোখরকে হুকুম দেয়ঃ

—সকালে আমার জন্য একটা নতুন ঘোড়া আসছে। সেটাকে বেশ করে দলাই-মলাই করবে, তারপর একটু দানা খাওয়াবে। আমাকে ঘুম থেকে তুলো না। যতোক্ষণ পারা যায় ঘুমিয়ে নেব। তবে সদর দপ্তর থেকে কেউ এলে জাগিয়ে দিও। বুঝতে পেরেছ?

চালাঘরের ছাপ্তির নিচে গিয়ে একটা গাড়ির ভেতর শোয় গ্রিগর। সঙ্গে সঙ্গে মরার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা বোধ করে। পা গুটিয়ে, শিশির-ভেজা গ্রেটকোটখানা টেনে গায়ে জড়িয়ে নেয়। কিন্তু সূর্য ওঠার পর সে ফের ঝিমুতে শুরু করে। প্রায় সাতটা নাগাদ কামানের ভারি গর্জনে ওর ঘুম ভেঙে গেল। গ্রামের পরিষ্কার নীল আকাশে একটা ম্যাড়মেড়ে রুপোলি রং-করা এরোপ্লেন চক্কোর দিচ্ছিল: নদীর ওপার থেকে সেটাকে লক্ষ্য করে কামান আর মেশিনগান ছোঁড়া হচ্ছে।

প্রোখর বিড়বিড়িয়ে বললে—কে জানে হয়তো ঠিক লেগে যাবে!— খুঁটিতে বাঁধা একটা উঁচু পাটকিলে রঙের ঘোড়াকে মহা-উৎসাহে দলাই-মলাই করছিল প্রোখর।—এই দ্যাখো পান্তালিয়েভিচ, দাখো কী চিজ্ ওরা পাঠিয়েছে তোমাকে!

গ্রিগর ঘোড়াটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেশ তৃপ্তির সুরে বললেঃ

—এখনো দেখিনি, দাঁড়াও। বয়েস কতো? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে ছ'বছরে পড়েছে?

—হ্যা, ছ'বছরই।

—বাঃ চমৎকার! পাগুলো বেশ দুরুস্ত, চারটেতেই আবার মোজা। সুন্দর ছোট্ট জানোয়ারটি! বেশ, এবার জিন চাপাও, একবার চড়ে দেখি কেমন জিনিস এল।

হ্যাঁ, ঘোড়া ভালো, তাতে সন্দেহ নেই। জোরে দৌড়োতে নিশ্চয়ই পারবে। সব রকম লক্ষণ দেখে তো মনে হয় খুব তেজীয়ান ঘোড়া।— জিনের পেটি আঁটতে আঁটতে বিড়বিড় করে বলে প্রোখর।

এবার আরেকটা ছোট্ট সাদা ধোঁয়াটে শ্রাপ্‌নেলের মেঘ ফেটে পড়ল এরোপ্লেনের গা ঘেঁষে।

মাটিতে নামার মতো ভালো একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে বিমানচালক চট্ করে নিচে নেমে এল। ঘোড়ায় চেপে গ্রিগর ফটক খুলে ছুটে চলল গাঁয়ের আস্তাবলগুলোর দিকে—এরোপ্লেনটা নেমেছে আস্তাবলের ওপাশে।

আগে ওগুলোতে গাঁয়ের ঘোড়া রাখা হত। গাঁয়ের প্রান্তে লম্বা পাথুরে বাড়ি। আটশো লালরক্ষী বন্দীকে সেখানে গাদাগাদি আটক করে রাখা হয়েছে। পাহারাদাররা তাজা হাওয়া কিংবা ব্যায়ামের জন্য ওদের বাইরেও আসতে দেয় না। গোটা জায়গাটাতে একটা বসবার টুল অবধি নেই। মানুষের মলের দুর্গন্ধ একটা ভারি দেয়ালের মতো বাড়ির সব জায়গা জুড়ে। দরজার নিচে দিয়ে গড়িয়ে আসছে ভ্যাপসা-গন্ধ প্রস্রাবের স্রোত। তার ওপর ভন্‌ভন্ করছে সবুজ মাছিগুলো।

কয়েদীদের এই বন্দীশালা থেকে দিন রাত চাপা কাতরানির আওয়াজ ভেসে আসে। শ'য়ে শ'য়ে বন্দী মারা যাচ্ছে জীবনশক্তি নিঃশেষ হয়ে, টাইফাস আর আমাশার মহামারীতে। অনেক সময় দিনের পর দিন মড়া যেমনকার তেমনি পড়ে থাকে।

আস্তাবল ঘুরে ওপাশে গিয়ে গ্রিগর ঘোড়া থেকে নামবার জোগাড় করছে এমন সময় ডনের ওপার থেকে আবার গর্জে উঠল কামান। গোলার তীক্ষ্ণ চিৎকার ক্রমেই জোরালো হয়ে ছুটে আসে, তারপর বিস্ফোরণের প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে তা মিলে যায়।

বিমানচালক আর অফিসারটি তখন সবে আসন ছেড়ে উঠছে, কসাকরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওদের যন্ত্রটাকে। কিন্তু ঠিক সেই সময় পাহাড়ের সমস্ত কামানগুলো একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। আস্তাবলের আশেপাশে নির্ভুল নিশানায় এসে পড়তে লাগল গোলাগুলো।

বিমানচালক তাড়াতাড়ি ফের আসনে গিয়ে বসে, কিন্তু ইঞ্জিন চলতে চায় না।

বিমানচালকের সঙ্গী অফিসারটি চড়া গলায় হুকুম করলেন—ঠেলে নিয়ে চলো! —তারপর নিজেই এক পাশের ডানা ঠেলতে লাগলেন। একটু দুলে উঠে এরোপ্লেনটা অনায়াসে সরে যেতে লাগল কতগুলো পাইনগাছের দিকে। এরোপ্লেনের সঙ্গে-সঙ্গে গুলিগোলাও পড়তে-পড়তে চলেছে। একটা গোলা সিধে এসে পড়ল কয়েদীদের ভিড়ে-ঠাসা আস্তাবলের ওপর। একরাশ ধোঁয়া আর চুণবালির গুঁড়োর মধ্যে আস্তাবলের একটা কোণা ধসে পড়ল। ভয়ার্ত কয়েদীদের আদিম বন্য চিৎকারে কেঁপে উঠছে আস্তাবলটা। তিনজন কয়েদী ভাঙা-দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু কসাকদের এলোপাথাড়ি গুলিতে তারা ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

গ্রিগর ঘোড়া চালিয়ে এক পাশে ছুটে যায়।

ও এগিয়ে যাবার সময় একজন কসাক ভয়ে চোখ বড়ো-বড়ো করে চিৎকার করে ওঠে—গুলি লেগে যাবে যে! পাইন ঝোপের দিকে ছুটে যাও!

গ্রিগর মনে মনে ভাবল কথাটা বলেছে ঠিকই, সত্যি-সত্যিই এক-আধজন খতম হতে কতোক্ষণ! তামাশার কথা নয়! - আস্তে আস্তে নিজের আস্তানার দিকে ফিরে আসে গ্রিগর।

সেদিন কুদীনভ সেনাপতি-দপ্তরে একটা অত্যন্ত গোপনীয় বৈঠক ডেকেছে। গ্রিগরকে ডাকেনি সে-বৈঠকে। এরোপ্লেনে চেপে যে অফিসারটি এসেছিলেন তিনি সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন যে এখন যে-কোনো দিন কমেন্স্কায়ার আশপাশে মোতায়েন-করা ঝটিকা-বাহিনী লালরক্ষীদের রণাঙ্গনে ভাঙন ধরিয়ে দেবে, আর জেনারেল সেক্রেতভের নায়কত্বায় ডন বাহিনীর একটা ঘোড়সওয়ার ডিভিশন বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য এগিয়ে আসবে। অফিসার প্রস্তাব করলেন এই মুহূর্তে নদী পারাপারের একটা বন্দোবস্ত করা হোক যাতে সেক্রেতভের ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর বিদ্রোহী ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্টগুলোকে ডনের ডান পাড়ে হাজির করানো যায়।

মজুত সৈন্যদের নদীর আরো কাছাকাছি সরিয়ে নিতে বললেন তিনি। তারপর সভার একেবারে শেষে যখন সেপাইদের নদী পার করা ও তাদের অন্য সব কাজকর্মের পরিকল্পনা করা হয়ে গেল তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ

—কিন্তু আপনারা ভিয়েশেনস্কাতে বন্দীদের রেখেছেন কেন বলুন তো?

সেনাপতিমণ্ডলীর একজন বললেন—তাদের অন্য কোথাও রাখবার জায়গা যে নেই। আশেপাশের গাঁয়ের মধ্যে তেমন ভালো বাড়ি কোথায়!

অফিসার সাবধানে তাঁর পরিষ্কার-কামানো ঘাম-ভেজা মাথাটা একটা রুমাল দিয়ে মুছে, খাকি উর্দির কলারের বোতাম খুলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেনঃ

—ওদের কাজানস্কাতে পাঠান।

অবাক হয়ে কুদীনভ ভুরু উঁচোয়। বলেঃ

—তারপর?

—তারপর সেখান থেকে ফের ভিয়েশেনস্কাতে। —অফিসার তাঁর নির্বিকার নীল চোখদুটো কুঁচকে সবিনয়ে বুঝিয়ে দিলেন। ঠোঁটদুটো চেপে ফের কড়া গলায় বললেন—সত্যি কথা বলতে কি মশাইরা, আমি বুঝতে পারছি না আপনারা কী করে ওদের সঙ্গে এখনো আদিখ্যেতা করছেন। আমার তো মনে হয় এখন ওসবের সময়ই নয়। এই সব নোংরা জীব, যতো রকমের দৈহিক আর সামাজিক রোগ ছড়াচ্ছে, এদের তো একেবারে খতম করে দেওয়া উচিত। এদের খাতির দেখাবার কোনো মানে হয় না। আপনাদের জায়গায় আমি থাকলে আমিও তাই করতাম।

পরদিন দুশোজন বন্দীর প্রথম দলটাকে মাঠের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। রোগা, মরার মতো ফ্যাকাশে লালফৌজের সেপাইরা পা অবধি টানতে পারছে না, ছায়ার মতো এগিয়ে চলেছে। এলোমেলোভাবে চলা ভিড়টাকে ঘিরে রয়েছে একদল ঘোড়সওয়ার। গাঁয়ের প্রায় সাত মাইল ওধারে নিয়ে দুশো জন বন্দীর শেষ প্রাণীটি অবধি তলোয়ার চালিয়ে মেরে ফেলা হল। বিকেলের দিকে বের করে আনা হল দ্বিতীয় দলটিকে। পাহারাদারদের ওপর কড়া হুকুম ছিল—শুধু তলোয়ার চালাতে হবে, তবে একেবারে উপায় না থাকলে তখন বন্দুক। দেড়শো জনের মধ্যে মাত্র পঁচাত্তর জন পৌঁছুলো কাজানস্কায়। বন্দীদের একজন রাস্তার মধ্যেই পাগল হয়ে গিয়েছিল—লোকটা জিপ্‌সিদের মতো দেখতে, লালফৌজের জোয়ান সেপাই। সারা রাস্তা সে গান গেয়ে, নেচে, কেঁদে, বুকের ওপর এক গোছা সুগন্ধ 'থাইম' ফুল চেপে ধরে হেঁটে এসেছে। মাঝে মাঝে গরম বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ছিল। সুতীর ছেঁড়া শার্ট ফর্‌ফর্‌ করছিল বাতাসে। ঘোড়সওয়াররা একবার ওর হাড্ডিসার পিঠের চামড়া আর ফাট-ধরা পায়ের তলা দেখে ওকে তুলে নিয়ে একটা কুঁজো থেকে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিল ওর চোখে-মুখে। পাগলের মতো জ্বলজ্বলে কালো চোখ চেয়ে ও শুধু নীরবে হাসল, তারপর আবার চলতে লাগল দুলে-দুলে।

রাস্তার ধারে একটা ছোট গ্রামে বন্দীদের ঘিরে দাঁড়াল কয়েকজন সহৃদয় মেয়েমানুষ। গম্ভীর ভারিক্কি চেহারার এক বুড়ী বন্দীদের জিম্মাদার ঘোড়সওয়ারকে কড়া গলায় বললেঃ

—ওই কালো লোকটিকে ছেড়ে দাও! ও ভগবানকে পেয়েছে, ভগবানের কাছাকাছি এসেছে, ওর মতো মানুষকে মারলে তোমাদের মহাপাতক হবে।

দলের পাণ্ডা লাল-গালপাট্টাওলা মেজাজী জিম্মাদার। হেসে বিদ্রূপ করে বললেঃ

—অন্যের পাপ নিজেদের ঘাড়ে নিতে আমাদের ভয় নেই, বুড়ি। আমাদের তুমি সৎ মানুষ বানাবে সে বান্দাই নই আমরা!

বুড়ি বায়না ধরলে—কিন্তু তুমি ওকে ছেড়ে দাও, আমার কথা রাখো। তোমাদের শিয়রে যে যমদূত দাঁড়িয়ে!

অন্য মেয়েরাও উৎসাহের সঙ্গে বুড়ির কথায় সায় দিলে। শেষ পর্যন্ত রাজি হল জিম্মাদার।

—আমার আপত্তি নেই। নিয়ে যাও ওকে। এখন আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ও। তবে আমরা এত ভালোমানুষি করলাম, আমাদের সকলের জন্য এক পাত্তর করে খাঁটি দুধ দাও দিকিনি।

পাগলকে বুড়ি তার ছোট্ট কুঁড়েঘরে নিয়ে এসে খাইয়ে-দাইয়ে বড়ো-ঘরে তার জন্য বিছানা করে দিলে। সারাদিন ঘুমোলো লোকটা, তারপর জেগে উঠে জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে চাপা সুরে গান গাইতে লাগল।

বুড়ি ঘরে এসে হাতের তেলোয় গাল রেখে অনেকক্ষণ বসে-বসে খুঁটিয়ে নজর করে দেখতে লাগল জোয়ান ছেলেটির শুকনো মুখ। তারপর ভারী গলায় বললেঃ

—আচ্ছা, শুনতে পাই তোমাদের লোকজন নাকি সব কাছেপিঠেই আছে

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করেছিল পাগল। তারপরেই আবার গাইতে লাগল, এবার আরো চাপা গলায়।

বুড়ি কঠিন গলায় বললেঃ

—দ্যাখো ছোকরা, ওসব খেলা এখন রাখো। আমাকে ঠকাতে পারবে অমন কথাও যেন ভেবো না। এতটা বয়েস হল, তুমি আমাকে ঠকাবে অতো বোকা নই। তোমার মাথা যে বিলকুল ঠিকই আছে সে আমি জানি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছিলে, আমি শুনেছি। বেশ বুদ্ধিমান লোকের মতো কথাবার্তা।

লালফৌজী সেপাই গান গেয়েই চলে, তবে ক্রমেই আস্তে হয়ে আসে আওয়াজ। বুড়ি আবার বলেঃ

—আমাকে তোমার ভয় নেই, তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই না। জার্মান যুদ্ধে আমার দুটি ছেলে মারা গিয়েছে আর সবচেয়ে ছোটটি মরল এই যুদ্ধে, চেরকাসে। অথচ এদেরই তো কোলেপিঠে মানুষ করেছিলাম আমি। খাইয়েছি পরিয়েছি, যখন কচি বাচ্চা ছিল রাতে দুচোখের পাতা এক করিনি।—তাই জোয়ান ছেলেরা ফৌজে কাজ করছে যুদ্ধ করছে দেখে বড়ো কষ্ট পাই মনে কয়েক মুহূর্তে চুপ করে থাকে বুড়ি।

লালফৌজের লোকটিও চুপ করে আছে। চোখ বুজল সে। কালচেপানা গাল দুটোর ওপর প্রায় অলক্ষ্যে একটা হাসি খেলে গেল। সরু, হাড়-জিরজিরে গর্দানের ওপর একটা নীল শিরা টান-টান হয়ে কাঁপতে শুরু করেছে।

এক মিনিট সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, মনে হচ্ছিল যেন কিছু একটা বলবে। তারপর কালো চোখজোড়া সে খানিকটা মেলে তাকাল। তাকানোর মধ্যে সচেতন বুদ্ধির ছাপ রয়েছে, একটা অধীর প্রতীক্ষা এমনভাবে ঝিলিক্ দিয়ে উঠল চোখে যে বুড়ি তা দেখে অল্প একটু হাসল।

জিজ্ঞেস করল—শুমিলিনস্কার রাস্তা তুমি চেন?

—না মা। জবাব দেবার সময় ঠোঁটদুটো প্রায় নড়লই না লোকটার।

—তাহলে কী করে সেখানে পৌঁছোবে?

—তা জানি না।

—সেই তো হল কথা! এখন তোমায় নিয়ে কী করি?— লোকটার জবাবের জন্য অনেকক্ষণ সবুর করে থেকে বুড়ি জিজ্ঞেস করলেঃ

—কিন্তু তুমি তো হাঁটতে পারো?

—তা কোনোরকমে চালিয়ে নেব।

—কোনোরকমে চালিয়ে নেবার সময় এটা নয়। রাতারাতি তোমাকে হেঁটে যেতে হবে তাড়াতাড়ি, বুঝলে, যতো তাড়াতাড়ি পারো! এখানে আরেকটা দিন থাকো, সঙ্গে খাবার দিয়ে দেব, ছোট নাতিটা তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে...ব্যস্ ভালোয় ভালোয় চলে যেও! তোমাদের লাল সেপাইরা শ্মির্লিনস্কার বাইরেই আছে, সে আমি ভালো করেই জানি। তুমি তাদের কাছে চলে যাও। কিন্তু সদর রাস্তায় যেও না, স্তেপের মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ী খাত ধরে বনবাদাড় ডিঙিয়ে যেতে হবে। নয়তো কসাকরা তোমাকে ধরে ফেলবে, তখন আর তোমায় দেখতে হবে না। ব্যাপার হল এই, বুঝলে বাছা!

পরদিন সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি তার বারো বছরের নাতি আর লালফৌজের সেপাইটিকে আশীর্বাদ করে রুক্ষ গলায় বললেঃ

-এবার যাও, ভগবান্ তোমাদের সহায় হোন্! দেখো আবার আমাদের সেপাইদের হাতে প'ড়ো না যেন খবরদার, খবরদার! আমাকে নমস্কার করার দরকার নেই, নমস্কার করো মাথার ওপর যিনি আছেন তাঁকে। আমি তো আর একলাই নই, মা আমরা সবাই ভালো।. তোমাদের মতো অভাগা দস্যি ছেলেদের দেখলে কষ্ট হয় আমাদের—বড়ো কষ্ট! ব্যস্, এবার চলো, ভগবান তোমাদের নিরাপদে রাখুন! বাড়ির হলদে, কাদা-মাখা বাঁকা দরজাখানা ঝপ্ করে বন্ধ করে দিলে বুড়ি।

॥ দশ ॥

রোজই ইলিনিচ্না ভোরের প্রথম আলো ফোটার সময় বিছানা ছেড়ে ওঠে, গাইগুলোকে দুইয়ে, তারপর শুরু করে সংসারের কাজ। বাড়ির উনোনটাতে সে আগুন দেয় না, তবে বার-বাড়ির রান্নাঘরে আগুন জ্বালিয়ে খাবার তৈরি করে ফের বাড়ির ভেতর ঢুকে ছেলেমেয়েদের কাছে আসে।

টাইফাসের পর নাতালিয়া খুব ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। 'ত্রয়ী' উৎসবের দ্বিতীয় দিনেই প্রথম ও বিছানা ছেড়ে ওঠে। ক্রমাগত চুলকোনিতে অস্থির হয়ে এঘর-ওঘর করে। ভালো করে পায়ের জোর অবধি পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে ছেলেমেয়েদের মাথা হাতড়ায়, টুলে বসে ওদের দু'চারটে কাপড়-জামাও কেচে দিতে চেষ্টা করে।

নাতালিয়ার শুকনো মুখে আজকাল হাসি লেগেই আছে। বসা গাল দুটো মাঝে মাঝে লাল হয়ে ওঠে। অসুখের পর চোখ জোড়া যেন আরো বড়ো বড়ো দেখায়। এমন একটা ঝলমলে চঞ্চল উৎফুল্ল ভাব চোখে, যেন সবে ওর ছেলেপুলে হয়েছে।

মেয়ের কালো চুলে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করে—পলিউশ্কা মা! আমি যখন বিছানায় পড়েছিলাম মিশাৎকা তোকে বিরক্ত করেনি তো রে? --গলার স্বর ওর দুর্বল, প্রত্যেকটা কথা টেনে টেনে উচ্চারণ করে।

মেয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে জবাব দেয়—না মা-মণি। একবার শ‍ুধ‍ু মিশ্‌কা আমায় মেরেছিল। এমনিতে আমরা দ‍ুজনে কিন্তু খ‍ুব খেলেছি। —মায়ের হাঁটুতে জোর করে ম‍ুখ ল‍ুকোয় ও।

হাসি ম‍ুখে নাতালিয়া আবার জিজ্ঞেস করে—ঠাক্‌মা তোদের যত্ন করতেন তো?

—উঃ তাঁর যা আদর!

—আর ওই লাল সেপাইরা তোদের কিছ‍ু বলে নি?

—আমাদের ছোট্ট বাছ‍ুরটাকে মেরেছে, শাপ লাগ‍ুক্‌ ওদের!— মিশাৎকা কথাটা বললে ছেলেমান‍ুষী অথচ ভারিক্কি গলায়। বাপের সঙ্গে ওর চেহারার আশ্চর্য মিল।

—অমন গালিগালাজ করতে নেই, মিশাৎকা। ব‍ুড়ো মান‍ুষের মতো কথাবার্তা বলছ! বড়োদের নিয়ে কখনো খারাপ কিছ‍ু বলবে না। —হাসি চেপে নাতালিয়া হ‍ুকুমের স‍ুরে বললে।

ঠাক্‌মাই তো এসব কথা বলেছে, পলিয়াকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো! — ছোকরা মেলেখফ গোমড়া ম‍ুখে কৈফিয়ৎ দিলে।

—তা সত্যি মা। ওরা আমাদের ম‍ুরগির বাচ্চাগ‍ুলোকেও মেরেছে, একটাও বাদ যায়নি!

পলিয়ার উৎসাহ এসে গেছে। ছোট ছোট কালো চোখ ঝিক্‌মিক্‌ করে ওঠে, ওরা সব ম‍ুরগিগ‍ুলোকে ধরল, ঈলিনিচ্‌না তাদের কতো করে বলল যাতে হলদে মোরগটাকে তারা ছেড়ে দেয় ডিম পাড়বার কাজে লাগবে বলে, আর একজন ফুর্তিবাজ লাল সেপাই হাতের ওপর মোরগটাকে দ‍ুলিয়ে জবাব দিলেঃ এ মোরগটা সোভিয়েত হ‍ুকুমতের ওপর গলাবাজি করেছে তাই এটিকে আমরা ফাঁসির হ‍ুকুম দিয়েছি! তুমি যতোই চেঁচাও না কেন, একে আমরা স‍ুপ্‌ বানিয়ে খাবোই, তবে এর বদলে তোমাদের এক জোড়া প‍ুরনো জ‍ুতো দিয়ে যাব।

হাত দ‍ুটো দ‍ুপাশে ছড়িয়ে ছোট্ট পলিয়া বললেঃ

—ফেল্টের যে জ‍ুতোগ‍ুলো ওরা রেখে গিয়েছিল সেগ‍ুলো এই এ্যাত্তো বড়ো! কি বিরাট বিরাট সব জ‍ুতো, আর একেবারে ফুটো।

হেসে কেঁদে নাতালিয়া ওর ছেলেমেয়েদের ব‍ুকে জড়িয়ে ধরে। ম‍ুগ্ধচোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে খ‍ুশিভরা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেঃ

—আমার গ্রিগরেরই মেয়ে তো! একেবারে আমার গ্রিগরের মতো। তুই তোর বাবারই মতো হ‍ুবহ‍ু, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি।

মিশাৎকা ঈর্ষাভরে জিজ্ঞেস করে—কিন্তু আমিও তো বাবারই মতো মা?— ভীর‍ু ছেলের মতো মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় ও।

—হ্যাঁ রে, তুইও তোর বাপেরই মতো। তবে মনে রাখিস ঃ যখন বড়ো হবি তখন যেন বাপের মতো খারাপ লোক হোস্‌নি।..

—কিন্তু বাবা কি খারাপ, মা? কি করে বাবা খারাপ হল? — পলিয়া উৎস‍ুক হয়ে ওঠে।

একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে নাতালিয়ার ম‍ুখে। জবাব না দিয়ে অতি কষ্টে ও বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

ঈলিনিচ্‌না ঘরের ভেতরেই ছিল। বিরক্ত হয়ে সরে গেল সে। নাতালিয়া ছেলেমেয়ের কথায় কান না দিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ একদ‍ৃষ্টে তাকিয়ে

থাকে আস্তাখফদের বাড়ির বন্ধ খড়খড়িগুলোর দিকে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রং-জ্বলা কাঁচুলিটার ফিতের ওপর আঙুল খুঁটতে থাকে অস্থির মনে।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল নাতালিয়ার। ছেলেমেয়েদের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে তাই চুপিচুপি উঠে হাতমুখ ধুয়ে তোরঙ্গ থেকে একটা পরিস্কার জামা, একটা ছোট জ্যাকেট আর সাদা ওড়না বের করল। দেখলে বোঝা যায় মনের মধ্যে ওর তোলপাড় চলছে। ওর পোশাকের ধরন, বিষাদময় নীরব গাম্ভীর্য দেখে ইলিনিচ্না আন্দাজ করল নিশ্চয় ওর ঠাকুরদাদা গ্রিশাকার কবর দেখতে চলেছে নাতালিয়া।

ধারণাটা ঠিক কিনা বুঝবার জন্য বুড়ি ইচ্ছে করেই বললে—কোথায় চললে?

নাতালিয়া কৈফিয়ৎ দিলে—দাদুকে দেখতে যাচ্ছি।— পাছে কেঁদে ফেলে তাই আর মাথা তুলল না ও। ঠাকুরদার মরার খবর শুনেছিল নাতালিয়া, শুনেছিল মিশ্কা কশেভয় ওদের বাড়ি আর খামারে আগুন দিয়েছে।

—তুমি বড্ডো দুর্বল, অতোদূরে কি যেতে পারবে?

—পথে একটু-আধটু বিশ্রাম নিয়ে ঠিক চলে যাব। বাচ্চাগুলোকে তুমি খেতে দিও, হয় তো আমার অনেক দেরি হয়ে যাবে।

—কিন্তু কেন বলো তো, ওখানে অতোক্ষণ থাকবে কেন? হ্যাঁ মরার কবর দেখতে যাবারই সময় বটে এখন। ভগবান্! দোষ নিও না! আমি হলে তো যেতামই না, বুঝলে বাছা নাতালিয়া।

—আমি কিন্তু যাচ্ছি!—নাতালিয়ার মুখটা আঁধার হয়ে যায়, ও দরজার হাতল চেপে ধরে।

—একটু সবুর। খিদে পেটে যাচ্ছ ওখানে? কেন? একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও; দই বের করে দেব?

—না মা। ভগবানের দোহাই, এখন আর ওসব নয়। ফিরে এসে খাব'খন কিছু।

ছেলের বউ যাবেই স্থির করেছে বুঝতে পেরে ইলিনিচ্না উপদেশ দিলেঃ

—ডনের পাশের রাস্তা ধরেই যেও বরং, বাগানের ভেতর দিয়ে। ও রাস্তায় চট্ করে কেউ তোমায় দেখতে পাবে না।

ডনের ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটা ফুলে-ফেঁপে ওঠা ধোঁয়াটে কুয়াশা। সূর্য এখনো ওঠেনি, কিন্তু পুব দিকে পপ্লারগাছের আড়ালে আকাশের কিনারাটা ভোরের হাল্কা ছোঁয়া লেগে নীল্চে হয়ে উঠেছে, একটা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আসছে মেঘের কোল থেকে।

আগাছা লতা জড়ানো ধসে-পড়া ছিটেবেড়া ডিঙিয়ে নাতালিয়া নিজেদের বাড়ির বাগিচার ভেতর ঢোকে। বুকে হাত চেপে একটা সদ্য-তৈরি মাটির ছোট্ট ঢিবির কাছে এসে থামে।

বাগানে আলকুশি আর প্রচুর আগাছা জন্মে গেছে। আগুনে ঝলসে-যাওয়া পুরনো মরা আপেল গাছটার ওপর একটা শুকপাখি জড়োসড়ো হয়ে বসে। কবরের ঢিবি আস্তে আস্তে বসে যেতে শুরু করেছে। এখানে ওখানে শুকনো কাদার চাপড়ার মধ্যে নতুন কচি ঘাসের শীষগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

অসংখ্য স্মৃতির ভিড়ে ভারাক্রান্ত হয়ে নাতালিয়া নীরবে হাঁটু গেড়ে বসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নির্দয় মাটির ওপর সে মাটিতে এখন পার্থিব অবক্ষয়ের চিরন্তন গন্ধ।

ঘণ্টাখানেক বাদে নাতালিয়া চুপিচুপি গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল বাগান থেকে,

তারপর বুকে অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে শেষবারের মতো ফিরে তাকাল সেই জায়গাটার দিকে যেখানে প্রথম ওর যৌবনের মুকুল ফুটেছিল। চালাঘরের পোড়া আড়কাঠ, উনোন আর বাড়ির ভিতের কালো ধ্বংসস্তূপ নিয়ে অযত্নে পড়ে-থাকা উঠোনটা একটা করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। নাতালিয়া পাশের একটা রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

রোজই নাতালিয়া একটু-একটু করে সুস্থ হয়ে ওঠে। পা-গুলো শক্ত হয়েছে কাঁধ-জোড়া সুগোল হয়ে উঠছে। সারা দেহে স্বাস্থ্যোচ্ছল পূর্ণতার জোয়ার। অল্পদিনের মধ্যেই ও শাশুড়ির ঘরকন্নার কাজে জোগান দিতে শুরু করে। উনোনের আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের মধ্যে ওদের কথাবার্তা চলে।

একদিন নাতালিয়া একটু যেন ক্ষোভের সুরেই বলেঃ

—কিন্তু কবে এর শেষ হবে? আমি যে আর সইতে পারছি না!

—ডন পার হয়ে আসতে আর বেশি দেরি নেই আমাদের লোকদের, দেখে নিও তুমি।— আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দেয় ইলিনিচ্‌না।

—কিন্তু কেমন করে জানলে তুমি মা?

—আমার মন বলছে।

—যতোক্ষণ আমাদের কসাকরা নিরাপদে বেঁচে বর্তে আছে ততোদিনই ভরসা! ভগবান্ করুন যেন ওদের একজনও না মরে, কিংবা জখম হয়। গ্রিশাও এমন বেপরোয়া মানুষ..।— দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নাতালিয়া।

—ওদের কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। ঈশ্বরের অপার দয়া। বুড়ো বলেছিল নদী পার হয়ে আমাদের দেখতে আসবে। কিন্তু মনে হচ্ছে কোনো কারণে তাতে বাধা পড়ছে। বুড়ো এলে তুমিও ফিরে যেতে পারবে তার সঙ্গে। আমাদের গাঁয়ের ঠিক উল্টো তরফে ঘাঁটি আগলাচ্ছে আমাদেরই গাঁয়ের লোকেরা। একদিন ভোরবেলায় তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলে। আমি জল আনতে গেলাম ডনে। শুনলাম আনিকুশ্‌কা নদীর ওপার থেকে চেঁচাচ্ছেঃ ও বুড়ি মা, নমস্কার! তোমার বুড়ো তোমায় নমস্কার জানাচ্ছে!

নাতালিয়া সাবধানে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু গ্রিশা কোথায়?

—ও পেছনের থেকে ওদের সবাইকে হুকুম দিচ্ছে—সরলভাবে জবাব দিলে ইলিনিচ্‌না।

—কিন্তু কোত্থেকে হুকুম দিচ্ছে ওদের?

—নিশ্চয় ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে। আর তো কোনো জায়গা নেই ওর।

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে নাতালিয়া। ইলিনিচ্‌না ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করেঃ

—কিন্তু ব্যাপার কী তোমার? কাঁদছ কেন?

নাতালিয়া কোনো জবাব দেয় না। নোংরা আঙরাখাটায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

—কেঁদো না নাতালিয়া, লক্ষ্মীটি। কাঁদলে এখন আর লাভ নেই। ভগবানের ইচ্ছায় আবার ওদের সুস্থসমর্থ দেখব। নিজের দিকে নজর দাও একটু: উঠোন থেকে

যখন-তখন বাইরে যেও না, নয়তো ওই খুন্টের দুশমনগুলো তোমাকে দেখতে পেয়ে ফের এসে ঢুকবে।

রান্নাঘরটা আগের চেয়েও অন্ধকার হয়ে গেল। বাইরে যেন কে এসে জানলাটা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। ইলিনিচ্‌না জানলার দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলঃ

—ওই যে ওরা এসেছে! লাল সেপাই! নাতালিয়া লক্ষ্মী! শিগ্‌গির বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো অসুখের ভান করে.. কে জানে কী পাপ ..কম্বলটা দিয়ে গা ঢাকো।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সবে বিছানায় গিয়ে বসেছে এমন সময় দরজার শিকল খুলে মাথা নিচু করে রান্নাঘরের ভেতর ঢুকল একজন ঢ্যাঙা লাল সেপাই। ইলিনিচ্‌নার ঘাগরা চেপে ধরল বাচ্চাগুলো। বুড়ি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। উনোনের ধারে যেখানটিতে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই ধপ্‌ করে বসে পড়ল বেঞ্চির ওপর, এক বাটি গরম দুধ চল্‌কে পড়ে গেল।

লালফৌজী সেপাই চট্‌ করে রান্নাঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উঁচু গলায় বললেঃ

—ঘাবড়াবার কিছু নেই! তোমাদের খেয়ে ফেলব না! নমস্কার!

নাতালিয়া যেন সত্যিই অসুস্থ এমনিভাবে কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে কম্বলটা মাথার ওপর টেনে নিয়েছে ; কিন্তু মিশাৎকা ভুরুর তলা দিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে খুশিভরা গলায় বললেঃ

—ঠাক্‌মা, এ তো সেই লোকটা যে আমাদের মোরগটাকে মেরেছিল! মনে নেই তোমার?

সেপাইটি খাকি টুপি খুলে চুমকুড়ি কেটে একটু হাসলে।

—শয়তানটা আমাকে চিনতে পেরেছে দেখছি! সেই মোরগটার কথা এখনো ভুলতে পারেনি নাকি? সে যাই হোক, গিন্নি-মা, আমি এসেছি আরেক কাজেঃ আমাদের জন্য কিছু রুটি বানিয়ে দিতে পারবে? ময়দা আমাদের আছে।

—হ্যাঁ...বেশ তো...বানিয়ে দেব..। —ইলিনিচ্‌না তোৎলাতে তোৎলাতে জবাব দেয়, আগন্তুকের মুখের দিকে তাকায় না। বেঞ্চির ওপর থেকে চল্‌কে-পড়া দুধটা মুছে ফেলে।

দরজার কাছে বসেছে সেপাইটি। পকেট থেকে তামাকের থলি বের করে একটা সিগারেট জড়িয়ে নিল সে। আলাপ জুড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

—সন্ধ্যের আগেই রুটি তৈরি হয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, তোমাদের যদি তাড়া থাকে।

—যুদ্ধের সময় ঠাক্‌মা, আমাদের সব সময়েই তাড়া। তবে সেই মোরগটার জন্য তোমরা উতলা হোয়ো না যেন।

ইলিনিচ্‌না ভয় পেয়ে জবাব দেয়—উতলা আমি হইনি। ছেলেটা গাধা.. যা ভুলে যাওয়াই উচিত তা ও মনে করে রাখে।

মিশাৎকার দিকে ঘুরে বাচাল লোকটি একটু মিষ্টি হেসে বলে—যা হোক্‌ তুমি কিন্তু বড্ডো ছিঁচ্‌কাঁদুনে। আমার দিকে অমন নেকড়ের মতো চেয়ে আছ কেন? এদিকে এসো, মন খুলে দু'জনে তোমার মোরগের কথাই বলাবলি করি।

ইলিনিচ্‌না হাঁটু দিয়ে নাতিকে ঠেলে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—যা না, বোকা কোথাকার!

কিন্তু মিশাৎকা ওর ঠাকুরমার ঘাগরা ছেড়ে রান্নাঘর থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। দেয়াল ঘেঁষে দরজার দিকে যাবার সময় লালফৌজের সেপাইটি লম্বা হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে কাছে টেনে নিলে। বললেঃ

—মন বিগড়ে গেছে?

না।—ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিলে মিশাৎকা।

—বাঃ, বেশ কথা! একটা মোরগের জন্য সুখ-শান্তি নষ্ট হবার নয়। তোমার বাবা কোথায়? ডনের ওপারে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে সে আমাদের সঙ্গে লড়ছে?

লোকটার সদয় কণ্ঠে ভরসা পেয়ে চট্‌পট্ জানিয়ে দিলেঃ

—বাবাই তো সব কসাকদের চালায়।

—যাঃ মিছে কথা বলছ।

—তা হলে ঠাক্‌মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

কিন্তু ঠাকুরমা শুধু দু'হাতে তালি বাজিয়ে অস্ফুট গলায় কি যেন বলল, নাতির বাচালতায় একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে

ধাঁধায় পড়ে গিয়ে সেপাইটি জিজ্ঞেস করলে সব কসাককেই সে চালায়?

—না, মানে সবাইকে হয়তো নয়। মিশাৎকা অনিশ্চিতভাবে জবাব দেয়, ঠাকুরমার ভর্ৎসনা চোখের চাউনিতেও ও ঘাবড়ায় না।

লাল সেপাই এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল। তারপর নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলঃ

ও! বউটির বুঝি অসুখ করেছে?

টাইফাসে ভুগছে। —ইলিনিচ্‌না অনিচ্ছাভরে জবাব দেয়।

দু'জন লালফৌজী সেপাই রান্নাঘরে এক বস্তা ময়দা টেনে এনে চৌকাঠের ওপর রাখল।

একজন বললে—ও গিন্নি, তোমার উনোন ধরাও। আমরা সন্ধ্যের আগেই রুটি নিতে আসব। যেন ভালো সেঁকা হয়। নয়তো খুব খারাপ ব্যাপার হয়ে যাবে কিন্তু।

নতুন লোকগুলো এসে বিপজ্জনক প্রসঙ্গটা বদলে দিল দেখে মনে মনে দারুণ খুশি হয়ে ইলিনিচ্‌না জবাব দিল—আমার যতোটা ক্ষমতা আছে সেইভাবেই বানিয়ে দেব। —মিশাৎকাও ততোক্ষণ রান্নাঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

নাতালিয়ার দিকে ফিরে তাকিয়ে একজন সেপাই বললে—টাইফাস্?

—হ্যাঁ।

নিজেদের ভেতর চাপা গলায় কথাবার্তা বললে ওরা, তারপর রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। শেষ লোকটি সবে ঘুরেছে এমন সময় ডনের ওপার থেকে রাইফেলের আওয়াজ ভেসে এল। নিচু হয়ে ঝুঁকে সেপাইরা ছুটল আধ-ভাঙা পাথরের পাঁচিলের দিকে। পাঁচিলটার আড়ালে শুয়ে সজোরে রাইফেল-বল্টু টেনে পালটা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ওরা।

ভীষণ ভয় পেয়ে ইলিনিচ্‌না উঠোনে ছুটে গেছে মিশাৎকার খোঁজে। পাঁচিলের ওপাশ থেকে সেপাইরা ডাকলঃ

—ও ঠাকুমা, বাড়ির ভেতরে ঢোকো! মারা পড়বে যে!

—আমাদের খোকা যে উঠোনে। ও মিশাৎকা! বাছা রে! —কাঁদো-কাঁদো গলায় বুড়ি ডাকতে লাগল।

উঠোনের মাঝামাঝি বুড়ি দৌড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডনের ওপার থেকে গুলি ছোঁড়া বন্ধ হল। কসাকরা নিশ্চয় বুড়িকে দেখেছে, চিনতেও পেরেছে। মিশাৎকা ছুটে এল। বুড়ি ওর হাত ধরে ফের রান্নাঘরে ঢুকতেই আবার শুরু হল গুলি ছোঁড়া। যতোক্ষণ না লাল সেপাইরা মেলেখফদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ততোক্ষণ সমানে চলতে থাকল গুলি।

নাতালিয়ার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলতে বলতে ইলিনিচ্না ময়দার খামির তৈরি করে। কিন্তু রুটি বানানো ভাগ্যে ছিল না বুড়ির।

দুপুরের দিকে গ্রামের মেশিনগান-ঘাঁটির লাল সেপাইরা হুড়মুড় করে উঠোন-বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ের ঢালের দিকে সরে গেল। মেশিনগানগুলো টানতে টানতে সঙ্গে নিয়ে চলল ওরা। পাহাড়ের ওপর যে ফৌজী কোম্পানিটা পরিখা আগলে ছিল তারাও নেমে এসে লম্বা পায়ে মার্চ করে চলে গেল হেৎমান মোড়লের সদর রাস্তার দিকে।

ডনের আশেপাশে সমস্ত এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা। কামান মেশিনগান নিশ্চুপ। সমস্ত গ্রাম থেকে মালপত্রের গাড়ি আর কামান অন্তহীন সারি দিয়ে রাস্তা ধরে, ঘাস-গজানো পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে মোড়লের সদর রাস্তার দিকে। পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার ফৌজ চলেছে সার বেঁধে।

জানলা দিয়ে ইলিনিচ্না চেয়ে দেখল—শেষ লালফৌজী সেপাইরাও খড়িমাটির টিলাগুলো ডিঙিয়ে পাহাড়ের দিকে সরে পড়ছে। জানলার পর্দায় হাতটা মুছে পরম ভক্তিভরে সে ক্রুশপ্রণাম করলে।

—নাতালিয়া মা, ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন এবার। লাল সেপাইরা হটে যাচ্ছে।

—না মা, ওরা গাঁ ছেড়ে পরিখায় গিয়ে ঢুকছে, সন্ধ্যের আগেই সব ফিরে আসবে।

—তাহলে অমন করে ছুটছে কেন? আমাদের লোকরা ওদের মেরে তাড়িয়েছে। পালাচ্ছে সব, শয়তানের ঝাড়! দৌড়োচ্ছে খৃষ্টের দুশমনগুলো!' —ইলিনিচ্না উল্লাসভরে বলে। কিন্তু আবার সে বসে ময়দার খামির মাখাতে।

নাতালিয়া সিঁড়ির দরজা অবধি গিয়েছিল। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে চোখের ওপর হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে সে তাকিয়ে রইল রোদ-ঝলমলে খড়িমাটি-পাহাড়ের দিকে, বাদামী রোদপোড়া টিলাগুলোর দিকে।

গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বিজলি-ঝড়ের পূর্বাভাস। পাহাড়ের ওপাশ থেকে মাথা তুলেছে সাদা কুণ্ডলীর মতো মেঘ। দুপুরের কাঠ-ফাটা রোদ মাটি পুড়িয়ে দিচ্ছে। মাঠে শিস দিচ্ছে মেঠো ইঁদুররা আর ওদের নরম করুণ সুরের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সুর মিলিয়েছে স্কাইলার্কের খুশিভরা গান। কামানের গোলাবর্ষণের পর এই নীরবতাটুকু নাতালিয়ার এত ভাল লাগে যে ঠায় দাঁড়িয়ে ও উৎসুক হয়ে শোনে স্কাইলার্কের সহজ অকৃত্রিম গান, পানকৌড়ির ডাক আর সোমরাজের গন্ধভরা বাতাসের ঝিরঝির শব্দ। স্তেপের পুবালী বাতাসে ঝাঁঝালো গন্ধ। রোদপোড়া কালো মাটির ভাপ, আর মাটির বুকে হরেকরকমের ঘাসের মাদকতাময় গন্ধে বাতাস উদ্বেল। কিন্তু এর মধ্যেই সংকেত পাওয়া যাচ্ছে আসন্ন বর্ষণের: নদীর দিক থেকে উঠে আসছে একটা সতেজ সজল হাওয়া। চাতকের দল দুভাগে-চেরা লেজ দিয়ে প্রায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছে আকাশে নকশার জাল বুনে; বহু, বহুদূরে, নীল ঊর্ধ্ব-গগনে ডানা মেলে উড়ে চলেছে একটা স্তেপ-বাসী ঈগল, আসন্ন ঝড়ের মুখ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে।

নাতালিয়া উঠোনের ভেতর দিয়ে হেঁটে এল। পাথুরে দেয়ালের ওপাশে দুমড়োনো ঘাসের ওপর পড়ে আছে কার্তুজের খাপের সোনালি পাঁজা। ঘরের জানলা আর চুণকাম-করা দেয়ালে মেশিনগানের বুলেটের ফুটোগুলো হাঁ করে চেয়ে আছে। নাতালিয়াকে দেখে একটা মুরগির বাচ্চা চিঁচিঁ করে ছুটে পালালো গোলাঘরের চালার দিকে—সব মরে গিয়ে ওইটেই শুধু বেঁচে আছে এখন।

কিন্তু স্বস্তিকর এই নীরবতা বেশিক্ষণ রইল না। বাতাস বইতে শুরু করেছে. খালি-বাড়িগুলোর সপাটে খোলা জানলার খড়খড়ি আর দরজা সশব্দে বন্ধ হচ্ছে। একটা তুষার-সাদা ঝোড়ো মেঘ বিপুল বিক্রমে সূর্যটাকে মুছে দিয়ে ছুটে এগিয়ে চলল পশ্চিমের দিকে।

হাওয়ায় উড়তে-থাকা চুলগুলো চেপে ধরে নাতালিয়া বার-বাড়ির রান্নাঘরের দিকে গেল। সেখান থেকে আবার তাকিয়ে দেখতে লাগল পাহাড়ের দিকটা। দিগন্তের ওপর লালচে-বেগুনি ধুলোর আড়ালে একদল সেপাই-ঘোড়া আর দু-চাকাওয়ালা ফৌজী গাড়িতে চেপে একেকজন এগিয়ে যাচ্ছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নাতালিয়া মনে মনে ভাবল—যাক্. সত্যিই তাহলে ওরা পালাচ্ছে।

সিঁড়ির দরজার কাছে যাবার আগেই পাহাড়ের ওপারে অনেকদূর থেকে কামানের গর্জন শোনা গেল—চাপা. গুরগুরে আওয়াজ। আর সেই সঙ্গে সাড়া দিয়ে ভিয়েশেনস্কার দুটো গির্জা থেকেও উল্লসিত ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে এল নদীর ওপর দিয়ে।

ডনের ওপারে কসাকরা বন থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে ভিড় জমাচ্ছে। মাটির ওপর দিয়ে বজরাগুলো টেনে আনছে. কেউ কেউ হাত দিয়েই বয়ে আনছে নদীর দিকে। জলে নামাবে। গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে মাঝিরা সজোরে দাঁড় বাইতে থাকে। প্রায় ডজন তিনেক বজরা হুড়মুড় করে একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে আসছে গাঁয়ের দিকে।

জলভরা চোখে ইলিনিচ্না রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে কাঁদতে কাঁদতে নাতালিয়া. মা রে! ওরে সোনা. আমাদের সবাই ফিরে আসছে রে!

নাতালিয়া মিশাৎকার কাঁধ চেপে ধরে ওকে উঁচু করে ধরে। উত্তেজনায় চোখ কাঁপছে নাতালিয়ার। হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলতে গিয়ে গলা ভেঙে যায়ঃ

—দ্যাখ্ তো খোকা. তোর নজর তো খুব পরিষ্কার!...হয়তো তোর বাবাও আছে কসাকদের সঙ্গে...দেখতে পাচ্ছিস? ওই তো একেবারে সামনের নৌকোটায়. ও-ই না? আঃ. তুই ঠিকমতো দেখছিস্ না...।

বজরার ঘাটে ওরা শুধু বুগ্ন পান্তালিমন প্রখোফিয়েভিচেরই দেখা পায়। বুড়ো প্রথমেই জিজ্ঞেস করে বলদগুলো. খামারের জিনিস আর গম-যবের দানা সব ঠিক আছে কিনা। তারপর হাপুস নয়নে কেঁদে নাতি-নাতনিদের বুকে টেনে নেয়। কিন্তু তাড়াতাড়ি করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যখন নিজের বাড়ির উঠোনে ঢোকে তখন ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, হাঁটু গেড়ে বসে অনেকখানি হাত ছুঁড়ে বুড়ো ক্রুশ প্রণাম করে। তারপর পুবমুখো মাথা নিচু করে থাকে অনেকক্ষণ অবধি আর গরম রোদপোড়া মাটির ওপর থেকে মাথা তোলে না।

॥ এগারো ॥

জ্নমাসের দশ তারিখে সেনাপতি সেক্রেতভের অধিনায়কতায় তিন হাজার সেপাই, ছ'টা ঘোড়ায়-টানা কামান আর আঠারোটা মেশিনগান নিয়ে ডনফৌজের ঘোড়সওয়ার দল প্রচণ্ড এক আঘাত হেনে উস্ত্-বেলোকালিভেন্স্কার জেলাকেন্দ্রের কাছাকাছি রণাঙ্গনে ভাঙন ধরিয়ে দিল। তারপর রেল-লাইন বরাবর ফৌজ চলল কাজান্স্কার জেলাকেন্দ্রের দিকে।

তিন দিনের দিন ভোরবেলায় নয় নম্বর ডন-রেজিমেণ্টের অফিসারদের একটা টহলদারী দল ডনের কাছাকাছি একটা বিদ্রোহী রণাঙ্গন-ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলল। ঘোড়াসওয়ারদের দেখে কসাকরা ছুটে পালাচ্ছিল পাহাড়ী খাতের মধ্যে; কিন্তু টহলদারদের নায়ক কসাক ক্যাপ্টেনটি বিদ্রোহীদের পোশাক দেখেই চিনতে পেরেছিল। তলোয়ারের ডগায় একটা রুমাল বেঁধে উড়িয়ে সে গম্‌গমে গলায় চেঁচিয়ে উঠলঃ

—আমরা তোমাদের দলে, কসাক ভাইসব, পালিও না..

সাবধানতার ধার না ধেরে টহলদাররা পাহাড়ের একেবারে কিনারা অবধি এগিয়ে এল। সবার আগে বেরিয়ে এল বিদ্রোহী ঘাঁটির সেনাপতি বুড়ো পাকা-চুলো সার্জেণ্টটি। শিশির ভেজা গ্রেট-কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে এগিয়ে আসছে সে। ঘোড়া থেকে নামল আটজন অফিসার। সার্জেণ্টের দিকে এগিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন মাথার খাকি টুপি খুলল—টুপির ফিতের ওপর অফিসারদের সাদা চুড়োটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ক্যাপটেন বললেঃ

—আমাদের অভিনন্দন নাও! সাবেকী কসাক প্রথায় আমরা পরস্পরকে চুম্বন করব।—বিদ্রোহী নেতার দু'গালে চুমু খেলে ক্যাপটেন, তারপর রুমাল দিয়ে ঠোঁট আর গোঁফ মুছে, সঙ্গীদের উৎসুক প্রতীক্ষমান দৃষ্টি লক্ষ্য করে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে টেনে-টেনে বললেঃ

—আচ্ছা, তাহলে তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরল? এবার বলশেভিকদের চেয়েও বন্ধুদের কদর বুঝলে বেশি?

—যা বলেছেন মহামান্য হুজুর! আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করেছি। তিনমাস ধরে লড়ছি। বেঁচে থেকে আপনাদের দেখতে পাবো সে আশাই ছিল না।

—যাক্, পরে যে তোমরা শুধরে নিয়েছ এই ঢের, যদিও বড্ডো দেরি হয়ে গেল। এখন সব চুকে-বুকে গেছে, যারা আগের কথা ফের তুলবে তারা সরে যেতে পারে। তোমাদের জেলাকেন্দ্র কোন্‌টা?

—কাজান্স্কা, হুজুর।

—তোমাদের ফৌজীদল ডনের ওপারে.

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ডন ছেড়ে কোন্‌দিকে সরে গেল লালফৌজ?

—নদীর উজানে; বোধহয় ডনিয়েৎস্‌-এর দিকে।

—তোমাদের ঘোড়সওয়ার-ফৌজ এখনো পার হয়নি?

—মোটেই না।

—কেন নয়?

—সে আমি বলতে পারব না হুজুর। আমাদেরই প্রথম এপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

—এখানে লালদের কোনো কামান ছিল?

—দুটো।

—কখন সরে গেল ওরা?

—রাতে।

—পেছু নেয়া উচিত ছিল ওদের।... উঃ, সুযোগটা ফস্কে যেতে দিলে!—ভৎর্সনার সুরে ক্যাপটেন বললে। ঘোড়ার কাছে গিয়ে থলির ভেতর থেকে একটা লিখবার খাতা আর ম্যাপ বের করে নিল সে।

সার্জেণ্ট দাঁড়িয়েছিল এ্যাটেনশন ভঙ্গীতে, পাৎলুনের দুপাশে হাত ঝুলিয়ে। ওর দু'পা পেছনেই ভিড় জমিয়েছে কসাকরা। অফিসাররা, তাদের ঘোড়ার জিনসাজ, ভালো-জাতের অথচ রোগা ঘোড়াগুলোর দিকে খুঁটিয়ে নজর করে দেখার সময় ওদের মনের মধ্যে আনন্দ আর অস্পষ্ট উদ্বেগের একটা মিশ্র অনুভূতি জাগে। পদকচিহ্ন লাগানো ছিম্‌ছাম দুরস্ত ব্রিটিশ উর্দি আর চওড়া ব্রিচেস্‌ পরা অফিসাররা মাঝে মাঝে এ-পায়ে ও-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, ঘোড়াগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে ওরা ছটফট করছে আর আড়চোখে তাকাচ্ছে কসাকদের দিকে। উনিশশো-আঠারো সালের মতো সেই কড়া পেন্সিলের দাগ দিয়ে আঁকা ঘরে-তৈরি পদকচিহ্নগুলো আর নেই কারো উর্দিতে। ওদের বুটজুতো, জিন, কার্তুজ বেল্‌ট্‌, দুরবিন, জিনের সঙ্গে আটকানো কার্বাইন—সবই আনকোরা, সবই রুশদেশের বাইরে থেকে আমদানি। শুধু ওদের মধ্যে চেহারায় যে একটু বয়স্ক তার ঘন নীল কাপড়ের সির্কাশিয়ান কোট, বুখারার কারাকুল পশমে তৈরি গোল কুবান টুপি, আর গোড়ালি-বিহীন পাহাড়ী বুট। সেই প্রথম এল কসাকদের কাছে। আস্তে করে এগিয়ে এসে পকেট থেকে বেলজিয়ামের রাজা আলবার্টের ছবি আঁকা একখানা চমৎকার সিগারেট-প্যাকেট বের করে সে বললেঃ

—সিগারেট চলবে ভাইসব?

সাগ্রহে সিগারেটের দিকে হাত বাড়ায় কসাকরা। অন্য অফিসাররাও কাছে সরে এসেছে।

বড়ো মাথাওয়ালা চওড়া-কাঁধ এক কর্নেট জিজ্ঞেস করলেঃ

—আচ্ছা, বলশেভিকদের আমলে কীভাবে দিন কাটাতে তোমরা?

—খুব আরামে নয়।—চাষীদের মতো পুরনো কোট পরা একজন কসাক সাবধানে জবাব দিলে সিগারেটে একটা সুখ-টান দিয়ে। অফিসারের মোটা মোটা পায়ের সঙ্গে আঁট হয়ে জড়িয়ে থাকা লম্বা পটিগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটা।

কসাকটির ছেঁড়া জুতো পা থেকে প্রায় খসে পড়ার জোগাড়। সাদা রিফু-করা উলের মোজাজোড়ার মধ্যে পাৎলুনটা গোঁজা। ফিতে দিয়ে জড়ানো। তাই চমৎকার শক্ত

শুকতলা আর পেতলের চক্‌চকে ফুটোওয়ালা ব্রিটিশ বুটগুলোর ওপর মুগ্ধ চোখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল লোকটা। নিজেকে সামলাতে না পেরে শেষ অবধি ভালোমানুষের মতো অবাক হয়ে বলে বসলঃ

—আপনার জুতোজোড়া কিন্তু ভারি চমৎকার!

বন্ধুর মতো গালগল্প করার তেমন আগ্রহ নেই কর্নেটের। নাক সিঁটকে, গলার আওয়াজে ঝগড়ার সুর এনে সে বললেঃ

—তোমরা বিলিতি জিনিসের বদলে মস্কোর রদ্দি জুতোই বেশি পছন্দ করেছিলে, এখন আবার অন্য লোকের জুতোর ওপর নজর দেওয়া কেন?

—আমরা ভুল করেছিলাম। আমরা তা স্বীকার করেছি, তার জন্য শাস্তিও পেয়েছি।— সমর্থন পাবার জন্য অন্য কসাকদের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভভাবে বললে আগের কসাকটি।

কর্নেট বিদ্রুপের সুরে আগের মতোই বক্তৃতা ঝেড়ে চললঃ

—তোমাদের যে বলদের মতো বুদ্ধি সেইটেই দেখালে যাহোক। বলদের তো এইরকমই হয় কিনাঃ প্রথমে এগোয়, তারপর দাঁড়িয়ে ভাবে। 'ভুল করেছি!' কিন্তু শীতের আগে যখন ফ্রন্ট ছেড়ে সরে পড়লে তখন কী ভেবেছিলে? বড়ো কমিসার হবার শখ চেপেছিল! দেশমাতার ভারী রক্ষাকর্তা সব!

—অনেক হয়েছে, থামো!— খেপে-ওঠা কর্নেটের কানে-কানে চাপা গলায় বললে একজন জোয়ান চেহারার কোম্পানি কমান্ডার। কর্নেট পা দিয়ে সিগারেট মাড়িয়ে, থুতু ফেলে, হেলে-দুলে ফিরে চলল ঘোড়াগুলোর দিকে।

ক্যাপটেন তার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে নিচু গলায় কী যেন বললে। হঠাৎ বেশ সহজ হয়ে গিয়ে দশাসই চেহারার কর্নেট্‌টি ঘোড়ার ওপর লাফিয়ে বসল। চট্‌ করে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটলো পশ্চিম দিকে।

কসাকরা বেজার হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ক্যাপটেন ওদের কাছে এসে বেশ গম্‌গমে ফুর্তিভরা মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেঃ

—ভারভারিন্‌স্কি গাঁ এখান থেকে কত্তোদূর?

—প্রায় পঁচিশ মাইল।— একসঙ্গে অনেকগুলো গলা মিলিয়ে কসাকরা জবাব দিলে।

—বেশ! কসাক ভাইরা, এবার ফিরে গিয়ে তোমাদের কমান্ডারকে জানাও এক মুহূর্ত দেরি না করে ঘোড়সওয়ার ফৌজ যেন এপারে চলে আসে। আমাদের একজন অফিসার তোমাদের সঙ্গে পারঘাটা অবধি যাচ্ছে—সেই ঘোড়সওয়ারদের চালাবে। পায়দল সেপাইরা মার্চ্‌ করে কাজান্‌স্কার দিকে এগোতে পারে। বুঝতে পেরেছ? যাক্‌ এবার তাহলে পেছন দিকে ঘুরে ডবল কদমে চলে যাও!

কসাকরা ভিড় করে উৎরাইয়ের পথে নেমে যায়। প্রায় দুশো গজ অবধি ওরা নীরবে হেঁটে চলে—যেন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিয়েছিল সবাই। কিন্তু চাষীদের মতো কোর্তাপরা সেই গেঁয়ো চেহারার কসাকটি যাকে কর্নেট সোৎসাহে বক্তৃতা শুনিয়েছিল—সে এবার মাথা নেড়ে সদুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেঃ

—আমরা আবার একসঙ্গে মিললাম তাহলে, ভাইসব...

আরেকজন কসাক উত্তেজিতভাবে বলে বসলঃ

—এমনি-মুলোর চেয়ে ঘোড়া-মুলো কি আর বেশি মিষ্টি! —তারপর কিছু সরেশ খিস্তি জুড়ে দিল সে।

। বারো ।

লালফৌজের পশ্চাদপসরণের খবর ভিয়েশেন্‌স্কায় এসে পৌঁছোবার সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রিগর মেলেখফ এবং দুটো ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্ট তাদের ঘোড়াগুলোকে সাঁতরে নদী পার করে নিয়ে গেল। শক্তিশালী টহলদার সেপাইদল পাঠিয়ে ওরা নিজেরা সরে গেল দক্ষিণের দিকে।

ডনপারের পাহাড়ের ওধারে লড়াই চলছে। কামানের চাপা গর্জন ভেসে আসে ওদের কানে, মনে হয় যেন মাটির তলা থেকে আওয়াজ আসছে।

কমাণ্ডারদের একজন গ্রিগরের দিকে ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে এসে তারিফের সুরে বললে—দেখলেন তো, গোলা খরচ করতে ক্যাডেটদের আটকায় না! একেবারে ধসিয়ে দিচ্ছে।

গ্রিগর শান্ত হয়ে আছে। চারদিকে মনোযোগ দিয়ে নজর রেখে ফৌজী সারির আগে আগে চলেছে ও। ডন থেকে বাজ্‌কি গাঁয়ের দিকে প্রায় দু'মাইল অবধি রাস্তায় ছড়িয়ে আছে বিদ্রোহীদের পরিত্যক্ত হাজার হাজার হাল্‌কা গাড়ি আর মালগাড়ি। জঙ্গলের সব জায়গায় পড়ে আছে নানান্ সামগ্রীঃ ভাঙা সিন্দুক, টেবিল, কাপড়জামা, ঘোড়ার সাজ, হাঁড়িপাতিল, সেলাইকল, শস্যের বস্তা,—সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পত্তি হাতাবার লোভে এইসব কেড়েকুড়ে আনা হয়েছিল, পালাবার সময় টেনে আনা হয়েছিল ডন অবধি। জায়গায় জায়গায় প্রায় হাঁটু-সমান গাদা হয়ে শস্য ছড়িয়ে আছে রাস্তায়। এখানে ওখানে পড়ে আছে ফুলে-ওঠা, দুর্গন্ধ, মরা বলদ আর ঘোড়া, পচে গলে বীভৎস আকার হয়েছে সেগুলোর।

এ দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গ্রিগর বলে ওঠে৺ দ্যাখো সংসারযাত্রার কী নমুনা, আহা!— মাথার টুপি খুলে, দম বন্ধ করে, দুর্গন্ধ-ওঠা শস্যের একটা ছোট গাদার ওপর দিয়ে ঘোড়া ডিঙিয়ে ও সাবধানে চলে যায়, কসাক-টুপি আর রক্তমাখা কোটপরা এক বুড়োর লাশ হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে।

কসাকদের একজন দুঃখ করে বললে—বুড়ো শেষ পর্যন্ত ওর সম্পত্তি পাহারা দিয়েছে। নিশ্চয় মরে যখ্ হয়ে আগলে থাকবে।

—গমগুলো পেছনে ফেলে আসবার মন হয়নি বুড়োর।...

পেছনের সারি থেকে ক্রুদ্ধ চিৎকার উঠল—আবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও না! উঃ কী গন্ধ ছড়াচ্ছে রে বাবা! এ্যাই, সামনে এগোও!

স্কোয়াড্রন এবার দুল্‌কি চালে ছোটে। আলাপ বন্ধ হয়ে গেছে। বনের ভেতর শুধু তালে-তালে অসংখ্য ঘোড়ার খুরের শব্দ আর শক্ত করে বাঁধা কসাক হাতিয়ারের ঝন্‌ঝনানি।

লিস্তনিৎস্কিদের জমিদারী এলাকার খুব কাছেই চলছিল লড়াই। লালফৌজের সেপাইরা ঘন ভিড় করে একটা শুকনো পাহাড়ী খাতের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ইয়াগদ্নয়ের একপাশে। ওদের মাথার ওপর শ্রাপ্নেল ফাটছে, পেছনে মেশিনগানের গুলি, তার ওপর ওদের পালাবার পথ বন্ধ করার জন্য কাল্মিক রেজিমেণ্টের একদল সেপাই স্রোতের মতো নেমে আসছে পাহাড়ের ওপর থেকে।

যুদ্ধ শেষ হবার পর গ্রিগর এল তার রেজিমেণ্টগুলোকে নিয়ে। চোদ্দ নম্বর মিরনভ ডিভিশনের বিধ্বস্ত বাহিনী আর মালগাড়ি নিয়ে অবশিষ্ট যে দুটো লালফৌজী কোম্পানী পশ্চাদপসরণ করছিল তারা গুঁড়ো হয়ে গেল কাল্মিক রেজিমেণ্টের চাপে, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল তারা। উপত্যকার পাশের উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গ্রিগর তার রেজিমেণ্টের ভার ইয়েরমাকভের হাতে দেবার সময় মন্তব্য করলঃ

- আমাদের বাদ দিয়েই এখানে ওরা চালিয়ে নিয়েছে। তুমি গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমি খানিকক্ষণের জন্য একটু ঘুরে আসি লিস্তনিৎস্কিদের

কেন?-- অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে ইয়েরমাকভ।

- সে কথা ঠিক বোঝাতে পারব না। যখন ছোট ছিলাম তখন এখানে কাজ করেছি, পুরনো জায়গাগুলো দেখতে খুব ইচ্ছে করছে..।

প্রোখরকে ডেকে নিয়ে গ্রিগর ঘুরে চলল ইয়াগদ্নয়ের দিকে। ওরা সিকি-মাইলটাক ঘোড়ায় চেপে এগোবার পর পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল স্কোয়াড্রনের আগে আগে একটা সাদা চাদর বাতাসে পত্পত্ করছে--কোনো কসাক বোধহয় বুদ্ধি করে এনেছিল।

গ্রিগর চিন্তিত হল- মনে হচ্ছে যেন ওরা আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে!-- ধীরে ধীরে, খানিকটা যেন অনিচ্ছার সঙ্গে ফৌজী সারিটা উপত্যকার মধ্যে নেমে সেক্রেতভ বাহিনীর টহলদার দলটির দিকে এগিয়ে যায়। ঘাসের ভেতর দিয়ে ওরা সিধে কদমচালে ছুটে আসছে ঘোড়ায় চেপে। ওদের দেখে গ্রিগরের মনটা অস্পষ্ট বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

হুমড়ি খেয়ে পড়া ফটকটার ভেতর দিয়ে গ্রিগররা যখন বাড়ির উঠোনে ঢোকে তখন ওদের অভ্যর্থনা জানায় একটা শোকার্ত করুণ অবহেলার আবহাওয়া। গোটা আঙিনাটা ভরে গেছে আগাছায়। ইয়াগদ্নয়েকে এখন আর চেনাই যায় না। সব জায়গায় গ্রিগরের নজরে পড়ে নিদারুণ অযত্ন আর ক্ষয়ের চিহ্ন। এককালের সেই মনোরম বাড়িখানা এখন ঘুপ্চি, মনে হয় যেন ভিত্শুদ্ধ মাটিতে বসে গেছে। রং-জ্বলা লম্বা ছাদটার ওপর মাঝে মাঝে হল্দে মরচের দাগ, কার্নিশের ধারে ভাঙা নল ঝুলছে, কাত হয়ে রয়েছে জানলার খড়খড়িগুলো - প্রায় কব্জা থেকে খুলে পড়ার জোগাড়। ভাঙা জানলার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের শোঁসানি। অনেকদিন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকলে যেমন হয় কামরাগুলোর ভেতর থেকে তেমনি একটা সোঁদা ভ্যাপ্সা গন্ধ।

তিন-ইঞ্চি কামানের গোলা লেগে সিঁড়ি-দরজা সমেত বাড়ির পুব কোণ্টা ধসে পড়েছিল। গোলার ঘায়ে একটা মেপ্ল্ গাছের মাথা ছিটকে গিয়ে পড়েছে গলি-বারান্দার ভাঙা ভেনিসীয় কাঁচের জানলাটার মধ্যে। ভিত্ থেকে ঠেলে ওঠা ইটের পাঁজার মধ্যে গোড়া ডুবিয়ে সেটা ওইভাবেই পড়ে রয়েছে। মরা ডালগুলো বেয়ে এর মধ্যেই একটা বুনো হপ্লতা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠতে শুরু করেছে ঝাঁকড়া হয়ে। জানলার

যে শার্সিগুলো এখনো আস্ত রয়েছে সেগুলোর ওপর দিয়ে এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে লতাটা উঠেছে কার্ণিশ অবধি।

সময় আর আবহাওয়া রেখে গেছে ক্ষয়ের চিহ্ন। আঙিনার ঘরগুলো পচেছে, দেখলে মনে হয় ওগুলোর ওপর মানুষের হাত পড়েনি অনেক কাল। আস্তাবলের পাথুরে দেয়ালটা ধসে গিয়েছে শীতের শেষে বর্ষার তোড়ে। একবার ঝড়ে কোচ্-খানার ছাদ উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, শুধু এখানে সেখানে এক আধ মুঠো আধ-পচা খড় লেগে আছে কঙ্কালের মতো সাদা কড়ি বরগাগুলোর গায়ে।

চাকরদের ঘরের সিঁড়িতে তিনটে বুনো বর্জোই কুকুর শুয়েছিল। মানুষ দেখে ওরা লাফিয়ে উঠে কর্কশগলায় ডাকতে ডাকতে পালিয়ে গেল সিঁড়ি-দরজার আড়ালে।

চাকরদের আস্তানার মস্তো খোলা জানলাটা অবধি ঘোড়া নিয়ে এসে গ্রিগর জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলেঃ

—কেউ বেঁচে বর্তে আছ নাকি হে

অনেকক্ষণ অবধি কোনো সাড়াশব্দ নেই শেষে মেয়েলি গলায় অতি কষ্টে যেন জবাব এলঃ

—খৃষ্টের দোহাই, একটু সবুর করো বাবা! এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।

খালি পায়ে গুটি গুটি সিঁড়ি অবধি এগিয়ে আসে বুড়ি লুকেরিয়া। রোদের জন্য চোখ কুঁচকে সে অনেকক্ষণ অবধি তাকিয়ে থাকে গ্রিগরের দিকে।

ঘোড়া থেকে নামতে নামতে গ্রিগর জিজ্ঞেস করে লুকেরিয়া পিসি, আমাকে তুমি চিনতে পারো?

এতক্ষণে লুকেরিয়ার বসন্তের দাগওলা মুখখানার ওপর একটা কাঁপুনি খেলে যায়, চাউনির মধ্যে যে ভোঁতা উদাসীনতার ভাবটা ছিল সেখানে ফুটে ওঠে একটা ভয়ানক উত্তেজনা। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বুড়ি, অনেকক্ষণ অবধি মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় না। গ্রিগর ঘোড়াটাকে বেঁধে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

—কী দুর্ভোগই গেছে! ভগবান্ করুন আর যেন আমায় এ দুঃখ সইতে না হয়!

—ময়লা একটা চটের আঙরাখায় গাল মুছে বুড়ি আক্ষেপ করতে থাকে—আমি তো ভেবেছিলাম ওরাই বুঝি এল আবার উঃ গ্রিশা! কী কাণ্ডই না ঘটে গেল এখানে... তোমার বিশ্বাসই হবে না শুনলে! একা আমিই বেঁচে আছি..।

—কেন, সাশ্‌কা দাদা কোথায়? সেও কি মনিবদের সঙ্গে চলে গিয়েছে?

—তা যদি যেত তাহলে তো বেঁচেই থাকত.

—মরেনি নিশ্চয়?

—ওরা তাকে খুন করেছে। এই তিন দিন হল সে ভাঁড়ার ঘরেই পড়ে আছে।... কবর দেবার কথা, অথচ আমি পড়লুম অসুখে তোমার ডাকে সাড়া দিতেই কোনোরকমে জোর করে উঠে এসেছি। আর ওই মরা মানুষটার কাছে যেতে আমার একেবারেই সাহস হচ্ছে না.

—খুন করতে গেল কেন ওরা?—গ্রিগরের গলার স্বর ভারী মাটির ওপর থেকে চোখ তোলে না ও।

—ব্যাপার হয়েছিল ওই ঘুড়ীটাকে নিয়ে। মনিবরা তো হুড়মুড় করে চলে গেলেন। শুধু টাকাগুলো নিলেন সঙ্গে, আর গোটা সম্পত্তিই প্রায় রেখে গেলেন আমার সঙ্গে। —এবার ফিস্‌ফিস্ করে বলতে থাকে লুকেরিয়া—সবই রেখেছিলাম কাছে,

একেবারে স্তোগাছটি অবধি। এখনো রয়েছে মাটিতে পোঁতা। ওঁরা শুধু তিনটে মন্দ অরলভ্ ঘোড়া সঙ্গে নিয়েছিলেন, বাকিগুলো রেখেছিলেন সাশ্কার জিম্মায়। যখন বিদ্রোহ শুরু হল, ঘোড়াগুলো কসাক আর লালফৌজ দু'দলই দখল করে নিল। তোমার বোধ হয় মনে আছে সেই কালো মন্দ ঘোড়া "ঘূর্ণি"-টার কথা? তাকে তো লালরাই কেড়ে নিলে। ওর পিঠে জিন চাপাতে গিয়ে কম হয়রান হয়নি। তুমি তো জানো ঘূর্ণি কোনোদিনও জিন বরদাস্ত করেনি। কিন্তু ঘূর্ণির পিঠে চড়া ওদের ভাগ্যে ছিল না, ওকে হার মানাবে সে সাধ্যি ছিল না ওদের। এক হপ্তা বাদে কারগিনের ক'জন কসাক এসে খবর দিলে ঘূর্ণির। পাহাড়ের ওপর ওরা নাকি লালদের ওপর চড়াও হয়ে গুলি চালাচ্ছিল। কসাকদের সঙ্গে ছিল একটা ছোট্ট বোকা ঘুড়ী, ঠিক সেই সময় সেটাও ডাকতে শুরু করল। ব্যস্, ঘূর্ণি তো আগুনের মতো ছুটল ঘুড়ীটার দিকে, যে লোকটা তার পিঠে ছিল সে কিছুতেই সামলাতে পারে না। যখন সে দেখল ঘোড়াটাকে দমানো তার কর্ম নয় তখন ছুটন্ত অবস্থাতেই লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। লাফিয়েছিল ঠিকই তবে রেকাব থেকে পা-টা বের করে নিতে পারেনি। ঘূর্ণি তাকে সোজা টেনে নিয়ে এল কসাকদের কাছে।

সোৎসাহে গ্রিগর বলে ওঠে—সাবাশ!

লুকেরিয়া আবার শুরু করে গল্প—এখন কারগিনের একজন লেফ্‌টেন্যান্ট ঘোড়াটায় চড়ছে। সে কথা দিয়েছে মনিব ফিরে এলেই ঘূর্ণিকে আস্তাবলে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। যাহোক্ ওরা আর সমস্ত ঘোড়াই নিয়ে গেল, এক শুধু দুল্‌কি চালের ঘুড়ী 'তীর' ছাড়া। ওর পেটে তখন বাচ্চা ছিল, তাই কেউ গায়ে হাত দেয়নি। সবে বিইয়েছে, বুড়ো সাশ্কা কী যত্নটাই না করেছিল বাচ্চাটাকে, শুনলে বিশ্বাস করবে না! কোলে নিয়ে ঘুরত, দুধ খাওয়াত, কী সব গাছগাছড়ার ওষুধ খাওয়াত পায়ে জোর হবে বলে। তারপর শুরু হল ঝকমারি। তিন দিন আগে বিকেলবেলায় তিনজন লোক এল ঘোড়ায় চেপে। সাশ্কা ফলবাগিচায় ঘাস কাটছিল। ওরা চেঁচিয়ে বলল—'ইদিকে আয়, এই হতভাগা অমুক-তমুক!' কাস্তে ফেলে বুড়ো এসে ওদের নমস্কার করলে, কিন্তু ওরা তার মুখের দিকেই চাইলে না, শুধু দুধ খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলে—'তোমাদের ঘোড়া আছে?' সাশ্কা বললে- 'একটা আছে, কিন্তু তোমাদের মিলিটারির কাজের পক্ষে সেটা সুবিধের হবে না। একে ঘুড়ী, তার ওপর সবে বাচ্চা দিয়েছে!' তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে অসভ্য বুনোটা চেঁচিয়ে উঠল -'সে নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না! ঘুড়ীটাকে নিয়ে আয় বুড়ো শয়তান! আমার ঘোড়াটার পিঠে ফোস্কা পড়ে গেছে, সেটাকে এবার বদলানো দরকার।' সাশ্কার উচিত ছিল মুখ বুঝে মেনে নেওয়া, ঘুড়ীটাকে না আটকালেই চলত। কিন্তু জানো তো বুড়ো কী ধাঁচের মানুষ ছিল মাঝে মাঝে কর্তা নিজেও ওর মুখ বন্ধ রাখতে পারতেন না। তোমার বোধহয় মনে আছে।

প্রোখর কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করলে—তাহলে সে ঘুড়ীটাকে ওদের হাতে তুলে দেয়নি?

—সে কি আর না দিয়ে উপায় ছিল? শুধু বলেছিল, 'তোমাদের আগেও কতোজন এসে সব ঘোড়া নিয়ে গেছে, কিন্তু এটার ওপর সবাই মায়া দেখিয়েছে, তোমরাই বা নেবে কেন...।' এ-কথায় ওরা চটে গেল—'ওরে থুতুচাটা কুত্তা, তুই নাকি মনিবের জন্য ওটাকে পুষে রেখেছিস!' যাহোক ওরা তো বুড়োকে টেনে সরিয়ে দিল...একজন ঘুড়ীটাকে বের করে এনে জিন চাপাতে চেষ্টা করল, বাচ্চাটা পেটের নিচে দাঁড়িয়ে ওলানে মুখ

দিচ্ছিল। বুড়ো সাশা কতো করে বলতে লাগল—'দোহাই তোমাদের, ওকে নিও না! কোথায় যাবে বাচ্চাটা?' 'কোথায় যাবে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে'—বলে আরেকজন বাচ্চাটাকে মার কাছ থেকে সরিয়ে নিল। তারপর রাইফেলটা খুলে নিয়ে গুলি করল। আমি তো একেবারে কেঁদেই ফেললাম।... ছুটে গিয়ে ওদের কতো করে বোঝাতে লাগলাম, সাশাকে ধরে বের করে আনতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বুড়োর ছোট্ট দাড়িটা কেঁপে উঠতে লাগল থরথর করে, সাদা দেয়ালের মতো ফ্যাকাশে হয়ে সে বলে উঠল—'তাই যদি হয়, তা হলে তোরা আমাকেও গুলি কর্, কুকুরের বাচ্চারা!' ছুটে গিয়ে বুড়ো ওদের চেপে ধরে ঠেকাতে চেষ্টা করল যাতে ঘুড়ীর পিঠে জিন না চাপাতে পারে। ওরাও তখন হন্যে হয়ে সেইখানেই বুড়োকে মেরে ফেলল। যখন ওরা গুলি করছিল আমি তখন প্রায় পাগল হয়ে যাই আর কি। . এখন, জানি না ওকে নিয়ে কী করব। একটা কফিন তো বানাতে হয়। কিন্তু সে কি মেয়েমানুষের কাজ?

গ্রিগর বলে—দুটো কোদাল আর ক'খানা চট নিয়ে এসো।

প্রোখর জিজ্ঞেস করে- ওকে কবর দেবে নাকি তুমি?

—হ্যাঁ।

—বাঃ, বেশ বুদ্ধি, নিজেই ঘাড়ে নিচ্ছ কাজটা, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্। তার চেয়ে বলো আমি ক'জন কসাককে ডেকে আনছি এখুনি। ওরাই কফিন বানিয়ে বেশ করে কবর খুঁড়ে দেবে।...

কোন্ এক অচেনা বুড়োকে কবর দেওয়া নিয়ে ঝামেলা পোয়াবার ইচ্ছে নেই প্রোখরের তা বেশ বোঝাই যাচ্ছিল। কিন্তু ওর কথায় আমলই দিলে না গ্রিগর।

—আমরাই কবর খুঁড়ে মাটি দেব। বুড়ো সাশ্কা মানুষ ভালো ছিল। তুমি বাগানে গিয়ে ঝিলের ধারে আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমি গিয়ে একটু দেখে আসি।

সাশা একদিন গ্রিগর আর আক্সিনিয়ার কচি মেয়েটিকে যেখানে কবর দিয়েছিল, শেওলা-ঢাকা পুকুরের ধারে সেই শেকড় ছড়ানো পপ্লার গাছটির নিচেই বুড়ো পেল তার নিজেরও শেষ বিশ্রামের স্থান। বুড়োর শুকনো দেহটাকে ওরা হপ্-লতার গন্ধে ভরা ময়দার খামির-ঢাকা পরিষ্কার একখানা চাদরে জড়িয়ে কবরের মধ্যে শুইয়ে দেয়, তারপর দেয় মাটি। সেই শিশুটির কবরের ঢিবির পাশাপাশি ওঠে আরেকটা ঢিবি, কসাকদের বুট দিয়ে সযত্নে মাড়ানো তাজা ভিজে মাটি উৎফুল্ল হয়ে চিকমিক করে।

স্মৃতি-ভারাক্রান্ত গ্রিগর এই ছোট্ট স্নেহ-লালিত কবরখানাটির কাছেই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মাথার ওপর সুবিস্তীর্ণ নীল আকাশটার দিকে। ওই অনন্ত শূন্যে কোথায় যেন বাতাসের আনাগোনা, রোদ-ঝল্কানো হিমেল মেঘের ছুটোছুটি; কিন্তু এই মাটি যে তার বুকে সবেমাত্র ফিরিয়ে নিল ফূর্তিবাজ সহিস আর মাতাল সাশ্কাকে—এ মাটির বুকে এখনো আগের মতোই টগ্বগ্ করে ফুটছে জীবনের উত্তাপ। ফলবাগিচার একেবারে কিনারা-অবধি চুপিসারে ওই যে সবুজের বন্যা এনেছে স্তেপ-প্রান্তর, পুরনো ফসল-ঝাড়াই আঙিনাটার ধারে ধারে জট পাকানো বুনো শণ—ওরই ফাঁকে গ্রিগর শুনতে পায় কর্মব্যস্ত তিতিরগুলোর অবিশ্রান্ত খস্খস্ শব্দ, মেঠো ইঁদুরের শিস্ আর ভোমরার গুন্গুন্; বাতাসের দোলা লেগে সর্সর্ করে ঘাস, সূর্যাস্তের ফাগ-ছড়ানো আলোয় স্কাইলার্ক গান গায়, আর প্রকৃতির বুকে মানুষের গৌরবের জানান দিয়েই অনেক দূরে কোথায় যেন একটা মেশিনগান ক্রমাগত সরোষে গম্ভীরভাবে গর্জন করতে থাকে।

॥ তের ॥

জেনারেল সেক্রেতভ যখন তাঁর সেনাপতিমণ্ডলী আর সাঙ্গোপাঙ্গ এক স্কোয়াড্রন কসাককে নিয়ে ভিয়েশেনস্কায় হাজির হলেন তখন তাঁর অভ্যর্থনা হল ঘটা করেই—নুন আর রুটি খাইয়ে, গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে। দুটি গির্জাঘরের ঘণ্টাই সারাদিন ধরে বাজল—যার যখন খুশি ঘণ্টাঘরে গিয়ে বাজিয়ে আসতে লাগল, ঠিক ইস্টার পরবের সময় যেমনটি হয়। দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে পরিশ্রান্ত রোগা ডনদেশী ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে দক্ষিণ ডনের কসাকরা এল শহরের রাস্তায়। সওদাগর-বাড়িতে জেনারেলের আস্তানা, তার কাছেই চত্বরের ওপর একদল আরদালি জটলা করছিল। সূর্যমুখীর বীচি চিবোতে চিবোতে তারা গাঁয়ের পথ-চলতি মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়। মেয়েরা আজ রোববারের সেরা পোশাক পরেছে।

বিকেল অবধি ভিয়েশেনস্কায় বাজল গির্জার ঘণ্টা। আর চলল ভদ্কা। কিন্তু সন্ধ্যের সময় বিদ্রোহী নায়করা নবাগতদের জন্য একটা উৎসবের আয়োজন করল অফিসারদের মেস্ হিসেবে আলাদা করে রাখা বাড়িটিতে।

সেক্রেতভ দীর্ঘকায় সুঠাম চেহারার মানুষ, একজন নির্ভেজাল কসাক যেমনটি হয়ে থাকে। ক্রাস্নোকুৎস্ক্ জেলার এক পল্লীতে তাঁর জন্ম। সেক্রেতভ ঘোড়ায় চড়তে বড়ো ভালবাসেন, সওয়ারও খুব পাকা, বেপরোয়া ঘোড়সওয়ার সেনাপতি। কিন্তু বক্তৃতা তাঁর আসে না। ভোজসভায় যে বক্তৃতা তিনি দিলেন তা মাতালের অহঙ্কারে ভরা, উজানী ডন এলাকার কসাকদের প্রতি দ্ব্যর্থহীন গালিগালাজ আর ধমকানিই তাঁর আসল বক্তব্য।

গ্রিগর হাজির ছিল ভোজসভায়। রাগে দম বন্ধ করে ও সেক্রেতভের সব কথা শুনল। জেনারেল সাহেব তখনো সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হননি, টেবিলে হাত রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, গ্লাসের সুগন্ধ ভদ্কা ছিটিয়ে উনি প্রত্যেকটা কথার ওপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলে চললেনঃ

—...না, সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ আমাদের দেবার কথা নয়, আপনাদেরই বরং উচিত আমাদের ধন্যবাদ জানানো। খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়াই দরকার আপনাদের। আমরা না থাকলে লালরক্ষীরা আপনাদের একেবারেই খতম করে দিত। আপনারাও সে কথা ভালোভাবেই জানেন। আমরা কিন্তু আপনাদের ছাড়াই ওই আপদগুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে পারতাম। গুঁড়িয়ে দিচ্ছিও, ভবিষ্যতেও দেব, মনে রাখবেন সে কথা—যতোদিন না সারা রুশদেশ সাফ করে ফেলছি ততোদিন এই চলবে। শরৎকালে আপনারা ফ্রন্ট ছেড়ে পালিয়েছিলেন। আপনারাই কসাক-এলাকায় ঢুকতে দিয়েছিলেন বলশেভিকদের। আপনারা ওদের সঙ্গে শান্তিতেই থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা পারেননি! তাই শেষ

অর্বাধ মাথা তুললেন নিজেদের সম্পত্তি আর জান বাঁচাবার জন্য। সোজা কথায় বলতে গেলে, আপনারা ভয় পেয়েছিলেন পাছে আপনাদের নিজেদের আর আপনাদের গরু-ঘোড়াগুলোর চামড়া খসানো হয়। আপনাদের পাপের কথা বলে গালিগালাজ করব এমন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আগের কথা তুলছি না...আপনাদের চটিয়ে দেবার জন্যও এসব কথা বলছি না আমি। কিন্তু সত্যি কথা বললে তো কোনো অন্যায় হয় না। অপনাদের বেইমানি আমরা ক্ষমা করেছি। এখন আপনাদের চরম বিপদের মুহূর্তে আমরা এসেছি সাহায্য করতে। কিন্তু আপনাদের লজ্জাকর অতীতের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া চাই ভবিষ্যতে। বুঝতে পেরেছেন তো ভদ্রমহোদয়গণ? আপনাদের সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সাহস দেখিয়ে, আমাদের পুণ্যসলিলা ডনের প্রতি অকৃত্রিম সেবা দেখিয়ে। বুঝতে পেরেছেন?

—বেশ, তাহলে প্রায়শ্চিত্তের নামে এবার পান করা যাক'— গ্রিগরের উল্টো দিকে বসা একজন বয়স্ক কসাক-অফিসার প্রায় চোখেই পড়ে না এমনিভাবে হেসে বললে। কথাগুলো বিশেষ কাউকে উদ্দেশ করে বলা নয়। কারুর জন্য অপেক্ষা না করে সে নিজেই প্রথম পান করে। লোকটার পৌরুষব্যঞ্জক মুখে বসন্তের সামান্য দাগ, হাসিমাখা ঘন বাদামি চোখ দুটো। সেক্রেতভের বক্তৃতার সময় বারবার ঠোঁটজোড়া কুঁচকে উঠছিল অনির্দিষ্ট একটা প্রচ্ছন্ন হাসিতে। তারপর চোখ দুটো যেন কালো হয়ে উঠল, কুচকুচে কালো।' অফিসারটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গ্রিগর লক্ষ্য করল সেক্রেতভের সঙ্গে লোকটির গলাগলি একটু বেশি, তার সঙ্গে বেশ হেসেখেলে কথাও বলছে কিন্তু অন্য অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তায় সে রীতিমতো গম্ভীর আর উদাসীন ভাব দেখাচ্ছে। একমাত্র ওই লোকটিরই পরনে খাকি উর্দির ওপর খাকি পদকচিহ্ন, জামার হাতায় কর্নিলভের প্রতীক। গ্রিগর ভাবল - লোকটা আদর্শবাদী। হয়তো বা ভলান্টিয়ার! কসাক অফিসারটা ঘোড়ার মতো চোঁ-চোঁ করে মদ খেল। সঙ্গে খাবার কিছু খায়নি অথচ তবু মাতাল হল না, মাঝে মাঝে শুধু চওড়া বৃটিশ কোমরবন্ধখানা ঢিলে করে দিতে লাগল।

পাশেই বসে ছিল বোগাতিরিয়েভ। গ্রিগর তাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে আমার উল্টো দিকে বসে আছে ও-লোকটা কে? ওই যে বসন্তের দাগওলা?

—ভগবান্ জানেন কে!- বোগাতিরিয়েভ এড়িয়ে গেল। ওর মাতাল হবার অবস্থা।

কদীনভ অতিথিদের জন্য ভদকার সরবরাহে কার্পণ্য করেনি। টেবিলে সুরাসার এল। সেক্রেতভ কন্টেসন্টে বক্তৃতা শেষ করে খাকি কোটটা খুলে ধপ্ করে বসে পড়লেন আরাম কেদারায়। মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখওলা একজন ছোকরা কোম্পানি-কমান্ডার সেক্রেতভের ওপর ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় কী যেন বললে।

মুখ কালো করে সেক্রেতভ জবাব দিলে--চুলোয় যাও!

কদীনভ যে গ্লাসটা অতি-বিনীতভাবে ভরে দিয়েছিল সেটা তিনি উল্টে ফেলে দিলেন।

বোগাতিরিয়েভকে গ্রিগর জিজ্ঞেস করলে—আর ওই টানা চোখওলা লোকটা কে? সহকারী অফিসার?

হাতের তেলোয় মুখ ঢেকে গ্রিগরের সঙ্গী জবাব দিলেঃ

—না, ও হল সেক্রেতভের পোষ্যপুত্র। জাপানী যুদ্ধের সময় মাঞ্চুরিয়া থেকে ওকে সঙ্গে করে এনেছিলেন সেক্রেতভ। পেলে পুষে বড়ো করে জাঙ্কারদের মিলিটারি স্কুলে

পাঠিয়েছিলেন। ছেলেটা বেশ উন্নতিও করল! ভয়ানক বেপরোয়া! গতকাল মাকিভ্‌কার কাছে লালফৌজের টাকার সিন্দুকগুলো কেড়ে নিয়েছে। কুড়ি লক্ষ রুবলের নোট দখল করেছে। ওই দ্যাখো না, সবগুলো পকেট থেকে নোটের তাড়া উঁচু হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ? শয়তানটার ভাগ্য ভালো! রীতিমতো দৌলতখানা! তা অমন হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি, খাও না!

কুদীনভ এবার বক্তৃতার জবাব দিলে, কিন্তু কেউ ওর কথা কানেই তুলল না। হুল্লোড় ক্রমেই উদ্দাম হয়ে উঠছে। সেক্রেতভ জ্যাকেট খুলে শুধু ওয়েস্ট্‌কোট্‌ পরে বসে রইলেন। চাঁচাঁছোলা মাথাটা ওঁর ঘেমে উঠেছে, ধব্‌ধবে সাদা লিনেনের শার্টটার ওপর মুখখানা যেন আরো লাল টক্‌টকে দেখাচ্ছে, রোদ-পোড়া ঘাড়টা হয়ে উঠেছে আরো শামলা। কুদীনভ ওঁর কানে কানে কী বললে, কিন্তু সেক্রেতভ তার দিকে না তাকিয়ে গোঁয়ারের মতো বার-বার বলতে লাগলেনঃ

—না, মাপ করুন! মাপ করতে হচ্ছে। আপনাদের আমরা বিশ্বাস করি তবে যতোটা না করলেই নয় আপনাদের বেইমানি আমরা সহজে ভুলতে পারি না। যারা শরৎ-কালে লালদের খাতির দেখিয়েছিল তারা সবাই মনের মধ্যে খোদাই করে রাখুক সে কথা..

মাতাল গ্রিগর চাপা রাগের সঙ্গে ভাবলে—বেশ তো আমরাও তোমাদের সেবা করব, তবে যতোটা না করলেই নয়...।

উঠে দাঁড়াল গ্রিগর।

মাথায় টুপি না দিয়ে সিঁড়ি অবধি হেঁটে চলে গেল। মনে সোয়াস্তি নেই। নিশ্বাসের সঙ্গে রাতের টাটকা হাওয়া টেনে নিল বুক ভরে।

ডনের ধারে ব্যাঙগুলো ডাকছে কলরব করে। জল-ভোমরাগুলো বিরক্ত হয়ে গুন্‌গুন্‌ করছে, বর্ষার আগে যেমন হয়ে থাকে। এক ফালি বালির চরে বসে চখাচখী ডাকছে। খানিকটা দূরে নদীর কিনারায় নলখাগড়ার বনে একটা ঘোড়ার বাচ্চা তার মাকে হারিয়ে সরু টানাগলায় চিঁচিঁ করে ডাকছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাল্লা ফটকের দিকে রাস্তা খুঁজে এগোতে এগোতে গ্রিগর ভাবল—নিতান্ত দায়ে পড়ে তোমাদের সঙ্গে আমাদের গাঁটছড়া বাঁধতে হয়েছে, নয়তো তোমাদের গায়ের গন্ধটুকুও বরদাস্ত করতে পারতাম না। হতচ্ছাড়া আবর্জনা সব! এক পয়সার ফুলুরির আবার ফুটুনি কতো, আমাদের চোখ রাঙায়! এক হপ্তা বাদে দেখব ঘাড়ে পা দিয়ে হুকুম করছে।... যাক্‌ যা হবার হয়েই গেছে।...যা ভয় করেছিলাম তাই হল।... এ হবেই তা জানতাম। কিন্তু কসাকরাও এখন নাক উঁচিয়ে চলবে! মহামান্যদের সামনে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠোকার অভ্যেস ওদের আর নেই।

মদের নেশা গ্রিগরকেও ধরেছেঃ ওর মাথা ঘুরছে, কেমন যেন ভারি ভারি লাগছে চলাফেরা করতে। পাল্লা-ফটক দিয়ে বেরুবার সময় একবার টলে গিয়ে টুপিটা মাথার ওপর থাবড়া দিয়ে বসিয়ে ফের পা টেনে-টেনে হেঁটে চলল রাস্তা ধরে।

আক্‌সিনিয়ার পিসির সেই ছোট্ট বাড়িটার সামনে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে ও ইতস্তত করতে লাগল, তারপর শক্ত পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সিঁড়ি-ঘরের ভেতর-দিকের দরজাটা আটকানো ছিল না। দরজায় টোকা না দিয়ে সোজা বড়ো ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল গ্রিগর। আক্‌সিনিয়ার মা উনোনের কাছে কাজে ব্যস্ত। টেবিলে পরিষ্কার কাপড় পাতা হয়েছে। ঘর-চোলাই আধবোতল ভদ্‌কা, একটা প্লেটের মধ্যে কয়েক টুকরো লালচে গোলাপী শুঁটকি মাছ।

স্তেপান সবে গ্লাসটা খালি করে বোধহয় ধূমপানেরই জোগাড় করছিল। কিন্তু গ্রিগরকে দেখে ও প্লেটখানা সরিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল।

নেশার ঝোঁক থাকলেও গ্রিগর লক্ষ্য করেছে স্তেপানের মুখটা যেন মরার মতো ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, চোখজোড়া জ্বলে উঠল নেকড়ের মতো। এইভাবে দেখা হয়ে যাওয়াতে হতভম্ব হয়ে গেলেও শেষ অবধি গ্রিগর ভাঙা গলায় বললেঃ

—বেশ ভালোই চলছে দেখছি!

বাড়ির গিন্নি ভয়ে-ভয়ে বললে—ভগবান্ মঙ্গল করুন!— ভাইঝির সঙ্গে গ্রিগরের সম্পর্কের কথা মনে করে সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, আক্সিনিয়ার স্বামী আর প্রেমিকের এই আকস্মিক সাক্ষাতের ফল ভালো হবে না বলেই তার ধারণা।

স্তেপান নীরবে বাঁ হাত দিয়ে গালের জুলফি ঘষে, জ্বলন্ত চোখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে গ্রিগরের দিকে।

গ্রিগর কিন্তু পা ফাঁক করে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে শুকনো হাসি হেসে বললঃ

—মানে, এই একবার দেখতে এসেছিলাম তুমি কিছু মনে কোরো না।

চুপ করে আছে স্তেপান। গ্রিগরকে যতোক্ষণ না বাড়ির গিন্নি সাহস করে ঘরে ডেকে নিল ততোক্ষণ এমনি ধরনের একটা অস্বস্তিকর থমথমে ভাব।

আক্সিনিয়ার পিসিমা বললে—ভেতরে এসে বোসো।

গ্রিগরের এখন আর লুকোবার কিছু নেই। আক্সিনিয়ার বাড়িতে ওর এইভাবে আসার পর আর স্তেপানকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার কিছু নেই।

তাই ও সোজা কথাটা পেড়ে বসেঃ

—তোমার বউ কোথায়?

—তাহলে ওকেই দেখতে এসেছ, কেমন!— ধীরে ধীরে অথচ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে স্তেপান। চোখের পাতা নাচতে থাকে ওর।

গ্রিগর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেনে নিলে—হ্যাঁ, তাই।

এই মুহূর্তে গ্রিগর যে কোনো কিছুর জন্য তৈরি, সংযত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে সে। কিন্তু স্তেপান চোখদুটো অল্প একটু খুলে বলে (আগের সে আগুন ওর চোখে আর নেই)ঃ

—ওকে একটু ভদ্কা আনতে পাঠিয়েছি; এক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। বসে অপেক্ষা করো।

স্তেপান শেষ অবধি উঠে একটা চেয়ারও এগিয়ে দেয় গ্রিগরের দিকে। দীর্ঘ সুঠাম দেহ স্তেপানের। গৃহকর্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই বলে—পিসিমা, একটা পরিষ্কার গেলাস দাও তো।— গ্রিগরের দিকে ফিরে বলে—একটু পান করবে তো নিশ্চয়ই?

—শুধু এক গেলাস।

—বেশ তো, বোসো।

গ্রিগর টেবিলের পাশে বসে। স্তেপান বাকি ভদ্কাটুকু সমান করে দু গেলাসে ভাগ করে ঢালে; তারপর গ্রিগরের দিকে অদ্ভুত রহস্যভরা চোখদুটো তুলে বলেঃ

—সকলের নামেই পান করা যাক্।

—সকলের স্বাস্থ্য কামনা করে!

দুজনে গেলাস ঠেকায়। তারপর পান করে। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

ইঁদুরের মতো চট্‌পটে আক্‌সিনিয়ার পিসি অতিথির হাতে একটা প্লেট আর হাতলওলা কাঁটা-চামচে তুলে দেয়।

—একটু মাছ খাও। নোনা মাছ।

—না ধন্যবাদ।

—নাও না একটু প্লেটে তুলে। ভালোই লাগবে। —বুড়ি এবার খুব খুশি হয়ে গ্রিগরকে সাধে। মারামারি হল না, পেয়ালা-প্লেট ভাঙল না, চেঁচামেচি নেই—এমন ভালোভাবে ব্যাপারটা মিটে যেতে দেখে সে যার-পর-নাই খুশি হয়েছে। প্রথমে যে অলক্ষুণে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছিল সেটা বন্ধ। এখন ওরা চুপচাপ খেয়ে চলেছে, কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। বুড়ির সাংসারিক জ্ঞান টনটনে। তোরঙ্গ থেকে একটা পরিষ্কার তোয়ালে বের করে দু'জনেরই হাঁটুর ওপর বিছিয়ে দিয়ে গ্রিগর আর স্তেপানের মধ্যে বলতে গেলে সে একরকম মিলই ঘটিয়ে দেয়।

মাছটার দিকে তাকিয়ে থেকে গ্রিগর জিজ্ঞেস করে—তুমি তোমার কোম্পানি ছেড়ে এলে কেন?

স্তেপান এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দেয়—আমিও এলাম দেখা করতে।—গলার স্বর থেকে বোঝা অসম্ভব ও ঠাট্টা করছে, না সত্যি-সত্যি বলছে।

—কোম্পানি বুঝি গাঁয়ে ফিরে এসেছে, তাই না?

—ওরা গাঁয়ে এসে আমোদ-আহ্লাদ করছে। আচ্ছা, আমরা তাহলে মদটুকু শেষ করে ফেলি?

—বেশ।

—তোমার স্বাস্থ্য কামনা করি!

—তোমার সৌভাগ্য!

সিঁড়ি-মুখে দরজার শেকলটা নড়ে উঠল। গ্রিগরের মাথা এখন বেশ ঠাণ্ডা। ভুরুর তলা দিয়ে তাকাল স্তেপানের দিকে, দেখল ওর মুখের ওপর আবার যেন একটা ছায়া সরে গেল।

আক্‌সিনিয়া ঢুকল ঘরে। মাথায় একটা ছুঁচের কাজ-করা ওড়না জড়ানো। গ্রিগরের দিকে না তাকিয়ে ও টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে আড়চোখে চাইল। কালো বড়ো-বড়ো চোখদুটোয় আতঙ্কের ভাব। হাঁপাতে হাঁপাতে শেষে জোর করে বলল:

—নমস্কার, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্!

স্তেপানের বড়ো বড়ো হাত দুটো টেবিলের ওপর কাঁপতে শুরু করেছে। গ্রিগর নীরবে আক্‌সিনিয়াকে প্রতিনমস্কার করলে, একটা কথাও বেরুলো না ওর মুখ থেকে।

টেবিলের ওপর ঘর-চোলাই দু'বোতল ভদ্‌কা রেখে আক্‌সিনিয়া ফের একবার নজর বুলিয়ে নিল গ্রিগরের ওপর—উদ্বেগ আর চাপা আনন্দে ভরা ওর চাউনি। ঘরের অন্ধকার কোণটার দিকে ঘুরে গিয়ে সিন্দুকের ওপর বসল, কাঁপা-কাঁপা হাতে চুল সোজা করতে লাগল। চাঞ্চল্য দমন করে স্তেপান ততোক্ষণে শার্টের কলারের বোতাম খুলে ফেলেছে, এতক্ষণ যেন দম আটকে আসছিল। কানায় কানায় গেলাসগুলো ভরে নিয়ে ও বউয়ের দিকে ফিরল:

—একটা গেলাস নিয়ে টেবিলে এসে বসে পড়ো।

—আমার দরকার নেই।

—এসে বোসোই না!

—কিন্তু আমি যে ভদ্‌কা খাই না স্তেপান।

—আর কতোবার সাধব বলো তো? —স্তেপানের গলার স্বর কাঁপছে।

গ্রিগর উৎসাহ দিয়ে হেসে বললে—বসো না পড়শি! —অনুযোগভরা চোখে ওর দিকে একবার তাকিয়ে আক্‌সিনিয়া চট্‌ করে চলে গেল আলমারীর কাছে। তাক থেকে একটা ডিশ্‌ ঝন্‌ঝন্‌ করে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

বাড়ির গিন্নি গোঁসা করে দুহাতে তালি বাজিয়ে বলে উঠল- দ্যাখো দেখি কান্ডটা!

আক্‌সিনিয়া চুপচাপ টুকরোগুলো কুড়োয়।

স্তেপানও তার গ্লাসটা কানায় কানায় ভরে নিয়েছিল। আরেকবার ওর চোখ দুটো ক্ষোভ আর ঘৃণায় দপ্‌ করে জ্বলে উঠল।

—এসো তাহলে, পান করা যাক্‌...। বলতে বলতে চুপ করে গেল সে।

আক্‌সিনিয়া যখন টেবিলের পাশে এসে বসে, নিস্তব্ধতার মধ্যে পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায় ওর ঘন-ঘন গভীর নিঃশ্বাস।

—দীর্ঘদিনের বিদায় মনে করে এবার আমরা পান করব বুঝলে বউ। কেন, তোমার ইচ্ছে নেই? খাবে না?

—কিন্তু তুমি তো জানো...

—এখন আমি সবই জানি।.. বেশ, তাহলে বিদায়ের নামে নয়, আমাদের প্রিয় অতিথি গ্রিগর পান্তালিয়েভিচের স্বাস্থ্য কামনাই করা যাক্‌।

—হ্যাঁ, আমি ওর স্বাস্থ্য কামনা করি! গুন্‌গুন্‌ করে বলে আক্‌সিনিয়া এক ঢোঁকে গেলাস শেষ করে।

ওর পিসিমা রান্নাঘরের দিকে ছুটে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলে তোর মাথায় গোবর পোরা।

এক কোণায় ঢুকে বুড়ি দুহাত বুকে চেপে অপেক্ষা করতে থাকে- এই বুঝি টেবিল ছোঁড়া শুরু হল, এই বুঝি কান-ফাটানো বন্দুকের আওয়াজ। কিন্তু খাস-কামরায় এখন গোরস্থানের নিস্তব্ধতা। একমাত্র শব্দ যা কানে আসছে সে হল কড়িকাঠের ওপর আলোয় চঞ্চল হয়ে-ওঠা মাছিগুলোর ভন্‌ভনানি, আর জানলার বাইরে রাত-দুপুরের প্রহর গুনে মোরগদের পালা করে ডাক।

* *

ডনের পারে জুন মাসের রাতগুলো ঘন আঁধার। অস্বাস্থিকর নীরবতার মধ্যে নীলচে-কালো আকাশে গরমকালের সোনালি বিজলির চমক, হুটন্তারার দৌড়—নদীর খরগতি স্রোতে তারই ছায়া পড়ে। স্তেপের মাঠ থেকে গরম শুকনো হাওয়া লোকালয়ের দিকে টেনে আনছে ফুল-ফোটা থাইম্‌ লতার মধু সৌগন্ধ্য। নদীর ঢালু পাড়ে ভিজে ঘাস, পলিমাটি আর শেওলার গন্ধ; অনবরত ডাকছে কর্নক্রেক্‌ পাখি, নদীর ধারের বন রুপোলি কুয়াশার পর্দায় ঢাকা—যেন রূপকথার গল্পের ছবি।

মাঝরাতে জেগে ওঠে প্রোখর। যে বাড়িতে ওরা আস্তানা নিয়েছে সেই বাড়ির কর্তাকে জিজ্ঞেস করলঃ

—আমাদের লোক কি আসেনি?

—না এখনো আসেনি। জেনারেলদের সঙ্গে আমোদ ফুর্তি করছে।

—ভদ্‌কা খেয়ে খুব মজা লুটছে নিশ্চয়।— ঈর্ষাভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রোখর। তারপর হাই তুলে পোশাক পরতে শুরু করে।

—কোথায় চললে?

—যাই ঘোড়াগুলোকে একটু জল আর দানা দিয়ে আসি। পান্তালিয়েভিচ বলেছিল ভোরে উঠে তাতারস্ক রওনা হব। সারা দিন ওখানে কাটিয়ে ফের ধরতে হবে আমাদের ফৌজের নাগাল।

—ভোর হতে তো অনেক দেরি। আলো ফোটা অবধি অপেক্ষা কর।

বিরক্তির সুরে প্রোখর জবাব দেয়ঃ

—বুড়ো, তুমি যে জোয়ান বয়েসে কোনোদিন ফৌজে কাজ করোনি সে যে-কেউ চোখ বুজে বলে দিতে পারবে। যদি ঘোড়াকে না খাওয়াই, না দেখি, তাহলে হয়তো নিজেরাই আর জ্যান্ত ফিরব না। একটা আধ-পেটা কচি জানোয়ারকে দাবড়ে তো আর সারা রাজ্যি ঘুরে বেড়ানো যাবে না। বাহনটি যতো তর-তাজা হবে, দুশমনের কাছ থেকেও ততো তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারবে। আমার বাবা এই কথা। ইচ্ছে করে শত্তুরের মুখে গিয়ে পড়ার দরকার নেই, তবে যদি শক্ত পাল্লায় পড়ে যাই তাহলে আমিই সবার আগে ছুটব। এত বছর বুলেটের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছি, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে! একটা বাতি জ্বালো হে বুড়ো, নয়তো পায়ের পট্টিগুলো খুঁজে পাব না। ধন্যবাদ! হ্যাঁ, বলছিলাম কি আমাদের এই গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্, সব রকমের পদক আর খেতাব পেয়েছে, সোজা মাথা ঢুকিয়েছে বাঘের গর্তে। কিন্তু আমি বাবা অমন গাধা নই, ওসবে আমার কোনো প্রয়োজনও নেই। শয়তান ওকে চালাচ্ছে, চালাক। বোধহয় মদে বেহুঁশ হয়ে বোঝাপড়া করছে।

দরজায় আস্তে টোকা পড়ল।

প্রোখর উঁচু গলায় বললে—ভেতরে এসো!

খাকি উর্দির ওপর জুনিয়র নন-কমিশন অফিসারের পদক-আঁটা একজন কসাক ঢুকল ঘরে। মাথায় চুড়ো-তোলা টুপি।

দরজার কাছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকে লোকটি বললে—আমি জেনারেল সেক্রেতভের আরদালি। মহামান্য মেলেখফ মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি?

সুশিক্ষিত আরদালির চালচলন আর আদবকায়দা দেখে তাজ্জব হয়ে প্রোখর জবাব দিলে—উনি এখানে নেই। কিন্তু অমন কাঠখোট্টার মতো সিধে হয়ে দাঁড়িও না। ছোকরা বয়েসে তোমার মতোই বুদ্ধু ছিলাম আমিও। আমি মেলেখফের আরদালি। কিন্তু তাঁকে কী জন্য দরকার?

মেলেখফ মশায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমায় হুকুম দিয়েছেন জেনারেল সেক্রেতভ। অফিসাররা মেস্-বাড়িতে এই মুহূর্তে হাজির হবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

—তিনি তো সেখানেই সন্ধ্যের সময় গিয়েছিলেন।

—গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে বেরিয়ে বাড়ি চলে এসেছেন।

প্রোখর শিস্ দিয়ে বিছানার ওপর বসা বাড়ির কর্তার দিকে চোখ টিপে বললেঃ

—বুঝলে তো বুড়ো? সট্‌কে পড়েছেন, তার মানে গেছেন তাঁর পেয়ারীর কাছে।... আচ্ছা, তুমি যেতে পারো সেপাই। আমি তাঁকে খুঁজে বের করে সঙ্গে-সঙ্গেই পাঠিয়ে দেব।

জেলার সদর ভিয়েশেন্‌স্কা ডুবে আছে গাঢ় অন্ধকারে। ডনের ওপারে বনের মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিস্‌ দিচ্ছে নাইটিঙ্গেল। ধীরে সুস্থে প্রোখর গিয়ে উঠল বহু-পরিচিত সেই ছোট্ট বাড়িটিতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবে দরজার শেকলটায় হাত দিয়েছে এমন সময় শুনতে পেল স্তেপানের দরাজ গলার আওয়াজ। প্রোখর ভাবল— এ তো বড়ো গাড্ডায় পড়লাম! এখন জানতে চাইবে কেন এসেছি। আমারও বলার কিছু থাকবে না। যাক্‌ যা হবার হবে। বলব ভদ্‌কা কিনতে বেরিয়েছিলাম, পড়শিরা এই বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

মনে সাহস এনে প্রোখর ঢুকল বড়ো ঘরটায়। ঢুকে তো একেবারে হতভম্ব, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল—আস্তাখভের সঙ্গে এক টেবিলে বসেছে ওই গ্রিগর, আর—যেন কোনোদিনও ওদের মধ্যে কোনো ঝগড়া হয়নি এমনিভাবে একটা গেলাস থেকে ধূসর-সবুজ ঘর-চোলাই ভদ্‌কা খাচ্ছে।

মুখে একটা কষ্টকৃত হাসি ফুটিয়ে স্তেপান তাকাল প্রোখরের দিকে। বললেঃ

—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অমন হাঁ করে চেয়ে দেখছ কী, 'নমস্কার' অবধি করলে না? ভূত দেখেছ নাকি?

—ওইরকমই কিছু। —তখনো অবাক হয়েই আছে প্রোখর, এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিয়ে জবাব দিলে সে।

স্তেপান ওকে ডাকলে—ঘাবড়িও না, ভেতরে এসে বসে পড়ো।

—বসবার তো সময় নেই। আমি তোমার খোঁজেই এসেছি গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ। এক্ষুণি জেনারেল সেক্রেতভের কাছে তলব পড়েছে তোমার।

প্রোখর আসার আগেই গ্রিগর অনেকবার যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল। গেলাস ঠেলে সরিয়ে উঠে ফের বসে পড়েছে, পাছে ওর চলে যাওয়াটাকে স্তেপান ভীরুতারই নিদর্শন বলে মনে করে। আক্‌সিনিয়াকে ছেড়ে দিয়ে স্তেপানের কাছে হার মানবে—এ কথা ভাবতে ওর অহঙ্কারে ঘা লাগে। ভদ্‌কা ও খাচ্ছে, কিন্তু তার কোনো প্রভাব হচ্ছে না ওর ওপর। ওর নিজের উপস্থিতির দ্ব্যর্থক প্রকৃতিটা ও বুঝতে পারে সহজেই, অপেক্ষায় থাকে নাটকীয় সমাধানের। এক মুহূর্তের জন্য ওর নিশ্চিত মনে হয়েছিল আক্‌সিনিয়া যখন গ্রিগরের স্বাস্থ্য কামনা করেছে তখন স্তেপান তার স্ত্রীকে মারবেই। কিন্তু ভুল করেছে সে। স্তেপান ওর লোমশ হাতখানা তুলে রোদপোড়া কপালটা মুছে একটুখানি চুপ করে রইল। তারপর প্রশংসাভরা চোখে আক্‌সিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি সত্যিই অসামান্যা! তোমার সাহসের তারিফ করি বউ!

এমনি সময় ঢুকেছে প্রোখর।

এক মুহূর্ত কী ভেবে গ্রিগর ঠিক করল—যাবে না। ভাবল স্তেপানকে সুযোগ দেবে তার মনের সব কথা খুলে বলার।

প্রোখরকে বললে—যাও, গিয়ে ওদের বলো আমাকে খুঁজে পাওনি। বুঝতে পেরেছ?

—বুঝতে পেরেছি ঠিকই। তবে তুমি গেলে বোধহয় ভালো করতে পান্তালিয়েভিচ।

—সে তোমায় ভাবতে হবে না। যাও ভাগো!

দরজার দিকে এগিয়ে গেল প্রোখর। কিন্তু ঠিক সেই সময় আক্‌সিনিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা দিলে। গ্রিগরের দিকে না তাকিয়ে শুকনো গলায় বললেঃ

—এ সবের কি মানে হয়? তুমি ওর সঙ্গে যাও গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ!

আমাদের অতিথি হয়ে এসে খানিকক্ষণ সময় কাটিয়ে গেলে সেজন্য ধন্যবাদ...। কিন্তু এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে, দুপহরের মোরগ ডাকল। খানিক বাদেই ভোর হবে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আর স্তেপানকে বাড়ি ফিরতে হবে।...তা ছাড়া তুমি ঢের মদও খেয়েছ! আর নয়!

স্তেপান আর গ্রিগরকে আটকাতে চেষ্টা করে না। গ্রিগর উঠে দাঁড়ায়। করমর্দনের সময় স্তেপান গ্রিগরের হাতটা চেপে ধরে নিজের ঠাণ্ডা খসখসে হাতের মধ্যে, যেন কিছু বলতে চায় সে। কিন্তু তবু সে বলে না কিছু, নীরবে গ্রিগরকে দরজা অবধি এগিয়ে দেয়, তারপর ধীরে সুস্থে হাত বাড়ায় অসমাপ্ত বোতলটার দিকে।

রাস্তায় এসে নামামাত্র একটা দারুণ ক্লান্তি যেন পেয়ে বসে গ্রিগরকে। অতি কষ্টে পা টেনে সে হেঁটে যায় প্রথম মোড়টা অবধি। প্রোখর আসছিল নাছোড়বান্দার মতো পেছন পেছন। গ্রিগর তাকে বলেঃ

-যাও, ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এখানেই নিয়ে এসো, আমি আর হেঁটে যেতে পারছি না।

গিয়ে রিপোর্ট করব যে তুমি রাস্তায় -

না।

--তাহলে একটু সবুর: আমি এখখুনি ফিরে আসছি।

এবারে স্বভাব-কুঁড়ে প্রোখর জোর কদমে ছুটল ওদের আস্তানার দিকে।

বেড়ার ধারে বসে গ্রিগর একটা সিগারেট ধরায়। মনে মনে স্তেপানের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাবার ঘটনাটা পর্যালোচনা করতে করতে অজ্ঞাতসারেই ভাবেঃ যাক্ এবার তো সবই জেনে গেল। এখন আক্সিনিয়াকে না মারাপিট করে বসে। ক্লান্তি আর এতক্ষণ যে মানসিক উত্তেজনা গেছে তারই ফলে গ্রিগর বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ে। ঝিমোতে শুরু করে।

একটু বাদেই এসে পড়ে প্রোখর।

খেয়া নৌকোয় চেপে ওরা ডনের ওপারে গিয়ে ফের ঘোড়া ছোটায় দুলকি চালে।

॥ চোদ্দ ॥

ভোর নাগাদ ওরা তাতারস্কে এসে হাজির হয়। বাড়ির ফটকের সামনে গ্রিগর ঘোড়া থেকে নেমে প্রোখরের হাতে লাগামটা ছুঁড়ে দিয়ে ঘরের দিকে ছোটে তাড়াতাড়ি। মনটা ওর ছটফট করছে।

নাতালিয়া আলুথালু পোশাকে কিসের খোঁজে যেন এসেছিল সিঁড়ি-দরজার কাছে। গ্রিগরকে দেখে ওর তন্দ্রালস চোখদুটো এমনভাবে উজ্জ্বল আনন্দের আভায় ঝিকমিক করে যে তাই দেখে গ্রিগরের বুকটা দুলে ওঠে, মুহূর্তের জন্য আচমকা চোখের পাতা

ভিজে ওঠে ওর। কিন্তু নাতালিয়া ওকে নীরবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সারা শরীর দিয়ে আলিঙ্গন করে, ওর কাঁধের কাঁপুনিতে গ্রিগর বুঝতে পারে নাতালিয়া কাঁদছে।

ঘরে ঢুকে বুড়ো-বুড়ি আর বড়ো-ঘরে ঘুমোতে-থাকা ছেলেপিলেগুলোকে চুমো খায় গ্রিগর। তারপর এসে দাঁড়ায় রান্নাঘরের মাঝখানটিতে।

উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল ওর। জিজ্ঞেস করলে তারপর, কেমনভাবে কেটেছে তোমাদের? সব ভালো তো?

—সবই তাঁর মহিমা রে খোকা, প্রাণে ডর জাগায় এমন কতোকিছুই তো দেখলাম, তবে আমাদের নিজেদের যে খুব ঝামেলা গেছে তা বলতে পারব না।— তাড়াতাড়ি জবাব দেয় ইলিনিচনা। নাতালিয়ার চোখের জলে ভেজা মুখটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দেয়—কোথায় বলে খুশি হবে, তা না কাঁদছে দেখ বোকা মেয়ে! আর হাত গুটিয়ে বসে থেকো না! দুটো লাকড়ি এনে উনোনটা জ্বালিয়ে দাও

ইলিনিচনা আর নাতালিয়া যখন চটপটে হাতে প্রাতরাশ তৈরি করতে ব্যস্ত, পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ সেই অবসরে ছেলেকে একটা পরিষ্কার তোয়ালে এনে দিয়ে বললে

—হাত-মুখ ধুয়ে নাও, জল ঢেলে দিচ্ছি। মাথাটাও সাফ হয়ে যাবে'খন। গায়ে তো ভদ্‌কার গন্ধ। কাল বুঝি শুভদিন বলে খুব মোচ্ছবে মেতেছিলে?

—উৎসব তো খুবই হল! তবে এই মুহূর্তে ঠিক বুঝতে পারছি না শুভদিন ছিল কি শোকের দিন

-তার মানে? বুড়ো যার পর-নাই অবাক হয়েছে।

—সেক্রেতভ আমাদের ওপর খাপ্পা হয়ে আছেন।

—তাতে আর শোকের কী হল? তোমার সঙ্গে একসঙ্গে মদ খাননি নিশ্চয়ই?

—হুঁ তা অবিশ্যি খেয়েছেন।

—বলিস্ কি রে! তোকে এত সম্মান দেখাল, গ্রিশকা! একজন সত্যিকারের জেনারেলের সঙ্গে এক টেবিলে বসে! এ যে ভাবতেও পারি না রে! সস্নেহে ছেলের দিকে চেয়ে পান্তালিমন আনন্দে জিভ দিয়ে চুক্‌চুক্ আওয়াজ করে।

হাসল গ্রিগর। বাপের সহজ সরল আনন্দে ও একটুও ভাগ নিতে পারছে না।

বুড়োকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল গরু-ঘোড়ার কথা, ফসলের কতোখানি ক্ষতি হল ইত্যাদি। প্রশ্ন করার সময় গ্রিগর লক্ষ্য করল খেতখামারের কথায় ওর বাপের আর আগের মতো সে উৎসাহ নেই। বুড়োর মনে যেন আরো কী দরকারী সব কথা জমে আছে, রীতিমতো ভারাক্রান্ত হয়ে আছে বুড়োর মনটা।

আসল ভয়ের কথাটা জানাতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না পান্তালিমনের।

—এবার কী হবে বল্ তো রে গ্রিশা? আবার কি আমাদের ফৌজের কাজে যেতে হবে?

—কাদের কথা বলছ?

—মানে বুড়োরা। যেমন ধর্ আমি।

—এখনই পাকাপাকি কিছু বলা যায় না।

—তার মানে আমাদের যেতেই হবে?

—তুমি থেকে যেতে পারো।

—সত্যি বলছিস্?—খুশি হয়ে বলে ওঠে পান্তালিমন, ফুর্তির চোটে রান্নাঘরের চারধারে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লাফাতে শুরু করে।

ইলিনিচ্‌না ধমক লাগায়—খোঁড়া শয়তান, চুপটি করে বোসো তো! বুটের কাদাগুলো বাড়িময় আর ছড়িও না। এমন আহ্লাদে আটখানা যে, আধ-পেটা খাওয়া নেকড়ের বাচ্চার মতো দৌড়োতে লেগেছে।

বুড়ো লোকটা কিন্তু ওর চিৎকারে কান দেয় না। টেবিল থেকে উনোনের দিকে কয়েকবার লাফিয়ে লাফিয়ে যায়, হাসে আর হাত ঘষে। তারপর হঠাৎ একবার সন্দেহ ঢোকে মাথায় :

—কিন্তু আমাকে ছাঁটাই করে দিতে তুই পারবি?

—তা নিশ্চয় পারি।

—বরখাস্তের চিঠি দিবি আমাকে?

—নিশ্চয় দেব।

বুড়ো বিড়বিড় করে কী যেন বলার চেষ্টা করে, তারপর বলেই ফেলে কথাগুলো :

—চিঠিটা কী রকমের হবে? শীলমোহর ছাড়াই? নাকি তোর কাছেই শীলমোহর রয়েছে?

গ্রিগর হেসে বলে—শীলমোহর ছাড়াই বেশ চলে যাবে।

বুড়ো আবার খুশি হয়ে বলে ওঠে—বেশ, তাহলে তো আর কথাই নেই। ভগবান তোকে সুস্থ রাখুন! আবার কবে ফিরে যাবি ঠিক করেছিস?

—কাল।

—তোর সেপাইরা কি আগেই চলে গেলে?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না বাবা। তোমার মতো বুড়োদের শিগ্‌গিরই বাড়ি ফিরে যেতে বলা হবে। তোমাদের যা করার ছিল করেছ।

—সবই তাঁর ইচ্ছে!—ক্রুশ প্রণাম করে পান্তালিমন, তার মানে এখন আর কোনো খট্‌কা নেই তার মনে।

বাচ্চা-কাচ্চারা জেগে ওঠে। গ্রিগর ওদের কোলে নিয়ে হাঁটুতে বসায়, একে একে ওদের চুমু খেয়ে হাসি মুখে অনেকক্ষণ ধরে শোনে ওদের কলরব।

বাচ্চাগুলোর মাথার চুলে কেমন গন্ধ! রোদ, ঘাস, নরম বালিশের গন্ধে মেশামিশি, সেই সঙ্গে এমন কিছু যা গ্রিগরের কতো যেন আপনার, কতো যেন কাছাকাছি। আর ওর নিজের রক্তমাংসে গড়া এই শিশুগুলো—এরা যেন সব ছোট-ছোট স্তেপের পাখি। বাচ্চা দুটোকে জড়িয়ে ধরার সময় ওর নিজের প্রকাণ্ড কালো হাত দুটোকে কেমন ধ্যাবড়া দেখায়! এ শান্তির পরিবেশে যেন কতো বেখাপ্পা লাগে নিজেকে—ও যেন ঘোড়সওয়ার, একদিনের জন্য ঘোড়া থেকে নেমে এসেছে, সেপাইয়ের মেহনত আর ঘোড়ার ঘামের ঝাঁঝালো গন্ধ ওর সারা দেহে, টক গন্ধ চামড়ার সাজের আর একটানা অভিযানের!

গ্রিগরের চোখ জলে ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। জুলফির কিনারায় ঠোঁট দুটো কাঁপে। তিন-তিনবার বাপের প্রশ্নের জবাব দিতে ভুলে গিয়েছে ও। নাতালিয়া যখন ওর জামার হাতাটা ছোঁয় তখনই কেবল ও টেবিলে এসে বসে।

গ্রিগর যেন সত্যিসত্যিই আর আগের মানুষ নেই! কোনোকালেই খুব ভাবপ্রবণ ছিল না ও, ছেলেবেলায়ও কান্নাকাটি কমই করেছে। কিন্তু এখন ওর চোখে জল, বুকের ভেতর চাপা দ্রুত স্পন্দন, গলার কাছে একটা ছোট ঘণ্টা যেন নিঃশব্দে বেজে চলছে এমনি একটা অনুভূতি...। হয়তো বা গেল-রাতে অনেকটা মদ খেয়েছিল আর ঘুমও হয়নি—তারই ফল হবে এটা।

মাঠ থেকে গরু তাড়িয়ে নিয়ে ফিরল দারিয়া। হাসি-মাখা ঠোঁট দুটো সে বাড়িয়ে দিল গ্রিগরের দিকে। গ্রিগর তামাশা করে জুলফিতে হাত বুলিয়ে দারিয়ার মুখের কাছে মুখ আনতেই সে চোখ বুজল। গ্রিগর দেখল ওর চোখের পাতাজোড়া যেন বাতাসে কাঁপছে. এক মুহূর্তের জন্য দারিয়ার গালের ভ্যাপসা ক্রীমের গন্ধটা সচেতন করে তুলল গ্রিগরকে।

দারিয়া তাহলে বদলায়নি একেবারেই। দেখলে মনে হবে এমন কোনো শোক নেই যাতে ও কখনো মচ্‌কাতে পারে. ভাঙা তো দূরের কথা। লাল-বাকল বুনোগাছের নরম ডালের মতোই নমনীয়, সুন্দর আর সুগম সে।

গ্রিগর বললে—তাহলে বেশ শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে তোমার?

জ্বলজ্বলে চোখ দুটো আধ-বোজা করে ঝলমলে হাসি হেসে দারিয়া বললে—হ্যাঁ, পথের ধারের আশ্‌শ্যাওড়ার মতো!—চট্‌ করে আয়নার সামনে গিয়ে দারিয়া রুমালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা দু'চারগাছি চুল সোজা করে ফিট্‌ফাট হয়ে নিল।

কিন্তু দারিয়া তো চিরকালই ওই ধাঁচের। এমন মেয়েকে শোধরাবার কোনো পথ নেই নিশ্চয়। পিয়োত্রার মৃত্যুতে ওর উৎসাহটাই যেন আরো বেড়ে গেছে. শোকের আঘাত সামলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো বেশি উদগ্র হয়ে উঠেছে ওর জীবন কামনা, নিজের চেহারার দিকে আরো বেশি করে নজর দিয়েছে সে।

দুনিয়া ঘুমোচ্ছিল গোলাঘরে. ওকে ওরা জাগিয়ে তুলল। কুশ প্রণাম সেরে গোটা পরিবারের সবাই বসল টেবিলের ধারে।

দুনিয়া দুঃখ করে বলল- তুমি কতো বুড়ো হয়ে গেছ দাদা! চুলগুলো একেবারে পেকে গেল!

টেবিলের এপাশ থেকে গ্রিগর শুধু নীরব কঠিন চোখে তাকায় ওর দিকে, তারপর বলে

—তাতো হবেই। আমার এখন বুড়ো হবার কথা, আর তোমার উঠ্‌তি বয়েস, স্বামীর ঘরে যাবে. কিন্তু তোমাকে আমি এই বলে দিচ্ছি : আজ থেকে মিশকা কশেভয়ের কথা যেন ভুলেও ভেবো না। আজ থেকে যদি শুনি তুমি ফের ওর জন্য হেদিয়ে মরছ, তাহলে এক ঠ্যাঙে পিষে আরেক ঠ্যাঙ ধরে দুটুকরো করে চিরে ফেলে দেব ব্যাঙের মতো। বুঝতে পেরেছ?

দুনিয়া লাল হয়ে ওঠে. জলভরা চোখে তাকিয়ে থাকে গ্রিগরের দিকে।

দুনিয়ার মুখের ওপর থেকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে নেয় না গ্রিগর। ওর প্রত্যেকটি রূঢ় দেহভঙ্গি, গোঁফের নিচে উঁকি-দেয়া দাঁত আর কোঁচকানো ভুরুর মধ্যে যেন আরো প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে মেলেখফ পরিবারের স্বভাবসিদ্ধ পাশব চরিত্রটুকু।

কিন্তু দুনিয়াও তো সেই পরিবারেরই মানুষ। অপ্রতিভ আর লজ্জাভাবটা কাটিয়ে উঠে সেও শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলেঃ

—তুমি কি জানো না, দাদা, মানুষের হৃদয়ের ওপর হুকুম চলে না?

—যে হৃদয় বশ মানে না তাকে উপড়ে ফেলে দিতে হবে।—কঠিন সুরে উপদেশ দেয় গ্রিগর।

ইলিনিচ্‌না মনে-মনে ভাবছিল—এসব কথা তোর বলা সাজে না রে খোকা। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কথাবার্তায় যোগ দিলে পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ। টেবিলে ঘুষি মেরে সে চড়া গলায় বলে উঠল :

—ওরে কুত্তীর বাচ্চি, আমার সামনে তুই মুখ করবিনে বলছি! নয়তো এমন একখানা বসিয়ে দেব যে, মাথায় একগাছিও চুল থাকবে না! হতচ্ছাড়ি! এক্ষুনি গিয়ে লাগাম নিয়ে আসছি দাঁড়া...।

মুখখানা কাঁচুমাচু করে দারিয়া বাগড়া দিলে—কিন্তু বাবা, ঘরে যে একজোড়াও লাগাম নেই। সব তো নিয়ে গেছে।

হিংস্র চোখে একবার ওর দিকে তাকাল পান্তালিমন, গলা খাটো না করে তেমনি-ভাবেই যা প্রাণে চায় বলে যেতে লাগল

—এখুনি জিনের পেটি নিয়ে আসব, তোর সব শয়তানি ঘোচাব এবার...।

—লাল সেপাইরা তো জিনের পেটিও নিয়ে গেছে।—এবার আরেকটু জোর গলায় বললে দারিয়া, শ্বশুরের দিকে কিন্তু অমনি নিরীহ গোবেচারার মতোই তাকিয়ে আছে।

এবার পান্তালিমনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য সে ছেলের বউয়ের দিকে তাকাল। বোবা রাগে কালো হয়ে উঠেছে মুখখানা। নীরবে মুখব্যাদান করে থেকে (সেই মুহূর্তে তাকে ঠিক জল থেকে তোলা পাইক মাছের মতো দেখাচ্ছিল) অবশেষে বুড়ো কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল

—চুপ কর্, ওরে হতচ্ছাড়ী। হাজারটা শয়তান রয়েছে তোর মধ্যে! তাদের জ্বালায় একটি কথাও কইবার জো নেই। এসবের কী মানে? কিন্তু দুনিয়া তুই বুঝে দ্যাখ্ : এধরণের ব্যাপার স্বাভাবিক নয়। তোর বাপ হিসাবেই বলছি। গ্রিগর তো ঠিকই বলেছিল : তুই যদি কেবলই ওই শয়তানটার কথা ভাবিস তাহলে তোকে খুন করলেও তেমন সাজা হয় না। ভালো পাত্তর পেয়েছ যাহোক! ফাঁসির আসামী ওনার চিত্ত জয় করেছে! গাঁয়ের আদ্ধেকটা পুড়িয়ে দিল, অসহায় বুড়োদের গুলি করে মারল—ওকে কি তুই মানুষ বলিস? তুই কি মনে করিস্ এমনি একটা বেইমানকে আমার জামাই করে নেব? আমার হাতে যদি পড়ে আমি নিজেই তাকে যমের দোরে ঠেলে দেব। পাল্‌টা জবাব দিবি তো এখুনি একগাছি বেত এনে তোর পিঠে..।

ইলিনিচ্‌না দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—কই কোথায়—ভর দুপুরে বাতি নিয়ে সারা উঠোন ঢুঁড়েও যদি একগাছি উইলোর ডাল মেলে। উঠোনের আনাচ-কানাচ যেখানেই খোঁজো আগুন জ্বালাবে এমন একটুকরো খড়কাঠি অবধি পাবে না। এই তো হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের অবস্থা!

নেহাত নিরীহ এই মন্তব্যটার পেছনেও শয়তানির গন্ধ পায় পান্তালিমন। বুড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে পাগলের মতো লাফ দিয়ে ছুটে যায় উঠোনে।

গ্রিগর হাতের চামচে নামিয়ে রেখে তোয়ালের মধ্যে মুখ ঢেকে হাসতে লাগল—চাপা হাসিতে শরীর কাঁপছে ওর। সমস্ত রাগ চলে গেছে, হাসছে অনেককাল আগের মতো হাসি। দুনিয়া ছাড়া বাকি সবাই হাসছে। এবার একটা আনন্দের আবহাওয়া এল টেবিলে। কিন্তু যে মুহূর্তে বাইরের সিঁড়িতে পান্তালিমনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল সঙ্গে-সঙ্গে সবাই গম্ভীর। ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল বুড়ো, প্রকাণ্ড একটা আল্‌ডারের ডাল টেনে নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

—এই নে দ্যাখ্! যতো সব লম্বা লম্বা জিভ এবার নিজের চোখে দেখে নে! লম্বা লেজ-ওলা শেয়ালনীর দল! ডাল পাওয়া যাবে না মানে? এটা তাহলে কী? বুড়ি ডাইনী, পিঠের ওপর এটা কেমন লাগে তাও পরখ নিতে পারবি! আমাকে তুই জ্বালাবি

ডালটা এত বড়ো যে, রান্নাঘরে জায়গা হয় না। একটা হাঁড়ি উলটে দিয়ে বুড়ো শেষ অবধি দুম্ করে ডালটা ছুঁড়ে দিল সিঁড়ির ওপর। তারপর ভয়ানক হাঁপাতে হাঁপাতে টেবিলের ধারে এসে বসল।

বুড়োর সব আনন্দ উপে গেছে। ফোঁস্‌ফাস্ করে খেয়ে চলল, মুখে রা নেই। অন্যরাও মুখ বুজেই ছিল। দারিয়া টেবিলের ওপর থেকে চোখ তুলতে পারছে না পাছে হেসে ফেলে। ইলিনিচ্‌না নিশ্বাস ফেলে। প্রায় শুনতেই পাওয়া যায় না এমনিভাবে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—হে ভগবান! আমাদের পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্তি নেই! কেবল দুনিয়ারই হাসি পাচ্ছিল না। বুড়ো যখন বাইরে গিয়েছিল তখন নাতালিয়া অদ্ভুত-ভাবে একবার জোর করে হেসেছিল, এবার নাতালিয়াও বিমর্ষ আর উদাসীন হয়ে রইল।

পান্তালিমন মাঝে মাঝে সকলের দিকে একেকবার কট্‌মট করে চেয়ে কড়া গলায় হুকুম চালাচ্ছে—নুনটা এদিকে দাও! রুটি কই!

পারিবারিক কলহের পরিণতিটা হল অস্বাভাবিক ধরনের। সকলেই চুপ করে আছে, এর মধ্যে ছোট্ট মিশাৎকা তার দাদুকে নতুন করে চটিয়ে দিলে। আগে ঝগড়া বাধলে মিশাৎকা প্রায়ই শুনতে পেত ঠাকুরমা ওর দাদুকে যা-তা বলে গালাগাল করে, তার ওপর এখন দাদু সকলকে পেটাবে বলে শাসাচ্ছে, রান্নাঘর তোলপাড় করছে দেখে ও হঠাৎ একেবারে বিগড়ে গিয়ে গলা কাঁপিয়ে নাকের ফুটো ফুলিয়ে বলে উঠল,

- খোঁড়া শয়তানটার রকম-সকম দ্যাখো না! তোমার মাথায় লাঠি পড়া চাই, তাহলে আর ঠাক্‌মাকে আর আমাদের শাসানো চলবে না।

এই কথা তুই আমাকে বললি? তোর দাদুকে?

--হ্যাঁ, তোমাকেই বলেছি! মিশাৎকা বুক ফুলিয়ে জবাব দেয়।

তোর ঠাকুরদাকে এসব কথা শোনাবার সাহস হল! এত দূর স্পর্ধা?

-তাহলে এত গলাবাজি করছ কেন?

- দ্যাখো কেমন খুদে শয়তান! -দাড়িতে হাত বুলিয়ে পান্তালিমন অবাক হয়ে ঘরের চারদিকে তাকায় এসব কথা ও শিখেছে তোর কাছে, বুড়ি মাগি! তুই ওকে এসব শেখাস!

- কে শেখায়? ও তোর মতো আর ওর বাপের মতোই বেয়াড়া হয়েছে! রেগে গিয়ে ইলিনিচ্‌না আত্মপক্ষ সমর্থন করে।

নাতালিয়া উঠে মিশাৎকাকে চড় কষিয়ে ধমক লাগাল :

—দাদুর সঙ্গে ওভাবে কথা বলতে হয় না! শুনতে পেয়েছিস কানে?

মিশাৎকা ফুঁপিয়ে উঠে গ্রিগরের হাঁটুতে মুখ লুকালো। কিন্তু পান্তালিমন ভাবতেই পারেনি তার নাতির একটা মেজাজ হয়েছে। সে টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে। দাড়ির ওপর গড়িয়ে-আসা চোখের জল না মুছেই মহা খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

—ওরে গ্রিশ্‌কা! আমার বেটা! মায়ের পুত! বুড়ি ঠিক কথাই বলেছে! আমাদেরই ঘরের ছেলে বটে! একেবারে খাঁটি মেলেখফের রক্ত! এই তো সেই রক্তের মেজাজ। এ তো বাবা মুখ বুজে মেনে নেবার নয়। ছোট্ট নাতিটা। আমার সোনামণি! এই নে, মার্ এই বোকা বুড়োটাকে যা দিয়ে খুশি। দাড়ি ধরে নিয়ে যা টেনে!—গ্রিগরের কাছ থেকে মিশাৎকাকে টেনে নিয়ে বুড়ো ওকে মাথার ওপর তুললে।

প্রাতরাশ শেষ করে টেবিল ছেড়ে উঠল ওরা। মেয়েরা হাত-মুখ ধোয়, কিন্তু পান্তালিমন একটা সিগারেট ধরিয়ে গ্রিগরকে বলে :

—তুই তো শুধু বেড়াতে এসেছিস, তাই তোকে বলা তেমন সাজে না। কিন্তু আর কীই বা করতে পারি? ওই বেড়াটা সোজা করে বসিয়ে ফসল মাড়াইয়ের আঙিনাটা একটু আলাদা করে দিতে চাই। তুইও আমার সঙ্গে একটু হাত লাগা। সবই ধসে পড়েছে কিনা, তাছাড়া এখন বাইরের লোককেও বলা চলে না। সকলেরই তো এক অবস্থা।

গ্রিগর নিজে থেকেই রাজি হয়। দুপুরের খাওয়ার সময় অবধি দুজন একসঙ্গে উঠোনে গিয়ে বেড়া সোজা করে।

বেড়ার খুঁটি সোজা করতে গিয়ে বুড়ো বলে :

—জমিতে মই দেবার সময় এখন, অথচ জানি না আরো ঘাস গজাতে দেব কিনা। খামারটার ব্যাপারে তোর কি মনে হয়? মেহনত করে কিছু ফয়দা হবে? একমাস বাদে হয়তো লাল সেপাইরা আবার এসে হানা দেবে। আবার সব চলে যাবে ওই শয়তানদের হাতে।

গ্রিগর সরাসরিই স্বীকার করলে—আমি জানিনে বাবা। কী যে দাঁড়াবে ঘটনা, কে জিতবে, কিছুই জানা নেই। চালিয়ে যেতেই হবে যাতে গোলাঘর বা উঠোন খালি না পড়ে থাকে। এখন যা দিনকাল, সবই বেফজুল। ধরো না আমার শ্বশুরের কথাই। সারা জীবন চেঁচিয়ে গলা ফাটাল, পয়সা করল, নিজের রক্ত জল করল, অপরের রক্ত নিংড়ে নিল, আর এখন তার রইল কী? উঠোনের মাঝখানে কয়েকটা পোড়া খুঁটি সম্বল।

দীর্ঘশ্বাস চেপে বুড়ো সায় দিলে—হ্যাঁ, সেই কথাই ভাবছিলাম রে খোকা।

খামার সম্পর্কে আর কোনো কথা তোলার চেষ্টা করলে না বুড়ো। একেবারে সেই বিকেল নাগাদ ফসল মাড়াই আঙিনার ফটকটা খাড়া করতে গিয়ে গ্রিগর অনাবশ্যক পরিশ্রম করছে দেখে বুড়ো বিরক্ত হয়ে সরাসরি চটা গলায় বললে :

—যাহোক একটা করে রাখ্ না! অতো ঝামেলা পোয়াচ্ছিস কেন শুধু-শুধু? সারা জীবন তো আর খাড়া হয়ে থাকছে না ওটা।

অর্থাৎ, বুড়ো এই প্রথম বুঝতে শুরু করেছে সাবেকী কায়দায় জীবনটাকে গড়ে তোলার সব চেষ্টাই এখন বৃথা।

ঠিক বেলা ডোবার আগে কাজ শেষ করে গ্রিগর বাড়ির মধ্যে ঢোকে। বড়ো ঘরে নাতালিয়া একা রয়েছে। ছুটির দিনের মতো পোশাক পরেছে ও। নীল পশমী ঘাগরা আর বুকের কাছে ছুঁচের-কাজ-করা লেসের আস্তিনওয়ালা হালকা-নীল পপ্‌লিনের জ্যাকেটে ওকে মানিয়েছে বেশ। মুখটা পেলব গোলাপী, একটু আগেই সাবান ঘষেছে বলে বেশ একটু চকচকেও দেখাচ্ছে। তোরঙ্গের মধ্যে কী যেন খুঁজছিল সে, গ্রিগরকে দেখেই ডালাটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসল।

গ্রিগর তোরঙ্গটার উপর বসে বললে :

—একটুখানি বোসো, কালই তো চলে যাচ্ছি, দুজনায় আর কথা বলার ফুরসতই পাব না।

সামান্য একটু অবাক হয়ে আড়চোখে গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে নাতালিয়া বিনীত-ভাবে বসল ওর পাশে। কিন্তু গ্রিগর আচমকা ওর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে আদর করে বললে :

—তোমাকে কিন্তু এমন মোলায়েম লাগছে যেন কোনদিন অসুখই করেনি।

—সেরে উঠেছি তো।...আমাদের মেয়েদের বেড়ালের প্রাণ। লাজুকভাবে হেসে মাথা নিচু করলে নাতালিয়া।

গ্রিগর ওর কানের নরম গোলাপী লতিটা লক্ষ্য করছে, নরম ক'গাছি চুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় ঘাড়ের পীতাভ চামড়াটা। জিজ্ঞেস করে :

—তোমার চুল কি উঠে যাচ্ছে?

—প্রায় সবই তো উঠে গেল। খোলস বদলাচ্ছি কিনা, শিগগিরই টাক পড়ে যাবে মাথায়।

হঠাৎ গ্রিগর প্রস্তাব করে—তোমার মাথাটা আমি কামিয়ে দেব?

সে কী!—অবাক হয়ে বলে ওঠে নাতালিয়া—কিন্তু কেমন দেখাবে তখন আমায়?

—কামিয়ে ফেলাই সবচাইতে ভালো, নয়তো আর চুল গজাবে না।

—মা বলেছিল কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেবে। সলজ্জভাবে হেসে নাতালিয়া বলে, তারপর কুশলী-হাতে একটা সাদা-ধবধবে, গাঢ় করে নীল-দেওয়া ওড়না মাথায় জড়ায়।

গ্রিগরের পাশে নাতালিয়া—ওর বউ, মিশাৎকা আর পলিউশ্‌কার মা। গ্রিগরের জন্যই সে আজ সেজেছে, সাবান দিয়ে মুখ ধুয়েছে। অসুখের পর ওর চুলগুলো কেমন বিচ্ছিরি হয়েছে দেখতে, তাই চট্ করে ওড়নাটা টেনে দিয়ে ও একপাশে মাথা হেলিয়ে বসে—এমন করুণ, এমন হতশ্রী অথচ তবু যেন কতো সুন্দর দেখায় ওকে নির্মল এক অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে। নাতালিয়া সব সময় উঁচু কলারের জামা পরে ওর ঘাড়ের ওপরের বিশ্রী কাটা দাগটা চাপা দেবার জন্য: এ সবই তো গ্রিগরেরই জন্যে। একটা স্নেহময় অনুভূতির আবেগে আর্দ্র হয়ে ওঠে গ্রিগরের মন। আদর করে কিছু বলতে চায় ওকে, কিন্তু কথা খুঁজে পায় না। নীরবে ওকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে চুমু দেয় ওর ফর্সা উঁচু কপালে আর করুণ চোখ দুটিতে।

গ্রিগর আগে কোনোদিন ওকে আদর করে এতটা বেপথু করে দেয়নি। চিরজীবন ওর পথের কাঁটা হয়ে ছিল আকসিনিয়া। স্বামীর এই আবেগের প্রকাশে, উত্তেজনায় অধীর হয়ে নাতালিয়া তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে।

মিনিটখানেক নির্বাক বসে থাকে ওরা। পশ্চিম সূর্যের ম্লান কিরণ এসে পড়েছে ঘরে। সিঁড়ির ওপর বাচ্চারা খেলা করছে। বসে থেকে ওরা শুনতে পায় দারিয়া উনোন থেকে গরম মাটির-হাঁড়ি নামাচ্ছে আর নালিশের সুরে শাশুড়িকে বলছে : তুমি বোধহয় গরুগুলোকে রোজ দোয়াচ্ছ না। বুড়ো গরুটা তো মনে হচ্ছে যেন আগের চেয়েও কম দুধ দিচ্ছে।

গরুর পাল ফিরল মাঠ থেকে। ওরা হাম্বা-হাম্বা করে আর ছেলেপিলেরা সপ্ সপ্ করে চাবুক হাঁকায়। গাঁয়ের বলদটা থেকে-থেকে ডাকছে মোটা ভারী গলায়। ডাঁশ-মাছির কামড় খেয়ে বলদটার লোমশ বুক আর খাড়া গোল পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরছে। বলদটা খেপে গিয়ে মাথা ঝাঁকায়; আস্তাখফদের ওয়াট্‌ল্-লতার বেড়াটা ছোট-ছোট মোটা শিং দিয়ে উপড়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যায়। নাতালিয়া জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললে :

—জানো, ওই বলদটাও ডন পার হয়ে ওদের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। মা বলল, গাঁয়ে গুলিগোলা চলতে শুরু করতেই ওটা নাকি গোয়াল থেকে বেরিয়ে সোজা নদী সাঁতরে ওপারে গিয়ে নলখাগড়ার বনে গা ঢাকা দিয়েছিল আর ওইভাবেই ছিল সারাক্ষণটি।

গ্রিগর চুপচাপ কী যেন ভাবে। নাতালিয়ার চোখ দ্রটো অমন বিষাদমাখা কেন? মাঝে মাঝে আবার গোপন রহস্যময় হেঁয়ালির মতো কিছ্ব প্রথমে দেখা দিয়েই ফের অদৃশ্য হয়ে যায় ওর চোখ দ্রটিতে। এমন কি আনন্দের মাঝখানেও ও কেমন যেন বেদনাচ্ছন্ন। একটু যেন দ্রর্বোধ্য মনে হয় ওকে।...হয়তো বা ভিয়েশেন্স্কায় আকসিনিয়ার সঙ্গে গ্রিগরের মেলামেশার গ্রজব কানে উঠেছে ওর? অবশেষে গ্রিগর জিজ্ঞেস করেই বসে:

—অমন মন-মরা হয়ে আছ কেন আজ? তোমার মনের মধ্যে কী আছে নাতাশা? আমাকে খ্রলে বলতে আপত্তি আছে?

গ্রিগর ভেবেছিল ও কাঁদবে, অন্রযোগ করবে। কিন্তু নাতালিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে জবাব দেয়:

—না না, ও তোমার অমনি মনে হচ্ছে তাই। আমি ঠিক আছি, আমি ঠিক আছি...। তবে এখনো প্ররোপ্ররি ভালো হয়ে উঠতে পারিনি। মাথাটা ঘোরে, যদি ঝ্রুকে পড়ি কিংবা নিচু হয়ে কিছ্ব তুলতে যাই তাহলে চোখের সামনে অন্ধকার দেখি।

গ্রিগর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে, তারপর আবার জিজ্ঞেস করে:

—এখানে তুমি যখন একা ছিলে, কোনো অস্রবিধা হয়নি? কেউ কোনো ঝামেলা করেনি তো?

—না। এ তুমি কী বলছ? অস্রখে পড়ে শ্রয়ে-শ্রয়েই তো কাটালাম।—সোজা গ্রিগরের চোখের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হাসলোও নাতালিয়া। খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কাল সকালেই চলে যাচ্ছ?

—একেবারে ভোরে।

—কিন্তু আরেকটা দিন এখানে কাটিয়ে গেলে পারতে না?—একটা অনিশ্চিত ভীরু আশার আভাস ফুটে ওঠে নাতালিয়ার গলার স্বরে। মাথা নেড়ে একটা নিশ্বাস ফেলে ফের ও বলে:

কী জানি কি হবে। তোমাকে পদকচিহ্নগ্রলো পরতে হবে নাকি?

—হ্যাঁ, তা হবে বই কি।

—বেশ, তাহলে তোমার জামাটা খ্রলে দ আলো থাকতে থাকতেই ওগ্রলো সেলাই করে দি।

গ্রিগর জামাটা খ্রললে 'উঃ আঃ' করে। এখনো ওটা ঘামে ভিজে রয়েছে। পিঠে আর কাঁধে যেখানেই ওর ফৌজী স্ট্র্যাপগ্রলো কাপড়ে ঘষা খেয়েছে সেখানেই একেকটা ভিজে দাগ উঠেছে ফুটে। নাতালিয়া তোরঙ্গ থেকে একজোড়া রং-জ্বলা খাকি পদক-চিহ্ন বের করে জিজ্ঞেস করে:

—এগ্রলোই তো?

—হ্যাঁ। ওগ্রলো তাহলে রেখে দিয়েছিলে?

—তোরঙ্গটা মাটির নিচে প্ঁতে রেখেছিলাম।—অস্পষ্টভাবে জবাব দিয়ে নাতালিয়া ছ্ঁচে স্রতো পরায়। চুপিচুপি ধ্রলোমাখা ফৌজী কোর্তাটা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে সাগ্রহে নোন্তা ঘামের গন্ধটা শোঁকে—এ গন্ধ ওর একান্ত আদরের।

গ্রিগর অবাক হয়ে বলে—ওটা আবার করলে কেন?

—এতে যে তোমারই গন্ধ।—বলতে বলতে চক্চকে হয়ে ওঠে নাতালিয়ার চোখ। হঠাৎ রাঙা হয়ে ওঠা গাল দ্রটো ল্রকোবার জন্য ও মাথা নিচু করে আর নিপ্রণ হাতে সেলাই শ্ররু করে দেয়।

গ্রিগর কোর্তাটা গায়ে দেয় ফের। মুখটা ওর অন্ধকার হয়ে উঠেছে। কাঁধজোড়া কোঁচকায় ও।

নাতালিয়া স্বামীর দিকে সরাসরি তারিফের দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে—এগুলো পরলে তোমাকে বেশ দেখায় !

কিন্তু গ্রিগর আড়চোখে বাঁ-কাঁধটার দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলে :

—ওগুলো আর দু'চক্ষে দেখতে পারিনে আমি! তুমি কিছু বোঝো না !

বড়ো ঘরের তোরঙ্গটার ওপর ওরা দু'জন অনেকক্ষণ অবধি বসে থাকে এ ওর হাতে হাত রেখে, চুপচাপ মগ্ন হয়ে থাকে যে যার নিজের চিন্তায়।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে। বাড়ির ঘন বেগুনি ছায়াগুলো যখন ঠাণ্ডা মাটির বুকে দীর্ঘায়িত হয়ে পড়ে তখন ওরা দু'জন রান্নাঘরে ঢোকে।

* *

এইভাবে কেটে যায় রাতটা। সূর্য ওঠা অবধি আকাশে ঝিলিক দিয়েছে গ্রীষ্মের বিজলি। আকাশ যতোক্ষণ না ফর্সা হয় ততোক্ষণ অবধি চেরী বাগিচার দোয়েলগুলো সারারাত ধরে গুলজার করেছে। গ্রিগর জেগে উঠেও অনেকক্ষণ চোখ বুজে দোয়েলের মিষ্টি সুরেলা গান শুনল, তারপর নাতালিয়াকে না তুলে নিঃশব্দে উঠে কাপড়জামা পরে বেরিয়ে এল উঠোনে।

পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ গ্রিগরের ঘোড়াটাকে আগেই খাইয়ে দিয়েছিল। সেপাইদের মতো আগে থাকতে ভেবে নিয়ে সে বললে :

—এটার পিঠে চড়ে একবার নিয়ে আসব নাকি চান করিয়ে?

—চান না হলেও ওর চলবে।—ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় জড়োসড়ো হয়ে গ্রিগর জবাব দিলে।

ওর বাপ বললে—ভালো ঘুম হয়েছে?

—খুব ভালো! তবে দোয়েলগুলোই জ্বালাতন করেছে! সারা রাত যেভাবে চেঁচামেচি করেছে সে আর কহতব্য নয়।

পান্তালিমন ঘোড়ার পিঠ থেকে দানার ঝুড়িটা তুলে নিয়ে হাসল।

—ওদের যে আর কিছু করার নেই রে খোকা। একেক সময় এই নন্দন-কাননের পাখিগুলোকে দেখলে হিংসেও হয়।.. ওরা না জানে লড়াই, না জানে ক্ষয়ক্ষতি...।

প্রোখর ঘোড়া চালিয়ে এল ফটকের কাছে। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। বরাবরকার মতোই খোশমেজাজে আছে, অনবরত বক্‌বক্ করছে। ঘোড়ার লাগামটা একটা খুঁটিতে বেঁধে সে গ্রিগরের দিকে এগিয়ে এল। মোটা কাপড়ের শার্টটা কড়া ইস্ত্রি চালানো। কাঁধের ওপর পদকচিহ্ন—নতুনের মতো ঝক্‌ঝকে।

প্রোখর চেঁচিয়ে বলে উঠল—গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ, তুমিও পদকচিহ্ন লাগিয়েছ দেখছি? এতদিন এ আপদগুলো পড়েই ছিল! এবার তো পরলাম, তবে টিঁকবে না মোটেই। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোও শেষ হবে। বউকে বলছিলাম : 'ওরে হাঁদা, ওগুলো আর সেলাই করিসনি, পরে আর খোলাই যাবে না! শুধু এমন করে টেকে দে যাতে বাতাসে না উড়ে যায়। তাতেই কাজ চলে যাবে।' আমাদের ব্যাপার তো জানো। যদি বন্দী হয়ে যাই তা হলে ওরা চট্ করে বুঝে নেবে আমি অফিসার না হলেও

একজন সিনিয়ার সেপাই তো বটেই। তখন ওরা চেঁচাবে : 'এই অমুক-তমুক, কী করে পদকচিহ্ন পেতে হয় সেটা তো বেশ জানিস, এবার শেখ্ কী করে ফাঁসির দড়িতে মাথা গলাতে হয়!' দ্যাখো না কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে? একেবারে ভাঁড়ের মতো!

প্রোখরের পদকচিহ্নগুলো নিশ্চয়ই খুব তাড়াহুড়ো করে লাগানো হয়েছিল, তাই জায়গামতো বসেনি কোনোটা।

পান্তালিমন হো-হো করে হেসে উঠল। উশ্‌কোখুশ্‌কো দাড়িগোঁফের ফাঁকে ওর সাদা দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল—বয়েসের ছাপই পড়েনি যেন।

—বেশ সেপাই হয়েছো যাহোক! তাহলে তুমি বলছ বিপদের লক্ষণ দেখলেই পদক-তকমা সব খুলে ফেলতে শুরু করবে?

প্রোখর হেসে বললে—তা নয়তো কী?

গ্রিগর হাসিমুখে তার বাপকে বললে :

—দেখেছ তো কেমন একটি চমৎকার আরদালি পাকড়েছি আমি? যদি কখনো বিপদেও পড়ি, ও কাছে থাকতে আমার কোনো ভয় নেই!

প্রোখর কৈফিয়তের ঢঙে বলে—সে না হয় বুঝলাম গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ, কিন্তু তুমি তো জানো...আজ তুমি মরছ, কাল মরব আমি।—অবলীলাক্রমে পদকচিহ্নগুলো ছিঁড়ে নিয়ে প্রোখর নির্বিকারভাবে সেগুলো পকেটে পোরে, বলে—যখন ফ্রন্টের কাছাকাছি যাব তখন ফের সেলাই করে নেব।

গ্রিগর চট্‌পট প্রাতরাশ সেরে পরিবারের সকলের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

ইলিনিচ্‌না ছেলেকে চুমু খেয়ে আবেগভরে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—স্বর্গের দেবী তোকে রক্ষা করুন! আমাদের তুই তো এখন রইলি শেষ সম্বল...।

গ্রিগর কাঁপা কাঁপা গলায় বলে—এবার তাহলে আমায় বিদায় দাও। কান্নাকাটি নয়! আসি তাহলে।—ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যায় ও।

ইলিনিচ্‌নার কালো তিনকোণা রুমালটা মাথার ওপর ফেলে নাতালিয়া ফটকের বাইরে বেরিয়ে আসে। ছেলেমেয়েরা ওর ঘাগরা আঁকড়ে ধরে থাকে। পলিউশ্‌কার কান্না যেন বাঁধ মানতে চায় না। ঢোঁক গিলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে :
—বাবাকে যেতে দিও না! যেতে দিও না মা-মণি! লড়াইয়ে মরে যাবে যে। ও বাপি, যুদ্ধে যেয়ো না তুমি!

মিশাৎকার ঠোঁট কাঁপছিল, কিন্তু কাঁদেনি ও। মরদের মতো নিজেকে সামলে রেখেছে। ছোট বোনটিকে ও ধমক লাগায় :

—বাজে বকিস্‌নি গাধার মতো! লড়াইয়ে সবাই মরে না!

ঠাকুরদার কথা ও বেশ ভালো করেই মনে করে রেখেছিল—কসাকরা কখনো কাঁদে না, কসাকদের কাছে কান্নাটা ভয়ানক লজ্জার বিষয়। কিন্তু ওর বাপ যখন ঘোড়ায় উঠে মিশাৎকাকে জিনের ওপর তুলে নিয়ে চুমু খায় তখন ও অবাক হয়ে দ্যাখে বাপের চোখের পাতাও জলে ভিজে উঠেছে। এরপর মিশাৎকা আর সামলাতে পারে না নিজেকে। বন্যার ধারায় নেমে আসে ওর চোখের জল। বাপের বুকের মধ্যে মুখ লুকোয় ও, মুখ লুকোয় চামড়ার স্ট্র্যাপগুলোর মধ্যে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে :

—দাদু যাক্ না লড়াই করতে! দাদু কেন ফিরে এল? তুমি যেও না বাবা...

গ্রিগর সাবধানে ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে দিলে। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নিঃশব্দে ঘোড়াকে ইশারা দিলে চলবার জন্য।

এ বাড়ির সিঁড়ির নিচের মাটিটা কতোবার খুর দিয়ে বিপর্যস্ত করেছে গ্রিগরের ঘোড়া! কতোবার এ পথ দিয়ে গ্রিগরকে টেনে নিয়ে গেছে সে, পথহীন স্তেপ-প্রান্তর পেরিয়ে চলে গেছে রণাঙ্গনে; নিয়ে গেছে করাল মৃত্যুর শিকার কসাকদের লড়াইয়ের প্রাঙ্গণে, যেখানে কসাকদের গানের ভাষায় "প্রতিদিন প্রতিক্ষণে শোক আর শঙ্কার প্রহর গুণি!" কিন্তু আজকের এই চমৎকার ভোরটির মতো এর আগে এত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ও গ্রাম ছাড়েনি কখনো।

একটা অস্পষ্ট পূর্বানুভূতি ওর মনটাকে পীড়া দিতে থাকে উৎকণ্ঠা আর অশুভ সূচনার ইঙ্গিতে। জিনের চূড়োয় লাগামটা ছেড়ে দিয়ে ও সোজা এগিয়ে যায় টিলার মাথা অবধি। তারপর ফিরে তাকায় পেছনদিকে। চৌরাস্তার মোড়ে ধুলোরাস্তাটা আলাদা হয়ে চলে গিয়েছে হাওয়া-কলের দিকে, সেখান থেকে ও ঘাড় ফিরিয়ে দ্যাখে। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে শুধু নাতালিয়া। আর ভোর সকালের তাজা হাওয়া ওর হাত থেকে উড়িয়ে নিচ্ছে শোকের চিহ্ন সেই কালো রুমালখানা।

* * *

হাওয়ার চাবুক খেয়ে মেঘের দল ফেনিল হয়ে ভেসে ছুটে চলেছে আকাশের নীল নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে। দিগ্বলয়ের রেখায়িত প্রান্তে কুয়াশার আমেজ। ঘোড়া দুটো চলেছে হেঁটে হেঁটে। জিনের ওপর ঢুলছে প্রোখর। গ্রিগর দাঁতে দাঁত চেপে বারবার ফিরে তাকায়। বেতসবনের সবুজ গোড়াগুলো খানিকক্ষণ অবধি চোখে পড়ে ওর, দেখতে পায় ডনের রুপোলি এঁকেবেঁকে চলা খেয়ালী স্রোতরেখা, হাওয়া-কলের মন্থর আবর্তন। এর পরেই পথটা আচমকা মোড় নিয়েছে দক্ষিণে। পায়ে মাড়ানো ফসলী খেতের ওপাশে হারিয়ে যায় ঘাসবনে ঢাকা নদীর পাড়, ডন, আর সেই হাওয়া-কল।...শিস্ দিয়ে সুর ভাঁজতে থাকে গ্রিগর, ঘামের ছোট ছোট ফোঁটা জেগে-ওঠা ঘোড়ার সোনালি-বাদামি ঘাড়টার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আর ফিরে তাকায় না পেছনপানে।...আর নয়, শেষ হোক্ এ লড়াই! চিরার ধার বরাবর যুদ্ধ চলছিল তখন, তারপর এল ডনের পাড়ে, আর এখন শোনা যাবে খপার, মেদভেদিয়েৎসা আর বুজুলুক নদীর ধারে তার বজ্রহুঙ্কার। গ্রিগর ভাবে : দুশমনের বুলেট তাকে শেষ অবধি কোথায় ধরাশায়ী করবে, কীইবা যায় আসে তাতে?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত